মাসুদ রানা

রিপোর্টার

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

দুই খণ্ড একত্রে

মাসুদ রানা

রিপোর্টার

[দুই খন্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

রিপোর্টারের গতি সর্বত্র।
একজন এজেন্ট বা অপারেটর যেখানে
যেতে পারে না, একজন রিপোর্টার সেখানে
ঢুকে পড়তে পারে অনায়াসে।
কাজেই এই কাভারটা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিলেন
বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের সুযোগ্য কর্ণধার
মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান।
খুব একচোট প্রাণ খুলে হেসেছিল মাসুদ রানা
বেচারি সোহানা, সলীল আর জাহেদকে
জার্নালিজমের ট্রেনিং নিতে দেখে। ওদের দুরবস্থায়
লাভ করেছিল অনাবিল আনন্দ। কিন্তু…
দ্বিতীয় ব্যাচে নোটিস বোর্ডে উঠল রানার নাম।
তারপর?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা

রিপোর্টার

[দুই খণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-7121-2

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৭৭
পঞ্চম প্রকাশ: ২০০০

প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮৯৪০৫৩ (M-M)
জি. পি. ও বক্স: ৮৫০
E-mail. sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana
REPORTER
(Part I&II)
A Thriller Novel
By Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

পঁয়তাল্লিশ টাকা

রিপোর্টার-১ ৫–১৩৪
রিপোর্টার-২ ১৩৫–২৬৪

মাসুদ রানার ভলিউম

১-২-৩	ধ্বংস পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ	৪৯/-
৪-৫-৬	দুঃসাহসিক+মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা+দুর্গম দুর্গ	৪২/-
৮-৯	সাগর সঙ্গম-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০-১১	রানা! সাবধান!!+বিস্মরণ	৪৪/-
১২-৫৫	রত্নদ্বীপ+কুউউ	৪১/-
১৩-১৪	নীল আতঙ্ক-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১৫-১৬	কায়রো+মৃত্যু প্রহর	৩৭/-
১৭-১৮	গুপ্তচক্র+মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র	৩৭/-
১৯-২০	রাত্রি অন্ধকার+জাল	৩১/-
২১-২২	অটল সিংহাসন+মৃত্যুর ঠিকানা	৩৪/-
২৩-২৪	ক্ষ্যাপা নর্তক+শয়তানের দূত	৩২/-
২৫-২৬	এখনও ষড়যন্ত্র+প্রমাণ কই	৩৩/-
২৭-২৮	বিপদজ্জনক-১,২ (একত্রে)	২৯/-
২৯-৩০	রক্তের রঙ-১,২ (একত্রে)	৩১/-
৩১-৩২	অদৃশ্য শত্রু+পিশাচ দ্বীপ (একত্রে)	৩৫/-
৩৩-৩৪	বিদেশী গুপ্তচর-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৩৫-৩৬	ব্ল্যাক স্পাইডার-১,২ (একত্রে)	৩০/-
৩৭-৩৮	গুপ্তহত্যা+তিনশত্রু	৩৪/-
৩৯-৪০	অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
৪১-৪৬	সতর্ক শয়তান+পাগল বৈজ্ঞানিক	৪০/-
৪২-৪৩	নীল ছবি-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৪৪-৪৫	প্রবেশ নিষেধ-১,২ (একত্রে)	৩১/-
৪৭-৪৮	এসপিওনাজ-১,২ (একত্রে)	২৯/-
৪৯-৫০	লাল পাহাড়+হৃৎকম্পন	৩৫/-
৫১-৫২	প্রতিহিংসা-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
৫৩-৫৪	হংকং সম্রাট-১,২ (একত্রে)	২৮/-
৫৬-৫৭-৫৮	বিদায়, রানা-১,২,৩ (একত্রে)	৪৬/-
৫৯-৬০	প্রতিদ্বন্দ্বী-১,২ (একত্রে)	২৯/-
৬১-৬২	আক্রমণ ১,২ (একত্রে)	৪১/-
৬৩-৬৪	গ্রাস-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৬৫-৬৬	স্বর্ণতরী-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৬৭-১৬১	পপি+বুমেরাং	৪৮/-
৬৮-৬৯	জিপসী-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৭০-৭১	আমিই রানা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
৭২-৭৩	সেই উ সেন-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
৭৪-৭৫	হ্যালো, সোহানা ১,২ (একত্রে)	৪১/-
৭৬-৭৭	হাইজ্যাক-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৭৮-৭৯-৮০	আই লাভ ইউ, ম্যান (তিনখণ্ড একত্রে)	৫৮/-
৮১-৮২	সাগর কন্যা-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৮৩-৮৪	পালাবে কোথায়-১,২ (একত্রে)	৪২/-
৮৫-৮৬	টার্গেট নাইন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৮৭-৮৮	বিষ নিঃশ্বাস-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৮৯-৯০	প্রেতাত্মা-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৯১-৯২	বন্দী গগল+জিম্মি	৩৭/-
৯৩-৯৪	তুষার যাত্রা-১,২ (একত্রে)	৪১/-
৯৫-৯৬	স্বর্ণ সংকট-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৯৭-৯৮	সন্ন্যাসিনী+পালের কামরা	৪১/-
৯৯-১০০	নিরাপদ কারাগার-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১০১-১০২	স্বর্গরাজ্য-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১০৩-১০৪	উদ্ধার-১,২ (একত্রে)	৩৭/-

১০৫-১০৬	হামলা-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০৭-১০৮	প্রতিশোধ-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১০৯-১১০	মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১১১-১১২	লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১১৩-১১৪	অ্যামবুশ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১১৫-১১৬	আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১১৭-১১৮	বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১১৯-১২০	নকল রানা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১২১-১২২	রিপোর্টার-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১২৩-১২৪	মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১২৫-১৩১	বন্ধু+চ্যালেঞ্জ	৪৪/-
১২৬-১২৭-১২৮	সংকেত-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-
১২৯-১৩০	স্পর্ধা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১৩২-১৫৩	শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী	৪৪/-
১৩৩-১৩৪	চারিদিকে শত্রু-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৩৫-১৩৬	অগ্নিপুরুষ-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১৩৭-১৩৮	অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১৩৯-১৪০	মরণকামড়-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১৪১-১৪২	মরণখেলা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১৪৩-১৪৪	অপহরণ-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৫-১৪৬	আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪৭-১৪৮	বিপর্যয়-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৯-১৫০	শান্তিদূত-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৫১-১৫২	শ্বেত সন্ত্রাস-১,২ (একত্রে)	৫০/-
১৫৮-১৬২	সময়সীমা মধ্যরাত+মাফিয়া	৪৬/-
১৫৯-১৬০	আবার উ সেন-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১৬২-১৬৫	কে কেন কিভাবে+কুচক্র	৪৭/-
১৬৩-১৬৪	মুক্ত বিহঙ্গ-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
১৬৬-১৬৭	চাই সম্রাজ্য-১,২ (একত্রে)	৬২/-
১৭২-১৭৩	জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৮০-১৮১	সত্যবাবা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১৮২-১৮৩	যাত্রীরা হুঁশিয়ার+অপারেশন চিতা	৪৩/-
১৯৫-১৯৬	ব্ল্যাক ম্যাজিক-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
১৯৭-১৯৮	তিক্ত অবকাশ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১৯৯-২০০	ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২০১-২০২	আমি সোহানা-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২০৩-২০৪	অগ্নিশপথ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
২০৫-২০৬-২০৭	জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে)	৫৩/-
২০৮-২০৯	সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২১০-২১১	গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২১৭-২১৮	অস্ত্রশিকারী১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২১৯-২২০	দুই নম্বর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২২১-২২২	কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২২৩-২২৪	কালোছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২২৫-২২৬	নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২২৭-২২৮	বড় ক্ষুধা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২২৯-২৩০	রণদ্বীপ-১,২ (একত্রে)	৪০/-
২৩১-২৩২-২৩৩	রক্তপিপাসা-১,২,৩ (একত্রে)	৪৮/-
২৩৪-২৩৫	অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৩৬-২৩৭	ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে)	৩১/-
২৩৮-২৩৯	নীল দংশন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪০-২৪১	সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২৪৫-২৪৬	নীল বজ্র ১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৫৪-২৫৫	সবাই চলে গেছে ১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২৫৬-২৫৭	অনন্ত যাত্রা ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২৫৮-২৬৫	রক্তচোষা+সাত রাজার ধন	৪৩/-
২৬৯-২৮৫	বিগব্যাঙ+মাদকচক্র	৪৩/-
২৭০-২৭১	অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ	৩৮/-
২৭২-২৭৩	মহাপ্রলয়+যুদ্ধবাজ	৩৯/-
২৭৪-২৭৫	প্রিন্সেস হিয়া ১,২ (একত্রে)	৪৬/-
২৭৬-২৯১	মৃত্যু ফাঁদ+সীমালঙ্ঘন	৪১/-
২৭৯-২৮২	মায়ান ট্রেজার+জন্মভূমি	৪৭/-
২৮০-২৮৯	ঝড়ের পূর্বাভাস+কালসাপ	৩৮/-
২৮১-২৭৭	আক্রান্ত দূতাবাস+শয়তানের ঘাঁটি	৪২/-
২৮৩-২৮৮	দুর্গম গিরি+তৃতীয়পের ভাস	৩৮/-
২৮৪-৩১২	মরণযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট	৪২/-
২৯২-২৯৮	রুদ্রঝড়+অগ্নিবাণ	৩৭/-
২৯৪-৩০৪	কর্কটের বিষ+সার্বিয়া চক্রান্ত	৪২/-
২৯৫-২৯৭	বোস্টন জ্বলছে+নরকের ঠিকানা	৩৩/-
২৯৬-৩০৬	শয়তানের দোসর+কিলার কোবরা	৪২/-
২৯৯-২৭৮	কুহেলি রাত+ধ্বংসের নকশা	৪০/-

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়

রিপোর্টার-১

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৪

এক

'আপনি স্বীকার করছেন সুটকেসটা আপনার?' দক্ষিণী টানওয়ালা গমগমে একটা গলা শোনা গেল অ্যামপ্লিফায়ারে।

'হ্যাঁ।'

'তাহলে এখন বলুন, বন্ডগুলো আপনি বস্টন, ম্যাসাচুসেটস থেকে মেক্সিকো সিটিতে ট্র্যান্সফার করলেন কিভাবে?'

প্রায় ঝিমোতে ঝিমোতে শুনছে রানা কথাগুলো। সিনেট এনকোয়্যারি কমিটি বসেছে আমেরিকার বৃহত্তম অর্থনৈতিক কেলেঙ্কারি সম্পর্কে তদন্ত করার জন্যে। সাড়ে তিন বিলিয়ন ডলার বন্ডের আকারে পাচার করা হচ্ছিল মেক্সিকোয়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এফ. বি. আই. ধরে ফেলেছে ব্যাপারটা। বমাল গ্রেফতার করা হয়েছে ব্রিটিশ হাউস অভ কমন্স-এর সদস্য মাইকেল কেইনকে।

চুপ করে আছে মাইকেল কেইন। ভাবছে কি বলবে। বুঝে ফেলেছে রানা, সবাই যা উত্তর দেয় এর উত্তরেও তার কোন ব্যতিক্রম হবে না। আমেরিকার কনস্টিটিউশনে তার সে অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। গলাটা একটু ঝেড়ে শব্দগুলো উচ্চারণ করল লোকটা—

'পুলিসের কাছে এবং এফ.বি.আই.-এর কাছে আগেই আমি জবানবন্দি দিয়েছি। একই কথা ক'বার বলব আপনাদের? আমি এ বিষয়ে জানি না কিছু।'

'তাহলে কিভাবে এল বন্ডগুলো আপনার সুটকেসে?'

'জানি না,' প্রচণ্ড বিরক্তির সঙ্গে বলল লোকটা।

নিজে নিজেই একটু মাথা নাড়ল রানা, নোট করল পয়েন্টটা। যতটা আশা করা গিয়েছিল তারচেয়ে কঠোর ভাবেই চলছে শুনানি: কিন্তু কাউকেই কব্জা করা যাচ্ছে না। আসলে একজন পরিচ্ছন্ন মার্জিত রুচির ইংরেজ ভদ্রলোক যে এরকম একটা নোংরা ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে তা ভাবতেই পারছে না কেউ। তার ওপর লোকটা আবার পার্লামেন্ট এবং সিটি কাউন্সিলের মেম্বার ইতোমধ্যে রানাও বুঝতে শুরু করেছে বড়সড় একটা ব্যাকিং রয়েছে লোকটার। যে কারণে আমেরিকার সিনেটের এনকোয়্যারি কমিটিও তেমনভাবে এঁটে ধরতে পারছে না সাক্ষীদের। বর্তমানে ইঙ্গ-মার্কিন সম্পর্কেই হয়তো ফাটল দেখা দেবে তাহলে।

লন্ডনে ফোন করে পরিস্থিতির পুরো বিবরণ দেবে জহির ভাইয়ের কাছে?— পুরো এনকোয়্যারিটাই একটা প্রহসনে পরিণত হয়েছে, খামোকা ওয়াশিংটনে বসে থাকার কোন মানে হয় না এখন আর। কিন্তু জানে রানা, রাজি হবেন না জহির ভাই। নির্ঘাত বলবেন, 'আরেকটা দিন থেকে এসো, রানা। শেষ পর্যন্ত কি হয় না হয় না জেনে চলে আসাটা ঠিক হবে না।'

আরও ঘণ্টাখানেক বসে রইল রানা। নাটকীয় কোন অগ্রগতি হলো না এনকোয়্যারির। নোটবুক বন্ধ করে পাশে বসা অন্যান্য সাংবাদিকদের দিকে চেয়ে একটু নড করে বেরিয়ে এল সে কমিটি রুম থেকে। ডালেস ইন্টারন্যাশনাল থেকে বিকেলের লন্ডন ফ্লাইট ধরবে ও।

সাত দিনের ছুটি নিয়ে ওয়াশিংটনে এসেছিল ও রানা এজেন্সির কিছু টুকটাক ঝামেলা সামলানোর জন্য। জহির ভাই নিজে ছুটি নেন না কখনও, এবং তাঁর প্রিয় পাত্রদের কেউ ছুটি নিক তা-ও চান না। যাদেরকে একবার মনে ধরে ভদ্রলোকের, তাদেরকে খাটিয়ে একেবারে মেরে ফেলার দশা করে ছাড়েন। তাঁর যুক্তি হচ্ছে: যথার্থই যারা কাজের লোক কাজ করার জন্যেই জন্ম হয়েছে তাদের। যাহোক, জহির ভাই পছন্দ না করলেও ছুটি দিতেই হয়, এবং কেউ ছুটি নিলে ছুটির ভেতর করার জন্যে একটা না একটা অ্যাসাইনমেন্ট তিনি চাপাবেনই তার ঘাড়ে। এবারেও কোন ব্যতিক্রম হয়নি। রানা ওয়াশিংটনে আসবে শুনেই উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন তিনি। 'খুব ভাল হলো, ব্যক্তিগত কাজগুলো সেরে সিনেট এনকোয়্যারি কমিটির হিয়ারিংটা সেরে আসবে।'

'মিস্টার মাসুদ রানা! লন্ডন যাত্রী—ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজের ডেস্কে রিপোর্ট করুন অনুগ্রহ করে।' ওয়াশিংটনের ডালেস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে ঢুকতেই মাইক্রোফোনে ভেসে এল কথাগুলো রানার কানে। রেশম কোমল মসৃণ গলায় পর পর তিনবার একই বাণী উচ্চারণ করল মেয়েটা।

ফেরার খবর দিয়ে লন্ডনে কেবলটা পাঠানো উচিত হয়নি—প্রথমেই মনে হলো রানার। জহির ভাই ছাড়া আর কেউ নয়। নির্ঘাত খবর পাঠিয়েছেন, আরেকটা দিন থেকে এসো।

এগিয়ে গেল রানা ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজের ডেস্কের দিকে। প্রশ্নবোধক চোখে চাইল ওর দিকে স্বর্ণকেশী মেয়েটা।

'আমি মাসুদ রানা।'

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, মিস্টার রানা,' মুখে মৃদু একটা হাসি ফুটিয়ে তুলে বলল মেয়েটা। 'আপনার নামে একটা কেবল আছে।'

আরেকবার মৃদু হেসে মুখ বন্ধ খামটা দিল সে রানার হাতে।

ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়েই খুলে ফেলল ও খামটা। জহির ভাইয়েরই পাঠানো কেবল। এক্ষুণি লাস ভেগাসে রওনা হতে বলা হয়েছে ওকে। কে এক সিনেটর জেমস থম্পসনকে কাভার করতে হবে। এক্সক্লুসিভ কিছু খবর কিনতে চায় 'দ্য নিউজ'। রানাকে সংগ্রহ করতে হবে খবরগুলো। সম্ভব হলে ইন্টারভিউ নিতে হবে সিনেটরের। পাঁচ হাজার ডলার পর্যন্ত উঠবার অধিকার দেয়া হয়েছে ওকে ডাইম প্যালেস মোটেলে সীটও বুক করে রাখা হয়েছে। কোথায় কার সঙ্গে দেখা করতে হবে তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে শেষে।

মেজাজটা খিঁচড়ে গেছে রানার। 'লন্ডনে আর যাচ্ছি না আমি,' বিরস কণ্ঠে ডেস্কের মেয়েটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল ও। জহির ভাইয়ের গোপন এক্সক্লুসিভ সংবাদের সূত্র অনুসন্ধানের জন্যে এগিয়ে গেল একটা নিউজস্ট্যান্ডের

দিকে। লন্ডনের একমাত্র বাঙালী মালিকানাধীন দৈনিক 'দ্য নিউজ' এর সর্বশেষ সংখ্যার একটা কপি কিনল ও।

প্রথম পৃষ্ঠায়ই পেল রানা সিনেটর জেমস থম্পসনের খবরটা। এক যুবতী মেয়ের ধর্ষিতা মৃতদেহ পাওয়া গেছে সিনেটরের হোটেল স্যুইটের বাথরুমে। পুরো খবরটা পড়তে পড়তে ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল রানার—সিনেটর জেমস থম্পসন, সিনেটের বৈদেশিক সাহায্য বিষয়ক সদস্য। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে সাহায্য দেয়ার পক্ষে সিনেটে এবং বাইরে সব সময়ই সোচ্চার কণ্ঠে বক্তব্য রাখেন জেমস থম্পসন। বাংলাদেশকে বড় একটা গ্র্যান্ট পেতে সাহায্য করেছিলেন সিনেটর কদিন আগে—মনে পড়ল রানার। আগামী নির্বাচনে নেভাডা স্টেটের গভর্নর পদের জন্যে ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা সিনেটর, জেমস থম্পসনের।

ও আমেরিকাতে আছে বলেই ওকে কাভার করতে বলা হলো ঘটনাটা না উপরের কোন নির্দেশ আছে এ ব্যাপারে, বুঝতে পারল না রানা। উপর মানে বুড়ো মিঞা—মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান। সিনেটরের বাথরুমে মৃতদেহ পাওয়াটা যে-সে ঘটনা নয়। আমেরিকায় তো বটেই, সারা পৃথিবী জুড়ে ঢি ঢি পড়ে যেতে পারে। বাংলাদেশের প্রতি বিশেষভাবে সহানুভূতিসম্পন্ন সিনেটর জেমস থম্পসন। এখন এই ঘটনায় যদি পদত্যাগ করতে হয় সিনেটরকে, তবে বাংলাদেশের জন্যে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে দেখা দেবে ব্যাপারটা।

লাস ভেগাস।

রানওয়ের কংক্রিট স্পর্শ করল ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স-এর বোয়িং সেভেন টু সেভেনের চাকা। রানওয়ের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে তিন এঞ্জিনের প্লেনটা। দ্রুত কমে আসছে গতি। রানওয়ের শেষ মাথায় পৌঁছে ঘুরে ট্যাক্সিওয়ের ওপর দিয়ে টারমাকে এসে দাঁড়াল প্লেন। ইকোনমি ক্লাসের প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে রানাও নেমে এল প্লেন থেকে। এক হাতের ওপর ভাঁজ করে রাখা কোটটা, অন্য হাতে ব্রীফকেস। উজ্জ্বল সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত বাইরেটা। প্লেনের এয়ারকন্ডিশনড পেটের ভেতর থেকে বাইরে এসে আগুনের ছ্যাঁকা লাগল যেন গায়ে। সানগ্লাসটা বের করে চোখে দিল রানা।

কয়েক মিনিটের মধ্যে অন্যান্য লাগেজের সঙ্গে রানার ব্যাগও এসে পৌঁছল টার্মিনালে। ব্যাগটা ঘাড়ে ঝুলিয়ে বেরিয়ে এল ও টার্মিনাল ছেড়ে। একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে বসল।

'ডাইম প্যালেস, মোটেল,' ড্রাইভারের প্রশ্নবোধক চোখের দিকে তাকিয়ে বলল রানা। কোটের পকেট থেকে দ্য নিউজটা বের করে মেলে ধরল চোখের সামনে। আর একবার চোখ বুলিয়ে নিতে চায় খবরটায়।

'দ্য নিউজ' শুধু লন্ডনের নয়, সম্ভবত বিশ্বের একমাত্র বাঙালী মালিকানাধীন পত্রিকা যার সারকুলেশন পৃথিবী জোড়া। সারকুলেশনও কম নয়—একমাত্র ব্রিটেনেই দেড় মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়। ওভারসিজ এডিশন ছাপা হয় আড়াই মিলিয়ন কপি। আপাতত দ্য নিউজ-এর রিপোর্টারগিরি করেই জীবিকা নির্বাহ করতে

হচ্ছে মাসুদ রানাকে। মেজর জেনারেল রাহাত খানের কড়া অর্ডার, কোর্স শেষ না হওয়া পর্যন্ত থাকতে হবে ওকে দ্য নিউজের সঙ্গে।

বেশ পুরানো পত্রিকা দ্য নিউজ। কপাল খারাপ পত্রিকাটার—কখনও যোগ্য সম্পাদক কিংবা উপযুক্ত মালিকের হাতে পড়েনি ওটা। এর আগে দু'বার বন্ধ হয়ে গেছে, তিনবার বন্ধ হতে হতে বেঁচে গেছে, পাঁচবার মালিক বদলেছে। আগে কখনোই ষাট-সত্তর হাজারের বেশি ওঠেনি সারকুলেশন। তৃতীয়বার যখন বন্ধ হওয়ার দশা হলো তখন ব্রিটিশ পাসপোর্টধারী লন্ডন প্রবাসী কয়েকজন বাঙালী বড়লোক কিনে নিল কাগজটা। তখন কেউ জানত না, বাঙালী বড়লোকদের ছদ্মবেশে আসলে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স কিনল ওটা।

ঢাকার দুঁদে সাংবাদিক জহিরুল ইসলামকে সম্পাদক করা হলো দ্য নিউজের। ভদ্রলোক মেজর জেনারেল রাহাত খানের বন্ধু। অনেক বলে কয়ে রাজি করিয়েছেন ওঁকে মেজর জেনারেল লন্ডনে এসে দ্য নিউজের সম্পাদনার ভার গ্রহণ করতে। বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণীর পত্রিকাগুলোর শীর্ষস্থানীয় সাংবাদিকদের অনেককেই তিনি নিজ হাতে গড়েপিটে মানুষ করেছেন। ভীষণ কাজপাগল মানুষটা।

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের কয়েকজন এজেন্টকেও পাঠানো হলো দ্য নিউজে কাজ শিখতে। জার্নালিজম এবং প্রেস সম্পর্কে ঢাকায় দু'মাসের প্রাথমিক ট্রেনিং দিয়ে লাগিয়ে দেয়া হলো ওদের রিপোর্টিঙে। প্রথম ব্যাচে ছিল সোহানা, সলীল এবং জাহেদ। ওদের দুরবস্থা দেখে প্রাণ খুলে হেসেছিল রানা, টিটকারি মেরেছিল। 'এত মজা পাওয়ার কিছু নেই, তুমিও পড়বে ফাঁদে, দাঁড়াও না,' বলেছিল সোহানা।

দ্বিতীয় ব্যাচে উঠল রানার নাম। ফাটা বেলুনের মত চুপসে গিয়েছিল রানা। ওকেও যে ফাঁসাবেন মেজর জেনারেল রাহাত খান, সেটা দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারেনি রানা। ভাগ্য ভাল, সোহানা, সলীল ওরা ধারে কাছে ছিল না। ওদের মুচকি হাসির ঠেলায় জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠত তাহলে। সোহেল মিঞা অবশ্য ছাড়েনি। খুব একচোট হেসে বলেছিল, 'সারাজীবন বন্দুকবাজি করে এসেছ, এবার একটু কলমবাজি করে দেখো বাছাধন, কেমন লাগে।'

মেজর জেনারেলের যুক্তি খুব পরিষ্কার। রিপোর্টারের গতি সর্বত্র—একজন এজেন্ট বা অপারেটর যেখানে যেতে পারে না একজন রিপোর্টার সেখানে যেতে পারে অনায়াসে। সংবাদপত্রের ছাপমারা লোকেরা সবসময়ই একটু বেশি সুবিধা ভোগ করে থাকে। এই কভারটা দরকার বি.সি.আই. এজেন্টদের। এসপিওনাজ এজেন্টদের যেসব ক্ষেত্রে কাজ করা প্রায় অসম্ভব সেরকম অনেক জায়গায়ই রানা এজেন্সির মাধ্যমে ঢুকে পড়তে পেরেছে বি.সি.আই.। কিন্তু তার পরেও এমন কিছু কিছু ক্ষেত্র রয়ে গেছে যেখানে নাক গলানো সম্ভব হয়নি বি. সি. আই. এজেন্টদের পক্ষে। সাংবাদিকের কাভারে সেসব জায়গায় সহজেই যেতে পারবে তারা এবার।

ট্যাক্সি এসে ঢুকল ডাইম প্যালেস মোটেলে। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নেমে এল রানা। মোটেলের পোর্টার ভেতরে নিয়ে গেল ওর ব্যাগটা। রিসেপশন কাউন্টারে এসে দাঁড়াল রানা। আগেই বুক করে রাখা ছিল রুম, কাউন্টারে শুধু পরিচয় দিয়ে একটা খাতায় সই করতে হলো ওকে।

রাত ন'টায় ফ্লেমিঙ্গো বারে দেখা করার কথা ওর ডেভিড ব্রনসনের সঙ্গে। ঘড়ির দিকে তাকাল রানা, মোটে সাড়ে সাতটা। এত আগে আগে গিয়ে লাভ কি? বরঞ্চ হোটেল ব্লুস্টার থেকে ঘুরে আসা যাক। এই হোটেলেই উঠেছিলেন সিনেটর জেমস থম্পসন। একজন রিপোর্টার হিসেবে ঘটনাস্থলটা একটু দেখে রাখা উচিত।

দশ মিনিটের ভেতর পৌঁছে গেল রানা হোটেল ব্লুস্টারে। লাস ভেগাসের সবচেয়ে নতুন আর দামী হোটেল ব্লুস্টার। বছরখানেক আগে চালু হয়েছে। অত্যাধুনিক আর্কিটেকচারাল ডিজাইনের অপূর্ব নিদর্শন হোটেল বিল্ডিংটা। ইন্টেরিয়ার ডেকোরেশনও দেখার মত। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লাউঞ্জের ভেতরটা একবার ভাল করে দেখে নিল রানা। খুব একটা ভিড় নেই লাউঞ্জে। দু'চারজন নারী-পুরুষ, বেশির ভাগই ষাটোর্ধ্ব বয়সের—বসে আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। সন্ধ্যাটা আরেকটু গাঢ় হলেই ঢুকবে ক্যাসিনোতে। ডানদিকের একটা দরজার ওপর লেখা 'ক্যাসিনো ব্লুস্টার'।

রিসেপশন কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা।

'আপনার জন্যে কি করতে পারি, মিস্টার···?' মাপা এক টুকরো হাসি দিয়ে জিজ্ঞেস করল কাউন্টারের মেয়েটি।

'রানা। মাসুদ রানা। আমি সিনেটর থম্পসনের সঙ্গে দেখা করতে চাই,' সরাসরি বলল রানা।

'দুঃখিত, মিস্টার রানা,' মিলিয়ে গেছে মেয়েটার মুখের হাসি। 'সিনেটর চলে গেছেন হোটেল ছেড়ে।'

'ভেগাসের লোক নন সিনেটর। নিশ্চয়ই অন্য কোন হোটেলে উঠেছেন, নাকি চলে গেছেন শহর ছেড়ে? কোন ধারণা আছে তোমার?'

'না, মিস্টার। কোন বোর্ডার হোটেল ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় কোথায় যাচ্ছে তা জেনে রাখার নিয়ম আমাদের নেই,' অন্য কাজে মন দিতে গেল মেয়েটা।

'এক মিনিট, শোনো,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'আমি দ্য নিউজ থেকে এসেছি। সিনেটরের রুমে যে মেয়েটার মৃতদেহ পাওয়া গেছে···'

'দুঃখিত, মিস্টার রানা। এব্যাপারেও কোন সাহায্য করতে পারছি না আপনাকে। পুলিসই ভাল সাহায্য করতে পারবে,' ভেতরে চলে গেল মেয়েটা কাউন্টারের পেছনের একটা দরজা দিয়ে। একটু পরেই দশাসই চেহারার এক লোক এসে ভ্রূ কুঁচকে দাঁড়াল কাউন্টারে।

বেরিয়ে এল রানা হোটেল ব্লুস্টার ছেড়ে। এবার? পুলিস স্টেশনে খোঁজ নিয়ে কোন লাভ হবে বলে মনে হয় না। সুতরাং চলো ফ্লেমিঙ্গোতে।

মোটে পৌনে আটটা। ফ্লেমিঙ্গো বারটা চেনে ও, বেশি দূরে না, হেঁটে গেলেও দশ মিনিটের বেশি লাগবে না। হাঁটতে শুরু করল রানা, সময় কাটানো দরকার।

বারে বসেই দেখতে পাচ্ছে রানা গেমিং রুমটার বেশিরভাগ অংশ। সতর্কতার সঙ্গে আলো আঁধারি পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে কামরাটায়। আলো এত নয় যে মহিলাদের সঙ্গে খুনসুটি করতে অসুবিধা হবে, আবার এত কমও নয় যে কর্মচারীরা প্রতিটি লোক এবং জিনিসের দিকে দৃষ্টি রাখতে পারবে না। স্যাক্সোফোনের রেকর্ড বাজছে মৃদু—মিষ্টি সুরে। চমৎকার জমকালো অর্কেস্ট্রেশন। আশাবাদী একটা ভাব

যেন ভেসে বেড়াচ্ছে পুরো কামরা জুড়ে। এই সুরের প্রভাবেই যেন হারতে হারতেও হতাশ হতে পারছে না রুলেত টেবিল ঘিরে দাঁড়ানো লোকগুলো।

ন'টা বাজল। দরজা ঠেলে গেমিং রুমের ভেতরে ঢুকল একটা লোক। অটোমেটিক সুইং ডোর—বন্ধ হয়ে গেল আবার লোকটার পেছনে। সোজা বারের দিকে হেঁটে আসছে লোকটা। লম্বার তুলনায় একটু পাতলাই হবে, তবে খুব একটা বেমানান লাগছে না দেখতে। ঝকঝকে আনকোরা নুতন পোশাক সেঁটে আছে শরীরের সঙ্গে। মেরিন ওয়ার‍্যান্ট অফিসারের মত লাগছে দেখতে। গালে অসংখ্য বলিরেখা—বয়স কত লোকটার আন্দাজ করা মুশকিল। মারকারি গ্লাস লাগানো বড় চারকোনা একটা সানগ্লাসে ঢেকে রয়েছে চোখ দুটো। বারের সামনে এসে পড়েছে লোকটা। নিজের চেহারার জোড়া প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছে রানা সানগ্লাসের আয়নায়।

বারের দিকে একবার তাকিয়ে আবার রানার দিকে চোখ ফেরাল লোকটা। 'মাসুদ রানা? দৈনিক দ্য নিউজ থেকে?' সানগ্লাস না খুলেই জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ।' একটু অবাক হলো রানা, এত সহজে চিনে ফেলল কি করে?

'আমি ডেভিড ব্রনসন।' শেকহ্যান্ড করবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল না সে।

'ড্রিংক?' সৌজন্য দেখাল রানা।

'কোক হলেই চলবে।'

অর্ডার দিল রানা। বিশ সেকেন্ডের মাথায় এসে গেল কোক। ড্রিংক-এর অর্ডার দেয়া সহজ এখানে। লাস ভেগাস এমন একটা জায়গা, বোধহয় পৃথিবীর যে-কোন জায়গার চেয়ে দ্রুত ড্রিংক সরবরাহ করা হয় এখানে।

'কত দেবে তুমি?' কোনরকম সৌজন্যের ধার না ধেরে সোজাসুজি জানতে চাইল ব্রনসন।

'আমি না, দেবে আমার কাগজ।'

'ওই একই কথা। কে দিচ্ছে সেটা বড় নয় আমার কাছে, কত দিচ্ছে সেটাই আসল।'

'আমার কাগজ কত দেবে না দেবে তোমার তথ্যের গুরুত্বের ওপর নির্ভর করছে সেটা।' মেপে মেপে ওজন করে কথাগুলো বলল রানা।

'না শুনে কি করে বুঝবে তুমি গুরুত্ব?' কোকে চুমুক দিতে দিতে কৌতুক মেশানো গলায় বলল ব্রনসন।

'অন্তত পক্ষে আভাস দিতে হবে তোমাকে।'

'সিনেটর কোথায় আছে তা জানি আমি।' এবার ব্রনসনও মেপে বলল কথাগুলো।

এবার রানার পালা। 'কত চাও তুমি?' নিস্পৃহ গলায় বলল ও।

'তুমি কতটুকু কিনবে তার ওপর নির্ভর করছে দাম।'

'ক'জনের কাছে বেচেছ তুমি তথ্যগুলো?'

'অফার দিয়েছি কয়েকজনকেই। যে বেশি দাম দেবে তাকেই সরবরাহ করব।'

'এ পর্যন্ত কত উঠেছে দাম?'

'সেটা আমার ব্যাপার, তুমি কত দিতে পারবে সেটা বলো।'

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা। দেখাই যাক লোকটার দৌড় কতটুকু।

'ঠিক আছে,' বলল ও। 'তিন হাজার ডলার পাবে তুমি—সিনেটরের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে হবে আমার।'

'মাত্র! তাও এতবড় একটা কাজের জন্যে!'

'কত চাও তুমি সেটা বলবে তো?'

'পাঁচ হাজার। ক্যাশ।'

'চার হাজার। সিনেটরের সঙ্গে আমার যদি দেখা হয় তবেই পাবে তুমি টাকাটা। আমার প্রস্তাবে রাজি না থাকলে আসতে পারো তুমি। আমি নিজেই খুঁজে নিতে পারব সিনেটরকে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ব্রনসন। প্রশ্নবোধক চোখে তাকিয়ে আছে রানা।

'ঠিক আছে। কাল সকালে খবর দেব তোমাকে। উঠেছ কোথায় তুমি?'

'ডাইম প্যালেস।'

মারকারি লেন্সের উপর দিয়ে ভুরু জোড়া একটু কুঁচকে উঠল লোকটার। 'মোটেল?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে। কাল সকালে খবর দেব তোমাকে।' এক চুমুকে বাকি কোকটুকু শেষ করে ঘুরে দরজার দিকে চলে গেল ব্রনসন।

'ডাইম প্যালেস' নামটা শুনতে যত সস্তা আর খেলো, জায়গাটা আসলে তত সস্তা বা খেলো নয় মোটেই। লাস ভেগাস এবং এর মানুষগুলো সহজ একটা মনোভঙ্গি থেকে অতিথিদের আপ্যায়ন করে থাকে। লোকদের তারা উৎসাহিত করে, প্রলুব্ধ করে, একই সঙ্গে তোষামোদও করে; আরামে থাকার ব্যবস্থা করে, সস্তায় ভাল খাওয়ায়। আর আসল মনোযোগ থাকে গেমিং টেবিল থেকে তাদের টাকা হাতানোর দিকে। ডাইম প্যালেসও তার ব্যতিক্রম নয়। দশ ডলার নিয়ে ওরা বিশ ডলারের সার্ভিস দেয়। এই দশ ডলারের মধ্যে রয়েছে একটা ফ্রি ড্রিংক, ফ্রি এক বেলার খাবার, সুইমিং পুল, প্লাস রুমে একটা কালার টেলিভিশন এবং ফ্রি লোকাল ফোন কল। প্যারিস, লন্ডন, জেনেভা, আমস্টার্ডাম কোথায় না থেকেছে রানা? কিন্তু লাস ভেগাসের মত কোথাও না, সিকি পরিমাণ সার্ভিস দিয়ে দ্বিগুণ দাম রাখতে ওস্তাদ ওসব জায়গার হোটেলওয়ালারা।

রাত প্রায় সাড়ে দশটার দিকে হোটেলে ফিরে এল রানা। কাপড়-চোপড় ছাড়তে ছাড়তে এয়ারকন্ডিশনারটা অ্যাডজাস্ট করছে, এমন সময় বেজে উঠল ফোন। বিস্মিত হয়ে ছোট্ট যন্ত্রটার দিকে তাকাল ও। একভাবে বেজে চলেছে। কে হতে পারে? ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল ও ফোনের দিকে। রিসিভারটা উঠিয়ে ঠেকাল কানে।

'মাসুদ রানা?' খসখসে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল ওপাশ থেকে।

'বলছি।'

'তোমার জন্য একটা সংবাদ আছে, বাছা। এক্ষুণি পালাও ভেগাস ছেড়ে। আর কখনও এমুখো হবে না। বুঝেছ?'

'কে···?'

'যা বললাম ঢুকেছে কানে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু, আমার মনে হয় রং নাম্বারে রিং করেছ তুমি।'

'ভাগো, রানা, এক্ষুণি ভাগো।' কেটে গেল লাইন।

লাইন কেটে যাবার পরেও কিছুক্ষণ ধরে রইল রানা রিসিভার। রং নাম্বারে করেনি, মাসুদ রানাকেই চাইছিল লোকটা। কুঁচকে উঠেছে ওর ভুরু জোড়া—ব্যাপারটা কি? রিসিভার ক্রাডলের উপরে রেখে বিছানায় এসে বসল ও।

ও যে ভেগাসে এসেছে তা জানে কে কে? একজন হচ্ছেন জহির ভাই—সিনেটরের ঘটনাটা কভার করতে বলেছেন তিনিই। আর কে? ব্রনসন। একটু আগেই তাকে ঠিকানা জানিয়ে এসেছে রানা। কিন্তু ফোন নম্বর তো জানায়নি। ডাইরেক্টরি দেখে ফোন নম্বর খুঁজে নেয়াটা কোন কঠিন কাজ নয় অবশ্য। ব্রনসন তার আগের খদ্দেরদের কাছে যায়নি তো আবার—চার হাজারের বেশি কেউ দেয় যদি, এই আশায়? ঠিক! সেটাই সম্ভব! মাসুদ রানাকে ভাগাতে পারা মানে লন্ডনের দ্য নিউজকে ভাগাতে পারা। সেক্ষেত্রে চার হাজারের কমেই কেউ কিনে নিতে পারবে খবরটা।

নিউজ শোনার জন্যে টিভির সুইচটা অন করল রানা। এক নম্বরেই সিনেটরের বাথরুমে যুবতীর মৃতদেহ পাওয়ার খবরটা। সিনেট এনকোয়্যারি কমিটির হিয়ারিংয়ের সর্বশেষ পরিস্থিতির খবরটা এল নয় নম্বরে। জহির ভাইয়ের এডিটোরিয়াল জাজমেন্টকে সমর্থন করল খবরটা।

সিনেটর জেমস থম্পসনের ব্যাপারে জানা গেল, এখনও কোন খোঁজ নেই সিনেটরের। পুলিস খুঁজছে, এবং আশা করছে শিগগিরই খুঁজে বের করে ফেলবে সিনেটরকে। রিপাবলিকান দলের সম্ভাব্য গভর্নর পদপ্রার্থীর ছোট্ট একটু সাক্ষাৎকারও জুড়ে দেয়া হলো নিউজে। তিনি মনে করেন—মেয়েটাকে ধর্ষণ এবং খুনের ব্যাপারে দায়ী জেমস থম্পসন। তা না হলে পালিয়ে বেড়াবে কেন সে? সিনেটরকে যে কিডন্যাপ করা হয়ে থাকতে পারে এ ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্য করল না কেউ।

বন্ধ করে দিল রানা টেলিভিশন। ফোনটা তুলে নিয়ে ডায়াল করল ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নে। জহির ভাইয়ের জন্যে একটা কেবল ডিকটেট করল—সকালে যাচ্ছে ও আসল লোকের কাছে। এবার মুখ হাত ধুয়ে শুয়ে পড়া।

ব্যাগটা খুলল রানা—পাজামা এবং শেভিং কেস বের করতে হবে। পাজামাটা ঠিকই পাওয়া গেল কিন্তু শেভিং কেসটা নেই ব্যাগের কোথাও। ওয়াশিংটনের হোটেল রুমের বাথরুমে রয়েছে ওটা, মনে পড়ল। টুথপেস্ট, ব্রাশ, এগুলো রয়েছে শেভিং কেসে। তার মানে রাতে ঘুমানোর আগে দাঁত মাজা হচ্ছে না, সকালে শেভ করা হচ্ছে না। ইস, একেবারে নতুন ইলেকট্রিক রেজারটা! ক'দিন আগে সোহানা উপহার দিয়েছিল।

আবার ফোনটা তুলে নিল রানা। 'আমি ওয়াশিংটনে একটা কল করতে চাই,' বলল ও। 'ড্রেক হোটেলে'। লন্ডন হলে অন্ততপক্ষে আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হত লাইন পাওয়ার জন্যে। দেড় মিনিটের মাথায় ড্রেক হোটেলের লাইন পেয়ে গেল ও। রেজারটা পাওয়া গেছে এবং লন্ডনের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে আগেই,

জানাল হোটেল থেকে। এই সেবাটুকু করতে পেরে খুব আনন্দিত হয়েছে তারা তাও জানাতে ভুলল না। আর, ও চলে আসার পর একটা ফোন এসেছিল।

'কে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কে একজন মিস সুফিয়া···। সুইডেনের গোদেনবার্গ থেকে। এখানকার সময় অনুযায়ী বিকেল তিনটের সময় এসেছিল কলটা।'

'কোন মেসেজ দিয়েছে?'

'না, স্যার। একটা নাম্বার দিয়েছেন আর বলেছেন আপনি যদি ওনাকে ফোন করতে পারেন তো খুব ভাল হয়। খুব জরুরী নাকি ব্যাপারটা।'

নাম্বারটা টুকে নিয়ে রেখে দিল রানা ফোন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মনে মনে হিসেব করল—এখন ভোর চারটের মত বাজে গোদেনবার্গে। যত জরুরীই হোক, এই সময়ে একজন ভদ্রমহিলার কাছে ফোন করাটা উচিত মনে হলো না ওর কাছে।

হিসেব ভুল হয়েছিল রানার—সুইডেনে তখন সকাল সাতটা।

দুই

ব্রনসন যখন ফোন করল, তখনও ঘুম ভাঙেনি রানার। শরীর ভর্তি ঘুম ঘুম জড়তা নিয়ে উঠল ও বিছানা ছেড়ে। আড়মোড়া ভেঙে, হাই তুলতে তুলতে রিসিভারটা কানে ঠেকাল।

'মাসুদ রানা?'

'হ্যাঁ। কে?'

'আমি ব্রনসন। দশ মিনিটের ভেতর মোটেলের বাইরে এসো।'

'কোথায় সিনেটর?' জড়তা কেটে গেছে রানার।

'বাইরে এসো, তখন কথা হবে।'

'এক সেকেন্ড,' বেডসাইড টেবিল থেকে ঘড়িটা তুলে নিতে নিতে বলল ও। 'মাত্র সোয়া ছটা বাজে। হাত মুখ ধোয়া, নাস্তা করা, দশ মিনিটের ভেতর অসম্ভব।'

'আমি ভেবেছিলাম জরুরী একটা খবরের পেছনে আছ তুমি।'

'ঠিক আছে, বিশ মিনিটের মধ্যে বেরোচ্ছি আমি। মোটেলের সামনে।'

রিসিভার রেখে দিয়ে ঢুকে পড়ল রানা বাথরুমে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে বেরোল বাথরুম থেকে। তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নিল ও। ক্যাসেট রেকর্ডার এবং নোট বুকটা নিয়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল রুম থেকে। মোটেলের স্ন্যাক কাউন্টারে গিয়ে এক গ্লাস অরেঞ্জ জুস, দুই কামড় স্যান্ডউইচ এবং এক কাপ কফি গলায় ঢেলে বেরিয়ে এল বাইরে।

কাল রাতের পোশাক বদলে এসেছে ব্রনসন, তবে হাবভাবে কোন পরিবর্তন হয়নি। মারকারি গ্লাসের বেঢপ সানগ্লাসটা পরে রয়েছে এখনও। বিরাট একটা সাদা ওল্ডসমোবিলে বসে আছে সে। তাকিয়ে আছে এদিকে। সানগ্লাসের আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে এগিয়ে গেল রানা।

'সতেরো মিনিট,' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল ও। 'খারাপ না, কি বলো?' সহজ হতে চেষ্টা করল রানা।

'জলদি, এসো তো।'

'তাড়া কিসের এত?' ব্রনসনের পাশে উঠে বসতে বসতে জানতে চাইল রানা।

'অনেক দূর যেতে হবে আমাদের।' চালু করাই ছিল ওল্ডসমোবিলের এঞ্জিন, রানা দরজা বন্ধ করার আগেই গাড়ি ছেড়ে দিল ব্রনসন।

'অ্যারিজোনা না ক্যালিফোর্নিয়া?' মুখের মধ্যে রয়ে যাওয়া স্যান্ডউইচের টুকরোগুলো চিবোতে চিবোতে প্রশ্ন করল রানা।

'বোট চালাতে পারো তুমি?' রানার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করল ব্রনসন।

'কি ধরনের বোট?'

'পাওয়ার বোট।'

'বোধহয় পারি,' একটু বিরতি নিয়ে বলল রানা।

'গাড়ি চালানোর চেয়ে কঠিন কিছু না। সহজই বলা যেতে পারে।'

'জানি। কিন্তু কেন?'

কোন জবাব দিল না ব্রনসন। তারপর কয়েকটা গাড়িকে ওভারটেক করল সে।

'বোট কেন?' শান্তভাবে প্রশ্নটা আবার করল রানা।

'সিনেটর থম্পসন আপাতত জলে আশ্রয় নিয়েছেন। একটা ক্রুজারে লুকিয়ে আছেন। ইন্টারভিউ নেয়ার জন্যে বোট চালিয়ে ক্রুজার পর্যন্ত যেতে হবে তোমাকে।'

মাথা নেড়ে হেলান দিয়ে বসল রানা। নিরাসক্ত দৃষ্টি মেলে দেখতে লাগল দু'পাশের মরুপ্রকৃতি। বালির নয় মরুভূমিটা, পাথর আর স্লেটের স্তর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। দূরে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের সারি। ওয়েসিসগুলোতে রয়েছে পামট্রির বদলে পেট্রোল পাম্প—ওদের ভাষায় গ্যাস স্টেশন।

বেশ কিছুক্ষণ পর নীরবতা ভাঙল রানা। 'গত রাতে কোন্ এক উজবুক ফোন করেছিল আমাকে। ইমিডিয়েটলি ভেগাস ছাড়ার পরামর্শ দিল। ব্যাপারটা বুঝলাম না কিছু।'

ব্রনসনের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে মুখটা একটু ঘোরাল রানা ওর দিকে। যা আশা করেছিল সেরকম কিছু দেখতে পেল না ও। হাঁ হয়ে গেছে ব্রনসনের মুখ। হয় পাকা অভিনেতা লোকটা, নয়তো সত্যি সত্যিই কিছু জানে না এ ব্যাপারে। 'কে লোকটা?' জিজ্ঞেস করল সে।

'পরিচয় দেয়নি। আমাকে শহর ছাড়তে বলল শুধু।'

'গেলে না কেন?' গেলেই ভাল করতে, এরকম একটা ভাব ওর গলায়।

'গুরুত্ব দিইনি তেমন। তোমার কি মনে হয়, সিরিয়াস কিছু?'

'তুমি কি কখনও উত্যক্ত করেছিলে কাউকে?'

'সাংবাদিক হিসেবে প্রায়ই মানুষকে জ্বালাতে হয় আমার। কিন্তু গত

কয়েকদিনের মধ্যে কাউকে তো কিছু বলিনি। অন্তত লাস ভেগাসে তো নয়ই। কাল সন্ধ্যায়ই মাত্র এসে পৌঁছেছি এখানে।' একজন ঝানু সাংবাদিক যেভাবে বলত কথাগুলো ঠিক সেভাবেই বলল রানা।

আবার আগের মত শক্ত হয়ে গেছে ব্রনসনের চোয়াল। ড্যাশ বোর্ডের ভেতর থেকে একটা কোকের ক্যান বের করল সে। মুখটা খুলে চুমুক দিল বাঁ হাতে ধরে। রানাকে অফার করার মত ভদ্রতাটুকু বাহুল্য মনে হলো তার কাছে। 'অন্য কোন পত্রিকার লোক একটা চাল দিয়েছে; তাই ভাবছ তুমি, ঠিক না?' বলল সে।

'হ্যাঁ, তাই।'

'হতে পারে,' কিন্তু সে যে মেনে নিতে পারছে না কথাগুলো তা ব্রনসনের গলার স্বরেই বুঝতে পারল রানা।

'তুমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছ না, তাই না? তাহলে আর কে হতে পারে?'

'আমি কিভাবে জানব? শোনো—' নিজে নিজেই থেমে গেল ব্রনসন। চকিতে একবার মুখ উঁচু করে তাকাল রিয়ারভিউ মিররের দিকে। তারপর আবার শুরু করল, 'এই শহরটা কারা চালায় বলে ভাব তুমি?'

'জানি না। তুমিই বলো।'

'বলছি, শোনো।' আবার তাকাল সে রিয়ারভিউ মিররের দিকে, খেয়াল করল রানা। 'গুণ্ডা বদমাশরা চালায় শহরটা। এখানে প্রায় সবকিছুই ওদের ইচ্ছেমত চলে। বুঝলে?'

'আমার সঙ্গে গুণ্ডা বদমাশদের কি? আমি ওদের কাউকে চিনি না, ওদের কারও পক্ষেও আমাকে চেনার কথা নয়। আমাকে ভয় দেখানোর কি কারণ থাকতে পারে ওদের?'

'আল্লা মালুম!' কাঁধ ঝাঁকাল ব্রনসন। 'তুমি জানো আর ওরা জানে।'

চুপচাপ বসে রয়েছে ওরা। প্রায় নিঃশব্দে মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলেছে ওল্ডসমোবিল। ঘাড় ঘুরিয়ে ব্রনসনকে দেখল রানা। স্টিয়ারিং হুইলের ওপর শক্তভাবে চেপে আছে ওর আঙুল, সাদা দেখাচ্ছে সেগুলো। ভোরের শীতল আবহাওয়া সত্ত্বেও চিকচিকে ঘাম দেখা যাচ্ছে ভুরুর কাছ দিয়ে। গরমের জন্যে না অন্য কোন কারণে বুঝতে পারল না রানা। কেমন একটা ঘাম ঘাম অনুভূতি হচ্ছে ওরও। পেছন ফিরে তাকাল একবার: ধূসর রঙের রাস্তা পড়ে আছে—ফাঁকা।

তিন ট্র্যাক হাইওয়ে। একটু পরেই একটা মোড়ের কাছে এসে তিনটে আলাদা পথে ভাগ হয়ে গেল ট্র্যাক তিনটে। হেন্ডারসন, বোল্ডার সিটি, কিংম্যান—একটা মাইল পোস্টে লেখা দেখল রানা। তীর চিহ্ন দিয়ে দেখানো রয়েছে দিকগুলো। বাঁ দিকে ঘুরল ওল্ডসমোবিল। চওড়া হাইওয়ে ধরে বোল্ডার সিটির দিকে চলতে লাগল। এত চওড়া ফাঁকা হাইওয়ে যে, অনায়াসেই সত্তর মাইল স্পীড ওঠাতে পারল ব্রনসন। নিঃশব্দে গাড়ি চালিয়ে চলেছে সে। কিছু একটা ভাবছে গভীরভাবে।

অবশেষে নীরবতা ভাঙল ব্রনসন। 'তোমাকে একাই যেতে হবে, বুঝলে?' বলল সে। 'লোকটা যেভাবে বলেছে সেভাবেই কাজ করতে হবে আমাদের। ইন্টারভিউ শেষ হওয়ার পর আমি যাব। সম্ভব হলে আগেই পৌঁছুতে চেষ্টা করব অবশ্য।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। কিসের যেন আভাস পাচ্ছে ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। শিরশির করছে ঘাড়ের কাছটা। বিপদে পড়তে যাচ্ছে না তো?

'সিনেটরের সঙ্গে দেখা হওয়া নিয়ে কথা। ভদ্রলোকের দেখা পেলে বাকিটা আমিই করতে পারব।'

'বুদ্ধি করে না চললে দেখাই পাবে না তুমি।'

ভেতরে ভেতরে চিন্তিত হয়ে উঠছে রানা। কথা ছিল ব্রনসন ওকে নিয়ে যাবে সিনেটরের কাছে, কিন্তু এখন বলছে একা একা যেতে হবে। আবার বলছে বুদ্ধি করে না চললে দেখা নাও হতে পারে—এর মানেটা কি? গতরাতের ফোন কলটার ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাকলেও ব্রনসন হয়তো জানে কে করেছিল ফোনটা। তা না হলে এখন এসব কথা আসে কেন?

'কাদের সঙ্গে আছেন এখন সিনেটর?'

'বন্ধুস্থানীয় কিছু লোকের সঙ্গে।'

'সিনেটর নিজেই কি রিপোর্টারদের সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন না; নাকি তাঁর বন্ধুরা বাধা দিচ্ছে?'

'হতে পারে, না-ও হতে পারে। বুঝতেই পারছ সিনেটরের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে ব্যাপারটার ওপর। এ নিয়ে যত কম আলোড়ন আলোচনা হয় ততই মঙ্গল সিনেটরের জন্যে।'

'তাহলে পুলিস কেন জানে না কোথায় আছেন সিনেটর?'

'এমনও হতে পারে, পুলিস জেনেও বলছে না। সিনেটরকে আগলে রেখেছে তারা।'

'তুমি তাহলে কিভাবে ব্যবস্থা করলে সাক্ষাৎকারের?'

'যেভাবেই করে থাকি না কেন, আমি পেরেছি সেটাই বড় কথা।'

এতক্ষণ ধরে একটা পাহাড়ের গা বেয়ে চড়াই পথে উঠছিল ওল্ডসমোবিল। ওপাশের ঢাল বেয়ে উৎরাই শুরু হলো এবার। সোজা চলে গেছে একটা লেকের দিকে। লেকের টলটলে পানি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে রানা, সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল নীল দেখাচ্ছে। দেখেই কেন যেন মনে হচ্ছে লেকের পানি ঠাণ্ডা। অপূর্ব লাগছে—যেন ট্যুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের পোস্টার থেকে তুলে আনা রঙিন ছবি একটা। কূলের কাছে অসংখ্য নৌকা, মোটর বোট। বেশির ভাগই বাঁধা রয়েছে।

'লেক মিড,' রাস্তার ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে বলল ব্রনসন।

প্রকৃতির এই অপরূপ সৌন্দর্য দেখে খুশি হয়ে উঠছে রানার হৃদয়। একটু আগের দ্বিধা দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যেতে চাইছে। প্রাকৃতিক হ্রদ নয় লেক মিড, মানুষের তৈরি। বিশ্বাস করা কঠিন এরকম সৌন্দর্য মানুষ তার নিজের চেষ্টায় সৃষ্টি করেছে। একদিকে পাহাড়ের খাড়া গা দেয়ালের মত উঠে গেছে। ঝর্নার পানি জলপ্রপাত হয়ে ঝরে পড়ছে এক জায়গা দিয়ে। মুগ্ধ হয়ে গেল রানা। তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বাস্তবতার মুখোমুখি হলো ও—

'কোথায় দেখা হবে আমাদের সিনেটরের সঙ্গে?'

'আমাদের না, রানা, তোমার।' শুধরে নিল ব্রনসন।

আগেরবার ভুল শুনেছে এরকম একটা আশা মনের কোণে উঁকি দিচ্ছিল। এখন

পরিষ্কার হয়ে গেল: ভুল শোনেনি রানা, একাই যেতে হবে ওকে। লেকের ঠাণ্ডা নীল পানি এখন আর তত সুন্দর লাগছে না ওর কাছে।

'ঠিক আছে। সিনেটরের সঙ্গে কোথায় দেখা হবে আমার?'

'একটু অপেক্ষা করো, দেখাব তোমাকে।'

লেকের গা ঘেঁষে প্রায় খালি একটা কারপার্কে গাড়ি দাঁড় করাল ব্রনসন। দরজা খুলে নেমে এল ওরা বাইরে। এদিক ওদিক একবার দেখে নিয়ে, এগিয়ে গেল একটা ছোট্ট শেডের দিকে। কয়েকটা বোট বাঁধা রয়েছে শেডের সামনে একটা জেটির সঙ্গে। একটা বোটের বো-এর দিকে এক লোক উপুড় হয়ে কি যেন করছে। শেড পেরিয়ে জেটির ওপর গিয়ে উঠল ওরা। ওদের পায়ের শব্দ পেয়ে মাথা তুলল লোকটা।

'একটা বোট রিজার্ভেশনের ব্যাপারে ফোন করেছিলাম আমি,' বলল ব্রনসন।

'কি নামে, স্যার?'

'রানা, মাসুদ রানা।'

'ওই বোটটা, স্যার। একদম রেডি করে রাখা হয়েছে,' পাশের একটা বোট দেখিয়ে বলল লোকটা। উঠে এসেছে সে জেটির ওপর।

'গ্যাস?'

'ট্যাঙ্ক ভর্তি আছে।'

'কোন ম্যাপ আছে?'

'বোটের ড্যাশ বোর্ডেই পাবেন, স্যার। আপনাদের কাছে ক্রেডিটকার্ড বা ওই জাতীয় কিছু আছে?'

রানার দিকে ফিরল ব্রনসন, 'আছে?'

সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ডাইনার'স কার্ডটা বের করল রানা ওয়ালেট থেকে। লোকটার পেছন পেছন গিয়ে ঢুকল ও শেডের তলে অফিসে। একটা স্লিপে সই করতে করতে জেনে নিল ও বোটের রেঞ্জ। একশো বিশ মাইল। ফিরে এল তারপর বোটের কাছে।

ব্রনসন ইতোমধ্যেই উঠে পড়েছে বোটে। রানাও অনুসরণ করল। ম্যাপটা খুলে দেখাতে লাগল ব্রনসন, 'উত্তর পূর্বদিকে থাকার কথা ক্রুজারটার,' বলল সে। 'এখানে দেখো, বোল্ডার ক্যানিয়নের প্রবেশ পথ এখান দিয়ে।'

'কতদূর হবে এখান থেকে?'

'কত আর? মাইল বিশেক,' কাঁধটা একটু ঝাঁকিয়ে বলল ব্রনসন। 'ভাল করে খুঁজে দেখবে। বেশ বড় ক্রুজারটা। নাম "ড্রাগন ফ্লাই" ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'ফিরে আসার পর আবার লাস ভেগাসে যাব কিভাবে?'

'বাস পেয়ে যাবে। পাঁচ মিনিট পরপরই বাস যায় এদিক দিয়ে।'

'টাকাটা কখন নেবে তুমি?'

'তুমি ফেরার পর যোগাযোগ করব আমি তোমার সাথে।'

'ঠিক আছে, অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।'

'আরে ধন্যবাদ লাগবে না। আমি নিজে তোমাকে ভেগাসে পৌঁছে দিতে

পারলে খুশি হতাম। কিন্তু কি করব বলো, উপায় নেই···।' এই প্রথম একটু অমায়িক শোনাল ব্রনসনের গলা।

মাথা ঝাঁকাল রানা। জেটির ওপর উঠে গেল ব্রনসন। দ্রুত পায়ে চলে গেল, ওল্ডসমোবিলের দিকে। ব্রনসন চলে যেতেই হঠাৎ করে ভীষণ নিঃসঙ্গ বোধ করতে লাগল রানা। লেকের শান্ত পানি এখন অশান্ত সমুদ্রের মত লাগছে ওর কাছে। গতরাতের উড়ো ফোন কলটার কথা মনে পড়ছে বারবার। ব্রনসন সম্পর্কেও নিঃসন্দেহ হতে পারছে না। টেলিফোনের কথা ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ সুফিয়ার কাছে ফোন করার কথা মনে পড়ল। তাড়াতাড়ি বোট থেকে নেমে অফিসে গিয়ে ঢুকল ও।

'টেলিফোন আছে এখানে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওই যে ওখানে।'

পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে ফোনের কাছে পৌঁছল ও। কিন্তু সুফিয়ার গোদেনবার্গের নাম্বার লেখা কাগজের টুকরোটা নেই পকেটে। মনে পড়ল, ডাইম প্যালেসের বেড সাইড টেবিলের ওপর রয়েছে সেটা। তার মানে মোটেলে না পৌঁছে ফোন করতে পারছে না ও সুফিয়াকে।

ওকে হঠাৎ করে কি এমন জরুরী দরকার পড়ল সুফিয়ার, ভেবে পেল না রানা। তাই আবার সুইডেনে বসে। রাশিয়া থেকে ফেরার পথে সুইডেনে থেমেছে ও তারপর কী এমন ঘটতে পারে? বোটের দিকে ফিরে আসতে আসতে কিছু একটা অমঙ্গলের গন্ধ পেল রানা।

দ্রুত বাড়ছে তাপমাত্রা। সূর্য উঠে এসেছে অনেকখানি উপরে। ঘামতে শুরু করেছে রানা। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ও বোটের ওপর। বড় বড় কয়েকটা লেক ট্রাউটকে বোটের আশেপাশে পানির নিচে ঘুরেফিরে বেড়াতে দেখল। জহির ভাইয়ের কথা মনে পড়ল। জ্বালিয়ে শেষ করে ফেলল একেবারে। কেমন করে জানি ধারণা হয়েছে লোকটার, জার্নালিস্ট হিসেবে বিরাট অবদান রাখার জন্যেই জন্ম হয়েছে রানার; এতদিন যে কাজই করে থাকুক না কেন ও, সেটা ওর উপযুক্ত কাজ ছিল না আসলে ও জাত সাংবাদিক, এটাই ওর লাইন।

ছ'মাসের এক্সটেনসিভ ট্রেনিংয়ের চতুর্থ মাস চলছে ওর। এই ছ'মাসের পিরিয়ডটা শেষ হলেই নাকি তিনি মেজর জেনারেলের কাছে অনুরোধ করবেন রানাকে ছেড়ে দেয়ার জন্যে; ফুল টাইম জার্নালিস্ট হিসেবে যেন আত্মনিয়োগ করতে পারে ও কিছু বলতেও পারে না, আবার সইতেও পারে না রানা, ব্যক্তিগত বন্ধু নাকি ভদ্রলোক মেজর জেনারেলের। একেবারে তিতিবিরক্তি ধরে গেছে ওর। কোন মতে আর আড়াইটা মাস পার করতে পারলে জানে পানি পায় ও। কাজপাগল লোকটাকে যে শ্রদ্ধাও সে না করে তা নয়। কিন্তু তাই বলে সারাজীবন সংবাদসেবা—অসম্ভব!

বোটে স্টার্ট দিল রানা। একেবারে ঝকঝকে নতুন বোটটা। মসৃণ একটানা মৃদু শব্দ হচ্ছে আউটবোর্ড এঞ্জিন থেকে। থ্রটলটা ঠেলে দিল রানা, চলতে শুরু করল বোট। অসংখ্য পাওয়ার বোট, রো-বোটের ভিড় থেকে খোলা লেকে বের হয়ে এল সে বোট নিয়ে আরেকটু ঠেলে দিল থ্রটল। পানির নিচে কিছুটা নেমে গেল বোটের

লেজ, নাকটা উঠে পড়ল উপরে, ছুটতে শুরু করল প্রচণ্ড বেগে। দু'পাশে ফোয়ারার মত ছিটকে পড়ছে পানি, পেছনে ঢেউয়ের সারি তৈরি করে ছুটে যাচ্ছে বোট উত্তর-পূর্ব দিকে।

কোর্সটা ঠিক করে চারদিকে একবার চাইল রানা। আশেপাশে আর কোন বোট দেখতে পেল না ও। যতদূর চোখ যায় ধু-ধু জলরাশি ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। ফুল থ্রটলে চলছে বোট। গতির সঙ্গে সঙ্গে আবার উৎফুল্ল হয়ে উঠছে ও। আশ্চর্য, পরিবেশ কিভাবে মানুষের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে! একটু আগের দুশ্চিন্তা কোথায় চলে গেছে। এখন ওর মন জুড়ে শক্তিশালী এঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জন আর ছুটন্ত পানির শোঁ শোঁ শব্দ ছাড়া আর কিছু নেই। সুপার মার্কেটগুলোয় মিষ্টি বাজনা বাজায় কেন এখন বুঝতে পারছে ও।

গ্র্যান্ড প্রি ড্রাইভারের মত শক্ত হাতে হুইল ধরে হেলান দিয়ে বসে আছে রানা। ফুলস্পীডে ছুটছে বোট। নানা চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে ওর মন। ফোন করেছিল কেন সুফিয়া? প্রশ্নটা বারবার ঘুরেফিরে আসছে মাথায়। আফ্রিকা থেকে ফেরার পর রানা এজেন্সির লন্ডন শাখায় নিযুক্ত করেছিল ওকে রানা। সাংবাদিকতার প্রতি ঝোঁক দেখে জহির ভাইকে বলে দ্য নিউজে কাজ করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। সময় ও সুযোগ মত রানা এজেন্সির টুকটাক কাজও করেছিল। নিশ্চয়ই কোন ঝামেলায় জড়িয়েছে ও, তা নাহলে লন্ডনে জহির ভাইয়ের কাছে ফোন না করে ওর কাছে ফোন করবে কেন? না কি সফলভাবে কাজটা করতে পারার আনন্দেই ফোন করেছিল খবরটা ওকে জানাতে? হতে পারে। রানা পারেনি রাশিয়ানদের তেল দিয়ে চলতে। ফলে দু'মাস আগে মাত্র দু'ঘন্টার নোটিশে মস্কো ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে ওকে। সুফিয়া যে অ্যাসাইনমেন্টে গিয়েছিল, সেই একই কাজে পাঠানো হয়েছিল রানাকেও। কিছু রূঢ় মন্তব্য করায় ওকে মস্কোয় রাখতে অস্বীকার করে সোভিয়েত সরকার।

জামিলের কথা মনে পড়ল রানার। সুফিয়ার ভাই। দু'দিনের পরিচয়েই মাসুদ ভাই বলতে পাগল হয়ে যেত ছেলেটা। এখনও লন্ডনে থাকলে সপ্তাহে অন্তত একবার ওর হোস্টেলে গিয়ে দেখে আসতে হত ওকে। কোন বিপদে পড়েনি তো সুফিয়া? ভেগাসে ফিরেই ফোন করতে হবে গোদেনবার্গে।

বছর খানেক আগে এক উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন দ্য নিউজ-এর সম্পাদক জহিরুল ইসলাম। আইনসম্মত ভাবে এবং খোলাখুলি দ্য নিউজ রাশিয়ায় বিক্রি করতে হবে। অনেকের মত মেজর জেনারেল রাহাত খানও প্রথম প্রথম বিশ্বাস করতে পারেননি এরকম একটা ব্যাপারে রাজি হবে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ। অবশ্য নিরাশ করলেন না তিনি জহির ভাইকে, বরং উৎসাহই দেখালেন এবং পরিকল্পনা মত চেষ্টা চালিয়ে যেতে বললেন। সত্যিই সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে ছেড়েছেন জহির ভাই।

প্রথম পর্যায়ে, পর পর কয়েকজন সফরকারী সোভিয়েত মন্ত্রীকে দাওয়াত করে খাওয়ালেন জহির ভাই। এক ফাঁকে তিনি মন্ত্রী মহোদয়দের কাছে তাঁর বহুদিনের লালিত একটা বাসনার কথা প্রকাশও করলেন সসংকোচে। রাশিয়া সম্পর্কে একটা

পত্রিকা প্রকাশ করতে চান ব্রিটেনে। প্রয়োজন হলে রাশিয়ানদের সরবরাহ করা মাল-মসলাই ব্যবহার করবেন তিনি, আর যদি তাঁর রিপোর্টারদের রাশিয়ায় গিয়ে তথ্য সংগ্রহের সুযোগ দেয়া হয় তো খুব ভাল। একই সঙ্গে তাঁর পত্রিকা দ্য নিউজ বিক্রি হোক রাশিয়ায় এটা আশা করেন তিনি, এরকম একটা আবদার জানাতেও ভুললেন না।

প্রথম পরিকল্পনাটা মন্ত্রী মহোদয়রা আনন্দের সঙ্গেই অনুমোদন করলেন, দ্বিতীয়টি সম্পর্কে বললেন: ভেবে দেখি। কারণ কয়েকদিনের মধ্যেই রাশিয়ানরা বুঝতে পারল দ্বিতীয় প্রস্তাবের ব্যাপারে উৎসাহ বেশি জহির সাহেবের আর দ্বিতীয় প্রস্তাবটা বাস্তবায়িত না হলে প্রথমটায় কোন আশা নেই। এদিকে ফ্রি ওয়ার্ল্ডে প্রচারের জন্য রাশিয়া বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তাবটা দারুণ লোভনীয় বলে মনে হলো ওদের। এরকম একটা প্রস্তাব দিয়েছেন যিনি তাঁকে কিছুটা সুযোগ সুবিধা দিতেই হবে দরকার হলে।

কয়েক মাস গেল ভাবাভাবিতে। এর ভেতর রাশানরা খোঁজ-খবর করল দ্য নিউজ সম্পর্কে। মোটামুটি সন্তুষ্ট হলো ওরা। স্ট্রিক্টলি নিরপেক্ষ সংবাদপত্র দ্য নিউজ, কোন রকম প্রোপাগান্ডার ভেতর নেই; মালিকও ব্রিটিশ নয়, বাঙালী। শেষ পর্যন্ত মত দিল সোভিয়েত সরকার। তবে কত কপি বিক্রি হবে তার সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দিল ওরা।

প্রথম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজও শুরু হয়ে গেল। পত্রিকার নাম ঠিক হলো 'সোভিয়েত লাইফ'। দ্য নিউজ রাশিয়ায় যে কয় কপিই বিক্রি হোক, সোভিয়েত লাইফ-এর প্রকাশনাও ভাল লাভজনক হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কেননা রাশিয়ানরাই প্রতি সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার কপি করে কিনতে চেয়েছে। আর এদিকে যদি আর লাখ খানেক কপিও বিক্রি করা যায় তো মন্দ কি? এ পত্রিকার পেছনে খরচা খুবই কম। মাল-মসলা সব সরবরাহ করবে রাশিয়ানরাই।

মস্কোর নাম্বার ওয়ান স্টেট ম্যাগাজিন পাবিলিশিং হাউসের উপর ছবি ও ফিচার সরবরাহের দায়িত্ব দিল সোভিয়েত সরকার। রানাকে পাঠানো হয়েছিল সেগুলো বেছে নিয়ে আসার জন্যে। প্রথম থেকেই ওরা রানাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করতে থাকে। রানা যেগুলো বেছে বেছে ঠিক করে ওরা সেগুলো নাকচ করে দিয়ে নিজেদের ইচ্ছে মত মেটেরিয়াল গছিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। এ নিয়ে লেগে গেল একদিন—তারপর দু'ঘণ্টার নোটিশে ব্যাক টু লন্ডন। পরে সুফিয়াকে পাঠানো হয়েছে সে জায়গায়। পুরো পরিকল্পনাটা বাতিল করার একটা ঝোঁক চেপেছিল জহির ভাইয়ের মাথায়। শেষ পর্যন্ত মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানই শান্ত করেন তাঁকে। রাশিয়ায় কাজ করার যেটুকু সুযোগ পাওয়া যায় সেটুকুরই সদ্ব্যবহার করতে চান তিনি। 'যে টাকাটা এ পর্যন্ত ইনভেস্ট করা হয়েছে সেটা না তুলেই কিভাবে বাতিল করো প্ল্যান?' যুক্তি দেখিয়েছিলেন তিনি।

সুইডেনের গোদেনবার্গে প্রিন্ট হওয়ার কথা রাশিয়ান লাইফ। লন্ডনে ছাপতে যে খরচ পড়ত তার প্রায় অর্ধেকে রাজি হয়েছে গোদেনবার্গের ওরা। কাগজও সস্তা অনেক। গোদেনবার্গে আরও সপ্তাহ দু'য়েক থাকার কথা সুফিয়ার। রাশিয়ান লাইফের প্রথম সংখ্যা বের করার ব্যবস্থা চূড়ান্ত করে ফেরার কথা ওর।

বর্তমানে ফিরে এল রানা—দারুণ সিগারেটের তৃষ্ণা পেয়েছে। উইন্ডস্ক্রিনের দিকে পেছন ফিরে দুই হাতের তালু এক জায়গায় এনে বাতাস আড়াল করে ম্যাচ জ্বেলে সিগারেট ধরাল ও। পরিতৃপ্তির সঙ্গে বুক ভরে ধোঁয়া টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে ছাড়তে ছাড়তে সামনে ঘুরল। মাথাটা একশো আশি ডিগ্রি ঘুরিয়ে দু'পাশ এবং সামনেটা ভাল মত দেখল। বাঁ দিকে, দূরে কয়েকটা বড় বড় কংক্রিটের টাওয়ার দেখতে পেল ও। সম্ভবত হুভার ড্যামের অংশ ওগুলো। এই বাঁধ দেয়ার ফলেই সৃষ্টি হয়েছে লেক মিড। ডানদিকে লেকের তীর বরাবর একটা খাড়া পাহাড়ের দেয়াল উঠে গেছে অনেক উঁচুতে। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারল না রানা সেদিকে। পানিতে সূর্যের প্রতিফলনে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। সামনেও একই অবস্থা: খাড়া পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি। এখনও ও একাই চলেছে লেকের ওপর দিয়ে—আর কোন বোট বা ওই জাতীয় কিছু নজরে পড়ল না।

মিনিট বিশেক পর, সরু হয়ে আসতে লাগল লেক। দু'দিকের উঁচু দেয়াল ক্রমশ চেপে আসছে এদিকে। সোজা লেকের শেষ প্রান্তের দিকে এগোচ্ছে বলে মনে হলো রানার। কিন্তু ম্যাপ বলছে অন্য কথা। ম্যাপ অনুযায়ী আর কয়েক মাইল সামনে গেলে ডানদিকে বোল্ডার ক্যানিয়নের মুখে এসে পড়বে ও। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে ও সামনের দিকে। ভাল জায়গা বেছেছে সিনেটর লুকিয়ে থাকবার জন্য। আরাম, প্রাইভেসি আর জার্নালিস্ট বা অন্য কারও উৎপাত থেকে বাঁচার জন্যে চমৎকার: ক্রুজারটা ছেড়ে দিয়ে কয়েক মাইল সরে গেলেই হলো। সঠিক অবস্থান আর ক্রুজারের নাম না জানলে এই লেকে ড্রাগন ফ্লাইকে খুঁজে বের করা খুবই মুশকিল।

কিছুক্ষণ পর ডানদিকে একটা পাহাড় দেখতে পেল রানা। লেকের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় পানির উপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়টার ওপাশে ড্রাগন ফ্লাই, রয়েছে কিনা কে জানে! পাহাড়টার চারদিকে একবার চক্কর দিল ও বোট নিয়ে। গতি কমাল না একটুও। কিন্তু পাওয়া গেল না সিনেটরের গোপন আস্তানার সন্ধান। ক্রুজার তো দূরের কথা একটা বোটও চোখে পড়ল না। আবার সামনে এগোতে লাগল রানা বোট নিয়ে। বোল্ডার ক্যানিয়নের বিশাল খোলা মুখটা দেখতে পেল। পাহাড়ের মাথা খাড়া উঠে গেছে ক্যানিয়নের মুখের দু'পাশে। পাহাড়ের মাথা ছাড়িয়ে বেশ উপরে উঠে এসেছে সূর্য। পানিতে ছায়া পড়েছে খাড়া পাহাড়ের।

ক্যানিয়নের মুখটা ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল ও। এখনও কিছু দেখতে পায়নি। থ্রটলটা টেনে আনল অনেকখানি। কমে গেল বোটের গতি। খুব আস্তে চলছে এখন বোট। পেছনে তাকাল রানা, সেদিকেও কিছু দেখতে পেল না। ক্রুজার কেন, কোন বোটকেও পাশ কাটিয়ে আসেনি ও। তাহলে গেল কোথায় ড্রাগন ফ্লাই? মাইল বিশেক আসার পরই পাওয়ার কথা ওটাকে, কিন্তু ইতোমধ্যে ত্রিশ মাইলের বেশি এসে পড়েছে ও।

হুইল ঘুরিয়ে ফিরে আসতে লাগল রানা। কোন কারণে বোল্ডার ক্যানিয়নের ভেতরে চলে যায়নি তো ড্রাগন ফ্লাই? যা হোক, ক্যানিয়নের ভেতরটা চেক না করে ফিরবে না, ঠিক করল ও।

আবার ফুল থ্রট্‌লে এগোতে লাগল বোট। কয়েক মিনিট পর আবার দেখতে পেল রানা বোল্ডার ক্যানিয়নের প্রবেশ মুখটা। স্পীড না কমিয়েই বাঁক নিল ও। একটু পরেই ঢুকে পড়ল ক্যানিয়নের ভেতরে। এগিয়ে চলল সোজা। দু'পাশের পাহাড়ের দেয়াল ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে দূরে। ক্রমশ ফানেলের মত চেহারা ধারণ করছে ক্যানিয়নটা।

ক্যানিয়নে ঢোকার পরেও প্রায় পাঁচ ছ'মিনিট পার হয়ে গেছে। এখনও কোন ক্রুজার দেখতে পায়নি ও। হয় ভাঁওতা দিয়েছে ব্রনসন, নয়তো সিরিয়াস কোন ব্যাপার আছে ওকে এরকম ঘুল্লি খাওয়ানোর পেছনে। বোল্ডার ক্যানিয়ন ছেড়ে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিল রানা। স্পীড একটু কমিয়ে হুইল ঘোরাল ও। বিরাট একটা অর্ধবৃত্ত তৈরি করে ঘুরল বোট। ছুটতে লাগল ক্যানিয়নের মুখের দিকে।

বোটের গজ পাঁচেক সামনে হঠাৎ সাঁৎ করে কি যেন একটা ঢুকে গেল পানির ভেতর। ছলাৎ করে খানিকটা পানি ছিটকে পড়ল চারদিকে। এক সেকেন্ডের কয়েক ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে ঘটল ব্যাপারটা। মাছ হবে বোধহয়, ভাবল রানা। কিন্তু এক সেকেন্ড পরই আবার একই ঘটনা। এঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা 'কড়াৎ' শব্দ ভেসে এল কানে, পর মুহূর্তে আরেকটা। দু'পাশের পাহাড়ের গায়ে বাড়ি খেয়ে খেয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রতিধ্বনিত হলো শব্দ দুটো। চমকে গেছে রানা। গুলি করছে কেউ। বাঁ দিকের পাহাড় চূড়ার দিকে তাকাল ও—ওদিক থেকেই এসেছে গুলির শব্দ। রঙিন শার্ট পরা একটা লোককে দেখতে পেল পাহাড়ের ওপর। হাতে একটা রাইফেল। আবার গুলি করার জন্য তাক করছে এদিকে। ধোঁয়া দেখতে পেল রানা রাইফেলের নলে। সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু করে ফেলল। এক সেকেন্ড পর শুনতে পেল শব্দ। মাথা নিচু অবস্থায়ই ঘাড় কাত করে আবার সেদিকে তাকাল ও—এবার আর একজন নয় দু'জন লোক দেখতে পেল। দ্বিতীয় জনের হাতেও একটা রাইফেল।

তিন

মাথা নিচু করে বোটের স্টিয়ারিং ধরে রয়েছে রানা। হুইল ঘুরিয়ে বাঁ দিকের পাহাড়টার একেবারে কাছে নিয়ে এল বোট। এই পাহাড়ের ওপরেই রয়েছে রাইফেলধারীরা। একটা বুলেট এসে লাগল বোটের সুপার স্ট্রাকচারে। তলাটা ফুটো হলো কিনা বুঝতে পারল না রানা। বোটটাকে পাহাড়ের বেশি কাছে নিতে পারছে না ও। ছোট ছোট ডুবো পাহাড় রয়েছে কূলের দিকে। যে জোরে চলছে বোট তাতে একটু টোকা লাগলেই একেবারে চুরমার হয়ে যাবে। এমন একটা সমস্যায় পড়েছে রানা—এই পরিস্থিতিতে স্পীড একটুও কমানো সম্ভব নয়, এদিকে স্পীড না কমালে তীরের বেশি কাছে যাওয়াও সম্ভব নয়। বোট থামানোর কথা তো ভাবাই যায় না। একেবারে নিরস্ত্র ও, একটা পেন্সিল কাটার ছুরিও নেই সঙ্গে।

এখনও রাইফেলধারীর ফায়ারিং রেঞ্জ বা লাইন কোনটারই বাইরে যেতে পারেনি ও। আরেকটা বুলেট এসে লাগল বোটের গায়ে। ঠকাস করে শব্দ হলো একটা। চুঁইঁই করে শিস তুলে চলে গেল একটা ওর কানের পাশ দিয়ে। হাতের টিপ ভাল নয় বোধহয় লোক দুটোর। আট দশটার ভেতর এই একটাই গেল ওর এত কাছ দিয়ে।

হঠাৎ করে এক জায়গায় এসে কূলের কাছে ডুবো পাহাড়ের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল। আরও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সেগুলো। যাওয়ার সময় মাঝ বরাবর দিয়ে চালিয়ে গেছে ও, তখন খেয়াল করেনি ডুবো পাহাড়গুলো। এখন দেখল, কোনটার দুই ফুট, কোনটার এক ফুট, কোনটার ছ'ইঞ্চি মাথা জেগে রয়েছে পানির ওপর। খুব বেশি হলে দু'ইঞ্চি বেরিয়ে আছে এরকম পাহাড়ও দেখল রানা। পানির সারফেস লেভেলের নিচেও একই অবস্থা। দুই ফুট, এক ফুট, ছ'ইঞ্চি বা চার ইঞ্চি নিচে রয়েছে ডুবো পাহাড়।

আবার ক্যানিয়নের মাঝামাঝি নিয়ে আসতে হলো বোট। ছোট্ট একটা বাঁকের পর কিছুটা আড়াল হয়েছিল রাইফেলধারীরা। এখন আবার বুলেটের লাইনে চলে এল বোট। এখনও রেঞ্জের ভেতরেই রয়েছে। পর পর পাঁচ ছ'টা গুলি বেরিয়ে গেল রানার আশপাশ দিয়ে। বোটের পেছনে এসে লাগল একটা।

আরও মিনিট খানেক পর বুলেটের রেঞ্জের বাইরে আসতে পারল ও। ভেবে পাচ্ছে না রানা, একটা গুলিও ওর গায়ে লাগল না কেন? ওরা কি বোটটা ফুটো করে দিয়ে ডুবিয়ে মারতে চেয়েছিল ওকে? কারা ওরা? সিনেটরের ব্যক্তিগত বডিগার্ড? একজন সিনেটর উইদাউট প্রভোকেশন একজন আনআর্মড লোকের ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ দেবেন, ভাবা যায় না। তা যদি কোন সিনেটর করতে পারেন তো একটা নিরীহ মেয়েকে ধর্ষণের পর খুন করে বাথরুমে ফেলে রাখাও তার পক্ষে অসম্ভব নয়। বোধহয় সিনেটরের বডিগার্ড নয় ওরা। তাহলে কে?

গতরাতের ফোন কলের কথা মনে পড়ল রানার। অজ্ঞাত পরিচয় কিছু লোকের কি স্বার্থ থাকতে পারে ওকে খুন করার পেছনে? পুরানো কোন শত্রু ওর? এয়ারপোর্টে, মোটেলে বা হোটেল ব্লুস্টারে ওকে দেখেই চিনে ফেলেছে এবং তাৎক্ষণিক ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওকে খুন করার? তাও না বোধহয়। তাহলে ফোন করে সাবধান করত না, সোজা পেছন থেকে পিঠে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিলেই পারত। অন্য কোন কাগজের লোক? যারা ব্রনসনের কাছ থেকে খবর পেয়ে ভাগিয়ে দিতে চাইছে ওকে। দ্য নিউজের নিরপেক্ষ নীতি অনেক আন্তর্জাতিক পত্রিকারই পছন্দ নয়। ফোনে ভয় দেখিয়ে কাজ হয়নি বলে মেরে ফেলতে চায়। অবশ্য গুলি করাটা ভয় দেখানোর জন্যেও হতে পারে। দু-দু'জন রাইফেলধারী দু'জনেরই হাতের টিপ যাচ্ছেতাই তা হতে পারে না। পনেরো বিশটা গুলি ছোঁড়া হয়েছে ওকে লক্ষ্য করে, কিন্তু একটাও লাগেনি!

বোল্ডার ক্যানিয়ন ছেড়ে বেরিয়ে এল বোট। আর কোন গুলিগোলার শব্দ নেই আপাতত। এটাই ঠিক, ওকে ভয় দেখিয়ে ভাগাতে চাইছে কেউ। চঞ্চলভাবে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে রানার চোখ। পেছন ফিরে তাকাল ক্যানিয়নের মুখে দু'পাশের পাহাড় চূড়ার দিকে। আর কোন বন্দুকধারী নজরে পড়ল না। কিন্তু

এদিকে তো থাকবার কথা দু'একজনের, ও যে ক্যানিয়নের ভেতরে ঢুকবে এমন কোন নিশ্চয়তা তো ছিল না!

অকারণে হঠাৎ পেছনে ফিরতেই নজরে পড়ল ওর ঘটনাটা। পাহাড়ের গায়ের একটা খাদের ভেতর থেকে দুটো বোট বেরিয়ে আসছে। দ্রুতগামী পাওয়ার ক্রুজার দুটোই। আধ মাইল মত পেছনে রয়েছে। এগিয়ে আসছে রানার সমান গতিতে।

ও দুটোর একটা কি ড্রাগন ফ্লাই? ওকে ভাগানোর চেষ্টা করার পাশাপাশি অন্য কেউ এসে ইন্টারভিউ নিচ্ছে সিনেটরের? দুটো ক্রুজার কেন তা নাহলে? দেখাই যাক আসল ব্যাপারটা কি?

স্লো করল রানা বোট। ক্রুজার দুটো কাছাকাছি এসে পড়লেই দেখে নেয়া যাবে কারা ওরা। কমে আসতে লাগল বোট আর ক্রুজার দুটোর মাঝখানের দূরত্ব। কয়েক সেকেন্ড পর ওরা বুঝতে পারল স্পীড কমিয়ে দিয়েছে রানা। ওরাও স্পীড কমাল সঙ্গে সঙ্গে। বুঝতে পারল না রানা, ব্যাপারটা কো-ইন্সিডেন্স কিনা। থ্রটলটা একটু বাড়িয়ে দিল আবার। লাফিয়ে উঠে খাড়া হয়ে গেল বোটের সামনেটা। মুহূর্তে স্পীড উঠে গেল চল্লিশ মাইলে।

পেছন ফিরে তাকাল রানা। হ্যাঁ, ক্রুজার দুটোও স্পীড বাড়িয়েছে। ফলো করছে ওরা। অর্থাৎ এখনও বিপদ কাটেনি ওর। হয়তো আসল বিপদ শুরু হলো মাত্র। নিশ্চয়ই ক্রুজারগুলোতেও রয়েছে আরও বন্দুকধারী লোক।

তাহলে দূরত্ব বজায় রেখে ফলো করে আসছে কেন ওরা? নিশ্চিন্ত মনে গুলি করতে পারে তো। এখনও জনশূন্য লেকের ওপরটা। অথবা, দ্রুত চালিয়ে এসে ধরে ফেলতে পারে ওকে; বোটের চেয়ে অনেক দ্রুতগামী ক্রুজার ওগুলো।

ম্যাপটা মেলে ধরল রানা। প্রচণ্ড বাতাসের জন্য ঠিকমত মেলা যাচ্ছে না। সবচেয়ে তাড়াতাড়ি নামার সম্ভাব্য জায়গাগুলো দেখতে চায় ও। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লোকালয়ে পৌঁছতে হবে।

ম্যাপে বোনেলি নামে একটা জায়গা দেখল রানা—মাইল দশেক দক্ষিণে। কিন্তু সেদিকে যাওয়ার পরিকল্পনাটা বাতিল করে দিল ও। জায়গাটা লেকের তীরে হলেও এর অন্য তিন দিকে বিরাট এলাকা জুড়ে মরুভূমি ছাড়া আর কিছু নেই। আরও তিনটে জায়গা দেখল। সেগুলো তত কাছে নয়। ওর বর্তমান অবস্থান থেকে বারো কি পনেরো মাইলের মধ্যে জায়গাগুলো। ইকো বে, রজার্স স্প্রিং এবং ওভারটন বিচ শব্দগুলো কোন অর্থ বহন করল না ওর কাছে। ওগুলো যে জায়গার নাম তা বুঝতে পারছে তবে কোন্ জায়গার, কেমন সে জায়গা সে-সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই ওর। এই ক'টা জায়গা ছাড়া লেকের তীরের অন্যান্য জায়গাগুলো বিরাট মরু এলাকা—এটুকুই শুধু দেখানো আছে ম্যাপে।

উত্তর দিকে কোর্স সেট করল রানা। ফুলস্পীডে এগোচ্ছে বোট। একই গতিতে আধ মাইল পেছনে থেকে আসছে ক্রুজার দুটোও।

কয়েক মিনিট পর, তীক্ষ্ণ সূচাল একটা অন্তরীপ মত জায়গা পার হলো বোট। আপার লেকটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। অন্তরীপটা ঘোরার পর খেয়াল করল ও, পুব দিকে চলছে বোট। আবার উত্তর দিকে ঘোরাল ও বোটের মুখ। অন্তরীপের আড়ালে পড়ে গেছে ক্রুজার দুটো। হঠাৎ করে একটা আশার আলো দেখতে

পাওয়ার চেষ্টা করল রানা—ফলো করছে না বোধহয় ক্রুজারগুলো। ওদের উপস্থিতিটা নিছক একটা কাকতালীয় ব্যাপার বোধহয়। কিন্তু একটু পরেই ওর আশার গুড়ে বালি দিয়ে বেরিয়ে এল ক্রুজার দুটো অন্তরীপের আড়াল থেকে। বোটের কোর্স অনুসরণ করছে ও দুটোও।

ইকো বে জায়গাটা এখনও বারো-তেরো মাইল দূরে। দেখা যাক ও পর্যন্ত পৌঁছার পর কি ঘটে।

ইকো বে আর বেশি দূর নয় এখন। কয়েক মাইল হবে হয়তো। খালি চোখেই রানা দেখতে পাচ্ছে উপকূল। একটু পরপরই পেছন ফিরে ক্রুজারগুলো দেখছে ও। হঠাৎ একটা ক্রুজার স্পীড বাড়িয়ে এগিয়ে আসতে শুরু করল। বাঁ দিক দিয়ে উপকূল আর রানার বোটের মাঝখানের জায়গাটায় ঢুকে পড়ল। বোটের সঙ্গে সমান্তরাল একটা কোর্সে চলতে লাগল। ক্রুজারের ডেকে একটা লোক বেরিয়ে এল, হাতে সরু লম্বা একটা কি যেন। সম্ভবত রাইফেল। উত্তর দিকে হাত বাড়িয়ে কাউকে কিছু একটা ইশারা করছে সে।

নিশ্চয়ই সুপরিকল্পিত কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কাজগুলো করছে ওরা। প্রথমে টেলিফোনে ভয় দেখানো, তারপর গুলি ছোঁড়া, সবশেষে এখন ও যে-দিকে যেতে চাইছে সেদিকে যেতে না দিয়ে অন্যদিকে যেতে বাধ্য করা—সবই একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে করেছে ওরা। কিন্তু উদ্দেশ্যটা যে ঠিক কি তা বিন্দুমাত্র আন্দাজ করতে পারল না রানা। কারা ওরা তাও ধারণা করতে পারল না। প্রশ্ন প্লাস প্রশ্ন সমান সমান প্লাস অথবা মাইনাস প্রশ্ন—অর্থাৎ সমস্যাটা রয়েই গেল।

বোটের নাকটা একটু ঘোরাল রানা। পাশের ক্রুজারটা আবার স্পীড বাড়িয়ে ঘুরে সামনে চলে আসছে। অর্থাৎ, ইকো বে-তে নামতে দিতে চায় না ওরা ওকে। বোটের নাকটা আরও একটু ঘুরিয়ে লেক সিডের মাঝের দিকে চলতে লাগল ও। ক্রুজারটাও আবার পিছিয়ে পড়ে বোট আর উপকূলের মাঝ দিয়ে পাশে পাশে চলতে লাগল। পেছনের ক্রুজারটাও একটু ডানদিকে সরে এগিয়ে এসেছে খানিকটা। দু'দিক থেকে চাপছে ওরা এখন।

আরও চার-পাঁচ মাইল পর রজার্স স্প্রিং এল এবং পেরিয়ে গেল। এবারও কূলের দিকে যেতে পারল না রানা। এবারও ক্রুজার আগে বাড়িয়ে বাধা দিল ওরা। এখন বাকি রইল কেবল ওভারটন বিচ। ওখানে লেকটা দু'ভাগে ভাগ হয়ে দু'দিকে চলে গেছে। বাঁ দিকের শাখাটার আশেপাশে নির্জন মরু এলাকা আর ডানদিকেরটা চলে গেছে ভার্জিন রিভারের দিকে। ওরা বোধহয় এই দু'দিকের কোন একদিকে পরিচালিত করতে চায় রানাকে। নিশ্চয়ই সময় মত ওরা জানতে দেবে কোন্‌দিকে যাবে ও।

পাশের ক্রুজারটা আবার একটু পিছিয়ে পড়েছে। দুটো এখন পাশাপাশি এগিয়ে আসছে। ছ'শো গজের মত পেছনে রয়েছে ও দুটো। একটু একটু করে নিজেদের দিকে চাপছে ওরা। একটা সমবাহু ত্রিভুজের তিন শীর্ষ বিন্দুতে রয়েছে বোট এবং ক্রুজার দুটো। সামনে দেখা যাচ্ছে ওভারটন বিচ, আধ মাইলের বেশি দূরে নয়।

থ্রটলটার দিকে তাকাল রানা, আরেকটু স্পীড বাড়ানো সম্ভব মনে হচ্ছে। এখন যদি আচমকা ফুল থ্রট্‌লে এগিয়ে যাওয়া যায় তো ওদের আগেই ও পৌঁছে

যাবে ওভারটন বিচে। অন্তত দু'তিন মিনিট আগে থাকতে পারবে ও। তাহলে লাভ কি হবে? ক্রুজারগুলো খুব বেশি পেছনে নয়। তাছাড়া ওগুলোর একটাতে, অন্তত একটা রাইফেল রয়েছে। দুটো ক্রুজার মিলে রাইফেলের সংখ্যা আরও বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। অন্যদিকে ওভারটন বিচের উত্তর দিকে লেক উপকূল জনবসতি-শূন্য। লুকানোর কোন জায়গা নেই সেখানে। আর ভার্জিন রিভারের দিকে বিশ মাইলের ভেতর কোন পায়েচলা পথও নেই। সামনে তাকাল রানা। এখন আরও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বিচটা।

কি করবে রানা? ক্রুজারগুলোর আগেই ও নামতে পারবে ওভারটন বিচে। কিন্তু তারপর? যা-ই হোক আপাতত পায়ের নিচে মাটি দরকার। তাছাড়া বিচের ওপাশে একটা কি যেন দেখতে পেয়েছে ও। থ্রট্‌লটা পুরো ঠেলে দিতেই বেশ খানিকটা স্পীড বেড়ে গেল বোটের। দ্রুত বেড়ে যেতে লাগল মাঝখানের ফাঁকটাও।

নিচু হয়ে সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে যথাসম্ভব ছোট করে আনল ও প্রতিপক্ষের টার্গেট। বোটের পেট্রল ট্যাঙ্কটা পেছনে, এটাই এখন বড় চিন্তা রানার। ওটাতে একটা গুলি লাগলেই শেষ। তাড়িয়ে দিল দুশ্চিন্তাটা মাথা থেকে—এ ব্যাপারে কিছুই করার নেই ওর। এসে পড়েছে বিচ। কিছু বুঝতে পারার আগেই অনেকটা পেছনে পড়ে গেছে ক্রুজারগুলো। ওরা যখন স্পীড বাড়াল রানা তখন প্রায় পৌঁছে গেছে বিচে। খুব বেশি গভীর নয় বোটের খোল। বোট নিয়ে সোজা বিচে উঠে পড়ার সিদ্ধান্ত নিল ও। ক্রুজারগুলোকে একটু গভীর পানিতে থামতে হবে—বেশ গভীর ওগুলোর খোল। তারপর ছোট বোটে করে অথবা পানি ভেঙে ওদেরকে আসতে হবে বিচে। মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠল রানা।

ঝিঁঝি পোকার শব্দ তুলে ওর কানের কাছ দিয়ে কি একটা যেন চলে গেল। পেছনে তাকানোর প্রয়োজনবোধ করল না রানা। বুঝতে পেরেছে কি ওটা। সামনের নিস্তরঙ্গ পানি ছিটিয়ে ঢুকে পড়ল বুলেটটা। এক সেকেন্ড পরে আরেকটা। মাথা আরেকটু নিচু করে হুইল ঘুরিয়ে এঁকেবেঁকে ছোটাতে লাগল রানা বোট।

এসে পড়েছে বিচ। আর গজ পঞ্চাশেকও দূরে নয়। হ্যাঁচকা একটানে থ্রট্‌লটা টেনে দিয়ে স্টিয়ারিংটা শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরল ও। মাথাটা খাড়া অবস্থায়ই ঢালু নরম বেলে বিচের ওপর ঘষটে উঠে পড়ল বোট। ছ্যাড়ড় ড়···তলাটা বিচের সঙ্গে ঘষা খাওয়ার প্রচণ্ড শব্দ উঠল। পেছনটা ঘুরে গেল সাঁ করে। আচমকা একদিকে কাত হয়ে গেল বোটটা। ছিটকে ওঠা পানিতে ভিজে গেল রানার গায়ের কাপড়। প্রচণ্ড একটা ধাক্কায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল ও ড্যাশ বোর্ডের ওপর। কপালটা বাড়ি খেলো উইন্ডস্ক্রিনের সঙ্গে।

তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে লাফ দিয়ে নেমে এল ও বোট থেকে। ভাগ্য ভাল বলতে হবে। মারাত্মক ঝুঁকি নিয়েছিল ও। এই স্পীডে বিচের সঙ্গে ধাক্কা লাগা আর পাথরের দেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ায় তফাৎ নেই কোন। বিচটা যদি আরেকটু শক্ত হত তাহলেই গেছিল: পেট্রল ট্যাঙ্কের বিস্ফোরণ ঠেকানো যেত না।

ডান পাশে কিছুটা দূরে কাঠের একটা জেটি মত, তার ওপাশে আধুনিক ডিজাইনের একটা নিচু বিল্ডিং। মোটেল অথবা বড়সড় রেস্টুরেন্টের মত দেখতে

অনেকটা। পড়িমরি করে দৌড় দিল রানা বিল্ডিংটার দিকে। দৌড়াতে দৌড়াতেই পেছন ফিরে তাকাল ও। ভুল ভেবেছিল ও। কূল থেকে দূরে থামছে না ক্রুজার দুটো। কাঠের জেটির দিকে আসছে ওগুলো। ভেতরে ভেতরে চুপসে গেল রানা। দৌড়ের গতি বাড়াল একটু।

বিচ থেকে পঞ্চাশ গজ মত দূরে বিল্ডিংটা। বিশ গজ যাওয়ার পরেই টের পেল ও গরমের প্রচণ্ডতা। চুলোর ভেতর ঢুকে পড়েছে যেন। এটুকু সময়ের মধ্যেই দর দর করে ঘাম নেমে আসতে শুরু করেছে সারা শরীর বেয়ে। লেকের ওপর দ্রুতগামী বোটে থাকায় আগে টের পায়নি গরমটা।

কাপড়ের ভেজা অংশগুলো সেঁটে গেছে শরীরের সঙ্গে। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে রানা। লোকজন নেই নাকি বাড়িটায়? বন্ধ জানালা দরজা। সূর্যের আলো জানালার কাঁচে পড়ে প্রতিফলিত হচ্ছে। ফুটন্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত আগুনে পড়েছে সে? বিল্ডিংটার সামনে পৌঁছে আরেকবার পেছনে তাকাল ও। জেটির দুই প্রান্তে ভিড়ছে ক্রুজার দুটো। প্রতিটা ক্রুজারে দু'তিনজন করে রাইফেলধারী দেখতে পেল ও; জেটির ওপর লাফিয়ে নামবার জন্য তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘুরে তাড়াতাড়ি বিল্ডিংয়ের ওপাশটায় গিয়ে পৌঁছল রানা। কাঁচের দরজার ওপর 'বন্ধ' লেখা সাইন প্লেট দেখতে পেল। চূড়ান্ত হতাশায় ছেয়ে গেল ওর মন। লুকোনোর মত কোন জায়গা পাওয়ার আশায় দ্রুত একবার চারপাশটা নিরীখ করল। ধূসর রঙের পিচঢালা রাজপথ ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না। বুঝতে পারছে রানা ফাঁদে পড়ে গেছে। আত্মসমর্পণ করা অথবা রাইফেলের বুলেট বিদ্ধ হয়ে মরা ছাড়া আর কোন উপায় নেই!

দৌড়ে বিল্ডিংয়ের অন্যপাশে চলে গেল রানা। একটা কারপার্ক। দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। একটা গাড়ির দরজা খুলে এক লোক বেরিয়ে আসছে। সম্ভবত রেস্টুরেন্টটা চালায় সে। মাত্র এসে পৌঁছেচে, এখন খুলবে ওটার দরজা জানালা। কিন্তু এল কখন লোকটা, গাড়ির শব্দ পায়নি তো ও! অত কিছু ভাবার সময় নেই, দৌড়াল রানা সেদিকে। বিশ গজ মত দূরে দাঁড়ানো গাড়িটা। ওর পদশব্দ পেয়ে ফিরে তাকিয়েছে লোকটা। চোখে প্রশ্ন।

'কি হয়েছে?' রানার হন্তদন্ত ভাব দেখে জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'আমাকে তাড়া করে আসছে কয়েকটা লোক, মারতে চাইছে,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'রাইফেল রয়েছে ওদের কাছে। প্লীজ, একটু সাহায্য করুন আমাকে।'

তাকিয়ে রইল লোকটা ওর দিকে।

'তাড়াতাড়ি...প্লীজ!' আবার বলল ও। 'আপনার গাড়িটা একটু ধার দিন আমাকে, অথবা পৌঁছে দিয়ে আসুন লোকালয়ে।'

আরও কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইল লোকটা ওর দিকে। তারপর দরজা খুলে ধরে বলল, 'ঠিক আছে, উঠুন গাড়িতে।' প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে উঠে বসল রানা সামনের সীটে। লোকটাও উঠে বসল স্টিয়ারিংয়ের পেছনে।

'ধন্যবাদ! অসংখ্য ধন্যবাদ!' লোকটার মখের দিকে তাকিয়ে বলল ও। চলতে

শুরু করেছে গাড়ি। পেছনে ফিরে চাইল রানা, দেখতে চায় ধাওয়াকারীদের মতিগতি। হ্যাঁ, এসে পড়েছে ওরা। রাইফেল তুলল একজন। ছুটতে ছুটতেই গুলি করল। পেছনের বনেটে লাগল গুলি। উঠে পড়েছে গাড়ি রাস্তার ওপর। কয়েক সেকেন্ড পর দৃষ্টিপথের আড়ালে চলে গেল ধাওয়াকারীরা।

চুপচাপ বসে আছে রানা। সামনের দিকে দৃষ্টি রেখে নিঃশব্দে গাড়ি চালাচ্ছে লোকটা। রোদে পোড়া চেহারা। সহজ সাবলীল একটা ভঙ্গিতে স্টিয়ারিং ধরে বসে আছে। আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে কোন রকম ঝাঁকুনি না লাগিয়ে ঘুরছে বাঁকগুলো। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল একবার রানার দিকে। কিছু একটা ঝিলিক দিয়ে উঠল কি লোকটার চোখে?

তিন-চার মাইল পথ পেরোনোর পর একটা ক্রস রোডের কাছে এসে পৌঁছল গাড়ি। একটা সাইন পোস্টে তীর চিহ্ন দিয়ে রাস্তাগুলোর গন্তব্য দেখানো রয়েছে। বাঁয়ের রাস্তাটা চলে গেছে ইকো বে এবং লাস ভেগাসের দিকে, ডানেরটা গ্লেনডেলের দিকে। এই দু'পথের একটাতেও না ঢুকে সোজা চলতে লাগল গাড়ি। হঠাৎ করেই বদলে গেল সামনের প্রকৃতি। ধূসর পাহাড়ী মরুর বদলে লাল রঙের পাহাড় দেখা যাচ্ছে। একটু পরে আরেকটা সাইন পোস্ট দেখতে পেল রানা: SCENIC RIM DRIVE: VALLEY OF FIRE STATE PARK. পাকা রাস্তা ছেড়ে বাঁ দিকের একটা মেঠো পথ ধরল লোকটা।

এবার আর না চমকে পারল না রানা। পেছন ফিরে দেখল একটা নীল রঙের গাড়ি ধুলো উড়িয়ে এগিয়ে আসছে এদিকে। ওভারটন বিচের বিল্ডিংটার কারপার্কে দেখা অন্য গাড়িটাও নীল রঙেরই ছিল, মনে পড়ল রানার। মুখ ঘুরিয়ে কিছু বলতে গেল রানা লোকটাকে, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে অনেক। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ফেলেছে লোকটা। কড়া ব্রেকের ফলে সামনে ঝুঁকে পড়ল রানা। সোজা হয়েই দেখল একটা রিভলভার শোভা পাচ্ছে লোকটার হাতে। ওর দিকেই তাক করে ধরা।

'বেরোও,' বলল লোকটা।

'কিন্তু...'

'বেরোও।' ভাবলেশহীন লোকটার মুখ।

'ওরা খুন করে ফেলবে আমাকে...'

'তিন পর্যন্ত গুনব আমি।'

লোকটার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল রানা। দ্রুত কাছে এসে পড়ছে নীল গাড়িটা।

'এসে পড়েছে ওরা,' বলল ও।

'এক।'

দরজার হ্যান্ডেলে হাত রাখল রানা। এক সেকেন্ড বিরতি নিল—না সম্ভব নয় লোকটাকে কায়দা করা। আর সম্ভব হলেও ততক্ষণে এসে পড়বে নীল গাড়িটা। ভেতরের লোকগুলোর হাতে রাইফেলের নল এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে রানা।

'দুই।'

খুলে ফেলল ও দরজা। নেমে এল গাড়ি থেকে। একশো গজও দূরে নয় নীল

গাড়িটা। ইতোমধ্যেই লোকটা ছেড়ে দিয়েছে গাড়ি। রওনা হয়ে গেছে বড় রাস্তার দিকে।

চারদিকে একবার তাকাল রানা। রাস্তার পাশে পাহাড়ের সারির মাঝ দিয়ে একটা ফাঁক মত দেখতে পেল ও। ছুটল সেদিকে।

চার

দৌড়ে পাহাড়ের ফাঁক গলে ঢুকে পড়তে পড়তে পেছনে নীল গাড়িটা এসে দাঁড়ানোর শব্দ শুনতে পেল রানা। ফিরে তাকাল না ও। দরজা খোলার এবং বন্ধ হওয়ার শব্দ। তারপর কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতা। ছুটছে রানা ঊর্ধ্বশ্বাসে। যথাসম্ভব বাড়াতে চাইছে রাস্তার সঙ্গে ওর দূরত্ব।

অসহ্য হয়ে উঠেছে গরম। মেঘশূন্য আকাশ। গনগনে আগুন ছড়াচ্ছে সূর্য। পাহাড়ের ফাঁকটুকুতে বাতাস এত গরম যে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ফাঁকা জায়গার অবস্থা আরও খারাপ। গরম হলেও ছায়া আছে পাহাড়ের ফাঁকে, কিন্তু ফাঁকা জায়গায় ছায়ার লেশমাত্র নেই। সূর্যের কিরণ সরাসরি এসে বাড়ি মারছে মাথায়। আর একটু দ্রুত ছোটার চেষ্টা করল রানা। কিন্তু পড়ে গেল হোঁচট খেয়ে। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল আবার। মাটিতে পড়ে থাকা দুটো বিশাল পাথরের ফাঁকে ঢুকে পড়ল মাথা নিচু করে। সংকীর্ণ গিরিপথের মত জায়গাটা। আবার স্রোতের মত ঘাম নেমে আসতে শুরু করেছে শরীর বেয়ে।

আরও গজ পাঁচেক যাওয়ার পর একটা বাঁক দেখতে পেল ও। বাঁকটা ঘুরতেই বন্ধ হয়ে গেল সামনেটা। বিরাট বিরাট বেলে পাথরে বন্ধ হয়ে আছে পথ। কমপক্ষে দশ ফুট উঁচু হবে পাথরের স্তূপটা। ছোটবড় অসংখ্য ফাটল স্তূপটায়। এখন আর ফেরার সময় নেই। এই গিরিখাতের বাইরে বেরোনোর আগেই গুলি খাবে ও। স্তূপটা টপকানোর সিদ্ধান্ত নিল রানা।

মাটি থেকে ফুট তিনেক উঁচুতে একটা ফাটলে ডান পা রেখে হাতড়ে হাতড়ে উপরে আরেকটা ফাটলে হাত ঢুকিয়ে শক্ত করে ধরল ও। অন্য পা দিয়ে নিচের দিকে একটা ঠেলা দিয়ে উঠে পড়ল ফাটলটায়। মাটি থেকে সাত-আট ফুট উপরে সরু একটা পাথরের থাক মত। দ্বিতীয় ধাক্কায় থাকটার উপরে উঠে পড়তে পারল রানা। সেখান থেকে চূড়াটা তিন ফুটের বেশি হবে না। ছোট ছোট দুটো ফাটলে পা বাধিয়ে উঠে পড়ল ও চূড়ায়। সঙ্গে সঙ্গেই উপুড় হয়ে বসে পড়ল ও। চুঁইঁই করে শিস বাজিয়ে একটা বুলেট চলে গেছে ঠিক কানের পাশ দিয়ে।

ভীষণ উত্তপ্ত হয়ে আছে পাথর। হাত সরিয়ে নিল রানা পাথরের ওপর থেকে। ফোস্কা পড়ে যাবে মনে হচ্ছে হাতে। এখনও শুকায়নি ওর গায়ের কাপড়। ভিজে কাপড়ের জন্যেই গরম আরও বেশি লাগছে। যা-ই হোক নামতে হবে এই স্তূপের ওপর থেকে।

যেমন গরম তেমনি এবড়োখেবড়ো পাথরের স্তূপের ওপরটা। বসা অবস্থায়ই কুঁজো হয়ে একটু একটু করে এগিয়ে গেল ও অন্য প্রান্তের দিকে। এইটুকু জায়গা পেরোতেই জান বেরিয়ে যাবার দশা হলো। পাথরে হাত রাখতে পারছে না, গরম। দাঁড়াতে পারছে না, গুলির ভয়।

শেষ মাথায় পৌঁছে নিচে তাকাল রানা। এদিকে মাটি প্রায় পনেরো ফুট নিচে। অসংখ্য ফাটল স্তূপের এ পাশের দেয়ালেও।

স্তূপের প্রান্তভাগ দিয়ে পা দুটো ঝুলিয়ে দিয়ে পেছন দিকে একটু হেলে শরীর ঢিল করে দিল রানা। লাফ দেয়া ছাড়া উপায় নেই। কয়েক সেকেন্ডের চেষ্টায় পা দুটো একটা ফাটলে আটকাতে পারল ও, কিন্তু হাত দুটোর জন্যে কোন জায়গা খুঁজে পেল না। ইতোমধ্যেই প্রায় কাবাব হয়ে গেছে পেছন দিকটা। তাড়াতাড়ি একটা মসৃণ পাথর ধরে উঠে দাঁড়াল ও, লাল বেলে পাথরগুলোর চেয়ে মসৃণ পাথরগুলো একটু কম গরম। সাঁ করে আরেকটা গুলি বেরিয়ে গেল কানের পাশ দিয়ে। লাফ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল রানা। যা হয় হবে; এছাড়া আর কোন উপায় নেই। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছে, যেন হাত-পা না ভাঙে। গোড়ালির একটুখানি মাত্র বেধে আছে ফাটলে। একটু একটু করে কাঁপতে শুরু করেছে পা দুটো।

নিচে খানিকটা সমতল জায়গা। ওখানেই লাফ দিয়ে পড়তে চায় রানা। টলমল করতে করতে লাফিয়ে পড়ল ও।

সশব্দে মাটিতে পড়ল রানা। দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করেও পারল না। বসে পড়ল ধপাস করে। ভাগ্য ভাল, জায়গাটায় শক্ত পাথর ছিল না। তাও যে ধাক্কাটা লাগল শরীরের ওপর, সেটা সামলাতেও অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। পা ভাঙেনি বটে, তবে উঠে দাঁড়িয়ে আবার দৌড়ানোর মত ক্ষমতা অর্জন করতে প্রায় ত্রিশ সেকেন্ড লাগল।

সামনে তাকিয়েই পায়ের ব্যথার কথা ভুলে গেল ও। সামনে একটা পথ দেখা যাচ্ছে, পাথর আর চাঁইয়ের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছুটতে শুরু করল রানা।

'এদিকে!'

পেছন থেকে একটা চিৎকারের শব্দ ভেসে এল। ধড়াস করে উঠল বুকের ভেতরটা। পেছন ফিরে না তাকিয়ে পারল না। গজ পঞ্চাশেক দূরে একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে লোকটা। রাইফেল তুলছে এইদিক লক্ষ্য করে।

ঝট্ করে পাশের একটা পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিল ও। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেল গুলির শব্দ। একটা বুলেট এসে পাথরের খানিকটা ছাল তুলে নিয়ে চলে গেল। এখন যদি এই পাথরের আড়াল থেকে বের হয় ও, তাহলে সরাসরি লোকটার টার্গেটে পরিণত হবে। আবার, এখানে বেশিক্ষণ থাকাও ঠিক নয়। অন্যান্য দিক থেকে আরও রাইফেলধারী এসে পড়তে পারে যে কোন সময়। কি করা যায়? চারদিকে তাকাচ্ছে রানা। হ্যাঁ, আরেকটা ফোকর দেখতে পেয়েছে ও। চার-পাঁচ গজ দূরে একটা পাহাড়ের ভেতর দিকে ঢুকে গেছে ফোকরটা। লম্বা একটা দম নিয়ে ছুটল ও সেদিকে। কড়াৎ করে শব্দ হলো পেছনে। আরেকটা

বুলেট এসে লাগল পাহাড়ের গায়ে।

ফোকর গলে ঢুকে পড়ল রানা ভেতরে। ধাপে ধাপে পাথর উঠে গেছে উপর দিকে। উঠতে শুরু করল ও। গরম, পরিশ্রম আর আতঙ্ক; সব মিলিয়ে কাহিল হয়ে পড়েছে রানা। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। শুকিয়ে গেছে বুকের ভেতরটা। দরদর ঘাম বেরোচ্ছে শরীর দিয়ে। এভাবে আর কিছুক্ষণ চললে ডি-হাইড্রেশনের শিকার হয়ে যাবে ও। বার বার ঢোক গিলেও গলার শুকনো খটখটে ভাবটাকে তাড়াতে পারছে না। হাপরের মত ওঠানামা করছে বুকটা। কপাল থেকে চোখের পাতা বেয়ে নোনতা ঘাম নেমে আসছে চোখের ভেতর। জ্বালা করছে চোখ। এভাবে আর কিছুক্ষণ চললে বোধহয় ফেটে যাবে হৃৎপিণ্ড। নেভাডার মরু এলাকার গরমের কথা শোনা ছিল, কিন্তু তা যে এত প্রচণ্ড তা ধারণার বাইরে ছিল। 'ভ্যালি অভ ফায়ার' নামটা শুধু শুধু হয়নি।

সরু গিরিপথ বেয়ে টলতে টলতে এগিয়ে গেল রানা। কিছুদূর যাওয়ার পর ফাঁকা জায়গায় এসে পড়ল ও। একটু দূরে পাশ দিয়ে আরেকটা একই ধরনের গিরিখাত এগিয়ে গেছে ডানদিকে। ফাঁকা জায়গাটুকু পার হয়ে নতুন গিরিপথটায় ঢুকবে বলে ঠিক করল রানা। দু'পা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুলির শব্দ শুনতে পেল ও। একটা পাথরের খানিকটা চলটা উঠিয়ে ছিটকে পড়ল। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দৌড়াল রানা। পাশের গিরিপথটায় ঢুকে পড়তে হবে।

গিরিপথটার মুখে পৌঁছে ডাইভ দিল ও। সিরিশ কাগজের উপর ডাইভ দিল যেন—হাঁটু আর কনুই ঘষা খেলো তীব্রভাবে। কাপড়ের নিচে হাঁটুর কাছটা ছিঁড়ে গেল কিনা বুঝতে পারল না। বোঝার মত সময়ও নেই। কয়েক সেকেন্ড পরেই উঠে দাঁড়িয়ে ছুটতে শুরু করল আবার। এছাড়া আর কিছু করার নেই ওর।

কিন্তু এভাবে তো আর চলতে পারে না। গাড়ি থেকে নামার পর খুব বেশি হলে সিকি মাইল এসেছে, কিন্তু এর ভেতরেই প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে ও। মারাত্মক গরম আর পাহাড়ী উচ্চতার কারণে শক্তি শেষ হয়ে আসছে দ্রুত। সি-লেভেল থেকে দেড়-দু'হাজার ফুট উঁচুতে জায়গাটা। বাতাস এখানে হালকা। স্বাভাবিকভাবে হাঁটা চলা করলেই একটুতে হাঁপিয়ে ওঠার কথা। আর ওকে ছুটতে হচ্ছে সর্বশক্তিতে, তার ওপর গরম। সি-লেভেল ফুসফুস নিয়ে এই উচ্চতা আর উষ্ণতায় খাবি খাচ্ছে রানা, যেন ডাঙায় তোলা মাছ।

যত জোরে ছুটতে চাইছে ও, ততই কমে আসছে গতি। প্রতিবার পা ফেলার আগে হাঁটুতে হাত রেখে শক্তি সঞ্চয় করতে হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর আবার ফাঁকা জায়গায় এসে পড়ল ও। সঙ্গে সঙ্গে আবার ভেসে এল গুলির শব্দ। একেবারে কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল এবারে গুলিটা। অন্ধের মত মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা। এরকম ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা মানেই মৃত্যু। বড়সড় একটা পাথরের ওপর পড়ল বুকটা। প্রচণ্ড ব্যথায় কুঁকড়ে গেল ও। পাঁজর ভেঙে গেল নাকি? সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে ব্যথা।

ঝাপসা চোখে পেছন দিকে তাকাল রানা। দেখতে পেল না কাউকে। কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারল না। পেছনে কাউকে দেখা যাচ্ছে না বলে আততায়ীরা চলে গেছে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। আশেপাশে এমন হাজারটা জায়গা

আছে যেখানে লুকিয়ে থেকে ওর দুরবস্থা দেখে মনে মনে হাসতে পারে ওরা, উঠে দাঁড়ালেই গুলি করবে। এবার আর মিস করবে বলে মনে হয় না।

অনেকক্ষণ মুখ গুঁজে পড়ে রইল রানা। পাঁজরের ব্যথাটা কমে এসেছে। একটু একটু করে বুকে হেঁটে এগোতে লাগল ও। সামনে একটা নিরাপদ জায়গা দেখতে পেয়েছে। বড়সড় একটা ফাটল। ওই ফাটল গলে অনায়াসে ঢুকে পড়তে পারবে। শরীরের সমস্ত শক্তি একসঙ্গে জড় করে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে ও। চারদিক নিস্তব্ধ। আর কোন গুলির শব্দ নেই। একটু একটু করে শরীরটাকে টেনে নিয়ে ঢুকে পড়ল ফাটলটার ভেতরে।

ফাটলের ভেতরের বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ আরও কম। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর। সমানে ঘেমে চলেছে। ফাটলের ভেতরে গরমও বাইরের তুলনায় বেশি। এবার কি করা যায় ভেবে পাচ্ছে না রানা। একবার ভাবল আর কোন চেষ্টা করবে না। এভাবে বাঁচার চেষ্টা করার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। অন্তত মানসিক কষ্টটা ভোগ করতে হবে না তাতে।

হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চমকের মত ঝলসে উঠল চিন্তাটা ওর মাথায়। এতক্ষণ কেন চিন্তাটা মাথায় আসেনি ভেবে পেল না। প্রশ্নের আকারে ঘুরপাক খেতে লাগল চিন্তাটা—যদি ওরা খুনই করতে চায় আমাকে তাহলে গায়ে কেন গুলি লাগছে না? হাতের টিপ খারাপ ওদের? এরকম সম্ভাবনা খুবই কম। চল্লিশ পঞ্চাশ গজ দূর থেকে একটা লোকের গায়ে গুলি লাগানো কিছুই না। একবার দু'বার মিস হতে পারে; ক্রমাগত মিস হয়ে চলেছে ওদের শট, সবক'টা গুলি কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, কেন?

ভাল করে কিছু ভাবতে পারছে না রানা। সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে মাথার ভেতর। মনে হচ্ছে একটা ফার্নেসের ভেতর গুড়ি মেরে বসে আছে ও। সমস্ত ইচ্ছাশক্তি জড় করে চিন্তাটায় মন দিতে চেষ্টা করল ও। পুরো ঘটনাটা গোড়া থেকে ভেবে দেখার চেষ্টা করল।

লেকের ওপর উত্তর দিকে যেতে বাধ্য করা হয়েছে ওকে। ইকো বে এবং রজার্স স্প্রিংয়ে নামতে বাধা দিয়েছে ওরা, কিন্তু ওভারটন বিচে নামতে বাধা দেয়নি। ওভারটন বিচে নামার ব্যাপারে ওর নিজের কোন কৃতিত্ব ছিল বলে মনে হলো না রানার। ওরা বাধা দেয়নি বলেই নামতে পেরেছে ও। তারপর, দেখা গেল ফাঁকা, তালাবন্ধ রেস্টুরেন্ট বিল্ডিংয়ের কারপার্কে দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে, একটা থেকে একজন লোক নেমে আসছে। আবার মনে পড়ল কথাটা—গাড়ি আসার কোন শব্দ পায়নি ও; ওখানে আর কোন লোক ছিল না, নীল গাড়িটা তা'হলে এল কোত্থেকে? গাড়িওয়ালা লোকটা ওকে লিফট্ দিতে চেয়ে এখানে নিয়ে এসে পিস্তল দেখিয়ে নামিয়ে দিল কেন? সন্দেহ নেই গাড়িওয়ালা ওদের দলেরই লোক; গুলি না করে ভয় দেখিয়ে নামিয়ে দিয়েই চলে গেল কেন সে? খুন করার ইচ্ছে থাকলে তো গাড়িতেই সাবড়ে দিতে পারত। তারপর এখানে? এখানেও বেশ কয়েকটাই গুলি হয়েছে ওকে লক্ষ্য করে; একটাও লাগাতে পারেনি ওরা। পাঁচ ছ'জন লোক, ইচ্ছে করলে ধাওয়া করে ধরে ফেলতেও পারত এতক্ষণে। তাহলে?

একটা সম্ভাবনার কথা উঁকি দিচ্ছে ওর মনে। সত্যি অথবা মিথ্যে?

সত্যিই হতে পারে। হ্যাঁ, একমাত্র সত্যিই হতে পারে। অন্যকিছু হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা একভাগ মাত্র। ওরা ওকে তাড়াতে চাইছে। মারতে চায় না, ধরতে তো নয়ই।

উত্তরটা এখন খুব সহজ মনে হলো রানার কাছে। তবু সতর্কতার সঙ্গে আরেকবার ভেবে দেখল উত্তরটা। উত্তর একটাই, গুলি লাগাতে চায়নি বলেই লাগেনি গুলি। আর কোন সম্ভাব্য উত্তর নেই? বোধহয় না। লোকগুলো যদি অন্ধ না হয় অথবা গুলি করার সময় যদি ওদের হাত না কাঁপে তো গুলি না লাগাতে পারার কোন কারণ নেই। এতগুলো অন্ধ অথবা হাত কাঁপা রোগীকে কেউ পাঠিয়ে দেবে একটা লোককে খুন করার জন্য এটা বিশ্বাস করা যায় না।

না, ওরা খুন করতে চায় না আমাকে, সিদ্ধান্ত টানল রানা। তাহলে, কি চায় ওরা? সঙ্গত কোন জবাব খুঁজে পেল না ও। তাড়াতে চাইছে? কিন্তু কেন? এ প্রশ্নেরও কোন উত্তর খুঁজে পেল না। তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত, গুলি করলেও ওরা গুলি লাগাবে না ওর গায়ে।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল রানা। বেরিয়ে এল ফাটলের বাইরে। মিনিট দু'তিনেকের বিশ্রামে অসুস্থতার ভাবটা একটু কমেছে। সূর্য সমানে ঝলসে চলেছে নেভাডার পাথুরে মরু প্রকৃতিকে। আশেপাশের পাহাড়চূড়াগুলোর দিকে তাকাল ও। শিং উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন সব, একটু নড়লেই ঢুঁ মারবে।

খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে রানা। ওকে মারতে চাইলে এখনই মারতে পারে ওরা। কিন্তু কোন গুলি চলল না।

কিছুটা দূরে বাঁদিকে একটা পাহাড়। ঢালু গা-টা সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে উঠে গেছে উপরে। যে জায়গায় এখন আছে ও সেখান থেকে বেরোতে হলে পাহাড় টপকাতেই হবে। এই পাহাড়টাকেই টপকানোর জন্যে সবচেয়ে সুবিধাজনক মনে হলো। ধীর পায়ে টলতে টলতে এগোল রানা। শরীরের শক্তি প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। বেকায়দা ভঙ্গিতে বেয়েছেয়ে উঠতে শুরু করল। আড়াই ফুট থেকে চার ফুটের ভেতর একেকটা ধাপের উচ্চতা। প্রতিটা ধাপ টপকানোর জন্যেই শরীরের অবশিষ্ট শক্তির সমস্তটা প্রয়োগ করতে হচ্ছে।

আর মাত্র তিনটে ধাপ বাকি, তারপরেই পৌঁছে যাবে চূড়ায়। কিন্তু হাত পা যে আর চলতে চাইছে না।

চুপচাপ মুখ গুঁজে পড়ে রইল রানা। একটু বিশ্রাম না নিলে আর এক ইঞ্চিও উঠতে পারবে না। মিনিট দু'য়েক একভাবে পড়ে থাকার পর আবার উঠতে শুরু করল ও। শেষ তিনটে ধাপের একটা টপকাল। আর দুটো বাকি। এই ধাপটা টপকাতে গিয়ে একটু ইতস্তত করতে লাগল ও। দ্বিধায় পড়ে গেছে। যদি ভুল হয়ে থাকে ওর? সত্যিই যদি ওরা খুন করতেই এসে থাকে? আগে একটু খেলিয়ে নিয়ে পৈশাচিক আনন্দ পাচ্ছে?

আরেকবার চিন্তা করল ও। না, ভুল হওয়ার সম্ভাবনা এত কম যে ঝুঁকিটুকু নেয়ারই সিদ্ধান্ত নিল রানা। তাছাড়া আর কিছু করারও তো নেই। বুক ভরে দম নিয়ে শেষ ধাপ দুটো ডিঙোতে শুরু করল ও।

ঠকাস করে কি একটা এসে লাগল গজখানেক দূরে একটা পাথরে। পরমুহূর্তে

ভেসে এল শব্দ। বেঁচে থাকার সহজাত তাগিদে আরেকটু হলেই কাভারের আশায় ডাইভ দিচ্ছিল রানা, কিন্তু সামলে নিল। থর থর করে কাঁপছে শরীর। তাল হারিয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল অল্পের জন্যে। সোজা হয়ে দাঁড়াল। যেদিক থেকে গুলির শব্দ এসেছে তাকাল সেদিকে।

বড়সড় একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। কাঁধের সঙ্গে ঠেকানো রাইফেল। চল্লিশ গজও হবে না। সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথাটা একটু নাড়িয়ে তাক করল লোকটা, তারপর ফায়ার করল আবার। কয়েক ফুট দূরে একটা বেলে পাথরের চল্টা উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল বুলেট। চল্লিশ গজ দূর থেকে দু'দুটো গুলি—দুটোই মিস! গাধা নাকি?

আস্তে আস্তে আত্মবিশ্বাস ফিরে আসছে রানার। নিশ্চয়ই ওরা খুন করতে চায় না ওকে। ডানদিকে কিছু একটা নড়াচড়া দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওর। গজ পঞ্চাশেক দূরে আরেকটা লোক। এরও হাতে রাইফেল। পরের গুলিটা এল এর রাইফেল থেকেই। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল ও। পাশ দিয়ে চলে গেল গুলিটা।

পেছন ফিরল রানা। আরও দু'জন লোক। এদের কাঁধেও রাইফেল। একটা অর্ধবৃত্ত তৈরি করে দাঁড়িয়ে আছে চারজন। হঠাৎ করে একসঙ্গে গুলি করতে শুরু করল চারজনে। দাঁতে দাঁত কামড়ে দাঁড়িয়েই রইল ও। কড়াৎ কড়াৎ গুলি করে চলেছে ওরা।

কানের কাছে শিস বাজিয়ে চলে যাচ্ছে একেকটা গুলি। হঠাৎ মনে হলো রানার, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েও যদি একটা এসে লাগে গায়ে! কিন্তু লাগল না। একটানা দু'মিনিট এক নাগাড়ে গুলি চালিয়ে থামল লোকগুলো। সবগুলোই ওর আশপাশ দিয়ে চলে গেছে।

শেষ গুলিটার শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নেমে এল গভীর নিস্তব্ধতা। মাথার উপর আগুন-ঝরা সূর্য আর চারদিকে সীমাহীন নৈঃশব্দ ছাড়া আর কিছু নেই যেন পৃথিবীতে। প্রায় এক মিনিট শোক প্রকাশের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল রানা। লোকগুলোও দাঁড়িয়ে রয়েছে মূর্তির মত। গুলি বন্ধ করেই রাইফেলগুলো নামিয়ে নিয়েছে ওরা। ওদের মধ্যে থেকে একজন চিৎকার করে বলল, 'চলো, ফেরা যাক।' নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করল ওরা রাস্তার দিকে। একটু পরেই হারিয়ে গেল; পাথর আর পাহাড়ের আড়ালে।

এতক্ষণের জমে থাকা টেনশন দূর হয়ে যেতেই এলিয়ে পড়তে চাইল রানার শরীর। যে রকম ক্লান্ত হয়েছে তাতে বোধহয় এই টেনশনের কারণেই এতক্ষণ খাড়া ছিল ও। এখন একেবারে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। কিন্তু শুয়ে পড়ল না রানা, এমনকি বসলও না। এই গরমে এখন যদি বসে তাহলে আর উঠতে পারবে না। শকুনির খাদ্য হবে ওর দেহ। শরীরের প্রায় সমস্ত পানি বেরিয়ে গেছে ঘাম হয়ে। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে রয়েছে। এদিকে দুপুরও হয়নি এখনও। সারাদিনের উত্তাপ পড়ে রয়েছে সামনে।

ঘণ্টাখানেক লাগল পাহাড় আর পাথরের মধ্যে দিয়ে পথ খুঁজে বড় রাস্তায় এসে উঠতে। এতক্ষণ ঢালু পাহাড়ে ঢাল বেয়ে নেমে এসেছে ও। প্রায় হাজার ফুট নেমে আসার পরও সুস্থতা ফিরে পাচ্ছে না রানা। এখনও ঘাম নেমে আসছে শরীর বেয়ে।

এত পানি যে কোথায় লুকোনো ছিল শরীরের মধ্যে ভেবে পেল না ও। ঘড়ির দিকে তাকাল, মাত্র এগারোটা বাজে। কখন রওনা হয়েছিল ডাইম প্যালেস ছেড়ে? এরই ভেতর এক যুগ কেটে গেছে বলে মনে হচ্ছে।

মেঠো পথের যেখানটায় গাড়িওয়ালা পিস্তল দেখিয়ে নামিয়ে দিয়েছিল, সেখানটায় এসে পৌঁছল রানা। নেই নীল গাড়িটা। অন্য কোন গাড়ি বা জন মানুষের ছায়াও নেই কোথাও।

জান বেরিয়ে যাচ্ছে গরমে। আর এক পা-ও এগোতে চাইছে না শরীর। পা পা করে ও টেনে নিয়ে চলেছে শরীরটাকে। একমাত্র ইচ্ছাশক্তির জোরেই এখনও খাড়া রয়েছে বোধহয়। অবশেষে এসে পৌঁছল মেইন রোডের কাছে। রাস্তার একেবারে ধার ঘেঁষে একটা পাথরের চাঁইয়ের ছায়ায় বসল রানা। আর এক পা-ও হাঁটার শক্তি নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন গাড়ি আসছে, অপেক্ষা করতে হবে।

প্রায় চল্লিশ মিনিট পার হয়ে গেছে। অপেক্ষা করতে করতে ঝিমুনি এসে গেছে রানার। একটা গাড়িও এই রাস্তা দিয়ে যায়নি গত চল্লিশ মিনিটে।

ঝিমোতে ঝিমোতেই শুনতে পেল গাড়িটার শব্দ। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মত তড়াক করে লাফিয়ে উঠল রানা। আরেকটু হলেই পার হয়ে যাচ্ছিল গাড়িটা। হঠাৎ কোত্থেকে শক্তি এল কে জানে, ছুটতে শুরু করল ও রাস্তার দিকে। রাস্তার মাঝখানে পৌঁছে দাঁড়াল। হাত নেড়ে গাড়ি থামাতে বলছে ড্রাইভারকে। গাড়িটাকে হয় থামতে হবে নয়তো ওকে চাপা দিয়েই চলে যেতে হবে।

ঝকঝকে-তকতকে গাড়িটা। সূর্যের আলো উইন্ডশিল্ডের ওপর পড়ে ঝিলিক মেরে উঠছে বার বার। ক্যাঁচ-চ-চ শব্দ তুলে স্কিড করে থামল গাড়িটা রানার সামনে। মাঝ বয়েসী এক মহিলা বেরিয়ে এল দরজা খুলে।

'কি ব্যাপার? কিছু হয়েছে?' উৎকণ্ঠা মহিলার কণ্ঠে।

'হারিয়ে গেছি আমি,' জড়িয়ে জড়িয়ে বলল রানা। আরেকটু হলেই হেসে ফেলছিল ও। হওয়ার কিছু বাকি আছে? এখনও পুরোপুরি সুস্থ বোধ করছে না ও। মুখের ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে রয়েছে। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে।

'হারিয়ে গেছ?' উৎকণ্ঠার সঙ্গে একটু বিস্ময় মিশল মহিলার কণ্ঠে। দ্বিধায় পড়ে গেছে মহিলা। ফাঁকা, জনহীন রাস্তায় অপরিচিত একটা লোককে সাহায্য করা উচিত হবে কিনা বুঝতে পারছে না।

'হ্যাঁ, হারিয়ে গেছি,' আবার বলল রানা। 'গরমে জান বেরিয়ে গেল। পানি আছে আপনার কাছে?'

'পানি? না।'

'আমাকে একটা লিফট দিতে পারবেন?'

'আমেরিকান নও তুমি মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। বাংলাদেশের। কাজ করি লন্ডনে। অফিসের কাজে এসেছিলাম এখানে।'

দ্বিধা এবং উৎকণ্ঠা দূর হয়ে গেছে মহিলার চেহারা থেকে। বাঙালী একটা লোককে ভয় পাওয়ার মত কোন কারণ দেখতে পাচ্ছে না সে।

'আমি ভেগাসে যাব।'

ধন্যবাদসূচক একটা মুখভঙ্গি করল রানা। মুখে বলল, 'আমিও ওখানেই যাব।'

মাইল দুয়েক পেরিয়ে আসার পর একটা বিল্ডিংয়ের সামনে গাড়ি থামাল মহিলা। বিল্ডিংয়ের গায়ে লেখা দেখল রানা, 'ভিজিটরস সেন্টার'।

'এখানে পানি পাবে তুমি,' বলল মহিলা।

নেমে গেল রানা গাড়ি থেকে। মুখ-হাত ধুয়ে দু'গ্লাস পানি খেয়ে ফিরে এল আবার গাড়িতে। এখন খানিকটা সুস্থবোধ করছে। ওকে পানি খেতে ভেতরে পাঠিয়ে মহিলা ভেগে পড়েনি দেখে স্বস্তি বোধ করল।

লাস ভেগাস পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ মাইল পথ পাড়ি দিতে দিতে সামান্যই কথা হলো মহিলার সঙ্গে। মহিলা জানতে চাইল সত্যিই ও হারিয়ে গিয়েছিল কি না? সামান্য একটু মিথ্যা বলে ম্যানেজ করল রানা ব্যাপারটা। ইকো বে থেকে ও হেঁটে আসছিল শুনে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল মহিলা।

'দেখো, এটা তোমার বাংলাদেশও নয়, ইংল্যান্ডও নয়। এটা আমেরিকা। তার উপর নেভাডা...' এরপর এরকম জায়গায় একা একা হেঁটে পথ চলার বিপদ সম্পর্কে ছোটখাটো একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেলল মহিলা। হুঁ-হাঁ করতে করতে শুনল রানা কথাগুলো—নিজে কিছু বলল না।

এমনিতে মহিলাকে খুবই ভাল মনে হলো ওর। তার পূর্বপুরুষরা নিউক্যাস্‌ল থেকে এসে সেট্‌ল করেছিল এখানে। রানার আপত্তি সত্ত্বেও ওকে ডাইম প্যালেস পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে, একা একা হাঁটার বিপদ সম্পর্কে আরেকবার সতর্ক করে দিয়ে চলে গেল ভালমানুষ মহিলা।

সুইংডোর ঠেলে ডাইম প্যালেসের ভেতরে ঢুকল রানা। রিসেপশন কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ওর বিধ্বস্ত চেহারা দেখে এয়ারকন্ডিশনের সামনে বসে থাকা লম্বা চওড়া ইউনিফর্ম পরা এক লোক উঠে দাঁড়াল। উটকো ঝামেলা মনে করেছে বোধহয়। লোকটা এসে ঘাড় ধরে ওকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়ার আগেই তাড়াতাড়ি বলল ও, 'চারশো এগারো, প্লীজ।'

চিনতে পেরেছে ওকে কাউন্টারের মেয়েটা। তাকিয়ে রয়েছে একটু অবাক চোখে।

'এই যে, স্যার।' মিষ্টি হেসে রুমের চাবি আর দুটো খাম দিল মেয়েটা রানার হাতে।

কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইল ও খাম দুটোর দিকে। একটা কেব্‌ল্ আর অন্যটা সাধারণ মুখবন্ধ খাম। কেব্‌ল্‌টাই আগে খুলল রানা। জহির ভাইয়ের পাঠানো। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি লন্ডনে ফিরতে বলা হয়েছে ওকে। খুবই জরুরী।

অন্য খামটা খুলল ও। ছোট্ট ভাঁজ করা একটা কাগজের টুকরো খামের ভেতর। বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে ধরে সাবধানে বের করে আনল রানা কাগজের টুকরোটা। স্বাক্ষর বিহীন টাইপ করা চিঠি একটা। উপরে ওরই নাম লেখা। স্বাক্ষর, তারিখ বিহীন চিঠিটা পড়ল ও।

'মাসুদ রানা,

ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স-এর তিনটার ফ্লাইটে শিকাগো যাবে। ওখান থেকে সোজা

লন্ডনের কানেকটিং ফ্লাইট ধরবে। তোমার ওপর নজর রাখব আমরা। নির্দেশ মত কাজ না করলে খুন হয়ে যাবে। এবার আর পার পাবে না।

খিঁচড়ে গেল মেজাজটা। সাংবাদিক মাসুদ রানার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের মাসুদ রানা। খেপে গেছে ও। ফাজলেমি পেয়েছে? টেলিফোনে ভয় দেখাচ্ছে, এই চিঠির কোথাও দ্য নিউজ প্রসঙ্গে কোন কথা নেই। ব্যক্তিগতভাবে নিচ্ছে ও ব্যাপারটা।

কিভাবে কি করতে হবে রুমে আসতে আসতে তার একটা ছক তৈরি করে নিল ও মনে মনে। ডেভিড ব্রনসনকে খুঁজে বের করতে হবে প্রথম। ওল্ডসমোবিলের নাম্বারটা মনে আছে এখনও। ব্রনসনকে খুঁজে বের করা কঠিন হবে না বোধহয়।

তালা খুলে রুমে ঢুকল রানা। সবচেয়ে আগে দরকার একটু ফ্রেশ হয়ে নেয়া—লম্বা একটা শাওয়ার, চমৎকার একটা লাঞ্চ, তারপর জহির ভাইকে ফোন করে জানিয়ে দেয়া, ফিরতে দু'দিন দেরি হবে, ব্যস। তারপর নেমে পড় কাজে। একটা পিস্তল জোগাড় করতে হবে। ওহ্ হো! সুফিয়াকে তো একটা ফোন করতে হবে গোদেনবার্গে।

টেলিফোনে পনেরো মিনিট পর লাঞ্চ পাঠানোর অর্ডার দিয়ে ঝটপট কাপড় ছেড়ে ঢুকে পড়ল ও বাথরুমে। একটানা দশ মিনিট ভিজল শাওয়ারের নিচে। বেশ আরাম লাগছে এখন। ঘণ্টাখানেক আগের দুঃসহ অবস্থা স্বপ্নের মত লাগছে। 'দাঁড়াও ব্রনসন,' দাঁতে দাঁত চেপে মনে মনে উচ্চারণ করল রানা। কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে বেরিয়ে এল বাথরুম ছেড়ে। কাপড় পরে নিল ঝটপট। এখনও লাঞ্চ নিয়ে আসেনি। এই ফাঁকে ফোনটা সেরে নেয়া যাক।

সুফিয়ার কাছেই আগে ফোন করতে চেষ্টা করল রানা। কিন্তু অপারেটর জানিয়ে দিল এখন গোদেনবার্গে ফোন করা সম্ভব নয়, তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে, লাইন খারাপ। অগত্যা লন্ডনের নাম্বার দিল অপারেটরকে।

দু'মিনিটের মধ্যে পাওয়া গেল লন্ডনের লাইন। হ্যাঁ, আছে জহির ভাই অফিসে।

'হ্যালো, জহির ভাই,' বলল রানা। 'এদিকে সব পণ্ড হয়ে গেছে। সিনেটরের ব্যাপারটা বেশ ফিশি লাগছে। আমার ওপর হামলা হয়ে গেছে একদফা। ব্যাপারটা ফয়সালা না করে ফিরতে পারছি না, দু'দিন দেরি হবে আমার।'

'মাথা খারাপ নাকি! কেব্‌ল্ পাওনি আমার?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে? এক্ষুণি চলে এসো। খুবই জরুরী ব্যাপার।'

'কি হয়েছে?'

'সুফিয়া···। ফোনে বলা যাবে না। এসে শুনো।'

সঙ্গে সঙ্গে চালু হয়ে গেছে রানার মস্তিষ্ক।

'ঠিক আছে।' নামিয়ে রাখল ও ফোন।

লাঞ্চ শেষ করে ওয়েটারকে বিল পাঠিয়ে দিতে বলল রানা। জিনিসপত্র ব্যাগে ভরে পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নিল ও। ক্যাসেট রেকর্ডারটার কথা মনে পড়ল। বোটে রয়ে গেছে ওটা। যাকগে। খব একটা দামী জিনিস নয়। ঠিক পাঁচ

মিনিট পর ব্যাগ আর ব্রীফকেস নিয়ে মোটেলের বাইরে এসে দাঁড়াল ও।

পনেরো মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল এয়ারপোর্টে। ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের ডেস্কে গিয়ে তিনটের শিকাগো ফ্লাইটে কোন সীট আছে কি না জিজ্ঞেস করল রানা।

'দেখছি, স্যার,' বলল ডেস্কের মেয়েটা। 'কি নাম?'

'মাসুদ রানা।'

'এক মিনিট।' একটা লিস্ট দেখছে মেয়েটা। 'মাসুদ রানা, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার নামে তো অলরেডি একটা রিজার্ভেশন আছে, স্যার।' একটু বিস্মিত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। কোন এক গবেটকে দেখছে যেন।

'ধন্যবাদ।' আগের টিকেট এবং ক্রেডিট কার্ড মেয়েটার হাতে ধরিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল রানা। নতুন টিকেটটা রেডি করতে সময় লাগবে কয়েক মিনিট।

ট্যাগ লাগিয়ে ব্যাগটা লাগেজ কাউন্টারে জমা দিয়ে ডিপার্চার লাউঞ্জের দিকে এগোল ও। এখনও অনেকটা দেরি আছে প্লেন ছাড়ার। ওর মত যে দু'চারজন প্যাসেঞ্জার আগে আগে এসে পড়েছে তাদের দেখতে লাগল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। ওর দিকে নজর রাখছে কোন্ লোকটা?

কালকের টেলিফোনের হুমকিটা যখন মিথ্যে ছিল না আজকেরটাও মিথ্যে নয় বোধহয়। কেউ তাকিয়ে আছে কিনা বা একটু পরপরই কেউ ওর দিকে তাকাচ্ছে কিনা খেয়াল করার চেষ্টা করল রানা। কিন্তু কারও আচরণেই বিশেষ কোন অস্বাভাবিকতা নজরে পড়ল না।

শিকাগোর ও'হেয়ার এয়ারপোর্টেও লোকটাকে চেনার চেষ্টা করল রানা। এবারও ব্যর্থ হলো ওর প্রচেষ্টা। বিশাল ও'হেয়ার এয়ারপোর্ট। পাঁচ সাত মিনিট পরপরই একটা প্লেন উঠছে অথবা নামছে। হাজার হাজার যাত্রী আসা যাওয়া করছে। এর ভেতর থেকে কে ওর দিকে নজর রাখছে তা বোঝা মুশকিল। শিকাগোতে নেমেই ও ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজের শিকাগো-মন্ট্রিল-লন্ডন ফ্লাইটের টিকিট কেটে নিয়েছে। এখন অপেক্ষা করছে—কখন বিমানে চড়তে বলবে যাত্রীদের।

শিকাগো-মন্ট্রিল-লন্ডন রুটে আগেও ভ্রমণ করেছে রানা। মন্ট্রিলে নানা আকৃতির পার্সেলে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে প্লেনের অন্তর। নাতী-নাতনীদের সঙ্গে দেখা করতে আসা দাদী-নানীরা অশ্রুসিক্ত চোখে এসে ওঠে প্লেনে। ব্রিস্টল অথবা বারি সেন্ট এডমন্ডে ফিরবে তারা।

প্রায় খালি প্লেন। ছ'জন মাত্র লোক নিয়ে রওনা হলো বিশাল ট্রাইস্টার। রানওয়ে ছেড়ে খাড়া উঠে গেল প্লেনটা। ত্রিশ হাজার ফুট উপরে উঠে মাটির সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় মন্ট্রিলের দিকে কোর্স সেট করল ক্যাপ্টেন। অন্যদিকে যাত্রীদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করতে লাগল কেবিন স্টাফরা। কেবিনের ছ'জন যাত্রীদের জন্যে তিনজন স্টুয়ার্ডেস এবং একজন স্টুয়ার্ড। সুতরাং ডিনারটা ভালই হলো, সার্ভিসটা আরও ভাল।

ডিনার শেষ করে একটা মার্টিনি নিয়ে বসল রানা। একটু একটু করে চুমুক দিচ্ছে ও মার্টিনিতে। একটু আগে ডিনার সার্ভ করেছিল যে মেয়েটা সে ফিরে এল ওর সীটের কাছে। মাথায় সোনালি চুল মেয়েটার, মিষ্টি চেহারা।

'আরেকজন জার্নালিস্ট আছেন প্লেনে।'

'ও, তাই নাকি?' খুব একটা উৎসাহ দেখাল না রানা মেয়েটার কথায়।

'আপনি কি আলাপ করবেন ভদ্রলোকের সাথে?' বিনয়ের সাথে বলল স্টুয়ার্ডেস।

'নাম কি তার?' এমনি, কিছু একটা বলতে হয় তাই বলল রানা।

'মি. রিড, স্যার। আমেরিকান।'

'আমি একটু খুঁতখুঁতে স্বভাবের, বুঝতেই পারছ। কেমন লোক মিস্টার রিড? বেশি কথা বলে? দশ ঘণ্টা ধরে একজন অপরিচিত লোকের বকবকানি শোনা পোষাবে না আমার।'

মিষ্টি করে একটু হাসল মেয়েটা। 'অত ঘাবড়াবেন না, স্যার। সেরকম নন ভদ্রলোক। বরং একটু চুপ-চাপই বলা যায়। "ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক"—এ কাজ করেন।' প্লেনের সামনের দিকের সীটে বসা একটা লোকের দিকে ইশারা করল মেয়েটা। আরেকজন স্টুয়ার্ডেস কথা বলছে লোকটার সঙ্গে। বোধহয় ওর সম্পর্কেই কিছু বলছে।

'ঠিক আছে। কিন্তু…,' একটু দ্বিধা রানার গলায়।

মুখ টিপে একটু হাসল মেয়েটা। তারপর বলল, 'একশো বাহাত্তর জন বুড়িকে তুলতে যাচ্ছি আমরা মন্ট্রিল থেকে। ওয়ার ব্রাইডদের মা সব। বাহাত্তরের নিচে নয় একজনেরও বয়েস।'

একটা ঢোক গিলল রানা। 'ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। আমি মিস্টার রিডের সঙ্গে যোগ দিতে রাজি আছি। তুমি আর দুটো মার্টিনি দিয়ে যাও দয়া করে।'

বিধিসম্মতভাবে পরিচিত হলো ওরা। মৃদু হেসে হ্যান্ড শেক করল রানা রিডের সঙ্গে। প্রথম দর্শনে খারাপ মনে হলো না লোকটাকে। লম্বাচওড়া, একটু ভারিক্কি চেহারা। চল্লিশের কাছাকাছি হবে বয়েস, কালো চুল, তবে খুব একটা ঘন নয়, কপালে কয়েকটা ভাঁজ। সব সময় যেন চিন্তিত হয়ে আছে লোকটা। খুব বেশি কথা হলো না ওদের ভেতর। ড্রিঙ্কের বিল কে দেবে তা নিয়ে স্বাভাবিক একটু তর্ক, ব্যস।

মন্ট্রিলের ডরভ্যাল এয়ারপোর্ট থেকে প্লেন ছাড়ার পরও রিডের সঙ্গে বিশেষ কথা হলো না ওর। উভয় পক্ষের নিস্পৃহতাই একমাত্র কারণ নয়, দাদী-নানীদের উপস্থিতিও আলাপ করতে বিশেষ উৎসাহিত করল না ওদের। সামনে, পেছনে, পাশে যেদিকে তাকানো যায় শুধু বুড়ি আর বুড়ি। ওদের কোন্ কথায় কি মনে করে বসে ওরা কে জানে। বুড়িরা অবশ্য সমানে কিচির মিচির…থুড়ি…ক্যাঁচর ম্যাচর করে চলেছে নিজেদের মধ্যে। পরস্পরের মধ্যে একটু হাসি বিনিময় করে দু'জনেই সীট দুটো পেছনে হেলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।

রানার ঘুম যখন ভাঙল তখন সকাল হয়ে গেছে। মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়েছে প্লেনের গায়ে। আগেই জেগে গেছে রিড। এত বেলা পর্যন্ত

ঘুমোনোর জন্যে বিব্রত ভাবে একটু হাসল রানা। স্বর্ণকেশী মেয়েটাকে ডেকে অরেঞ্জ জুস দিতে বলল। রাতে বেশি হুইস্কি খাওয়ার ফলে খটখটে শুকনো হয়ে রয়েছে মুখের ভেতরটা।

'কোথায় যাচ্ছেন আপনি?' অরেঞ্জ জুসে চুমুক দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল রানা। আরও অনেকটা সময় থাকতে হবে প্লেনে। কথাবার্তা বললে সময়টা কাটবে ভাল।

'ল্যাপল্যান্ড।'

'আমি যতদূর জানি,' বলল রানা, 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক অনেক আগেই ল্যাপল্যান্ড কাভার করেছে।'

'হ্যাঁ,' একটু হেসে বলল রিড। 'তিনশো বিরাশিবার। দেশটা বিরাট, আরও তিনশো বিরাশিবারেও শেষ হবে না। আপনি?'

'আস্তানায় ফিরছি।'

'কোথায় গিয়েছিলেন?'

একটু ইতস্তত করল রানা। তারপর বলল, 'লাস ভেগাস। সিনেটর জেম্‌স থম্পসনের খবরটা শুনেছেন নিশ্চয়ই? ওটা কাভার করতেই গিয়েছিলাম।'

'লাভ হলো কিছু?'

'বিশেষ না।' আর একটু ইতস্তত করে খুলেই বলল রানা ভেগাসের ঘটনাটা।

'নিশ্চয়ই আপনি ঘাঁটিয়েছিলেন কাউকে!'

'উঁহুঁ। সে রকম কিছু তো মনে পড়ছে না আমার।'

'তাহলে?'

'সেজন্যেই তো আশ্চর্য হচ্ছি।'

'খুব একটা আশ্চর্যের কিছু নেই অবশ্য। দিনকাল বদলে গেছে, গুণ্ডা, বদমাশদেরই দিন এখন। আজকাল ছেলে-ছোকরাগুলোও কেমন বদলে গেছে। একটা বাচ্চার কথা বলি: আমাকে একটা আপেল উপহার দিয়েছিল, ভেতরে পোরা ছিল আস্ত একটা রেজর ব্লেড। আরেকটু হলেই জিভটা যাচ্ছিল আমার। পরে ছেলেটাকে ধরে কারণ জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি। ও কি জবাব দিয়েছিল জানেন?'

প্রশ্নবোধক চোখে চাইল রানা।

' "তোমার সঙ্গে একটু মজা করছিলাম"। বুঝুন তাহলে। আপেলের ভেতর ব্লেড ভরে দিয়ে মজা করে আজকালকার বাচ্চারা। ভেগে পড়ে ভালই করেছেন আপনি।'

বাকি সময়টুকু নানান বিষয়ে আলাপ করে কাটিয়ে দিল ওরা। উত্তর আয়ারল্যান্ডের ওপর এসে গতি কমে গেল ট্রাইস্টারের। পরবর্তী পনেরো মিনিটের মাথায় হিথ্রো এয়ারপোর্টে নামল প্লেন।

রিডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠল রানা। সোজা দ্য নিউজ বিল্ডিংয়ে গিয়ে উঠল। অফিসে আছেন জহির ভাই।

এডিটরের অফিসের বাইরে সেক্রেটারিদের রুমে ঢুকল ও। সেক্রেটারিদের একজনও নেই চেয়ারে। কোটগুলো ঝুলছে চেয়ারের সঙ্গে। ওপাশে জহির ভাইয়ের কামরার ভেতর থেকে কথাবার্তার অস্পষ্ট শব্দ ভেসে আসছে। অপেক্ষা

করতে লাগল রানা। প্রায় দশ মিনিট পর হপকিন্স ব্যস্ত ভাবে বেরিয়ে এল এডিটরের কামরা থেকে, হাতে সেদিনকার পত্রিকার কপি একখানা।

রানার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে একটু কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলে গেল হপকিন্স। হপকিন্স দরজা খোলার সময় জহির ভাই নিশ্চয়ই দেখেছেন ওকে, কারণ কয়েক সেকেন্ড পরেই এডিটরের দু'নম্বর সেক্রেটারি বেরিয়ে এল। 'এডিটর সাহেব এক্ষুণি দেখা করতে বলেছেন, মিস্টার রানা।'

চেয়ার ছেড়ে উঠল রানা। ঢুকে পড়ল এডিটরের রুমে। দু'নম্বর সেক্রেটারি আর ঢুকল না। রানা আর জহির ভাই ছাড়া আর কেউ নেই রুমে।

'দরজাটা লক করে দাও, রানা।' গম্ভীর কণ্ঠস্বর জহির ভাইয়ের। হাসিখুশি লোক জহির ভাই। গত চার মাসে একবারও লোকটার গোমড়া মুখ দেখেছে বলে মনে পড়ল না ওর। ঘটনা খুব সিরিয়াস মনে হচ্ছে।

'উধাও হয়ে গেছে সুফিয়া।'

কোনরকম ভণিতার ভেতর না গিয়ে সরাসরি বললেন জহির ভাই।

'মানে?' সুফিয়ার ফোনের কথা মনে পড়ল রানার। 'কি হয়েছিল?'

'জানি না। শুধু এটুকু জানি, উধাও হয়ে গেছে সে। বাতাসে মিলিয়ে গেছে একেবারে।'

পাঁচ

আস্তে আস্তে বসে পড়ল রানা চেয়ারে। বিব্রত একটা ভঙ্গিতে বসে আছে জহির ভাইও। কেমন যেন বোকা বোকা লাগছে দেখতে। সুফিয়ার উধাও হয়ে যাওয়াটা যেন তাঁরই দোষ।

'কোথায় গেছে সুফিয়া?' জানতে চাইল রানা। বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উপর দু'হাতের কনুই ঠেকিয়ে একটু ঝুঁকে বসল ও।

'জানি না। গোদেনবার্গে ছিল ও। হোটেল থেকে বেরিয়ে কোথাও গেছিল, ফিরেও এসেছিল। কিন্তু তারপর আর দেখা যায়নি ওকে।'

'কখন?'

'গতরাতের আগের রাতে।'

তার মানে রানার কাছে যখন ফোন করেছিল সেই সময়।

প্রথমেই জামিলের কথা মনে পড়ল রানার। বাপ-মা মরা ছেলে। সুফিয়া ছাড়া আর কেউ নেই ওর ত্রিভুবনে। দ্য নিউজ-এর একটা অ্যাসেট হয়ে উঠেছিল মেয়েটা। জহির ভাইয়ের ধারণা, সুফিয়ারও জন্ম হয়েছে সাংবাদিকতা করার জন্যেই। দ্য নিউজে জয়েন করার দু'মাসের ভেতরই ওকে টুকটাক কাজ দেয়া বন্ধ করেছিলেন তিনি। গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোতে শুধু পাঠাতেন ওকে। ওর নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে নিজেকেই হয়তো দায়ী করছেন জহির ভাই। সুফিয়াকে তিনিই

পাঠিয়েছিলেন রাশিয়ায়।

'কি হয়েছিল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'মস্কো থেকে ফিরেই ফোন করেছিল আমাকে। তখন পর্যন্ত ঠিকই ছিল ও। পরশু রাতে—বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল তখন, স্থানীয় পুলিসকে ফোন করে ও।'

'কেন?'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন জহির ভাই। তারপরে বললেন, 'কি বলব! হাস্যকর লাগতে পারে কথাটা। পুলিসের কাছে সাহায্য চেয়েছিল ও। ভয়ানক বিপদে পড়েছে নাকি, জীবন-সংশয় রীতিমত। পুলিস হোটেলে পৌঁছে দেখে নেই ও। কোন মেসেজও রেখে যায়নি পুলিস বা আর কারও জন্যে।'

'তারপর?'

'কিছুই না।' লম্বা করে শ্বাস নিলেন জহির ভাই। নাকের বাঁশি কাঁপছে একটু একটু। 'কোন খবর নেই।'

'পুলিস কি বলছে?'

'সচরাচর যা বলে থাকে তাই। মূর্খের দল যতসব!'

'আপনি কিভাবে জানলেন এসব? আপনার কাছেও ফোন করেছিল নাকি?'

'না। পুলিস সোর্স থেকেই জেনেছি এগুলো।'

বাঘা সাংবাদিক জহিরুল ইসলাম অসহায়ের মত তাকিয়ে আছেন, কিছুই করতে পারছেন না তিনি—সচরাচর দেখা যায় না এরকম দৃশ্য। একটু হাসিই পেল রানার জহির ভাইয়ের এমন অসহায় অবস্থা দেখে।

'আর কাউকে পাঠানো হয়নি গোদেনবার্গে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'না।'

'না! কেন?'

'পুলিস মানা করেছে। তাই পাঠানো হয়নি কাউকে।'

'পুলিস বলল আর আপনিও চুপচাপ বসে রইলেন হাত গুটিয়ে?'

'তাছাড়া কোন উপায় ছিল না আমার। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের গুরুত্বপূর্ণ কোন স্বার্থ জড়িত আছে তার সাথে। শুধু পুলিস নয়, অফিশিয়াল সার্কেল, মানে মিনিস্ট্রি অভ হোম থেকেও কড়া নির্দেশ পাঠানো হয়েছে, যেন কাউকে না পাঠাই আমরা।'

এতক্ষণ পরে না চমকে পারল না রানা। 'আমাদের একজন রিপোর্টার উধাও হয়ে গেছে, তাও আবার সুইডেন থেকে, এর ভেতর ব্রিটিশ সরকারের কি স্বার্থ থাকতে পারে?'

'সেটা আমিও জানি না। এই পরিস্থিতিতে রাহাতের কাছে ফোন করেছিলাম আমি।'

'কি বললেন উনি?'

'তুমি লন্ডনে আছ কিনা সেকথা জিজ্ঞেস করল প্রথমেই। নেই শুনে ইমিডিয়েটলি তোমাকে আনিয়ে নিয়ে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করতে বলল কি করব না করব।'

'হুঁ।' কি যেন ভাবল রানা কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'আমি যাচ্ছি গোদেনবার্গে।'

'অবশ্যই অফিশিয়ালি না। দ্য নিউজের কেউ যদি এখন ছুটি কাটাতেও গোদেনবার্গে যায় তো সন্দেহ করবে ওরা।'

'তাহলে রিজাইন করছি আমি।'

'মানে?'

'মানে, রিজাইন করছি। দরকার হলে পরে আপনি আবার আমাকে অ্যাপয়েন্ট করতে পারবেন। একটা কাগজ দিন, সই করে দিয়ে যাচ্ছি আমি, পরে সেক্রেটারিকে দিয়ে টাইপ করিয়ে নেবেন চিঠিটা।'

'ঠিক আছে।' একটা সাদা কাগজ এগিয়ে দিতে দিতে বললেন জহির ভাই। কাগজটায় সই করে ফিরিয়ে দিল রানা।

'আচ্ছা, মিনিস্ট্রি অভ হোম থেকে কি চিঠি পাঠানো হয়েছে; না ফোনে জানানো হয়েছে?'

'ডাকিয়ে নিয়েছিল আমাকে, হোমের ডেপুটি সেক্রেটারি। ডিফেন্সের সেক্রেটারিও ছিল সেখানে।'

'ডিটেইলস বলুন তো, কি বলেছে ওরা?'

'ওই তো, যা বলেছি তার চেয়ে বেশি কিছু নয়: আমরা যেন কাউকে না পাঠাই গোদেনবার্গে। ব্যস।'

'কি কারণ তা জিজ্ঞেস করেননি?'

'রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত, তাই।'

'হুঁ।' আবার কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইল রানা। 'ওদের নির্দেশ না মানলে কি ক্ষতি হতে পারে দ্য নিউজের?'

'ব্ল্যাক লিস্টেড করতে পারে। সরকারী বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়ে যাবে তাতে, বেসরকারী বিজ্ঞাপনের পরিমাণও কমে যাবে অনেক। ডিক্লারেশনও বাতিল করে দিতে পারে ইচ্ছে করলে। বুঝতেই পারছ ব্যাপারটা: দ্য নিউজের মালিকদের মধ্যে সাদা চামড়া নেই একজনও।'

'মস্কো থেকে ফেরার পরপরই যখন ফোন করেছিল সুফিয়া তখন তো বিস্তারিত আলাপ হয়েছিল আপনার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ।'

'অস্বাভাবিক কিছু বলেনি?'

'না। একগাদা ছবি আর ফিচার নিয়ে এসেছে। ছবিগুলোর বেশিরভাগই আবার ট্র্যান্সপারেন্সি। পরদিন থেকেই এডিটিংয়ের কাজ শুরু করবে এইসব বলছিল।'

'আর কিছু না?'

'আর কি যেন বলেছিল···হ্যাঁ, মস্কো এয়ারপোর্টে প্লেনে ওঠার ঠিক আগ-মুহূর্তে নাকি পুলিস ওর জিনিসপত্র সার্চ করেছিল।'

'কি বললেন? মস্কো এয়ারপোর্টে পুলিস সার্চ করেছিল, তাও আবার প্লেন ওঠার আগ-মুহূর্তে?'

'হ্যাঁ। ওদের কি একটা ম্যাগাজিনের ফ্রন্ট কাভারের ট্র্যান্সপারেন্সি নাকি পাওয়া যাচ্ছিল না। ওর ছবি আর ট্র্যান্সপারেন্সিগুলোর সঙ্গে ভুলে চলে এসে থাকে যদি তাই চেক করেছিল বোধহয়। হাসতে হাসতে বলেছিল···'

'কিন্তু, তা তো হওয়ার কথা নয়। সার্চ করলে করতে পারে কাস্টমস, পুলিস কেন করবে? ও কি চুরি করে পালাচ্ছিল? সোভিয়েট গভর্নমেন্টের অ্যাপ্রুভাল নিয়েই তো ও ছবি আর আর্টিক্‌লগুলো আনছিল, তাই না?'

'তাই তো!' কিছু একটা মনে পড়ে গেছে হঠাৎ এমন একটা ভঙ্গিতে বললেন জহির ভাই। 'যদি সত্যিই ওদের কোন ট্র্যান্সপারেন্সি ভুলে চলে এসে থাকে, তাহলেও তো পুলিসের চেক করার কথা নয়। নাম্বার ওয়ান স্টেট ম্যাগাজিন পাবলিশিং হাউসের কেউ এসে চেক করলেই পারত!'

আর বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া গেল না জহির ভাইয়ের কাছ থেকে। গোদেনবার্গে স্ক্যান্ডা নামের এক হোটেলে উঠেছিল সুফিয়া, ওখানকার যে ফার্মটা 'রাশিয়ান লাইফ' ছাপার দায়িত্ব নিয়েছে তার নাম স্ট্রম ব্রাদার্স। তুলনামূলক ভাবে সস্তায় ভাল ছাপে ওরা। এত সস্তায় কালার প্রিন্টিং বোধহয় পৃথিবীর আর কোথাও সম্ভব নয়। বছর জোড়া লেবারট্রাব্‌ল আর তিনদিন পরপর স্ট্রাইক লেগে নেই সুইডেনে, সুতরাং পারে ওরা সস্তায় ছাপতে। স্ট্রম ব্রাদার্সের ঠিকানাটা নোট করে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে আসবে রানা এমনি সময়ে হঠাৎ দাঁড়ালেন জহির ভাই। 'ঠিক আছে, রানা, রওনা হয়ে যাও তুমি। আর এই নাও এক হাজার পাউন্ড, তোমার খরচের জন্যে।' ড্রয়ার থেকে এক তাড়া নোট বের করে ওর হাতে ধরিয়ে দিলেন তিনি।

নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে এল রানা। ব্যাগ থেকে ময়লা কাপড়গুলো বের করে দু'সেট নতুন কাপড় ভরল। তারপর এম.এ.এস.-এ ফোন করে একটা সীট বুক করল। বিকেল চারটায় ফ্লাইট। ভাগ্য ভাল, ননস্টপ ফ্লাইটটা, অনেকটা সময় বাঁচবে তাতে। ঘড়ির দিকে তাকাল ও—ট্র্যানজাকশন আওয়ার শেষ হয়নি এখনও। সঙ্গে সঙ্গে ছুটল ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্যে। জহির ভাইয়ের দেয়া টাকাটার অর্ধেক অন্তত ক্রোনারে বদল করে নিতে হবে।

সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় গোদেনবার্গে নামল রানা। একটা ট্যাক্সি নিয়ে রওনা হলো হোটেল স্ক্যান্ডার উদ্দেশে।

আর দশটা আধুনিক হোটেলের মতই দেখতে স্ক্যান্ডা। সোজা-সাপটা, ছিমছাম, আয়তাকার; ট্যুরিস্টদের মোটেই আকর্ষণ করে না যেগুলো। কাউন্টারে নাম লিখিয়ে, খাতায় সই করে সোজা রুমে চলে গেল ও। জিনিসপত্র রেখে খাটের ওপর বসল। কিভাবে এগোবে এখন? প্রশ্নটা সহজ, কিন্তু উত্তরটা সহজ নয় মোটেই। সমস্যা একটা নয়...

প্রথম সমস্যা, ব্রিটেনের মিনিস্ট্রি অভ হোম সতর্ক করে দিয়েছে জহির ভাইকে, যেন কাউকে না পাঠানো হয় গোদেনবার্গে; সুইডিশ গভর্নমেন্ট বা পুলিস তা জানে কিনা জানে না রানা। এখানকার পুলিসকেও যদি সতর্ক করে দেয়া হয়ে থাকে তো কোন সাহায্য পাবে না ও, বরঞ্চ উল্টোটাই ঘটবে হয়তো। দ্বিতীয়ত, হোটেলের কর্মচারীদের কাছে বা পুলিসের কাছে ও জানতে চাইতে পারে, কি হয়েছিল, কিন্তু কিসের ভিত্তিতে? কে ও? সুফিয়ার নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় কি আসে যায় ওর?

অনেক চিন্তা ভাবনার পর শেষ পর্যন্ত হোটেল স্টাফদের দিয়েই শুরু করার

সিদ্ধান্ত নিল ও। হোটেল স্টাফদের কেউ জড়িত থাকলে—পাকা লোক যদি না হয় তো ধরে ফেলতে পারবে বলে আশা করছে।

নিচে নেমে এল রানা। চারকোনা লাউঞ্জের একধারে একটা চেয়ার দখল করে বসল ও। কফির অর্ডার দিল। যে মেয়েটা কফি নিয়ে এল তাকেই ধরল প্রথম। জিজ্ঞেস করল সুফিয়ার কথা।

সুফিয়ার নাম শুনেই বদলে গেল মেয়েটার চেহারা। একই সঙ্গে দুশ্চিন্তা আর দ্বিধা ফুটে উঠল সেখানে।

'আপনি ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বললেই ভাল করবেন, মিস্টার।' রানার হাত থেকে দশ ক্রোনারের নোটটা নিতে নিতে সতর্ক গলায় বলল মেয়েটা।

জলে গেল দশটা ক্রোনার। বুঝে ফেলেছে রানা, মুখ খুলবে না হোটেলের কেউ। সমস্যাটা পরিষ্কার হয়ে গেছে ওর কাছে। আনঅফিশিয়ালি গোদেনবার্গে এলেও পুরোপুরি আনঅফিশিয়ালি কিছু করতে পারবে না ও। জায়গা বুঝে একটু আধটু অফিশিয়াল হতেই হবে। রিসেপশন কাউন্টারে এসে ম্যানেজারের সাথে দেখা করতে চাইল ও।

ম্যানেজারের নাম পেডারসন। তার হোটেলের মতই ঝকঝকে-তকতকে আধুনিক লোকটা। সুইডিশ। মাঝারি গড়ন। মুখে নির্লিপ্ত একটা মুখোশ এঁটে রয়েছে সব সময়। কথাবার্তা এবং চালচলনে কেতাদুরস্ত এবং অমায়িক। কিভাবে পাবলিকের সঙ্গে ডিল করতে হয় ভালই জানে সে।

'আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি, মিস্টার রানা?'

'আপনার অফিসে গিয়ে কথা বললে কিছু মনে করবেন কি আপনি?'

'তার কি কোন দরকার হবে?'

'বোধহয়। আমি সুফিয়া, মিস সুফিয়া আশরাফ সম্পর্কে একটু আলাপ করতে চাই।'

'ওহ! নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আসুন, এদিক দিয়ে।' রানার রেজিস্ট্রেশন স্লিপটা হাতেই ছিল ম্যানেজারের। চকিতে একবার দেখে নিল স্লিপটা। বিজনেস বা পেশার ঘরটা ফাঁকাই রেখেছিল রানা।

গদি মোড়া একটা চেয়ারে বসতে দিল ওকে ম্যানেজার। রানা বসার পর ডেস্কের ওপাশে নিজের চেয়ারে বসল সে।

'আপনি কে তা জানতে পারি?' বিনীত ভাবে জিজ্ঞেস করল ম্যানেজার।

'মিস আশরাফের বন্ধু।'

'জার্নালিস্ট?'

'অনেকটা সে রকম। তবে এখানে আমি জার্নালিস্ট হিসেবে আসিনি।'

'কোন অথোরাইজেশন আছে আপনার?' সতর্ক কণ্ঠস্বর ম্যানেজারের।

'না থাকলে?'

একটু কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। 'থাকলে ভাল হয়'। তারপর মৃদু হেসে বলল, 'আমরা সুইডিশরা স্বভাবতই একটু বুরোক্র্যাটিক, বুঝলেন, মিস্টার রানা। নিয়ম কানুনগুলো একটু বেশি মেনে চলি আমরা।'

সুতরাং, একটা একটা করে পাসপোর্ট, কেব্‌ল্ কার্ড, অয়্যারলেস কার্ড, প্রেস

কার্ড এবং ডাইনারস কার্ড দেখাল ও পেডারসনকে। ডাইনারস কার্ডটাই লোকটাকে প্রভাবিত করল সবচেয়ে বেশি। ও যে অস্তিত্বহীন লোক নয় তার প্রমাণ পেয়ে সন্তুষ্ট হলো লোকটা।

বিনীত ভঙ্গিতে কাগজগুলো ফেরত দিল ম্যানেজার। নড়ে চড়ে বসল একটু। তারপর বলল, 'আপনাকে খুব একটা সাহায্য করতে পারব বলে মনে হয় না, মিস্টার রানা। সামান্যই জানি আমি মিস আশরাফ সম্পর্কে। দশ দিনের জন্যে বুক করেছিলেন উনি সিঙ্গল সিটেড রুম। দশ দিনের জন্যে বুক করলেও শুধু একটা রাতই তিনি ঘুমিয়েছিলেন হোটেলে। দ্বিতীয় রাতে পুলিসকে ফোন করেছিলেন, ভয়ানক বিপদে পড়েছেন এবং ইমিডিয়েটলি পুলিস প্রোটেকশন চান। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুলিস ডিপার্টমেন্ট একটা গাড়ি পাঠিয়ে দেয়, কিন্তু রুমে পাওয়া যায়নি তাঁকে।'

'টেলিফোনটা কি হোটেল থেকেই করেছিল ও?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ।'

'শিওর আপনি?'

'অবশ্যই। হোটেল অপারেটরের মাধ্যমে পুলিস স্টেশনের লাইন চেয়েছিলেন উনি।'

'ক'টার সময়?'

'সম্ভবত এগারোটা বাজার মিনিট পাঁচেক পরে। ব্যাপারটা জরুরী হলে লিস্টটা চেক করে দেখতে পারি আমি।'

'ও যে বিপদে পড়েছে সে সম্পর্কে আপনাকে কিছু জানায়নি সুফিয়া?'

'না।'

'কিংবা হোটেলের অন্য কোন স্টাফকে?'

'না।'

'ওর রুমটার কি অবস্থা? দেখতে পারি আমি একবার?'

'দুঃখিত।' আবার কাঁধ ঝাঁকাল পেডারসন। একটু বিরক্ত হয়েছে বোধহয়। 'তালা বন্ধ রুমটা। পুলিসের নির্দেশ। পুলিসের অনুমতি যদি আনতে পারেন তো আমার কোন আপত্তি...'

'কারও সঙ্গে কোন ঝগড়াঝাঁটি বা কোন গোলমাল হয়েছিল নাকি সুফিয়ার?' ম্যানেজারকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'বোধহয় না। হলেও জানা নেই আমার।'

'ওর জিনিসপত্রের কি অবস্থা? ঘাঁটাঘাঁটি করা হয়েছে নাকি সেগুলো?'

'পুলিস করেছে। ওরা অনেকটা সময় কাটিয়েছে মিস আশরাফের রুমে।'

'কোন ধস্তাধস্তির চিহ্ন পাওয়া যায়নি?'

একটু চুপ করে রইল পেডারসন। 'দেখুন, মিস্টার রানা, প্রশ্নগুলো আপনার পুলিসকেই করা উচিত। আমি সিম্পলি একজন হোটেল ম্যানেজার। আমরা এসব ব্যাপারে...'

'জড়িত হতে চান না।' রানাই শেষ করল ম্যানেজারের কথাটা।

'স্বভাবতই। কোন হোটেলওলাই চায় না তার হোটেলে এ ধরনের ঘটনা

ঘটুক। আপনার উপকারে আসতে পারলে সত্যিই আনন্দিত হব, মিস্টার রানা। আমি যা যা জানি তা সবই বলে ফেলেছি। আমার মনে হয়, এখন আপনার পুলিসের সঙ্গে কথা বলা উচিত।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল রানা। 'আপনার পরামর্শ মনে থাকবে আমার, মিস্টার পেডারসন। ধন্যবাদ।'

আগের মতই নির্লিপ্ত সৌজন্যের সঙ্গে রানাকে কাউন্টার পর্যন্ত এগিয়ে দিল ম্যানেজার। নির্লিপ্তভাবে মুখোশ এঁটে অপ্রীতিকর ব্যাপারটাকে হজম করার চেষ্টা করছে সে।

'আরেকটা জিনিস,' বলল রানা। 'সে রাতে ও আমার কাছে ফোন করার চেষ্টা করেছিল। ঠিক ক'টার সময়, জানতে চাই।'

'নিশ্চয়ই। একটু দাঁড়ান, আমি টেলিফোন অপারেটরকে জিজ্ঞেস করছি।'

জানা গেল, সে রাতে তিনটে ফোন করেছিল অথবা করতে চেষ্টা করেছিল সুফিয়া। প্রথমটা রাত আটটার দিকে লন্ডনে। দ্য নিউজে। সম্ভবত জহির ভাইয়ের কাছে না, জহির ভাই তাহলে বলতেন ওকে সে-কথা। দ্বিতীয়টা ওয়াশিংটনে রানার কাছে, আর তৃতীয়টা পুলিসের কাছে। বোধহয় লন্ডনে ফোন করেছিল, ও কোথায় আছে তা জানার জন্যেই, ধারণা করল রানা। ওয়াশিংটনেও চেষ্টা করে ওকে না পাওয়ার তিন ঘণ্টা পরে বোধহয় ফোন করেছিল পুলিসকে। ওই তিন ঘণ্টায় কি ঘটেছিল?

পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত নিল রানা। ফোন করার জন্যে নিজের রুমে গেল ও। রুমে পৌঁছে আবার সিদ্ধান্ত বদলাল। ফোন না করে নিজেই পুলিস স্টেশনে যাবে ঠিক করল। বেরিয়ে আসতে যাবে রুম ছেড়ে, এমন সময় বেজে উঠল ফোন। নিচে কে এক ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিস এসেছে, দেখা করতে চায় ওর সাথে।

ইন্সপেক্টরকে উপরে পাঠিয়ে দিতে বলে অপেক্ষা করতে লাগল রানা। নিঃসন্দেহে ও চলে আসার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিসে খবর দিয়েছে পেডারসন। একটু পরেই নক করার শব্দ হলো দরজায়। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল রানা। দু'জন লোক এসে ঢুকল ওর কামরায়।

'মিস্টার রানা?' জিজ্ঞেস করল প্রথমজন। বেঁটে খাটো লোকটা। পাঁচ ফুট চারের বেশি হবে না কোনমতেই। মাথা নেড়ে সায় দিল ও।

'আমি ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিস। আর এ হচ্ছে সার্জেন্ট টমাস। শুনলাম আপনি নাকি মিস সুফিয়া আশরাফের ব্যাপারে এখানে এসেছেন?'

'বসুন,' বলল রানা।

বসল ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিস। দাঁড়িয়ে রইল সার্জেন্ট টমাস। যেন বসার চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই পছন্দ তার।

'কতটুকু জানেন আপনি, মিস্টার রানা?' জিজ্ঞেস করল ইন্সপেক্টর।

'খুব বেশি না। হোটেলের ম্যানেজার যতটুকু বলেছে ততটুকুই।'

'আমরা তো আরও কম জানি।'

'এখন কোন খবর নেই তাহলে?'

'না। তবে চেষ্টা করছি আমরা।'

'কিন্তু,' বলল রানা। 'জলজ্যান্ত একটা যুবতী মহিলা তো আর বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারে না! আপনারা জানেন কিভাবে, কি পরিস্থিতিতে হোটেল ছেড়েছিল সে?'

'এখনও জানতে পারিনি,' জবাব দিল ইন্সপেক্টর। 'মিস আশরাফের ব্যাপারে আমরা খুবই উদ্বিগ্ন, মিস্টার রানা। কারণ মাত্র ক'দিন আগে উনি সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ফিরেছেন। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা?'

'না, কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। আমি জানি ও ক'দিন আগেই মস্কো থেকে এসেছে। কিন্তু তার সঙ্গে ওর উধাও হয়ে যাওয়ার সম্পর্ক কি? মস্কো থেকে আসলেই কি একটা লোক নিখোঁজ হয়ে যাবে?'

একটু হাসল ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিস। 'সম্পর্ক থাকতেও পারে, মিস্টার রানা। মিস আশরাফকে না পাওয়া পর্যন্ত আপনি জোর করে কিছুই বলতে পারেন না। আপনার পাসপোর্টটা দেখি।'

পাসপোর্টটা বের করে এগিয়ে দিল রানা। দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিল ইন্সপেক্টর পাসপোর্টের পৃষ্ঠাগুলোয়। 'আচ্ছা! আপনিও তো দেখছি ক'দিন আগে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ঘুরে এসেছেন!'

'ক'দিন আগে না, বেশ ক'দিন আগে বলুন। দু'মাস তো হবেই...'

'হ্যাঁ। তা ঠিক।' পাসপোর্টটা রানার হাতে ফিরিয়ে দিল ইন্সপেক্টর। 'এবার বলুন, আপনার গোদেনবার্গে আসার কারণ কি, মিস্টার রানা? ম্যানেজারের কাছ থেকে কিছুটা শুনেছি অবশ্য, তবে খুব একটা বিস্তারিত না।'

'ম্যানেজারের কাছ থেকে যা শুনেছেন তা-ই। সুফিয়াকে খুঁজতে এসেছি আমি।'

'সে-কাজের জন্যে তো আমরাই রয়েছি। আমাদের উপর আস্থা নেই আপনার?'

'নিশ্চয়ই। আস্থা থাকবে না কেন। তবে আপনারা কতটুকু এগোলেন সেটাও জানা দরকার তো, না কি?'

'ঠিক আছে। হোটেলেই থাকবেন আপনি। মিস আশরাফের কোন খবর পেলেই জানাব আপনাকে। এখন বলুন তো, সুফিয়া আশরাফ কেন এসেছিলেন গোদেনবার্গে?'

'অফিসের কাজে।'

'মস্কো থেকে গোদেনবার্গে অফিসের কাজে!'

'হ্যাঁ। যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করে ও সেই প্রতিষ্ঠান রাশিয়া সম্পর্কে একটা ম্যাগাজিন বের করছে, ব্রিটেনে বিক্রির জন্যে। ওই ম্যাগাজিনের জন্যে কিছু মেটেরিয়াল জোগাড় করতেই রাশিয়ায় গিয়েছিল ও। এখানে সেগুলো এডিট করে ছাপতে দেয়ার কথা। ম্যাগাজিনটা এখানেই ছাপা হবে।'

'কেন, এখানে ছাপা হবে কেন?'

'সাধারণ কথা: কম দামে ভাল ছাপে এখানকার প্রিন্টাররা।'

'তা অবশ্য ঠিক।' এক সেকেন্ড তাকিয়ে রইল লোকটা রানার দিকে।

'একজন মহিলাকে পাঠানো হয়েছিল কেন এরকম একটা কাজে?'

'কারণ...' একটু ইতস্তত করল রানা। 'কারণ আমার মনে হয়, কাজটা করার যোগ্যতা ছিল ওর। ম্যাগাজিন প্রোডাকশনের ব্যাপারে ভাল অভিজ্ঞতা আছে সুফিয়ার।'

'তবু একজন মহিলাকে এতবড় একটা দায়িত্ব দিয়ে পাঠানোটা একটু অস্বাভাবিক নয়?'

'আমাদের পুরুষ-শাসিত সমাজে সে-রকম মনে হতে পারে বটে। তবে ব্যাপারটা মোটেই সে-রকম নয়।'

'অর্থাৎ?'

'সুফিয়াকে শুধুমাত্র একজন "মহিলা" বললে ভুল বলা হবে। অনেক পুরুষ সাংবাদিকের চেয়ে ভাল কাজ জানে সে। সত্যিই কাজের মেয়ে সুফিয়া এবং সে কারণেই ওকে পাঠানো হয়েছিল।'

'এবং আকর্ষণীয়াও, তাই না? আমি ছবি দেখেছি মিস আশরাফের।'

'তাহলে তো জানেনই আপনি।'

'হ্যাঁ। অদ্ভুত একটা আকর্ষণ, সেই সাথে ব্যক্তিত্ব আছে ভদ্রমহিলার চেহারায়।'

'কর্মদক্ষতাও আছে সেরকমই।'

মহিলাদের সম্পর্কে দুনিয়াজোড়া পুলিসদের একই রকম ধারণা। অবলা নারী, ঠুনকো একটা জিনিস যেন, একটু স্পর্শেই ভেঙে যাবে। ধারণাটা ভেঙে দেয়ার জন্যে ইচ্ছে করেই ও একটু ফেনিয়ে বলল কথাগুলো।

'মিস আশরাফের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক?' তীক্ষ্ণ চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করল ইন্সপেক্টর।

'অনেক দিনের চেনা। বন্ধু বলতে পারেন। এক সঙ্গে কাজও করেছি কিছুদিন আমরা।'

মাথাটা একটু ঝাঁকিয়ে নিজের আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল ইন্সপেক্টর। অমূল্য কিছু পরখ করছে যেন। আচমকা মাথা তুলেই জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, আপনি কেন রাশিয়ায় গিয়েছিলেন, মিস্টার রানা?'

হাসি পেয়ে গেল রানার। ইন্টারোগেটরদের পুরানো কৌশল: হকচকিয়ে দিয়ে কথা আদায় করার চেষ্টা। 'একই কারণে, মিস্টার ইন্সপেক্টর,' বলল ও।

'একই ম্যাগাজিন?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে, মিস আশরাফের আবার...'

থামিয়ে দিল রানা ইন্সপেক্টরকে। 'হ্যাঁ, দরকার ছিল ওকে পাঠানোর। আমি তালগোল পাকিয়ে ফেলেছিলাম কাজটায়। ওরা বের করে দেয় আমাকে। সুফিয়া বোধহয় ভালভাবেই করতে পেরেছিল কাজটা।'

একটু মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিস। 'অনেক ধন্যবাদ। মিস আশরাফের কোন খবর পেলে জানাব আপনাকে।'

'দাঁড়ান দাঁড়ান,' বলল রানা। 'কয়েকটা কথা জানতে চাই আমি।'

'বলুন?'

'আমি ওর রুমটা একটু দেখতে চাই।'

'না। সেটা সম্ভব নয়।'

'কেন?'

'জিনিসপত্র একটুও নড়াচড়া হোক তা চাই না আমরা। কোন্‌টা থেকে কি সূত্র পাওয়া যাবে কিছু কি বলা যায়?'

'আমিও তো সেটাই বলতে চাই কোন্‌টা থেকে কি সূত্র পাওয়া যাবে কিছুই কি বলা যায়? এমনও তো হতে পারে, আপনাদের নজরে যা পড়েনি আমার নজরে তা পড়ল; জরুরী কিছু।'

'হতে পারে। কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, ওরুমে এখন কাউকে ঢুকতে দেয়া হবে না। বললাম তো, কোন খবর পেলেই জানাব আপনাকে।' বিরক্ত শোনাল ইন্সপেক্টরের গলা।

একটু খোঁচানোর ইচ্ছে হলো রানার ইন্সপেক্টরকে। শান্ত কণ্ঠে বলল, 'কি খবর দেবেন আপনারা তা ভালই জানা আছে আমার। আটচল্লিশ ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। বলতে চান এর ভেতরে কোন সূত্রই আপনারা পাননি? কোথায় গেছে সুফিয়া, কেন ভয় পেয়েছিল ও সে সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেননি আপনারা?'

খোঁচাটুকু গায়ে মাখল না ফ্রান্সিস। বলল, 'একটা সম্ভাবনার কথা মনে হচ্ছে আমার, মিস্টার রানা। মিস আশরাফ বোধহয় কিছু নিয়ে আসছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে। আপনি জানেন নাকি কিছু?' আবার সেই একই কৌশল, হকচকিয়ে দেয়ার চেষ্টা।

'নিশ্চয়ই। আনছিল তো,' বলল রানা।

'তাই নাকি? কি?'

'ছবি আর আর্টিকেল। অনেক। ম্যাগাজিনটার ছয় সংখ্যা অনায়াসে বের করা যাবে তা দিয়ে। সুফিয়া একজন জার্নালিস্ট, স্পাই নয়, মিস্টার ইন্সপেক্টর।'

'দুটোর ভেতরে তেমন স্পষ্ট কোন সীমারেখা টানা যায় কি?'

'আমি আবারও বলছি ইন্সপেক্টর, স্পাই নয় সুফিয়া। এ ব্যাপারে, একশো পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিতে পারি আমি। গোপনীয় তেমন কিছু যদি ওকে বহন করতে হয়েও থাকে তো তা নিজের অজান্তেই সে করেছে।'

'যেমন?'

'কেউ ওর লাগেজে কিছু ঢুকিয়ে দিয়ে থাকতে পারে।'

'এই সম্ভাবনার কথা আমরাও ভেবেছি। যাক, আমি তাহলে...'

চলে গেল ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিস। পেছন পেছন বিশালদেহী সার্জেন্ট টমাস। পেছন ফিরে তাকাল না দু'জনের একজনও। যাওয়ার সময় বন্ধ করে দিয়ে গেল রুমের দরজা।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল রানা, বন্ধ হয়ে গেল দরজা। এখন কি করা যায়? সুফিয়ার রুমে ঢুকবার উপায় নেই। দরজা বন্ধ। ফোনটা তুলে নিল ও। অপারেটরকে লন্ডনে জহির ভাইয়ের নাম্বার দিয়ে একটা কল বুক করল। পাঁচ মিনিটের ভেতর

পেয়ে গেল লাইন। জহিরুল ইসলামের গলা ভেসে এল ওপাশ থেকে, 'কে?'

'আমি রানা—।'

'ও, কি খবর? খোঁজ পেলে কোন?' ব্যাকুলতা জহির ভাইয়ের গলায়। গলা শুনেই বুঝল রানা, বেশ দুশ্চিন্তায় আছেন ভদ্রলোক।

'না। পুলিস খুব একটা সহযোগিতা করছে না। তালা মেরে রেখেছে ওর রুমে।'

'হুম:···। এখন কি করবে?'

'দেখি। আমি একটা জিনিস জানতে চাই, জহির ভাই, সুফিয়া সে রাতে অফিসে ফোন করেছিল একবার। কার সঙ্গে কথা বলেছিল ও জানা দরকার সেটা।'

'আচ্ছা, দেখছি আমি। তোমার নাম্বারটা দাও।'

ফোন নাম্বার দিল রানা। নাম্বারটা টুকে নিয়ে লাইন কেটে দিলেন জহির ভাই।

দশ মিনিট পর বেজে উঠল ফোন। রিসিভারটা তুলে কানে ঠেকাল রানা। এডিটরের পি.এ. জুলি। 'মিস সুফিয়া আশরাফ আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন, মিস্টার রানা,' বলল সে।

'কি বলেছিল?'

'আপনি কোথায় তা জানতে চাইছিলেন।'

'আর?'

আপনি লন্ডনে নেই শুনে আমার কাছে আপনার নাম্বার আছে কি না জানতে চাইলেন। ওয়াশিংটনে যেখানে ছিলেন আপনি, সেখানকার কথা বললাম।'

'তারপর?'

'তারপর আর কোন কথা হয়নি। কেটে দিয়েছিলেন লাইন।'

'কেমন শোনাচ্ছিল ওর গলা?'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল জুলি। 'আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি না।'

তারমানে মিস জুলি জানে না কিছু।

'চিন্তিত শোনাচ্ছিল নাকি ওর গলা?' আবার জিজ্ঞেস করল রানা।

'আবার কিছুক্ষণ নীরবতা ওপ্রান্তে।'

'আমি ঠিক বলতে পারছি না। নাম্বারটা জিজ্ঞেস করেছিলেন শুধু। কোন অস্বাভাবিকতা তো টের পাইনি!'

ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন রেখে দিল রানা। একটু চিন্তিত হয়ে পড়ছে ও, গল্প করে বেড়াবে না তো জুলি? সুফিয়ার নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা গোপন রাখা হয়েছে। এখন জুলি যদি কিছু একটা আন্দাজ করে গল্প করতে শুরু করে তো মুশকিল হবে। খবরটা কোন কাগজে বেরিয়ে গেলেই সর্বনাশ! তাহলে? জহির ভাইকে আবার রিং করে সাবধান করবে? থাক। দরকার হবে না বোধহয়। এডিটরের পার্সোনাল স্টাফদের বিশেষ ভাবে বাছাই করে নেয়া হয়। গল্প করে বেড়ানোর মত মেয়ে বা ছেলেদের নিয়োগ করা হয় না এডিটরের সেক্রেটারি বা পি.এ. হিসেবে।

জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। গুম হয়ে থেকে কি যেন ভাবল কিছুক্ষণ।

কোথায় গেল সুফিয়া? এখনও বেঁচে আছে তো? ভাবনা চিন্তা বাদ দিয়ে পরবর্তী কর্তব্য ঠিক করতে বসল ও। পুলিসের অসহযোগিতার মুখে কিভাবে এগোনো যায়? বেশ কিছুক্ষণ ভেবেও কোন কূল কিনারা পেল না ও। সচেতন ভাবে ঘুমোতে না চাইলেও কিছুক্ষণের ভেতরেই বিছানায় এলিয়ে পড়ল ও।

ভোর চারটেয় ঘুম ভাঙল রানার। ভাঙল বলাটা ঠিক হবে না বোধহয়, তন্দ্রার ঘোরটা কাটেনি এখনও। এক মিনিটের ভেতরেই পুরো সজাগ হয়ে গেল ও। সজাগ হয়ে প্রথমেই প্রশ্নটা খেলে গেল ওর মনে। ঘুম ভাঙল কেন? কোন শব্দ হয়েছিল নিশ্চয়ই! কেউ ঢুকেছে নাকি ঘরে? চুপচাপ কান খাড়া করে শুয়ে রইল ও। নিজের হার্টবিট ছাড়া অন্যকোন শব্দ শুনতে পেল না। বিছানায় শোয়া অবস্থায়ই সাবধানে বাতির সুইচের দিকে হাত বাড়াল ও। কেউ যদি ঢুকে থাকে রুমে তাহলে নিশ্চয়ই বিছানার পাশে এসে দাঁড়াবে না সে। সুইচের ওপর আঙুল রেখে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ও। নিশ্চয়ই কোন শব্দ শুনেছে ও। নইলে ঘুম ভাঙল কেন? পরমুহূর্তেই আবার মনে হলো স্বপ্ন দেখছিল না তো? বোধহয় না, ওর স্মৃতিতে এখন অনুরণিত হয়ে চলেছে শব্দটা।

সুইচটা টিপে দিল ও। উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল ঘরটা। কেউ নেই। আস্তে আস্তে উঠে বসল রানা। বিছানা থেকে নেমে বাথরুমটা চেক করে এল। সেখানেও নেই কেউ। অখণ্ড নিস্তব্ধতা ঘর জুড়ে। বাইরেও কোন শব্দ নেই। রাতের এ সময় স্বাভাবিক ভাবে কোন শব্দ হওয়ার কথা নয়। তাহলে ঘুম ভাঙল কেন? প্রশ্নটা ঘুরে বেড়াতে লাগল মন জুড়ে। দুটো কোট হ্যাঙ্গারে বাড়ি খেয়ে শব্দটা তৈরি করেছিল নাকি? ওয়ার্ডরোবটা খুলল ও। না। স্থির নিষ্কম্প হ্যাঙ্গারগুলো। বাড়ি খাওয়ার কোন কারণও নেই। ওয়ার্ডরোবের ভেতর বাতাস আসবে কোত্থেকে?

খালি পায়ে উঠে এসেছে ও বিছানা ছেড়ে। কার্পেটে ভেজা কিছুর উপর পা পড়ল। পায়ের দিকে তাকাল ও। না, কোন জিনিস নয়, কার্পেটটারই খানিকটা জায়গা ভেজা। পানি এল কোত্থেকে? ছাদের দিকে তাকাল, পানির কোন চিহ্ন নেই সেখানে। বাথরুম থেকে এতটা দূরে কার্পেট ভিজল কি করে?

কার্পেটের ওপর হাঁটু গেড়ে বসল রানা। ভেজা জায়গাটায় আঙুল বুলিয়ে দেখল। পানিতেই ভিজেছে জায়গাটা। বৃষ্টি হয়েছে নাকি? ছাঁট এসে ভিজিয়ে দিয়েছে? জানালার কাছে গিয়ে ভারী পর্দাটা সরিয়ে দেখল ও, মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে, তবে ছাঁট আসছে না কোন। জানালার একেবারে কাছেও খটখটে শুকনো কার্পেট। তাছাড়া ছাঁট এলে পর্দাতেই ঠেকানোর কথা তা। এত দূরে তো আসতেই পারে না। তাহলে জানালা থেকে এত দূরে পানি এল কি করে? আবার প্রশ্নটা জাগল ওর মনে।

স্মরণ করার চেষ্টা করল রানা, যখন শুতে গেছিল তখন কি বৃষ্টি হচ্ছিল? না, স্পষ্ট মনে আছে ওর, জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল শোয়ার আগে। বৃষ্টি হচ্ছিল না তখন।

আবার এসে হাঁটু গেড়ে বসল ও ভেজা জায়গাটার কাছে। হাত দিয়ে পরীক্ষা করল আবার জায়গাটা। ভেজা অংশটুকু বাদ দিয়ে আশপাশের খানিকটা জায়গায় হাত বুলিয়ে দেখল, আর কোন ভেজা জায়গা পাওয়া যায় কি না। হ্যাঁ, ফোঁটা

ফোঁটা পানির দাগ চলে গেছে দরজার দিকে। ভাল করে খেয়াল করে দেখল, বিছানার পাশেও কয়েক ফোঁটা পানির দাগ।

সন্দেহ নেই কেউ এসেছিল রুমে। কে হতে পারে? কেন? তাড়াতাড়ি রুমটার চারদিকে চোখ বুলাল ও, কোন রকম অস্বাভাবিকতা নজরে এল না। ব্যাগটার কাছে গিয়ে খুলল ওটা। না, এটাতে হাত দেয়নি। হোটেলের ছিঁচকে চোররা মাঝে মধ্যে বোর্ডারদের পাসপোর্ট, ক্রেডিট কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স ওয়ালেট এসব চুরি করে বেচে দেয় দাগী অপরাধীদের কাছে। দাগী অপরাধীদের ছদ্ম পরিচয়ে কাজ করতে সুবিধা হয় তাতে। অপর ব্যাগটার কাছে গিয়ে খুলল ওটা রানা। না, এটাতেও হাত দেয়নি। পাসপোর্ট, ওয়ালেট, প্রেস কার্ড সব যথাস্থানেই রয়েছে, খোয়া যায়নি কিছু। তাহলে? খামোকা রাত দুপুরে লুকিয়ে লুকিয়ে অন্য লোকের কামরায় ঢোকে না কেউ। নিশ্চয়ই কিছু একটা করতে এসেছিল।

বিছানার পাশের পানির ফোঁটাগুলোই চিন্তায় ফেলে দিল ওকে। আগন্তুক কি অকারণে এখানে এসে দাঁড়িয়েছিল? ওর চেহারা দেখেই ফিরে গেছে? নাকি অন্য কিছু? বেড-সাইড টেবিলের ড্রয়ারটা খুলল রানা, টুকটাক কিছু জিনিসের সঙ্গে টেলিফোন ডাইরেক্টরিটা রাখা। টেলিফোন! তাড়াতাড়ি টেলিফোনটা তুলে নিল ও। শুধু রিসিভার নয় পুরো সেটটা। সাবধানে ওল্টাল সেটা। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল বেসপ্লেটের স্ক্রুগুলোর দিকে। স্টীলের স্ক্রু। স্ক্রুর মাথায় দু'জায়গায় খুব ছোট স্ক্র্যাচ পড়েছে। একেবারে নতুন স্ক্র্যাচগুলো। আলো পড়ে চক চক করছে।

আড়ি পাতার যন্ত্র বসানো হয়েছে ফোনের ভেতর!

ছয়

আড়ি পাতার যন্ত্রটা কি শুধু যখন ফোন ব্যবহার হয় তখনই কাজ করে, না সবসময় চালু আছে, বুঝতে পারল না রানা। যদি সবসময় চালু থাকে, তাহলে যারা লাগিয়েছে ওটা তারা এতক্ষণে বুঝে ফেলেছে যে ও হাত দিয়েছে ফোনে, কিন্তু কারও সঙ্গে কথা বলেনি, অর্থাৎ টের পেয়ে গেছে যন্ত্রটার অস্তিত্ব। এই ফোন থেকে কোন কল না করাই এখন সবচেয়ে মঙ্গলজনক। কোন কল নয়, এবং যথাসম্ভব স্বাভাবিক আচরণ করতে হবে, ভাবল রানা। যাতে ওরা বুঝতে না পারে ও টের পেয়ে গেছে ব্যাপারটা।

রিসিভারটা তুলে কিছুক্ষণ চুপচাপ ধরে রইল রানা। আন্দাজে একটা নাম্বারে ডায়াল করে আবোল তাবোল কিছু কথা বলল। কোন নাম্বারের সঙ্গে কানেকশন হয়নি, সুতরাং ও প্রান্ত থেকে কোন উত্তর আসার প্রশ্নই ওঠে না। রিসিভার নামিয়ে রেখে শুয়ে পড়ল আবার। হল পোর্টার কোথাও বসে বসে ঝিমোচ্ছিল, নয়তো কিছু টাকার বিনিময়ে ইচ্ছে করেই অন্য জায়গায় সরে ছিল যাতে নির্বিঘ্নে কেউ ঢুকতে পারে ওর রুমে, ভাবল রানা।

টেলিফোনে আড়ি পাতার যন্ত্র বসানোয় একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে ও, নিজের ইচ্ছায় কোথাও যায়নি সুফিয়া, ওকে বাধ্য করা হয়েছে। কিন্তু কেন? কোথায় নিয়ে গেছে ওকে? বেঁচে আছে তো? বার বার ঘুরে ফিরে আসছে প্রশ্নগুলো। আরও ঘণ্টা দু'য়েক শুয়ে রইল ও বিছানায়। কিন্তু ঘুম এল না আর। এর পরে যে কি করবে তা-ও ঠিক করতে পারল না ও।

ভোর ছ'টার দিকে বিছানা ছেড়ে উঠল রানা। শেভ করে, শাওয়ার সেরে কাপড় পরে নিল ঝটপট। নেমে এল নিচে। হোটেলের ডাইনিং রুম খুলতে এখনও ঘণ্টাখানেক দেরি। বেরিয়ে এল ও হোটেল ছেড়ে। বাইরে একটা ওয়ার্কম্যান'স কাফেতে নাস্তা সেরে নিল। ভোরের শিফটে কাজ করতে যায় যে-সব শ্রমিক তারা খায় এখানে। দ্বিতীয় কাপ কফিতে চুমুক দিতে দিতে বুদ্ধিটা এল মাথায়। এক চুমুকে বাকি কফিটুকু শেষ করে বেরিয়ে এল ও কাফে ছেড়ে। একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে বসল।

শহরের কেন্দ্র থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে স্ট্রুম ব্রাদার্সের অফিস। ওদের প্রেসও ওখানেই। পৌনে সাতটার দিকে সেখানে পৌঁছল রানা। এখনও খোলেনি অফিস। রাস্তার ওপর বেশ কিছুক্ষণ পায়চারি করে সময় কাটাল ও। অবশেষে সাড়ে সাতটার দিকে গেট খুলে দিল দারোয়ান। আসতে শুরু করেছে শ্রমিকরা। অফিস খুলতে এখনও আধ ঘণ্টা। শ্রমিকরা সাধারণত অফিস স্টাফদের চেয়ে আগে আসে।

দারোয়ানকে বলে কয়ে ওয়েটিং রুমটা খোলাল ও। আটটা বাজতে পাঁচ মিনিটের সময় হুড়মুড় করে এক দঙ্গল লোক এসে ঢুকল স্ট্রুম ব্রাদার্সের কম্পাউন্ডে। সবাই যার যার কাজের জায়গায় চলে যাচ্ছে সরাসরি। ঠিক আটটার সময় একটা মেয়ে এসে জিজ্ঞেস করল রানাকে, 'আপনার জন্যে কি করতে পারি?'

'আমি ওয়ার্কস ম্যানেজারের সাথে দেখা করতে চাই।'

'আসুন আমার সঙ্গে।' পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল মেয়েটা।

ওয়ার্কস ম্যানেজারের নাম টেংমার্ক। সুফিয়া নিরুদ্দেশ হওয়ায় যথার্থই চিন্তিত এবং দুঃখিত হয়েছে লোকটা। জানাল, মিস আশরাফকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে যথাসম্ভব সাহায্য করবে সে রানাকে। এ পর্যন্ত যতটুকু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে তা জানাল রানা টেংমার্ককে। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সুফিয়ার?'

'হ্যাঁ। একবার মাত্র। যেদিন উনি মস্কো থেকে এসে পৌঁছুলেন সেদিনই বিকেলে। এয়ারপোর্ট থেকেই স্ক্যান্ডা হোটেলে একটা রুম বুক করে আমাদের এখানে ফোন করেছিলেন উনি। আমরা সঙ্গে সঙ্গে একটা গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম এয়ারপোর্টে। হোটেলে জিনিসপত্র নামিয়ে রেখেই উনি চলে এসেছিলেন আমাদের এখানে।'

মনে মনে হিসেব করল রানা, মস্কো থেকে ফিরেই জহির ভাইকে যে ফোনটা করেছিল ও সেটা বিকেলেই করেছিল। এদিকে হোটেলে জিনিসপত্র নামিয়ে দিয়েই স্ট্রুম ব্রাদার্সের অফিসে চলে এসেছিল ও। তাহলে লন্ডনে ফোন করার সময় পেল কখন সুফিয়া? নিশ্চয়ই গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করতে করতে এয়ারপোর্ট থেকেই

করেছিল ফোনটা।

'সেদিন বিকেলে ও কি কোন মেটেরিয়াল নিয়ে এসেছিল এখানে, মিস্টার টেংমার্ক?'

'বোধহয় অল্প কিছু।' স্মরণ করার চেষ্টা করছে টেংমার্ক। 'ওনার হাতে একটা ব্রীফকেস আর, আর্টিস্টরা যেগুলো ব্যবহার করে সে ধরনের একটা চ্যাপ্টা পোর্টফোলিও ছিল।'

'ওগুলোর কোনটা কি এখন আছে এখানে?'

'হ্যাঁ।'

'আমি দেখতে পারি একটু?'

মুখটা একটু নিচু করল লোকটা। তারপর আমতা আমতা করে বলল, 'পুলিস···। দুর্ভাগ্যক্রমে ওরা···'

'ওরা কি নিয়ে গেছে ওগুলো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না, আছে এখানেই। তবে···'

'দেখুন, মিস্টার টেংমার্ক,' ওয়ার্কস ম্যানেজারের চোখে চোখ রেখে বলল রানা। 'আমরা মিস আশরাফের ব্যাপারে যতটা চিন্তিত, ম্যাগাজিনটার প্রোডাকশনের ব্যাপারেও ঠিক ততটাই চিন্তিত, বুঝতে পারছেন? আগামী মাসেই বের হওয়ার কথা ওটার।'

সতর্ক চোখে তাকিয়ে আছে টেংমার্ক ওর দিকে। 'সব সময় আমরা শিডিউল রক্ষা করি, মিস্টার রানা,' বলল সে।

'এবার আপনারা পারবেন কিনা সন্দেহ আছে।'

'না পারলেও সেটা আমাদের দোষ হবে না। চুক্তিপত্রে একটা শর্ত ছিল···'

'দেখুন, আমরা চুক্তিপত্র বিশ্লেষণ করতে যাচ্ছি না, তাই না?' রানাও একটু সতর্কভাবেই বলল এবার। 'কনট্রাক্টে যা-ই থাক আর যার দোষেই ঘটুক, শিডিউল রক্ষা করতে পারলেন না আপনারা, সেটাই বড় হয়ে দেখা দেবে না?'

রানার দিকে এক পলক তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে ম্যানেজার। কয়েকবারই করল ওরকম। তারপর আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বলল, 'ব্যাপারটা ফেয়ার হচ্ছে না, মিস্টার রানা। আমরা···'

আবার বাধা দিল রানা ম্যানেজারকে। 'চুক্তি অনুযায়ী, ছ' সংখ্যা রাশিয়ান লাইফ দেড় লাখ কপি করে ছাপা হবার কথা। আমাদের অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে একটা মহিলা বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা বের হওয়ার কথা আছে, শুনেছেন নিশ্চয়। প্রথম পর্যায়ে সপ্তাহে পাঁচ লাখ কপি ছাপা হবে সেটা। আমরা আশা করছি ছ'মাসের মধ্যে দেড় মিলিয়নে উঠবে ওটার সার্কুলেশন। ওটা ছাপার অর্ডারও হয়তো আপনারাই পাবেন। তাছাড়া মিস্টার জহিরুল ইসলামের খুবই প্রিয় পাত্রী সুফিয়া আশরাফ তা জানেন তো?'

অস্থিরতা বেড়ে গেল ম্যানেজারের। 'আপনি বলতে চাচ্ছেন, ব্যক্তিগত ভাবে···?'

'না। সেরকম কিছু না,' বলল রানা। 'জহির ভাই নিজের মেয়ের মত স্নেহ করেন সুফিয়াকে।'

এখনও দ্বিধামুক্ত হতে পারছে না লোকটা। 'পুলিস কিন্তু খেপে যাবে।'

এবার একটু গলা চড়াল রানা। 'পুলিস আপনাকে সপ্তাহে দেড় মিলিয়ন কপি ছাপার অর্ডার দেবে না, মিস্টার টেংমার্ক। অসহযোগিতা করলে মিস্টার জহিরও খেপে যাবেন।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল ম্যানেজার। 'আপনি অত্যন্ত সাবধান হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে...'

'নিশ্চয়ই। আপনিও সাবধান হবেন, যেন কোনমতেই পুলিস জানতে না পারে আমি দেখেছি ওগুলো।'

'চলুন তাহলে।' অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলো ম্যানেজার। 'এক মিনিট।' ফোনটা তুলে সুইডিশ-এ কি যেন বলল কিছুক্ষণ ধরে।

ম্যানেজার ফোন রাখতেই বলল রানা, 'পুলিস এলে খবর দেয়ার ব্যবস্থা করবেন আমাকে। আপনি এদিকে ওদের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই বেরিয়ে আসব আমি। ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ। আমি দেখব সেটা।'

সাদাসিধে পরিপাটি রুমটা। সব ম্যাগাজিন প্রিন্টারদেরই বোধহয় এ ধরনের রুম থাকে, যেখানে প্রোডাকশনের সঙ্গে জড়িত এডিটোরিয়াল লোকজন কাজ করে। কয়েকটা ডেস্ক, একটা লে-আউট টেবিল, ট্র্যান্সপারেন্সি দেখার জন্যে নিচে বাতি লাগানো টেবিল আকৃতির একটা ফ্রাস্টেড গ্লাস, একটা টেলিফোন এবং একটা ফটো-কপিয়ার মেশিন সাজানো রয়েছে রুমে।

ধন্যবাদ জানাল রানা ম্যানেজারকে। কিন্তু নড়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না লোকটার মধ্যে। এখানেই যদি সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে লোকটা তো পণ্ড হবে সব।

'আপনার নিশ্চয়ই জরুরী কাজ রয়েছে হাতে?' ম্যানেজারকে ভাগানোর জন্যে বলল রানা।

'হ্যাঁ। দয়া করে খেয়াল রাখবেন, মিস্টার রানা, পুলিস এলে...'

'বুঝতে পেরেছি। অত বলতে হবে না আমাকে।'

'ঠিক আছে, তাহলে, সময় নষ্ট করে লাভ নেই।' চলে গেল ম্যানেজার।

কয়েকটা খসড়া লে-আউট পড়ে ছিল একটা ডেস্কের ওপর। একটা তারের বাস্কেটের ভেতর কয়েকটা সাদাকালো প্রিন্ট, ব্যস। আর কিছু নেই। সুফিয়া বোধহয় হোটেলে ফেরত নিয়ে গিয়েছিল ব্রীফকেস এবং আর্টওয়ার্ক পোর্টফোলিওটা।

ডেস্কটার সামনে গিয়ে বসল রানা। সাবধানে একটা একটা করে দেখতে শুরু করল কাগজগুলো। ছবিগুলো প্রচলিত রাশিয়ান প্রোপাগাণ্ডা টাইপের : নতুন নতুন শহর গড়ে উঠছে সাইবেরিয়ার প্রান্তরে; ব্যালে স্কুলে বাচ্চারা নাচ শিখছে; সুন্দর সুন্দর সব সাজসরঞ্জামে সজ্জিত জিমনাশিয়ামে আরও বাচ্চারা ব্যায়াম করছে; গাড়ি, টেলিভিশন, ঘড়ি ইত্যাদি তৈরি করছে শ্রমিকরা। এইসব কয়েকটা ছবির পেছনে সুফিয়ার হাতে লেখা মন্তব্য দেখল রানা। ছাপার জন্যে প্রাথমিক ভাবে নির্বাচন করেছে ও ছবিগুলো। বিশেষ কিছু বুঝতে পারল না রানা সেগুলো থেকে।

লে-আউটগুলো ম্যাগাজিনের বিভিন্ন পৃষ্ঠার খসড়া। টাইপ এরিয়া আর ছবির

কোথায় কোন্‌টা হবে তার পরিকল্পনা। প্রচ্ছদের খসড়া ডিজাইন কয়েকটা। তাড়াহুড়ায় যেনতেন রকমের করা ছবির আউটলাইন; কয়েকটা খসড়া টাইপ স্টাইল। খুব একটা পছন্দ হলো না ওর ডিজাইনগুলো। একটা জিনিস ওর চোখে পড়ল: বিভিন্ন জায়গায় ফ্ল্যাগ আঁটা রাশিয়ার ম্যাপ একটা। প্রতিটি ফ্ল্যাগের মাঝখানে একটা করে ছবি সেঁটে দেয়ার কথা ভেবেছে নিশ্চয়ই সুফিয়া। আইডিয়াটা মৌলিক না হলেও ভাল লাগল রানার। আর্টিস্টরা যদি রং ব্যবহারে সতর্ক হয় আর ছাপার সময় যদি কোনাগুলো ঝাপসা না হয়ে যায় তো বেশ ভাল হবে জিনিসটা।

ঘণ্টাখানেক সময় কাটাল রানা রুমটায়। তিনবার করে চেক করল জিনিসগুলো, কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু নজরে পড়ল না। কোন সূত্রই আবিষ্কার করতে পারল না ও। যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেল।

এখনও নজরে পড়েনি, পরে হয়তো কোন সূত্র পাওয়ার মত কিছু নজরে পড়বে এই ভরসায় কয়েকটা জিনিসের ফটোকপি করল ও। তারপর আবার যেটা যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় সাজিয়ে রেখে বেরিয়ে এল রুম ছেড়ে। দরজায় তালা লাগিয়ে এসে ঢুকল টেংমার্কের অফিসে।

'পুলিস আসেনি তো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না।' অনেক কষ্টে একটা কাষ্ঠহাসি ফুটিয়ে তুলল ম্যানেজার। 'কাজ হলো কোন?'

'বোধহয় না,' বলল রানা। 'আপনাকে চাপ দেয়ার জন্যে দুঃখিত। আমার মনে হচ্ছিল, দেখা দরকার জিনিসগুলো।'

এবার স্বাভাবিক ভাবে একটু হাসল ম্যানেজার। 'যাকগে, শেষ হয়ে গেছে ব্যাপারটা। ও নিয়ে আর চিন্তা করবেন না। আমি সত্যিই সাহায্য করতে চাই আপনাকে। কোন কিছুর দরকার পড়লে জানাবেন আমাকে।'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

'জহির সাহেবকে বলবেন দয়া করে, আমরা সহযোগিতায় বিশ্বাসী।'

'অবশ্যই বলব।'

'কোথায় যাবেন এখন আপনি?'

ওর নিজেরই কোন ধারণা নেই কোথায় যাবে। বলল, 'এখনও জানি না। বোধহয় হোটেলেই ফিরব।'

'একটা গাড়ি দিয়ে দিচ্ছি আমি,' বলল টেংমার্ক। উঠে দরজার কাছে গিয়ে বলল, 'মিস্টার ভ্লাদিমিরের সঙ্গে কথা বলেছেন?'

ঝট করে ফিরল রানা ওর দিকে। 'কে?'

বিস্মিত দৃষ্টি ম্যানেজারের চোখে। 'জানেন না? মিস আশরাফের সঙ্গে আমাদের এখানে এসেছিলেন মিস্টার ভ্লাদিমির রোসভ। স্টকহোমে সোভিয়েত অ্যামব্যাসির প্রেস অ্যাটাশে নাকি যেন লোকটা।'

'কি করছিল সে?'

মিস আশরাফ বলছিলেন, 'কিছু একটা অনুবাদের কাজে সাহায্য করছেন নাকি উনি।'

'হুম।' কিছুক্ষণ গুম মেরে রইল রানা। 'ওরা দু'জনে কি একসঙ্গে বেরিয়ে

গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ। আমাদের গাড়িতেই।'

'কোথায় গিয়েছিল ওরা?'

'স্ক্যান্ডা হোটেলে। পুলিস জানে এসব। ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ওরা।'

হোটেলে ফেরার পথে রানাও জিজ্ঞেস করল ড্রাইভারকে। সুফিয়া এবং রাশিয়ান লোকটাকে স্ক্যান্ডা হোটেলে পৌঁছে দিয়ে চলে আসে ড্রাইভার। দু'জনকেই হোটেলের ভেতর ঢুকতে দেখেছে সে।

'গাড়িতে বসে কি আলাপ করছিল ওরা বলতে পারো?'

কাঁধ ঝাঁকাল ড্রাইভার। 'আমি ইংরেজি ভাল বুঝি না, মিস্টার...'

'একটা কথাও বুঝতে পারোনি ওদের?'

'রাশান লোকটাকে একবার সরি বলতে শুনেছি। এছাড়া আর কিছু বুঝতে পারিনি আমি।'

সরি হবার মত কি এমন ঘটেছিল, বুঝতে পারল না রানা। বেশি ভাবল না ও ব্যাপারটা নিয়ে। সুফিয়ার গায়ে বা শাড়িতে সিগারেটের ছাই ফেলার কারণেও সরি হতে পারে লোকটা।

ড্রাইভারকে ধন্যবাদ জানিয়ে নেমে এল ও গাড়ি থেকে। ভলভোটার চলে যাওয়া দেখল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। এক সেকেন্ড পরে ঢুকে পড়ল ও স্ক্যান্ডার লবিতে। লিফটের দিকে যাচ্ছে ও এমন সময় একজন পোর্টার 'মিস্টার রানা, মিস্টার রানা' করতে করতে ছুটে এল ওর দিকে।

'এক ভদ্রলোক দেখা করতে চান আপনার সঙ্গে, স্যার।'

'আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়? কে?'

'ওই যে ওখানে, স্যার।' লাউঞ্জের এক ধারে বসা একটা লোকের দিকে ইশারা করল পোর্টার। চুপচাপ বসে সিগারেট টানছে লোকটা। চোখাচোখি হতেই উঠে দাঁড়াল। লিফটে না উঠে লোকটার দিকে এগোল রানা।

'আপনি মিস্টার মাসুদ রানা?' জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'হ্যাঁ। আপনি?'

'ভ্লাদিমির রোসভ। আমি স্টকহোমে সোভিয়েত অ্যামব্যাসির প্রেস অ্যাটাশে।'

হাত বাড়িয়ে দিল লোকটা। রানা হাতটা ধরে একটু মলে দিল। ঠাণ্ডা ভেজা ভেজা হাত ভ্লাদিমিরের। লোকটাও অনেকটা তার হাতের মতই। রিমলেস চশমা চোখে। মাঝারি উচ্চতা। ঠিক বর্ণনা করা যায় না চেহারাটা। ঢিলেঢালা একটা স্যুট পরা, তবে চোখের দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ।

'আমি এখানে এসেছিলাম মিস সুফিয়ার কোন খবর পাওয়া গেল কিনা জানতে। এসে শুনি আপনি এখানে।'

বিশ্বাস করল না রানা কথাটা।

'কোন খবর পেলেন?' পাশে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করল ও।

'না, পুলিসের কাছেও খোঁজ নিয়েছি। ওরাও কোন খোঁজ পায়নি এখনও। খুব

দুশ্চিন্তা হচ্ছে আমার।'

'আমরাও চিন্তিত ব্যাপারটা নিয়ে,' বলল রানা।

'আমাদের অ্যামব্যাসাডর নিজেও খুব উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন।'

কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইল ও ভ্লাদিমিরের দিকে। তারপর বলল, 'মিস্টার রোসভ, বেশি কিছু জানি না আমি। পুলিস কিছুই জানাচ্ছে না। কিন্তু আমি জানতে পেরেছি, কি একটা ট্র্যান্সপারেন্সি নিয়ে নাকি ঘাপলা হয়েছিল মস্কোয়?' ফ্রান্সিসের কৌশল অবলম্বন করল ও। ভ্লাদিমিরের চোখে চোখ রেখে ট্র্যান্সপারেন্সি শব্দটার ওপর জোর দিল রানা।

কিন্তু একটুও বিব্রত হলো না লোকটা, চমকাল তো না-ই। 'ও হ্যাঁ। ব্যাপারটা দুর্ভাগ্যজনক। মিস আশরাফকে বিরক্ত করা হয়েছিল বলে আমরা ভীষণ ভাবে মর্মাহত। আপনিও তো একজন জার্নালিস্ট, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আপনি নিশ্চয়ই বুঝবেন ব্যাপারটা। মস্কোয় সুফিয়া আশরাফ নাম্বার ওয়ান ম্যাগাজিন পাবলিশিং হাউসে ছিলেন।'

'জানি। আমি নিজেও ছিলাম ওখানে।'

কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইল ভ্লাদিমির রানার দিকে।

'আপনিই তাহলে সেই...'

'হ্যাঁ, আমিই। যাকে বের করে দিয়েছিলেন আপনারা।'

মাথা ঝাঁকাল লোকটা। হাসল একটু। 'আমি শুনেছি ঘটনাটা। কিন্তু, সুইডেন তো একটা নিরপেক্ষ দেশ, কি বলেন?' আবার কিছুক্ষণ চুপ মেরে থেকে আগের প্রসঙ্গে ফিরে এল ভ্লাদিমির। 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন ওখানে একটা সেন্ট্রাল ফটোগ্রাফিক ল্যাবরেটরি আছে। ওরা অনেকগুলো পত্রিকার জন্যে ছবি সরবরাহ করে।'

'হ্যাঁ, মনে আছে আমার!'

'ওরাই মিস আশরাফের জন্যে ট্র্যান্সপারেন্সি কপি করে দিচ্ছিল। বিপুল সংখ্যক ট্র্যান্সপারেন্সি, জানেন তো? উনি বেছে দিয়েছেন আর ওরা কপি করে দিয়েছে। অরিজিন্যাল ট্র্যান্সপারেন্সিগুলো প্রিজার্ভ করা হয়, দেয়া হয় না কাউকে। বুঝতে পারছেন আমার কথা?'

'হ্যাঁ। বলুন।'

'স্বভাবত:ই ল্যাবরেটরির ডেসপ্যাচ সেকশনে অনেক ট্র্যান্সপারেন্সি ছিল। ওগুলোর ভেতরে "সোভিয়েত ইন্ডাস্ট্রি" পত্রিকার একটা বিশেষ সংখ্যার জন্যে নির্বাচিত ট্র্যান্সপারেন্সিগুলোও ছিল। মিস আশরাফ প্রচুর ট্র্যান্সপারেন্সি নিয়েছিলেন এবং যখন দেখা গেল সোভিয়েত ইন্ডাস্ট্রির কভারটা পাওয়া যাচ্ছে না তখন ধারণা করা হলো, হয়তো ভুলে ওনার ট্র্যান্সপারেন্সিগুলোর সঙ্গে চলে গেছে ওটা। সময় মত পত্রিকাটা প্রকাশের জন্যে অত্যন্ত জরুরী ছিল ট্র্যান্সপারেন্সিটা।'

'ঠিক কি ঘটেছিল তা জানতে চাই আমি, মিস্টার রোসভ,' বলল রানা।

'ঘটনাটা খুবই দুঃখজনক। এয়ারপোর্টে থামিয়ে মিস আশরাফের জিনিসপত্রগুলো চেক করা হয়েছিল শুধু।'

'কে থামিয়েছিল ওকে?'

'পুলিস। আমার মনে হয়, পাবলিশিং হাউস থেকে এয়ারপোর্ট পুলিসের কাছে মেসেজ পাঠানো হয়েছিল। স্বভাবতই ব্যাপারটা পুলিসের এক্তিয়ারের বাইরে ছিল...'

'স্বভাবতই,' বলল রানা। সেই মুহূর্তটার কথা কল্পনা করতে পারছে ও: মস্কো এয়ারপোর্টে এক বোঝা ট্র্যান্সপারেন্সি নিয়ে বসে আছে সুফিয়া, এমন সময় এগিয়ে এল রাশিয়ান পুলিসের লোমশ কর্কশ হাত। কেমন হয়েছিল ওর মনের অবস্থা?

'ওর ব্যক্তিগত জিনিসপত্রগুলো কি সার্চ করা হয়েছিল?'

'ছি ছি, সার্চ! কি বলছেন আপনি!' ভর্ৎসনা ভ্লাদিমিরের কণ্ঠে। 'মিস আশরাফ সোভিয়েত জনগণের সম্মানিত অতিথি ছিলেন, মিস্টার রানা। তাঁকে বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তাঁর জিনিসপত্রগুলো একটু দেখা যাবে কি না।'

'রাজি হয়েছিল ও?' নিশ্চয়ই রাজি হয়েছিল সুফিয়া, ভাবল রানা! তাছাড়া আর কি করতে পারত ও? রানওয়েতে প্লেন দাঁড়িয়ে আছে, একটু পরেই উঠবে ও প্লেনে এমন সময় সোভিয়েত পুলিস হন্তদন্ত হয়ে তার জিনিসপত্র চেক করার অনুমতি চাইছে এই পরিস্থিতিতে অন্য কিছু করার কথা ভাবা সম্ভব? রানা নিজে হলেও তো পারত না।

'নিশ্চয়ই। খুব সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব দেখিয়েছেন মিস আশরাফ। দুর্ভাগ্যক্রমে ওনার জিনিসপত্রের ভেতর পাওয়া যায়নি ট্র্যান্সপারেন্সিটা।' আবার একটু হাসল ভ্লাদিমির। 'একটা নতুন কাভার তৈরি করতে হবে ওদের। তাছাড়া কোন উপায় নেই।'

'বুঝতে পারছি। আমিও দুঃখিত, মিস্টার রোসভ।'

'না না, মিস্টার রানা, দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই। মিস আশরাফ বলছিলেন এরকম ঘটনা তো ঘটতেই পারে। আর উনি কিছু মনেও করেননি।'

'চমৎকার মেয়ে সুফিয়া,' বলল রানা।

'খুব চমৎকার।' স্বীকার করল ভ্লাদিমির। 'খুবই ভাল লেগেছে আমার মহিলাকে।'

'সবারই লাগে। এখন আমাকে বলুন তো, মিস্টার রোসভ, স্টকহোম থেকে এতদূরে, গোদেনবার্গে আপনি কি করছেন?' আচমকা জিজ্ঞেস করল ও।

এবারও ঘাবড়াল না ভ্লাদিমির। নিজের হাত দুটোর দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বলল, 'রুশ ভাষা জানেন না মিস আশরাফ। আমি ইংরেজি জানি। ওঁকে সবরকম সাহায্য করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমাকে, অতিরিক্ত তথ্য দিয়ে বা অনুবাদে সহায়তা করে...'

আপাতঃদৃষ্টিতে ভ্লাদিমিরের কথায় সন্দেহ করার মত কিছুই নেই অবশ্য। সত্যিই হয়তো সুফিয়াকে সাহায্য করতেই এখানে পাঠানো হয়েছে ওকে, সেই সঙ্গে মস্কোর অফিশিয়াল লাইনের বাইরে কিছু ছাপা হয় কিনা সেদিকেও নজর রাখত সে। কিন্তু লোকটাকে ঠিক ততটা নিষ্পাপ ভাবতে ইচ্ছে করছে না রানার।

'আপনার কোন ধারণা নেই, কোথায় যেতে পারে ও?'

'না।' মাথা নাড়ল ভ্লাদিমির। মাথা নাড়ার ভঙ্গিটা নির্ভেজালই মনে হলো

রানার কাছে।

'কিংবা, কেন উধাও হয়ে গেছে ও?'

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল লোকটা। অস্বস্তিকর একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে। 'আমি জানি, মিস্টার রানা,' বলল ভ্লাদিমির। 'আপনি ভাবছেন আমরা কিডন্যাপ করেছি মিস আশরাফকে।'

'আমি একজন রিপোর্টার,' বলল রানা। 'আগেও কয়েকবার এরকম ঘটনা কাভার করতে হয়েছে আমাকে।'

'আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি, সেরকম কিছু ঘটেনি।' চশমার আড়ালে চোখ দুটো একটু ঝিলিক দিয়ে উঠল ভ্লাদিমিরের। পর মুহূর্তেই ফুটে উঠল অনুনয়ের দৃষ্টি, 'আমরা চাই মিস আশরাফ তাঁর কাজ শেষ করুন। আমাদের শুভেচ্ছা রয়েছে ওঁর জন্যে। তাছাড়া পত্রিকাটা ছাপা হওয়ার সঙ্গে আমাদের স্বার্থও জড়িত আছে, মিস্টার রানা। দয়া করে অন্য কিছু ভাববেন না।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ঠিক আছে। আপনার কথা বিশ্বাস করবার চেষ্টা করব আমি। আর একটা কথা, আপনি ক'টার সময় বিদায় নিয়েছিলেন ওর কাছ থেকে?'

'আমি ড্রিংক অফার করেছিলাম মিস আশরাফকে। ড্রিংকটা শেষ করেই বিদায় নিই আমি। তখন বোধহয় সাড়ে পাঁচটা।'

'ঠিক আছে। আমরা যোগাযোগ রাখব পরস্পরের সঙ্গে, কি বলেন?'

'খুব খুশি হব তাহলে। আমি হোটেল নর্ড-এ আছি। আর, মিস্টার রানা...'

'কি?'

'আপনি কোন খবর পেলে অবশ্যই জানাবেন আমাকে। সত্যিই যে-কোন রকম সাহায্য করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব আমরা।'

'আচ্ছা।'

'আসি তাহলে।'

শেকহ্যান্ড করে বিদায় নিল ভ্লাদিমির। এখনও বসে আছে রানা। লোকটার কথা বিশ্বাস করবে কি করবে না বুঝতে পারছে না।

আমাদের কাছে ফোন করার দরকার নেই আমরাই ফোন করব, এই রুটিন মত চলছে ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিস। কাল রাতের পর এখনও কোন যোগাযোগ করেনি ইন্সপেক্টর। তার মানে আর কোন অগ্রগতি হয়নি তদন্তের। কিন্তু সুইডেনের হাইলি এফিশিয়েন্ট পুলিস এক বিন্দুও অগ্রসর হয়নি ভাবতে কেমন খটকা লাগছে রানার। কমপক্ষে ষাট ঘণ্টা পার হয়ে গেছে সুফিয়া নিরুদ্দেশ হওয়ার পর।

লবির কয়েন বক্স থেকে ফোন করল ও পুলিস স্টেশনে। ওর ধারণা, ওর ফোনে আড়িপাতার যন্ত্র বসিয়েছে রাশিয়ানরাই। অবশ্য ভ্লাদিমির যদি মিথ্যে কথা না বলে থাকে তো অন্য কেউ হতে পারে। যাই হোক, কার কীর্তি ওটা সে ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে ওই টেলিফোনে কথা বলার ঝুঁকি নিতে রাজি নয় রানা।

ফোনে পাওয়া গেল না ফ্রান্সিসকে। বাইরে রয়েছে সে, অন্তত পক্ষে ওরা বলল তাই। সার্জেন্ট টমাসও।

'দুঃখিত, এখনও কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি মিস আশরাফের। খবর পাওয়া মাত্রই জানানো হবে আপনাকে।' রানার প্রশ্নের জবাবে জানাল ডিউটি ইন্সপেক্টর।

ফ্রান্সিসের কাছে ওর নাম এবং ফোন নাম্বার থাকা সত্ত্বেও আবার দিতে হলো সেগুলো ডিউটি ইন্সপেক্টরকে। ফ্রান্সিস যে আগেই ওর নাম এবং ফোন নাম্বার নিয়ে এসেছে এবং বলেছে আমাদের কাছে ফোন করার দরকার নেই আমরাই করব, তা জানাতে ভুলল না ডিউটি অফিসারকে।

লিফটে চড়ে টপ ফ্লোরে পৌঁছল রানা। সিক্স-টু-এইট লেখা দরজাটা খুঁজে বের করল। এই রুমেই ছিল সুফিয়া। আশেপাশে তাকিয়ে দেখল ও, কেউ নেই করিডরে। হ্যান্ডেলটা ধরে ঠেলাঠেলি করল কিছুক্ষণ, যদি কোন ভাবে না লেগে থাকে তালা। কিন্তু না, ভাল ভাবেই আটকেছে। ঠেলাঠেলিতে খুলল না দরজাটা। পাশের রুমের দরজার সামনে গেল ও। ছয়শো উনত্রিশ। খোলাই সেটা। উঁকি দিল ভেতরে। ডবল বেড খাটটা মাত্র গোছানো শেষ হয়েছে। রুমটা বোধহয় পরিষ্কার করা হয়েছে একটু আগে। দুই রুমের মাঝে কোন দরজা দেখতে পেল না ও। কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করল ও করিডর দিয়ে। একজন চেম্বার মেইড বিছানা গোছানোর কাজ করছে। অনেকগুলো দরজাই খোলা। বোধহয় করিডরের এক মাথা থেকে ঘর গোছাতে শুরু করেছে মেয়েটা। এখনও ছয়শো ত্রিশ পর্যন্ত এসে পৌঁছায়নি। দেখলেই বোঝা যায়, রুমটায় কেউ ছিল না গতরাতে। সুফিয়া উধাও হয়ে যাওয়ার রাতে কে ছিল এই রুমে? হঠাৎ করেই প্রশ্নটা জাগল ওর মনে। নিশ্চয়ই স্বেচ্ছায় কোথাও যায়নি ও। তাহলে কিভাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওকে?

করিডর ধরে ফিরে এল রানা। ফায়ার এস্কেপ ডোরটা দেখতে পেল ও। ঠেলা দিতেই খুলে গেল। সিঁড়ি উঠে গেছে ছাদ পর্যন্ত। ছাদে উঠল না ও, লিফট বেয়ে নিচে নেমে এল। রিসেপশন কাউন্টারে গিয়ে জানতে চাইল, সেরাতে ছয়শো আটাশ নম্বর রুমের দু'পাশে অর্থাৎ ছয়শো সাতাশ এবং উনত্রিশে কারা ছিল। রিসেপশন ক্লার্ক সন্দেহের দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ওর দিকে। তারপর দিল তথ্যগুলো। 'ছয়শো উনত্রিশে দু'জন ভদ্রলোক ছিলেন সে রাতে—।'

'কারা?'

'ফ্রেঞ্চ, স্যার। মসিয়ে রাউল বার্গসন এবং মসিয়ে ফিলিপ ব্রেইলি।' নামগুলো ফরাসী ঢঙে উচ্চারণ করল লোকটা।

খাতায় নামগুলো দেখতে পাচ্ছে রানা। কেমন একটা খটকা লাগল ওর। জিজ্ঞেস করল, 'ইহুদী?'

'সম্ভবত। আমি ঠিক জানি না, স্যার।'

'আর ছয়শো সাতাশ?' অন্য দিকের রুমটার কথা জিজ্ঞেস করল রানা।

'এক সেকেন্ড।' লিস্টের দিকে তাকাল লোকটা। 'এক আমেরিকান দম্পতি, স্যার। মিস্টার এবং মিসেস হেনরি জেমসন। ফিলাডেলফিয়া থেকে এসেছিলেন।'

'বিদায় নিয়েছে কখন ওরা?'

'বোধহয় পরদিন, স্যার···। হ্যাঁ, পরদিন।'

'দু'রুমের সবাই?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

কাউন্টার থেকে চলে এল রানা। দু'দিকেই দু'জন করে এবং দু'জোড়াই পরদিন তল্পিতল্পা গুটিয়েছে। নিছক কো-ইন্সিডেন্স না অন্য কিছু? হোটেলের রুম

বরাদ্দ করা হয় কি নিয়মে? ব্যাপারটা কাদের হাতে থাকে?

সম্ভবত রিসেপশন ক্লার্কই ইচ্ছেমত রুম বরাদ্দ করে, যদি না কোন ভি. আই. পি.-র ব্যাপার হয়। ভি. আই. পি.-দের ক্ষেত্রে বোধহয় ম্যানেজার নিজে দায়িত্ব নেয়।

লাউঞ্জে খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে আবার লিফটের দিকে গেল রানা। লিফটের সামনে গিয়ে বাধা পেল ও। কাঠের কি যেন একটা মেরামত করছে এক মিস্ত্রি। আরেকটু হলেই লোকটার উপরে গিয়ে পড়ছিল ও। নজর ছিল লিফটের মাথায় লেখা নম্বরগুলোর দিকে, খেয়াল করেনি লোকটাকে।

লিফটে ঢুকে ভেতরে পুশ বাটনগুলো চেক করল ও। বোতামগুলোর গায়ে এক থেকে ছয় পর্যন্ত নাম্বার দেয়া। আরেকটা বোতাম রয়েছে নিচে যাওয়ার। হোটেলের নিচে আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজ এবং পার্কিং এরিয়া। নিচে যাওয়ার বোতামটা টিপে দিল রানা।

নিচে নেমে গ্যারেজটা দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারল ও, কিভাবে সুফিয়াকে সরানো হয়েছে এখান থেকে। ছয়শো আটাশ নম্বর রুমের দরজা লিফট থেকে দশ গজও দূরে নয়। গ্যারেজটা ফাঁকা এবং জনশূন্য, রাস্তার দিকের পথটা খোলা।

ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিস বলছিল, কিভাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সুফিয়াকে সে সম্পর্কে এখনও কোন ধারণা করতে পারেনি সে। যদি সত্যি কথা বলে থাকে তো লোকটাকে গাধা ছাড়া আর কিছু বলার উপায় নেই। কিন্তু লোকটাকে বোকা মনে হয়নি রানার। তাহলে বলল না কেন লোকটা? অন্তত একটা সম্ভাবনা হিসেবেও তো সে উল্লেখ করতে পারত পয়েন্টটা।

ফ্রান্সিসের সঙ্গে দেখা করার জন্যে পুলিস স্টেশনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ও। বার্গসন, ব্রেইলি, এবং মিস্টার ও মিসেস জেমসন সম্পর্কে পুলিস কোন তথ্য সংগ্রহ করেছে কিনা জানতে চায় ও।

ফোন করল না রানা; একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা পুলিস স্টেশনে উপস্থিত হলো। ফ্রান্সিস বাইরে এখনও। সুফিয়া ওর আত্মীয় কিনা, ওর এত উৎসাহ কেন এ ব্যাপারে সন্দেহপূর্ণ মনোভাব নিয়ে কয়েকটা প্রশ্ন করল ডিউটি ইন্সপেক্টর। ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিসের কাছে যা যা বলেছিল সে সব কথার পুনরাবৃত্তি করল ও। তারপর কাঠের শক্ত বেঞ্চ দেখিয়ে ওকে অপেক্ষা করতে বলল ডিউটি ইন্সপেক্টর। বোঝা যাচ্ছে লোকটা পছন্দ করেনি ওকে।

পাক্কা এক ঘণ্টা বসে রইল রানা কাঠের বেঞ্চিতে। বিরক্ত হয়ে উঠছে ও। তিন চার ঘণ্টা ধরে বাইরে কি করছে ব্যাটা? শেষ পর্যন্ত উঠে গেল ও ডিউটি ইন্সপেক্টরের কাছে।

'কি ভাই, ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিসও কি উধাও হয়ে গেল নাকি?'

'কেন, বহুক্ষণ আগেই তো ফিরেছে ও। আপনার সামনে দিয়েই তো গেল, খেয়াল করেননি?'

থতমত খেয়ে গেল রানা। ঘুমায়নি ও এতক্ষণ। ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিস ওর সামনে দিয়ে গেলে নিশ্চয়ই খেয়াল করত ও। স্পষ্ট মনে আছে লোকটার চেহারা।

'অন্যমনস্ক ছিলাম, ঠিক খেয়াল করতে পারিনি,' তাড়াতাড়ি বলল রানা।

'কোথায় বসেন উনি?'

'দোতলায়। ওই যে, ওদিক দিয়ে সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠেই হাতের ডান দিকে ফ্রান্সিসের ঘর।'

কেমন যেন বোকা বোকা লাগছে ওর নিজেকে। ফ্রান্সিস এসে ওর সামনে দিয়ে নিজের রুম পর্যন্ত চলে গেল, আর ও খেয়ালই করতে পারল না! বোধবুদ্ধি লোপ পাচ্ছে নাকি? নিজের উপরেই বিরক্ত হয়ে উঠল রানা।

দোতলায় উঠে ডানদিকে তাকাতেই দেখতে পেল ও রুমটা। দরজার ওপর ইন্সপেক্টরের নেমপ্লেট লাগানো। নক করল রানা। অপরিচিত এক লোক খুলল দরজা। আগে কখনও দেখেনি ও লোকটাকে।

'মিস্টার মাসুদ রানা?' নম্রভাবে জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'হ্যাঁ।'

'ভেতরে আসুন। ইনি ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিস।' ডেস্কের পেছনে বসা এক লোকের দিকে ইশারা করল সে।

'আপনি সার্জেন্ট টমাস?' দরজা খুলে দিয়েছে যে-লোকটা তাকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ।'

আগে কখনও দেখেনি ও দু'জনের একজনকেও!

সাত

কয়েক মুহূর্ত বিস্ময়ে বোবা বনে গেল রানা। সুইডিশ পুলিস ফোর্সে দু'জন কেন তারও বেশি ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিস থাকতে পারে। কিন্তু একই পুলিস স্টেশনে দু'জন ফ্রান্সিস এবং দু'জনই ইন্সপেক্টর, তারপর আবার তাদের চেলা হিসেবে দু'জন সার্জেন্ট টমাস? অসম্ভব। এই লোকটাই আসল ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিস এবং একমাত্র ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিস। আগের দিন সন্ধ্যায় স্ক্যান্ডা হোটেলে ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল যে, সে যে নকল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'আপনি সত্যিই ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিস?' জিজ্ঞেস করল রানা। কৌতুক ঝিলিক মারছে ওর চোখে।

'কেন? আপনার সন্দেহ আছে নাকি?'

'ঠিক তা নয়। একটা কথা ভাবছি আমি, আপনি যদি ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিস হন তো সেই লোকটা কে, আর সেই লোকটা যদি ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিস হয় তো আপনি কে?'

'মানে?'

'কাল সন্ধ্যায় হোটেল স্ক্যান্ডায় আমার রুমে জনৈক ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিসের সঙ্গে কথা বলছিলাম আমি। তার সঙ্গে জনৈক সার্জেন্ট টমাসও ছিল।' পুরো ঘটনাটা

খুলে বলল রানা।

পুলিস অফিসারের নাম এবং পরিচয় ভাঁড়ানোটা গুরুতর অপরাধ। সুতরাং দু'জন পুলিস অফিসারের নাম ভাঁড়ানোটা নিশ্চয়ই ডবল গুরুতর। নকল ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিস এবং সার্জেন্ট টমাস-এর চেহারার বর্ণনা সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেয়া হলো পুরো গোদেনবার্গ ফোর্সকে।

আসল ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিস গম্ভীর মুখে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। 'আমি আপনাকে ফোন করব ভাবছিলাম, মিস্টার রানা। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আরও আগেই আপনাকে ফোন করা উচিত ছিল।'

'আমারও কেমন জানি মনে হচ্ছিল ফ্রান্সিস বলে যে লোকটা গিয়েছিল আমার কাছে, সে ফোন করবে না আমাকে। আমার ধারণা সত্য হয়েছে।'

পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করল ওরা। ফ্রান্সিসকে খুব একটা প্রসন্ন মনে হলো না। সম্ভবত এর আগে আর কোন কেস নিয়ে এত ভুগতে হয়নি লোকটাকে? রানা যখন সুফিয়ার দু'পাশের রুমের প্রসঙ্গ তুলল এবং লিফটে করে সোজা আন্ডার গ্রাউন্ড গ্যারেজে যাওয়া যায় জানাল তখন খুব একটা বিস্মিত হলো না ফ্রান্সিস। সম্ভাবনাগুলোর কথা আগেই ভেবেছে সে এবং জোর তদন্ত চালানো হচ্ছে বলে জানাল। এপর্যন্ত যতটুকু জানা গেছে, মসিয়ে বার্গসন এবং মসিয়ে ব্রেইলি দু'জনেই সেলস্‌ম্যান। দু'জনের সঙ্গেই পরদিন সকালে কথা বলেছে সে—কিছুই জানে না তারা। সেদিনই তাদের দেশে ফিরে যাওয়ার কথা। তাদেরকে সুইডেনে আটকে রাখার মত কোন কারণ খুঁজে পায়নি ইন্সপেক্টর। চলে গেছে ওরা। মিস্টার ও মিসেস জেমসন ট্যুরিস্ট, আর ওরা এক রাত মাত্র ছিল হোটেলে—যে রাতে সুফিয়া নিখোঁজ হলো সে রাতটা। পরদিন সকালেই ওরা লেক ভ্যাটার্ন রিসর্টে চলে গেছে।

ইন্সপেক্টরের কথাগুলো শুনল রানা, তারপর নিজের পয়েন্টগুলো বলল একে একে। উড়িয়ে দিল না ফ্রান্সিস রানার সন্দেহগুলোকে।

'হ্যাঁ, আমিও জানি সন্দেহ করা যায় ফ্রেঞ্চ দু'জনকে,' বলল ইন্সপেক্টর। 'কিন্তু কিসের ভিত্তিতে আটকে রাখব ওদের? সুইডেনের আইন অনুযায়ী নিছক সন্দেহের বশে আটকে রাখা যায় না একজন বিদেশীকে।'

ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিস লোকটা বেশ অমায়িক এবং পেশাগত দিক থেকে ধৈর্যশীল। রানাকে দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে তা মোটেই নয়, কিন্তু কোন বিরক্তি প্রকাশ করল না সে। রানা জানে অথচ সে জানে না এমন কিছু বিষয়ে আলাপ করতে চায় রানা শোনার পরেও না।

পুরো ব্যাপারটা নিয়ে খোলাখুলি আলাপ করল ওরা। কয়েকটা পয়েন্ট একাধিকবার এল ওদের আলোচনায়। কিন্তু নতুন কোন সূত্রই বেরোল না। সবশেষে বলল ইন্সপেক্টর, 'আপনার কি মনে হয়, কিছু একটা ছিল মিস আশরাফের কাছে?'

'আপনি ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন তার ওপর নির্ভর করছে উত্তরটা। তবে আমার মনে হয় না ও কিছু আনছিল। অন্ততঃপক্ষে জ্ঞাতসারে বা স্বেচ্ছায় না।'

'ইচ্ছা-অনিচ্ছাটা বড় কথা নয়। স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, কিছু একটা বহন করেছিলেন উনি।'

'হলেও ও কিছুই জানত না সে ব্যাপারে,' বলল রানা।

'অত নিশ্চিত করে কিছু বলা যায়, মিস্টার রানা? হয়তো উনি...'

'দেখুন ইন্সপেক্টর, সুফিয়া একটা ম্যাগাজিনের জন্য কিছু মেটেরিয়াল আনতে মস্কো গিয়েছিল, গুপ্তচরগিরি করতে নয়।'

চিন্তিত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ফ্রান্সিস ওর দিকে। 'আপনি কেবল আপনার তরফটাই দেখছেন, কিন্তু আমি সম্ভাব্য সবগুলো দিক থেকে দেখার চেষ্টা করছি। বুঝতে পারছেন?'

'হ্যাঁ, বলুন।'

'অর্ধেকটা আপনি ঠিকই ভাবছেন, বাকি অর্ধেকটা সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করছেন আপনি, মিস্টার রানা। দু'সপ্তাহ কাটিয়ে এসেছেন উনি রাশিয়ায়। আমি যতটুকু শুনেছি কোন ঝামেলা হয়নি সেসময়।'

হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল রানা। মস্কো এয়ারপোর্টে সার্চের কথা ভাবছে ও। ফ্রান্সিস বোধহয় জানে না ব্যাপারটা।

'এখানে, গোদেনবার্গে এসেও কোনরকম অস্বাভাবিক আচরণ করেননি উনি, ঠিক?' বলল ইন্সপেক্টর।

'হ্যাঁ।'

'এক মিনিট, এখানে আসার পর কি কি করেছিলেন উনি বলতে পারেন?'

'যতটুকু জানতে পেরেছি আমি, স্ট্রম ব্রাদার্সে গিয়েছিল ও, ভ্লাদিমির ছিল সঙ্গে। জানেন তো, স্ট্রম ব্রাদার্স আমাদের কিছু ছাপার কাজ করছে।' কথা বলতে বলতে লক্ষ করছে রানা ফ্রান্সিসকে। ভ্লাদিমিরের নাম শুনে আশ্চর্য হলো সে। 'ওখানে কিছুক্ষণ কাজ করে ভ্লাদিমিরের সঙ্গেই স্ক্যান্ডায় ফেরে ও,' বলে গেল রানা। 'ভ্লাদিমির বোধহয় ড্রিংক অফার করেছিল ওকে। ড্রিংকটা শেষ করে বিদায় নেয় ভ্লাদিমির।'

'এ থেকে কি সিদ্ধান্তে আসছেন আপনি?'

'সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আচরণ করছিল ও।'

'ভাল কথা। কিন্তু তারপর? তার পরের আচরণগুলোকে কি স্বাভাবিক বলবেন? লন্ডনে ফোন করা, এমন কি আমেরিকায় পর্যন্ত ফোন করেছিলেন উনি, কোন এক মাসুদ রানার কাছে পার্সন টু পার্সন কল।'

'আমি পাইনি ফোন কলটা,' বলল রানা। এ প্রসঙ্গে বেশি কথায় গেল না ও।

সমঝদারের মত মাথা নাড়ল ফ্রান্সিস। 'উনি কি প্রায়ই এরকম ফোন করে থাকেন আপনাকে?'

'না।'

'আপনি তার প্রেমিক? ফিয়াঁসে?'

'কোনটাই না। বন্ধু বলতে পারেন।'

'ঠিক আছে। বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে না পেরে মনের দুঃখে উনি হোটেল ছেড়ে চলে গেলেন। একা।'

'কোথায় গেল ও?' প্রশ্ন করল রানা।

'জানি না আমি,' বলল ফ্রান্সিস। 'তবে এটুকু জানতে পেরেছি, ফোনগুলো

করার পরপরই অনেকক্ষণ বাইরে ছিলেন উনি। প্রায় তিন ঘণ্টা।'

'ডিনারে গিয়েছিল কিনা খোঁজ নিয়েছেন?'

'হতে পারে। তবে গোদেনবার্গের কোন রেস্টুরেন্টে অবশ্যই নয়।'

'সবগুলোতে খোঁজ নিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, সবগুলোতে খোঁজ নিয়েছি; ছোট-বড় সব। লাভ হবে না জানতাম, তবু। জানি না উনি গোদেনবার্গের বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন কি না, তবে গেলেও ট্যাক্সিতে যাননি এ ব্যাপারে নিশ্চিত আমি। ওটাও চেক করেছি আমরা। বাইরে থেকে ফিরে সোজা রুমে যান উনি। আধঘণ্টা পর পুলিসকে ফোন করে জানান যে ভয়ানক বিপদ তাঁর সামনে, প্রাণ নিয়ে টানাটানি। এর মানে কি?'

'আপনি মনে করেন কিছু একটা আবিষ্কার করে ও?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ঠিক তাই।'

'কখন? কিছু একটা যদি ও আবিষ্কার করেই থাকে তো কখন সেটা? বাইরে যাওয়ার আগে, না পরে?'

'সেটাই তো সমস্যা,' বলল ফ্রান্সিস। 'যুক্তি দিয়ে বিচার করতে গেলে বলতে হয় রুমে ফেরার পরেই উনি জানতে পেরেছিলেন ব্যাপারটা। কিন্তু একটু খটকা লাগছে না আপনার? তিন ঘণ্টা কোথায় না কোথায় কাটিয়ে রুমে ফিরলেন উনি, জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে খেয়াল করলেন অপরিচিত কিছু একটা রয়েছে তাঁর জিনিসপত্রের ভেতর এবং পুলিসকে ফোন করে জানালেন "আমার জীবন সংশয়"।'

'সত্যিই যদি জীবনের ওপর হামলার আশঙ্কা করে থাকে ও তাহলে পুলিসকে ফোন করার ব্যাপারে কোন অসঙ্গতি খুঁজে পাচ্ছি না আমি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, হঠাৎ করে এরকম একটা আশঙ্কা হলো কেন ওর? কি ঘটেছিল?'

'সম্ভবত আগুনটাই ওঁকে এরকম ভাবতে উৎসাহী করেছিল,' বলল ইন্সপেক্টর।

'আগুন! কিসের আগুন?' বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

'স্ক্যান্ডা হোটেলের লেটারবক্সে। সামান্য কিছুটা ফসফরাস রাখা হয়েছিল লেটারবক্সে, মিস্টার রানা। সবগুলো চিঠি পুড়ে গিয়েছিল। আপনি জানতেন না?'

'না,' বলল রানা। 'জানতাম না আমি। ও কি কোন চিঠি পোস্ট করেছিল?'

'সে সম্পর্কে কিছু জানতে পারিনি আমরা। জ্বলন্ত ফসফরাসের তাপ কেমন হয় জানেন তো? খানিকটা ছাই ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল রানা, ভাবছে কিছু। 'চিঠি লেখার কথা না তো ওর! কোন দরকার পড়লে ফোন করত,' বলল ও।

'না? কোন আত্মীয়ের কাছে বার্থডে কার্ড অথবা পিকচার পোস্টকার্ড?'

'অথবা যে জিনিসটা ও খুঁজে পেয়েছিল সেটা।' রানা বিদ্রূপ করল কিনা বুঝতে পারল না ইন্সপেক্টর। বলে যেতে লাগল রানা, 'এমনও হতে পারে জিনিসটা পাওয়ার পর—যদি সত্যি সত্যিই কিছু পেয়ে থাকে ও, এনভেলপে ভরে পোস্ট করেছিল। পোস্টাল সার্ভিস সব সময় নিরাপদ।'

মাথা ঝাঁকাল ফ্রান্সিস। 'বিশেষ করে সুইডেনে খুবই নিরাপদ। ইউরোপের অনেক দেশের চেয়েই ভাল আমাদের পোস্টাল সার্ভিস। কিন্তু কথা হচ্ছে,

চিঠিগুলো পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের হাতে পৌঁছুনোর পর তো নিরাপত্তার প্রশ্ন। লেটারবক্সগুলো সবসময় নিরাপদ নয়।'

'বুঝলাম।'

'জিনিসটা পাওয়ার পর পোস্ট করলেন উনি এবং লেটার বক্সে থাকতেই পুড়িয়ে দেয়া হলো সেটা...' কথা অসমাপ্ত রেখেই থেমে গেল ফ্রান্সিস। শূন্যস্থান পূরণ করতে বলছে যেন রানাকে।

'আপনি বলতে চান এই কারণেই কিডন্যাপ করা হয়েছে ওকে?'

'যদি ওঁকে আদৌ কিডন্যাপ করা হয়ে থাকে।'

'মানে? কিডন্যাপ না করলে কোথায় গেল সে?'

'স্বেচ্ছায়ও তো কোথাও গিয়ে থাকতে পারেন।'

'উঁহুঁ, আমার তা মনে হয় না। সেক্ষেত্রে কোন না কোন ভাবে কিছু একটা খবর পাঠাতই।'

'হ্যাঁ, স্বীকার করছি। কিন্তু সম্ভাবনাটা তো আপনি একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেন না।'

'তা অবশ্য ঠিক,' পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা ইন্সপেক্টরের সমস্যাটা। 'আচ্ছা, ও হোটেলের অন্য কোন রুমে গিয়েছিল কিনা, জানতে পেরেছেন কিছু এ ব্যাপারে? যেমন ধরুন, দু'পাশের রুম দুটোর কোনটাতে?'

মাথা নাড়ল ইন্সপেক্টর। 'না। মিস সুফিয়া আশরাফের রুমে পাওয়া কিছু কাগজ থেকে কিছু ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করেছি, ওগুলো ওঁরই বলে ধারণা করছি আমরা। কিন্তু দু'পাশের রুমে ওই রকম কোন ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যায়নি। ছয়শো আটাশে অবশ্য অনেকগুলোই পাওয়া গেছে একই ফিঙ্গারপ্রিন্ট।'

'একদিকে আমেরিকান অন্যদিকে ইহুদী!'

'ফ্রেঞ্চ,' শুধরে দিল ইন্সপেক্টর। 'সম্ভবত ইহুদী। ওদেরকে ইজরায়েলী বলে ভাবছেন?'

অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'জানি না। সুফিয়ার নিরুদ্দেশ হওয়ার একটা সঙ্গত কারণ খুঁজে বের করতে চাইছি আমি। আরব টেরোরিস্টদের নিয়ে একবার ঝামেলা হয়েছিল না সুইডেনে?'

'জার্মান, ব্রিটিশ, আমেরিকান সবাইকে নিয়েই ঝামেলা পোহাতে হয়েছে আমাদের। রাশিয়ান, গ্রীক, নরওয়েজিয়ান এবং ডেনিসদের নিয়েও। এমন কি আপনাদের বাঙালীদের নিয়েও। ক'দিন আগেই আপনাদের এক বাঙালী ছোকরা বউকে খুন করল না!'

'এ ব্যাপারটা সে রকম না, তা নিশ্চয়ই বুঝিয়ে বলতে হবে না আপনাকে?'

'না, এ ব্যাপারটা সে রকম নয় ঠিক। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে? এতগুলো সম্ভাব্য যুক্তি রয়েছে যে...'

'বুঝলাম,' তিক্ত কণ্ঠে বলল রানা। আঁতেলেকচুয়ালরা ভাবুক সে-সব সম্ভাবনা নিয়ে। কিন্তু সুফিয়া কোথায়? কে ধরে নিয়ে গেছে ওকে? কেন?

'দেখুন মিস্টার রানা, আমাদের জনসংখ্যা অনেক কম, দেশটা বড়। প্রচুর লুকানোর জায়গা রয়েছে এখানে। সুইডিশ পুলিস বাহিনীর পুরোটাকেও যদি খুঁজতে

লাগানো হয় তাও কমপক্ষে এক মাস লাগবে।'

সন্তুষ্ট হতে পারল না রানা ইন্সপেক্টরের জবাবে। 'ঠিক আছে, আসুন, আবার গোড়া থেকে শুরু করা যাক। রাশিয়া থেকে কিছু একটা পাচার করে আনার কাজে কে ব্যবহার করে থাকতে পারে ওকে?'

'অনেকগুলোই জবাব আছে আপনার প্রশ্নের, মিস্টার রানা,' আঙুলে গুনতে গুনতে বলল ইন্সপেক্টর। 'প্রথমে ধরুন, আমেরিকান বা ব্রিটিশ; সুইডিশ, যেহেতু উনি সুইডেনেই এসেছেন; ফ্রেঞ্চ, দু'জন ফ্রেঞ্চম্যানও রয়েছে মঞ্চে, তাই না? রাশিয়ানও হতে পারে।'

'কেন, রাশিয়ানরা কেন?'

'কে জানে?' জবাব দিল ফ্রান্সিস। 'রাশিয়ানরা কখন কি করে আমাকে তো জিজ্ঞেস করে না!'

বিরক্ত হয়ে উঠেছে ইন্সপেক্টর বুঝতে পারল রানা। বলল, 'ঠিক আছে, প্রশ্নটা করার জন্যে আমি দুঃখিত।'

'দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই, মিস্টার রানা। আমরা হাত গুটিয়ে বসে নেই। আমাদের ওপর আস্থা রাখুন, সেটাই চাই আমি।'

'আপনাদের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা আছে আমার, মিস্টার ফ্রান্সিস। আমি কি সুফিয়ার রুমটা একবার দেখতে পারি?'

'না।'

'নকল ইন্সপেক্টরও একথাই বলেছিল। কেন?'

'কারণ ওই রুমটাই আমাদের একমাত্র সম্বল, যা কিছু সূত্র পাওয়ার সম্ভাবনা তা ওখান থেকেই। আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি ওটা। আপাতদৃষ্টিতে কিছু নেই মনে হলেও...'

'অনেক কিছুই থাকতে পারে ওখানে,' ইন্সপেক্টরকে সুযোগ না দিয়ে রানাই সম্পূর্ণ করল বাক্যটা। 'এমন কিছু, যা আপনাদের নজরে আসেনি, কিন্তু আমার নজরে আসবে।'

'স্বীকার করছি আপনার কথা, মিস্টার রানা, কিন্তু তবুও না। বুঝতে চেষ্টা করুন দয়া করে। কাজ এগোচ্ছে আমাদের। একটা সূত্র থেকে আরেকটা সন্ধান পাব আমরা। ওই রুমের কোন জিনিস সম্ভবত একধাপ এগিয়ে দেবে আমাদের।'

'কিন্তু একটা সূত্রও কি এপর্যন্ত পেয়েছেন আপনারা?' হতাশার সুর রানার গলায়।

'পাইনি, পেয়ে যাব।' রানাকে আর কথা বাড়াতে দিল না ইন্সপেক্টর। বলল, 'দেখুন, মিস্টার রানা, নীতির প্রশ্ন এটা। আপনার দেশের পুলিস কি গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রমাণ পরীক্ষা করার জন্যে জার্নালিস্টদের অনুমতি দেবে? আমার মনে হয় না। আমরাও দেব না।'

পুলিস স্টেশন থেকে বেরিয়ে হোটেলে ফিরে এল রানা। তাড়া নেই কোন। পরবর্তী কর্তব্য ভাবতে ভাবতে হেঁটেই ফিরল ও। যতই ভাল ভাল কথা বলুক না কেন ফ্রান্সিস, খুব একটা এগোতে পারেনি পুলিস তা বুঝতে কোন অসুবিধা হয়নি ওর।

ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিসের পয়েন্টগুলো মনে মনে আরেকবার ভাল করে খতিয়ে দেখল। পুলিস যতটুকু জানতে পেরেছে, তদন্তের কাজে একজন সাধারণ লোককে লাগালেও এটুকু জানা যেত।

সুফিয়ার রূমে ঢুকতে হবে, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা। যতই ভাবছে ততই মনে হচ্ছে, ওই রূমে কিছু না কিছু সূত্র পাওয়া যাবেই। সত্যি সত্যি ভয় পেয়েছিল বলেই পুলিসকে ফোন করেছিল সুফিয়া। যাহোক, অন্ততপক্ষে ফোন করার সময়টুকু পেয়েছিল ও। কিন্তু নিজের রূম থেকেই কেন করল ও কলটা? লবিতে লোকজনের ভিড়ের মধ্যে যায়নি কেন? অনেক লোকের উপস্থিতিতে অনেক সময়ই বিপদ কমে যায়। তার মানে নিচে নামার সুযোগ বা সাহস পায়নি ও। নিশ্চয়ই দরজার বাইরেই অথবা পাশের কোন কামরায় কেউ অপেক্ষা করছিল ওকে ধরার জন্যে। হোটেলে ফিরে কিছুটা সময় রূমে কাটিয়ে ও ফোন করেছে পুলিসকে। রূমে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই কেন ফোন করেনি? দেরি করল কেন? কারণ নিশ্চয়ই রূমে ঢোকার পর কিছু একটা ঘটেছিল। কি সেটা?

সুফিয়া সম্পর্কে যতটুকু জানে রানা, ভয় পেতে পারে, কিন্তু আতঙ্কিত হওয়ার মেয়ে নয় সে। কোন কিছু করার আগে বেশ ভেবেচিন্তেই সিদ্ধান্ত নেয়। হঠাৎ করে মনে হলো, কেউ পেছনে লেগেছে, হয়তো খুন করে ফেলবে আর পুলিসকে ফোন করে দিল, আমাকে বাঁচাও, সুফিয়া সম্পর্কে এমনটা ভাবা কষ্টকর। যথেষ্ট বুদ্ধিমতী মেয়ে, তাছাড়া দুনিয়াদারি সম্পর্কে ভালই জ্ঞান রাখে। রানা এজেন্সিতে ওকে এমনি এমনিই নেয়নি রানা। রানা এজেন্সিতে থাকতে, ঘাবড়াল না কখনও, বিপদে পড়লেও ঠাণ্ডা মাথায় মোকাবেলা করল সব, আর এখন অনেক নিরাপদ কাজ সাংবাদিকতা করতে গিয়ে ঘাবড়ে গেল আর উল্টোপাল্টা করে বসল?

হোটেলে পৌঁছেই ম্যানেজারকে ধরল রানা। ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিসকে চেনে কিনা জিজ্ঞেস করল।

'নিশ্চয়ই চিনি,' বলল ম্যানেজার।

'তাহলে গতরাতে ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিসের পরিচয় দিয়ে কে না কে একজন আমার সঙ্গে কথা বলে গেল কি করে?'

'মানে?'

গতরাতের ঘটনাটা খুলে বলল রানা। 'আপনার রিসেপশন ক্লার্ক ফোন করে জানায় আমাকে যে ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিস দেখা করতে চায়। ভালকথা। আমি রূমে পাঠিয়ে দিতে বললাম তাকে। আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে চলে গেল লোকটা। কিন্তু আজ পুলিস স্টেশনে গিয়ে দেখি ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিস অন্য লোক।'

'এক মিনিট, মিস্টার রানা, দেখছি আমি ব্যাপারটা।'

এক মিনিট না, পাঁচ মিনিটের মাথায় জানা গেল, যে লোকটা গত সন্ধ্যায় রিসেপশন ডেস্কে ডিউটিতে ছিল সে আগে দেখেনি ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিসকে। নকল লোকটা সেই সুযোগ গ্রহণ করেছে ভালমত।

অনেক করে দুঃখ প্রকাশ করে শেষে বলল ম্যানেজার, 'আমি এখুনি ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিসের সঙ্গে আলাপ করছি এ ব্যাপারে, মিস্টার রানা।'

বেরিয়ে এল রানা ম্যানেজারের রূম ছেড়ে। লিফটের দিকে এগোতে যাবে ও

এমন সময় লবির এক কোণ থেকে ভেসে এল একটা শব্দ, 'মিস্টার রানা না?'

চিন্তার ট্রেনটা লাইনচ্যুত হয়ে গেল। ঘুরে তাকাল ও। এগিয়ে আসছে লোকটা ওর দিকে। বিস্মিত চোখের দৃষ্টি। রানাও কম অবাক হয়নি। কি যেন নাম লোকটার? পরমুহূর্তেই মনে পড়ল।

'কি আশ্চর্য, মিস্টার রিড! আপনি এখানে কি করছেন?' বলল রানা।

'আমারও তো একই প্রশ্ন,' হাসতে হাসতে বলল লোকটা। 'পৃথিবীটা যে গোল তা আরেকবার প্রমাণ হয়ে গেল। ড্রিংক চলতে পারে, কি বলেন?'

বারের দিকে এগোল ওরা। 'পৃথিবীটা আজকাল খুবই ছোট হয়ে গেছে, মিস্টার রিড,' বলল রানা।

'সত্যিই, মিস্টার রানা। খুবই অবাক লাগছে আপনাকে দেখে। আমি ভেবেছিলাম, লন্ডনেই থাকছেন আপনি।'

'আমিও ভেবেছিলাম, ল্যাপল্যান্ডে যাচ্ছেন আপনি।'

'ঠিকই ভেবেছিলেন, ল্যাপল্যান্ডেই যাচ্ছি আমি। প্রশ্ন হচ্ছে, কখন? আমার ক্যামেরাম্যানকে ডেকে পাঠানো হয়েছে হেড অফিস থেকে, ফেঁসে গেছি আমি।'

'স্টকহোমে যাওয়ার কথা ছিল না আপনার?'

'হ্যাঁ। বেল্‌স্‌ হুইস্কি চলবে?' মাথা ঝাঁকাল রানা, অর্ডার দিল রিড।

'আমাদের আরেকজন ক্যামেরাম্যান আছে, নরওয়েজিয়ান স্কেরি বা ওই ধরনের কিছু একটার ছবি তুলছে। ওর আসার কথা গোদেনবার্গে। এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে ও-ও ফেঁসে যাবে। বেচারা জানে না আমি অপেক্ষা করছি এখানে। আপনি এখানে কেন?'

'আমার ব্যাপারটা অন্যরকম,' বলল রানা। 'বুঝতেই পারছেন জানাতে পারছি না কারণটা।' একজন রিপোর্টার অন্য পত্রিকার আরেকজন রিপোর্টারের সঙ্গে কথা বলছে, আমি একটা খবরের পেছনে আছি এবং তোমাকে জানাচ্ছি না সেটা, সুতরাং প্রশ্ন কোরো না; এমনি একটা ভঙ্গি ওর।

'যাকগে, আমাকে জানালে আমি আপনার খবরটা চুরি করতাম না নিশ্চয়ই।'

'রিপোর্টিং লাইনে এমন লোকও আছে যারা তাদের ডান হাত কি করছে বাঁ হাতকেও তা জানতে দেয় না।'

'ঠিক আছে, বাবা, ঠিক আছে। জানতে চাওয়াটা অন্যায় হয়ে গেছে আমার, হলো?' অভিমান রিডের গলায়।

জবাবে মৃদু একটু হাসল রানা।

হুইস্কিতে চুমুক দিতে দিতে ভাবছে রানা। মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখলেও চিন্তার ট্রেনটা আবার উঠে এসেছে লাইনের উপর; চলতেও শুরু করেছে। ফ্রান্সিসের আঙুল গোনার ছবিটা ভেসে উঠেছে ওর মনের পর্দায়। রাশিয়া থেকে কোন জিনিস বের করে আনার ব্যাপারে কার স্বার্থ থাকতে পারে? আমেরিকা এক নম্বর তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং বোধহয় ওদের চেয়ে প্রবল উৎসাহ আর কারও নেই। এই রিড লোকটা কি সত্যিই ন্যাশনাল জিওগ্রাফিতে কাজ করে?

নানা বিষয়ে আলাপ করল রানা লোকটার সাথে। কিন্তু আসল প্রশ্নের কোন উত্তর পেল না। অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে রিড। হুঁ-হাঁ করে শুনছে রানা।

সন্দেহজনক একটা কথাও এখন পর্যন্ত উচ্চারণ করেনি লোকটা। বিদেশের মাটি থেকে নিজের দেশের মাটিতে ফিরে যাওয়ার ভেতরে যে কি প্রশান্তি আর পরিতৃপ্তি তা ব্যাখ্যা করে চলেছে সে। যাই হোক, লোকটা ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকে কাজ করুক আর না-ই করুক কাভারটা ভালই নিয়েছে। হাল ছেড়ে দিল রানা। ঘুঘু লোক, প্রশ্ন করে লাভ নেই, বুঝে নিয়েছে এর মধ্যেই।

'রাতে এক সাথে ডিনার খেলে কেমন হয়, রানা?' জিজ্ঞেস করল রিড। ইতোমধ্যেই ওরা শুধু রিড ও রানার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে; অর্থাৎ বাংলা হিসেব মত আপনি থেকে তুমিতে।

জবাব দেয়ার আগেই রিসেপশন কাউন্টার থেকে একটা গলা ভেসে এল, 'মিস্টার রানা, আপনার ফোন।'

রিডের দিকে ফিরে, 'এক্সকিউজ মি,' বলে উঠে গেল রানা কাউন্টারের দিকে।

'হ্যালো?'

'মাসুদ রানা?' একটা পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এল ফোনে। ইংরেজি, তবে কেমন একটা বিজাতীয় টান আছে বলার ভঙ্গিতে।

'হ্যাঁ।'

'বিরাশি নম্বর স্টোর্গাতান, গোদেনবার্গ—এই ঠিকানায় আসতে পারো তুমি। ওখানে আগ্রহী হওয়ার মত কিছু জিনিস আছে তোমার জন্যে।'

হ্যাঁ, এবার আরও স্পষ্ট লাগল বিজাতীয় টানটা। সুইডিশ, ভাবল রানা। অন্ততপক্ষে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান।

'আমি কেন আগ্রহী হব? গাধা নাকি? কে বলছ তুমি?'

'বিরাশি নম্বর, স্টোর্গাতান!' কেটে গেল লাইন।

রিসিভারটা রেখে, রেইন-কোট নেয়ার জন্যে বারে ফিরে এল রানা। চলে গেছে রিড। গ্লাসটা খালি পড়ে আছে কাউন্টারে। রেইন-কোটটা গায়ে চড়িয়ে হোটেলের বাইরে এসে দাঁড়াল ও। বৃষ্টি পড়ছে ঝিরঝির করে।

এদিক ওদিক তাকাল খালি ট্যাক্সির আশায়। রিডকে দেখতে পেল দাঁড়িয়ে আছে একপাশে। মৃদু হেসে এগিয়ে এল রিড। 'ভেতরে খুব গুমোট লাগছিল, একটু খোলা হাওয়ার আশায় বেরিয়ে এসেছি বাইরে।'

'চমৎকার,' অকারণেই বলল রানা। বিরক্ত মুখে তাকিয়ে আছে খালি ট্যাক্সি স্ট্যান্ডটার দিকে। একটা ট্যাক্সিও নেই। পেভমেন্ট পার হয়ে রাস্তায় চলে এল ও, কিন্তু একটাও খালি ট্যাক্সি চোখে পড়ল না।

'কোথাও যাবে নাকি?' জিজ্ঞেস করল রিড। রানার পেছন পেছন এসেছে সে-ও। হাতে ধরা গাড়ির চাবিটা। 'আমার কোন কাজ নেই এখন, পৌঁছে দিতে পারি তোমাকে।'

একটু ইতস্তত করল রানা। সঙ্গে কেউ থাকুক তা চাইছে না ও, এদিকে ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠেছে। বিরাশি, স্টোর্গাতানে কি আছে দেখতে চায় এক্ষুণি। আরও কিছুক্ষণ ট্যাক্সির আশায় দাঁড়িয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত বলল, 'ঠিক আছে, চলো।'

রাস্তার পাশে পার্ক করা একটা নীল স্যাব ৯৯-এর দিকে এগিয়ে গেল রিড।

অনুসরণ করল রানা।

'চিন্তা কোরো না,' ড্রাইভিং সীটে উঠে বসতে বসতে বলল রিড। 'আমি তোমার এক্সক্লুসিভে নাক গলাব না। কাজকর্ম ছাড়া চুপচাপ বসে থাকতে ভাল লাগে? সেজন্যে যাচ্ছি তোমার সাথে। কোথায় যাবে?'

'বিরাশি, স্টোর্গাতান। কোথায় সেটা কে জানে?' বিরক্তি রানার কণ্ঠে।

'ঠিক আছে,' হেসে ফেলল রিড। 'আমার কাছে একটা স্ট্রীট গাইড আছে। তুমি খুঁজে বের করো রাস্তাটার লোকেশন, আমি স্টার্ট দিই গাড়িটা।' পকেট থেকে গাইড বের করে দিল সে রানার হাতে।

গোদেনবার্গ—মোলুডান রোড থেকে বেরিয়ে ডাইনে চলে গেছে স্টোর্গাতান স্ট্রীট। স্ক্যান্ডা থেকে তিন মাইল মত দূরে। দশ মিনিটের ভেতর পৌঁছে গেল ওরা স্টোর্গাতান স্ট্রীটে। রিডকে আস্তে আস্তে গাড়ি চালাতে বলল রানা, বিরাশি নম্বর বাড়িটা খুঁজে বের করতে হবে। অল্প কিছুদূর যাওয়ার পরই পেয়ে গেল ও বাড়িটা।

এদিককার বেশিরভাগ বাড়িই খালি। সম্ভবত ডিমোলিশন এরিয়া এটা। পুরানো মধ্যযুগীয় বাড়ি সব। একেকটা তলাই প্রায় তিনতলা সমান উঁচু। বিরাশি নম্বরের সামনে গাড়ি থামাতে বলল রানা। গাড়ি থেকে নেমে বাড়িটার দিকে রওনা হলো ও।

শ্রীহীন দন্ত বিকশিত চেহারা বাড়িটার। লোহার একটা গেট সামনে। বন্ধ। খিল লাগানো নেই গেটটায়, ঠেলা দিতেই খুলে গেল। গেটের পরে ছোট্ট এক টুকরো কম্পাউন্ড। কম্পাউন্ডটা পেরোল রানা। আট কি নয় ধাপ পাথরের সিঁড়ি টপকে সামনে দরজার কাছে গিয়ে পৌঁছল ও। কোনরকম সাড়াশব্দ নেই ভেতরে। খালি বোধহয় বাড়িটা। ময়লা হয়ে গেছে জানালার কাঁচগুলো, কতদিন পরিষ্কার করা হয় না কে জানে। জানালায় টাঙানো ভেতরের পর্দাগুলো ছিঁড়ে ত্যানার মত হয়ে গেছে। দরজা জানালার রঙ যে কতদিন আগে করা হয়েছিল তা বোধহয় গবেষণা করেও বের করা সম্ভব নয়। জায়গায় জায়গায় ছাল তুলে নেয়া চেহারা হয়েছে সেগুলোর। খুব শিগগিরই পুরোদস্তুর পোড়োবাড়িতে পরিণত হবে।

এহেন বাড়ির দরজায় নক করার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ ছিল না, তবু নক করল রানা। অভ্যাসবশেই হয়তো বা। ফাঁকা একটা প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল নকের শব্দ। নির্ভুল, খালি-বাড়ির শব্দ।

মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে রইল ও চুপচাপ। কিছু যেন বোঝার চেষ্টা করছে মনে মনে। তারপর জোরে ধাক্কা দিল দরজায়, যদি খুলে যায় এই আশায়। কিন্তু খুলল না দরজা। যথেষ্ট মজবুত রয়েছে এখনও, তাছাড়া ভেতর থেকে খিল দেয়া বোধহয়। সিঁড়ির ধাপগুলোর দু'পাশে লোহার রেলিং। তার একটা ধরে একটু ঝুঁকে জানালা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিল রানা। পুরানো মেঝে, বাড়িটার চেয়ে মোটেই ভাল নয় অবস্থা, জায়গায় জায়গায় গর্ত হয়ে গেছে। মেঝেতে হলদেটে রঙের পুরানো খবরের কাগজ বিছানো। এছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না ও।

'লাভ হলো না কোন?' গাড়ির পাশ থেকে হেঁড়ে গলায় বলল রিড। গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে রানার কার্যকলাপ লক্ষ করছে সে।

'একটু দাঁড়াও, পেছনটা দেখে আসি,' বলল রানা। সিঁড়ি থেকে নেমে

একপাশে সরে মাটির তলায় কুঠুরির জানালা দিয়ে উঁকি মারছে এখন ও। এখানেও একই অবস্থা, ফাঁকা এবং নোংরা। আবার সিঁড়ি টপকে উঠে গেল রানা দরজার কাছে। তালাটা দেখল। সম্প্রতি ব্যবহার হয়েছে কিনা ঠিক বোঝা গেল না।

'আমি আসব নাকি?' জিজ্ঞেস করল রিড।

'তোমার ইচ্ছা।'

বাড়ির পেছন দিকে যাচ্ছে রানা। ভাবছে, কে এখানে আসতে বলল ওকে? কেন? কিছু একটা নিশ্চয়ই আছে এখানে এবং সুফিয়ার নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে জড়িত সেটা। কি থাকতে পারে এখানে কল্পনা করে হঠাৎ কেমন একটা তেতো স্বাদ উঠে এল ওর গলা বেয়ে।

পেছন দিকটার অবস্থা আরও খারাপ। ইতোমধ্যেই খসে পড়তে শুরু করেছে দেয়ালের অনেক জায়গা। পেছনের ফাঁকা জায়গাটায় যে কোনকালে একটা বাগান ছিল তা অনেক কষ্ট করে কল্পনা করে নিতে হয়। ঘন ঝোপঝাড়ে ছেয়ে রয়েছে জায়গাটা। এক জায়গায় মাটির স্তূপ একটা। ঘাসে ছেয়ে গেছে।

'কালের করাল গ্রাস...' বলল রিড। একটু দার্শনিক দার্শনিক ভঙ্গি ওর গলায়। ভুরু কুঁচকে এক ঝলক তাকাল রানা ওর দিকে।

সেলারের জানালার দিকে এগোল ও। কাঁচের উপর হাত ঘষে খানিকটা জায়গার ধুলো মুছে নিয়ে উঁকি দিল ভেতরে। মোজাইকের একটা সিঙ্ক আর দেয়ালে কয়েকটা পেরেক থেকে ঝোলানো কিছু ন্যাকড়া ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না।

পেছনের দরজাটাও তালা মারা। এদিকেও একটা জানালা দিয়ে উঁকি দিল ও! দেখা গেল না কিছু। ধুলোয় ঝাপসা হয়ে আছে কাঁচ। হাত দিয়ে মুছে পরিষ্কার করল খানিকটা জায়গা। আবার উঁকি দিল। সামনে যা দেখছিল তারই পুনরাবৃত্তি—ময়লা, ভাঙাচোরা মেঝে আর পুরানো খবরের কাগজ।

'ভেতরে ঢোকার ইচ্ছে তোমার কতখানি?' জিজ্ঞেস করল রিড।

'প্রচণ্ড।'

'তাহলে চলো। ওই জানালাটা দেখছ,' তল কুঠুরির জানালাটা দেখাল রিড। 'একটা জ্যাক-নাইফ হলেই খোলা যাবে ওটা। আমার কাছে আছে একটা জ্যাক-নাইফ।'

একটু ভুরু কুঁচকাল রানা, সাংবাদিকের কাছে ছুরি কেন? পরমুহূর্তে স্বাভাবিক গলায় বলল, 'দেখি, আমার কাছে দাও ওটা।'

স্লাইডিং স্যাশ টাইপের জানালাটা। একটা টার্নার বার জানালার কপাট দুটোকে আটকে রেখেছে। রিডের কথামত জ্যাক-নাইফের ব্লেডটা কপাট দুটোর মাঝখানের সরু ফাঁকে ঢুকিয়ে একটু চাড় দিতেই দুদিকে প্রায় আধ ইঞ্চির মত সরে গেল দুটো কপাট। মাঝখানের সরু ফাঁকটা বেড়ে প্রায় এক ইঞ্চি হয়েছে। তারপরে হাত দিয়েই বাকি কাজটুকু সেরে ফেলল রানা।

'আসবে, না এখানে অপেক্ষা করবে?' রিডের দিকে ফিরে জানতে চাইল ও।

'আসব না মানে? পোড়োবাড়িতে সিঁদ কেটে কি পাও দেখব না?'

আশ্চর্য! ইললিগ্যাল কিছু করছে, এতক্ষণ একবারও মনে হয়নি রানার সে-

কথা। যাহোক পাত্তা দিল না ও চিন্তাটা। 'এসো তাহলে।'

'পা দুটো ঝুলিয়ে দাও ভেতরে, তারপর ধরছি আমি তোমাকে।'

এক সেকেন্ড পর ওরা ঢুকে পড়ল ভেতরে।

সেলারগুলো আগে চেক করল ওরা। ফাঁকা সবগুলো। বাইরে থেকে যতটুকু দেখা গিয়েছিল ভেতরে ঢুকেও তার চেয়ে বেশি কিছু দেখতে পেল না। এক তলার কামরাগুলোরও একই অবস্থা। দোতলায় ওঠার কাঠের সিঁড়িটা দেখল রানা।

'ঠিক কি খুঁজছ তুমি, রানা?' জিজ্ঞেস করল রিড।

জবাব দিল না রানা। ও নিজেই জানে না কি খুঁজছে, তো ওকে কি বলবে? দোতলায় উঠে প্রথম যে কামরাটা দেখল ওরা সেটা একটা বেডরুম ছিল কোন এককালে। খাবারের কয়েকটা খালি কাগজের ঠোঙা পড়ে আছে এক কোণে। কয়েকটা প্লাস্টিকের কাপ। তলায় কয়েক ফোঁটা কফি রয়েছে এখনও। সাদা সর পড়ে গেছে কফিটুকুর ওপর। নোংরা কাপ দেখার অভিজ্ঞতা নেই রানার, এমন নয়; বুঝতে পারল কাপের তলানিটুকু এক দিনের বেশি পুরানো হবে না। আর কিছু পেল না ওরা দোতলায়।

চিলেকোঠাটাই শুধু দেখতে বাকি রয়েছে এখনও। অন্ধকার সিঁড়ির দিকে তাকাল রানা। গা ছমছম করে উঠল ওর। সুফিয়া থাকতে পারে এখানে। এবং ওখানে থাকলে···। যদি ওখানে থেকে থাকে ও তাহলে কোন সাড়াশব্দ নেই কেন?

সিঁড়ির রেলিংগুলো বোধহয় বেশ যত্নের সঙ্গে ঘষামাজা করা হত। এখনও যথেষ্ট মসৃণ রয়েছে সেগুলো। এমন কি যেখানে যেখানে ধুলোর স্তর কারও হাতের ঘষায় উঠে গেছে অনুজ্জ্বল আলোয় সে জায়গাগুলো একটু যেন চকচকও করছে। রেলিংয়ের উপর থেকে ধুলোর স্তর মুছেছে কার হাতের ঘষায়? প্রশ্নটা উঁকি মারতে লাগল ওর মনে।

লম্বা একটা দম নিয়ে উপরে উঠতে শুরু করল রানা। উপরে ছোট্ট একটা ল্যান্ডিংয়ের দু'দিকে দুটো দরজা। ভুল দরজাটাই প্রথমে খুলল ও। খালি কামরা। অন্য দরজাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। ভেজানো। আস্তে করে ঠেলা দিতেই ভেতর দিকে খুলে গেল। খালি নয় এটা। দুটো লোক শুয়ে আছে মেঝেতে। দুজনেরই গায়ে দামী স্যুট। মাঝ বয়েসী দু'জনেই, চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের ভেতর।

ঘাড়ের কাছে রিডের গলা শুনতে পেল রানা, 'জিয়াস!'

দু'পা আগে বাড়াল ও। কাছের লোকটার মুখের দিকে তাকাল তীক্ষ্ণ চোখে। লোকটার সারা মুখে রক্তের দাগ, শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে। গলার কাছে লালচে দাগ একটা। শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে লোকটাকে। অন্য লোকটাকেও মারা হয়েছে একই ভাবে।

আট

দু'জনের একজনকেও চিনতে পারল না রানা। আগে কখনও দেখেছে বলে মনে হলো না। রিডের বিস্মিত গলা শোনা গেল পেছন থেকে, 'দুজনেই মারা গেছে দেখছি!' কিন্তু বিস্ময়টা ঠিক ফুটল না যেন ওর গলায়। চেষ্টা করে বিস্মিত হচ্ছে বলে মনে হলো রানার। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও রিডের দিকে। মুখের ভাব আর গলার স্বরে কোন সঙ্গতি খুঁজে পেল না। মৃতদেহ দুটো দেখে ও আশ্চর্য হয়েছে বোধহয়, তবে ব্যথিত হয়নি বা ভয় পায়নি মোটেই।

হাঁটু গেড়ে বসে লাশ দুটো পরীক্ষা করল রানা। ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিসেরও অপরিচিত এরা? বোধহয় না। কেন জানি মনে হলো ওর, চেনে এদেরকে ফ্রান্সিস।

'কারা এরা!' এবার শুধু বিস্ময় নয় আতঙ্ক ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করল রিড গলায়।

'জানি না।'

একজনের কোট সরিয়ে ভেতরের পকেটটা অনুভব করল রানা, কোন কাগজপত্র পাওয়া যায় যদি। কিন্তু পকেটগুলো খালি।

'তুমি এই খবরের পেছনে আছ, নিশ্চয়ই তুমি জানো কারা এরা, কি কারণে মরেছে!' বলল রিড।

'তুমিও,' বলল রানা। আবার বিস্মিত হওয়ার চেষ্টা করল রিড, কিন্তু এবারও ভঙ্গিটা তেমন ফুটল না ওর মুখে।

'আমি! কি বলতে চাও তুমি? আমি তোমাকে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছি শুধু!'

'গাধা নই আমি, রিড। প্রথমবার তোমার সঙ্গে দেখা হওয়াটা কাকতালীয় হতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয়বার দেখা হওয়া, তারপর আমাকে লিফট দিতে চাওয়া?'

'পাগল নাকি?' বলল রিড। 'তুমি বলেছ বলেই এসেছি ভেতরে, নইলে তো বাড়িতেই থাকতাম আমি। আমি বলছি...'

'কিছু বলতে হবে না। এখানে আর দরকার নেই তোমার। পুলিসে খবর দাও তাড়াতাড়ি।'

'ঠিক আছে। কিন্তু পুলিস...'

'হ্যাঁ। ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিসকে চাইবে, যাও।'

'ইন্সপেক্টর...? শোনো কি করছ তুমি বুঝতে পারছ? ছাড়বে না পুলিস তোমাকে।'

'ফ্রান্সিসকে খবর দাও আগে, তারপরেও যা বলার বলতে পারবে তুমি।'

'ঠিক আছে, বাবা,' মাথা ঝাঁকিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল রিড।

বিশ মিনিট পর সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেল, একাধিক। দু'জন কমপক্ষে, তিনজনও হতে পারে। রিড কি পুলিসে খবর দিয়ে চলে যায়নি? ফিরে এসেছে

আবার?

হ্যাঁ ফিরে এসেছে রিড ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিসের সঙ্গে।

লাশ দুটোর দিকে এক ঝলক তাকিয়েই রানার দিকে চোখ ফেরাল ফ্রান্সিস। 'আশ্চর্য, তাই না, মিস্টার রানা?'

'কারা এরা? চেনেন আপনি?'

'আপনি?'

'চিনি না,' বলল রানা। 'তবে একটা কথা মনে হচ্ছে আমার। নিছক ইন্সটিংক্ট আর কি। আপনার সেই ফ্রেঞ্চ দু'জন নয় তো? বার্গসন আর ব্রেইলি?'

'আপনি আগে কখনও দেখেননি ওদের?'

'আপনি ভাল করেই জানেন, আমি দেখিনি। আমার ধারণা ঠিক কিনা?'

সম্মতিসূচক মাথা ঝাঁকাল ইন্সপেক্টর। 'এখন বলুন, এখানে এসেছিলেন কেন?'

'একটা ফোন পেয়ে,' বলল রানা। 'কেউ একজন স্ক্যান্ডায় ফোন করেছিল আমাকে। এখানে আসতে বলেই কেটে দিল লাইন। পরিচয় দেয়নি। গলা শুনেও বুঝতে পারিনি পরিচিত কি না।'

সতর্ক চোখে তাকিয়ে আছে ফ্রান্সিস ওর দিকে। কোন মন্তব্য না করে পাশে দাঁড়ানো সার্জেন্ট টমাসকে কি যেন বলল সুইডিশ ভাষায়। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল সার্জেন্ট।

তারপর আবার রানার দিকে ফিরল ইন্সপেক্টর। 'আপনি কি হাত দিয়েছেন মৃতদেহগুলোয়?'

'হ্যাঁ। পকেটগুলো দেখেছি আমি।'

'খুব খারাপ কথা, উচিত হয়নি কাজটা! আর বাড়ির অন্যান্য অংশ?'

'পুরো বাড়িটা দেখেছি আমি। কিছুই নেই। কয়েকটা প্লাস্টিকের কাপ আর কাগজের ঠোঙা। ওরা বোধহয় এখানে ছিল কিছু সময়।'

'আর এই লোকটা? মিস্টার···?'

'রিড, জন রিড।'

'আপনি এখানে কেন, মিস্টার রিড? আমেরিকান আপনি?'

'হ্যাঁ। আমি আমার গাড়িতে করে মাসুদ রানাকে এখানে পৌঁছে দিয়েছি, ব্যস।'

'আচ্ছা!' কান খাড়া করল ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিস, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। একটু পরেই এসে ঢুকল টমাস। নিজের ভাষায় কিছু বলল ফ্রান্সিসকে। রানার দিকে ফিরল ফ্রান্সিস।

'দরজাগুলোয় তো তালা মারা, কিভাবে ঢুকলেন আপনারা?'

'জানালা গলে। সেলারের একটা জানালা খুলতে পেরেছিলাম! যা হোক সেটা খুব জরুরী বিষয় নয়।'

'আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে না হলেও পুলিসের দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্যই ব্যাপারটা জরুরী।' আবার তাকাল ইন্সপেক্টর মেঝেতে পড়ে থাকা লাশগুলোর দিকে। 'অন্য সব কারণ বাদ দিলেও, শুধু অনধিকার প্রবেশের কারণেই আপনাকে আটক করতে পারি আমি, তা জানেন?' একটু কঠোর শোনাল ফ্রান্সিসের গলা।

রেগে গেল রানা। 'আপনাকে তো বলেইছি, কি কারণে এখানে এসেছি আমি।'

'হ্যাঁ, আপনি কেন এখানে এসেছেন তা জানি আমি, আর মিস্টার রিড কেন এসেছেন তাও শুনলাম।'

'আমি ওকে চালিয়ে এনেছি শুধু,' বলল রিড। 'আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না আমার।'

'অত সহজ নয়, মিস্টার রিড। আপনিও অবৈধভাবে ঢুকেছেন এ বাড়িতে। ক্রিমিন্যাল অ্যাক্ট।'

ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। লোকটার উদ্দেশ্য কি তা বুঝতে চাইছে ও। শুধু ফর্ম্যালিটির কারণেই ভয় দেখাচ্ছে না সত্যি সত্যিই হাজতে পুরে দেবে? কিন্তু ইন্সপেক্টরের মুখ দেখে কিছুই আন্দাজ করতে পারল না। কয়েক ঘণ্টা আগেই ফ্রান্সিস জানিয়ে দিয়েছে, পুলিসের ব্যাপার পুলিসই দেখবে এবং কোন অবস্থাতেই অন্য কাউকে এ ব্যাপারে নাক গলাতে দেয়া হবে না। রানার কৌতূহল পছন্দ করছে না লোকটা। এখন যদি দুই বা তিনদিনের জন্যে লকআপ-এ ভরে রাখে তো কিছু করার নেই।

'আপনার সঙ্গে প্রাইভেট ভাবে কিছু কথা বলতে চাই, ইন্সপেক্টর,' বলল রানা। রিডের সামনে বলতে চায় না ও কথাগুলো। রিড লোকটাকে যত সোজা, ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না ধরনের মনে হচ্ছে, আসলে তা নয় বোধহয়।

'পরে,' বলল ফ্রান্সিস। পর মুহূর্তেই মত বদলাল, 'ঠিক আছে, মিস্টার রানা, চলুন নিচে যাই।'

গ্রাউন্ড ফ্লোরে নেমে এল ওরা। রাস্তার দিকের একটা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ইন্সপেক্টর।

'এবার বলুন।'

'ও, মানে সুফিয়া এখানে ছিল বলে মনে হচ্ছে আমার।'

'কিভাবে বুঝলেন?' নিরুত্তাপ গলা ফ্রান্সিসের।

'কি আশ্চর্য, বুঝতে পারছেন না, যে রাতে নিখোঁজ হয় সুফিয়া সে রাতে ওর পাশের রুমেই ছিল ওই লোক দুটো। একই রাতে হোটেলের লেটার বক্সেও আগুন লেগেছিল!'

'আমি জানি এসব কথা। এতে কিছু প্রমাণ হয় না।' আরও নিরুত্তাপ হয়ে উঠল ইন্সপেক্টরের কণ্ঠস্বর, অনেকটা নিষ্ঠুর। ওর প্রত্যেকটা কথাকেই গুরুত্ব না দেয়ার একটা প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে ইন্সপেক্টরের ভেতর।

'ঠিক আছে। আসুন তাহলে আরেকবার চিন্তা করে দেখি আমরা,' বলল রানা। 'ধরা যাক, ওপরের লোক দুটো ধরে এনেছিল সুফিয়াকে। এখন ও নেই এখানে। তার মানে অন্য কেউ ওকে নিয়ে গেছে এখান থেকে। এবং যাওয়ার সময় খুন করে রেখে গেছে ওই দু'জনকে।'

'না। ঘটনাটার আরও দু'রকম ব্যাখ্যা হতে পারে, তিনরকমও হতে পারে। এক, মিস আশরাফই খুন করেছে ওদের...'

'কি বলছেন আপনি, মাথা ঠিক আছে তো?'

'দাঁড়ান দাঁড়ান, অত চটবেন না। আমি সম্ভাবনার কথা বলছি এবং প্রতিটি সম্ভাবনাই খুঁটিয়ে বিচার করে পুলিস। হয়তো খুনের ব্যাপারে কোন সাহায্যকারী ছিল মিস আশরাফের। পুলিসের দৃষ্টিকোণ থেকে এটাও একটা সম্ভাবনা মাত্র।'

'কিন্তু...'

'শুনুন, দ্বিতীয়ত মুক্তি দেয়া হয়েছে ওঁকে।'

'এবং তৃতীয়ত?' বিদ্রূপ রানার কণ্ঠে।

'তৃতীয়ত উনি এখানে আদৌ ছিলেন না।' কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ইন্সপেক্টর। 'যাহোক, আপনি যে সম্ভাবনার কথা বললেন তাতেও যুক্তি আছে। ঘাবড়াবেন না, আমরা খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

বাইরে একাধিক গাড়ি এসে থামার শব্দ পাওয়া গেল। জানালা দিয়ে দেখল রানা, নানান রকম যন্ত্রপাতি নিয়ে নেমে এল কয়েকজন লোক। এগিয়ে গিয়ে সামনের দরজাটা খুলে দিতে দিতে ওর দিকে ফিরে বলল ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিস, 'কথা দিচ্ছি আপনাকে, আমরা সব তথ্য প্রমাণ চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখব।'

যন্ত্রপাতি হাতে লোকগুলোকে নিয়ে সিঁড়ির দিকে রওনা হলো ফ্রান্সিস। দ্রুত নির্দেশ দিচ্ছে ওদের, কি কি করতে হবে সে সম্পর্কে। তারপর ফিরল রানার দিকে। 'এই রিড লোকটা আসলে কে?'

'আমি জানি না,' বলল রানা। প্লেনে প্রথম সাক্ষাৎ থেকে শুরু করে এখানে আসা পর্যন্ত পুরো ঘটনা সংক্ষেপে জানাল ইন্সপেক্টরকে।

চুপচাপ শুনল ফ্রান্সিস। রানার কথা শেষ হতেই বলল, 'দেখুন, মিস্টার রানা, আমি একজন পুলিস অফিসার। পুলিস অফিসার হিসেবে পরিচয় দিচ্ছে এমন কারও সঙ্গে যদি আমার আলাপ হয় তো অল্প সময়ের মধ্যেই আমি ধরে ফেলতে পারব সত্যিই সে পুলিস অফিসার কি না। মিস্টার রিড কি সত্যিই একজন জার্নালিস্ট?'

'আর কি হতে পারে?'

'আমি জানি না। আমার প্রশ্নের জবাব দিন দয়া করে।'

'আমিও জানি না। তবে, জার্নালিজম সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখে ও তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'তারমানে আপনি নিশ্চিত নন, সত্যিই ও জার্নালিস্ট কিনা?'

'হ্যাঁ।'

'এবং আমি প্রশ্ন করার আগেই আপনার মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে, ঠিক?'

'ও ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিনের সঙ্গে আছে বলে বলেছে। ওখানে একটা কেব্‌ল্ করলেই তো কনফার্ম হওয়া যায় সত্যিই ও ওই পত্রিকার সঙ্গে আছে কিনা?'

'হ্যাঁ, সেটা সম্ভব, মিস্টার রানা, সেটা সম্ভব,' চিন্তিত গলায় বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল ফ্রান্সিস। কয়েক ধাপ উঠে আবার থেমে বলল, 'আপনি যাবেন না, মিস্টার রানা, একটা স্টেটমেন্ট দরকার হবে। আমি দুঃখিত, একটু অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে।'

অনেকক্ষণ সময় লাগল ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিসের তদন্ত কাজ শেষ করতে। পুরোটা সময়ই রানাকে সে রিডের কাছ থেকে দূরে দূরে রাখল। আলাদা দুটো গাড়িতে

ওদের দু'জনকে পুলিস স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হলো। জিজ্ঞাসাবাদও করা হলো আলাদা রুমে। রাত ন'টার দিকে ফ্রান্সিস একটা টাইপ করা স্টেটমেন্ট এনে হাজির করল। 'এই স্টেটমেন্টটায় সই করলেই আপনি চলে যেতে পারবেন, মিস্টার রানা।'

কাগজটা পড়ে দেখে সই করে দিল রানা। বেরিয়ে আসবে এমন সময় বলল ফ্রান্সিস, 'ও হ্যাঁ, মিস্টার রানা, বিরাশি, স্টোর্গাতানে এমন কিছু পাওয়া যায়নি যাতে প্রমাণ হয় মিস আশরাফ ছিলেন ওখানে।'

'আপনি শিওর ও ছিল না ওখানে?'

'না,' বলল ইন্সপেক্টর। 'থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু আমার হাতে কোন প্রমাণ নেই।'

'প্রমাণ যে থাকবেই এটা আপনি কি করে ভাবলেন?'

'জানি না।'

হেঁটে হেঁটেই ফিরল রানা হোটেলে। একা। মেজাজ একদম ভাল নেই। বুদ্ধু ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিসের কথা যতই মনে পড়ছে ততই খিঁচড়ে উঠছে মেজাজটা। উজ্জ্বল নিয়ন আলোয় আলোকিত রাস্তা। বেশ রাত হয়েছে, কিন্তু রাস্তায় লোক চলাচল কমেনি এখনও। কয়েক রাত আগে এই সময়ে সুফিয়াও ছিল এ রাস্তারই কোন এক জায়গায়। তিন ঘণ্টা বাইরে ছিল ও। কেন? নিশ্চয়ই ডিনারের জন্যে নয়। তাহলে আর কি কারণে বাইরে গিয়েছিল ও?

স্ক্যান্ডার দারোয়ান সুইংডোরটা খুলে ধরল, বিনীত একগাল হাসিমুখে। ধন্যবাদ জানিয়ে এগিয়ে যেতে গিয়েও কি মনে করে থেমে দাঁড়াল রানা।

'যে রাতে মিস আশরাফ নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, সে রাতে কি তুমিই ডিউটিতে ছিলে?' জিজ্ঞেস করল ও।

সতর্ক চোখে চাইল দারোয়ান রানার দিকে। 'হ্যাঁ, স্যার। কিন্তু, এ ব্যাপারে ম্যানেজারের সঙ্গেই...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ করতে চাইলে আর তোমার কাছে এসেছি কেন?' দশ ক্রোনারের দুটো নোট ধরিয়ে দিল ও লোকটার হাতে। অভ্যস্ত ভঙ্গিতে টাকাটা মুঠোয় পুরল দারোয়ান।

'বাইরে যেতে দেখেছিলে মিসকে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ। উনি বেরোনোর সময় এবং ঢোকার সময়, দুবারই আমি দরজা খুলে দিয়েছিলাম।' একটু গর্বিত শোনাল দারোয়ানের গলা।

'কিছু বলেছিল নাকি? তোমাকে বা অন্য কাউকে?'

'হ্যাঁ, স্যার। সিনেমার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন।'

ভুরু কুঁচকে উঠল একটু রানার। ও যতটুকু জানে সিনেমা দেখার কোন বাতিক নেই সুফিয়ার। তবে ভাল নাটক হলে দেখে ও।

'ঠিক মনে আছে তোমার? সিনেমার কথা বলেছিল না নাটকের কথা?'

'সিনেমা, স্যার। আমি বলেছিলাম মিসকে।'

'পুলিসকে বলোনি একথা?'

'না।'

'কেন?'

'ওরা জিজ্ঞেস করেনি তাই। উনি কখন বাইরে গেছেন এবং কখন ফিরেছেন এছাড়া আর কোন প্রশ্ন করেনি ওরা।'

'মাথা মোটা গাধা,' বিড় বিড় করে বলল রানা।

'হ্যাঁ, স্যার?'

'না, তোমাকে না। তুমি কি বলেছিলে মিসকে?'

'সবচেয়ে কাছেরটার কথাই বললাম, স্যার। এই রাস্তায়ই, তিনশো মিটারও হবে না।' অপরাধী ভঙ্গিতে চারদিক একটু দেখে নিল দারোয়ান, দেখল, কেউ লক্ষ করছে কিনা রানার সঙ্গে ওর কথা বলা।

'ম্যানেজার তোমাকে কিছু বলতে বারণ করেছে তাই না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

একটু ইতস্তত ক'রে জবাব দিল দারোয়ান, 'হ্যাঁ, স্যার।'

'চিন্তা কোরো না, জানতে পারবে না ম্যানেজার।' আরও বিশ ক্রোনার দিল রানা লোকটার হাতে। জিজ্ঞেস করল, 'ও কি সিনেমা হলের দিকেই গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

'কি পরে ছিল ও?'

'স্যার?'

'কাপড় চোপড়?'

'ওহ। কোট, স্যার।'

'কি রঙের?'

'সাদা। হাতে ব্যাগ ছিল, আর...' গ্লাভ্স শব্দটা মনে পড়ছে না ওর, ইশারায় বোঝানোর চেষ্টা করছে।

'গ্লাভ্স?'

'হ্যাঁ, গ্লাভ্স।'

'যখন ফিরল তখন?'

'একই। চমৎকার মিষ্টি এক মহিলা।'

'আর কিছু মনে করতে পারো নাকি দেখো তো?'

কিছুক্ষণ ভাবল দারোয়ান। তারপর বলল, 'কেমন একটু চিন্তিত দেখাচ্ছিল বোধহয়।'

'কখন? যাওয়ার সময় না আসার সময়?'

'দুই সময়েই, স্যার।'

'ধন্যবাদ।'

সুইংডোর ঠেলে আবার বেরিয়ে এল রানা হোটেলের বাইরে। ডানদিকে ঘুরে চলতে শুরু করল। দারোয়ানের কথা অনুযায়ী এই পথেই গিয়েছিল সুফিয়া।

হাঁটতে হাঁটতে সিনেমা হলটার কাছে পৌঁছল রানা। একটা সুইডিশ ছবি চলছে। আলোকিত ভেতরটার দিকে তাকাল। ভীষণ আশ্চর্য হয়েছে ও সুফিয়ার আচরণে। সিনেমা দেখে না সুফিয়া। সিনেমা এবং টেলিভিশনের ওপর উদ্ভট এক রকমের বিতৃষ্ণা আছে ওর। ছায়া দেখে মজা পেতে রাজি নয় ও। থিয়েটার অবশ্য

দেখে, তাও ভাল নাটক হলে। সিনেমায় প্রায় যায়ই না, একা একা তো নয়ই। তার ওপর এখানে সাধারণ একটা ছবি চলছে এবং এমন একটা ভাষায় যার এক বর্ণও বোঝে না ও।

পুরো ব্যাপারটাই কেমন যেন বিদঘুটে। মনে মনে কারণ খোঁজার চেষ্টা করল রানা, কেন ও একা একা সাধারণ একটা বিভাষী ছবি দেখতে গেল। কিন্তু সঙ্গত কোন সুদত্তর পেল না।

কাজে লাগতে পারে ভেবে লন্ডন থেকে আসার সময় সুফিয়ার একটা ছবি নিয়ে এসেছিল রানা। ওয়ালেটেই ছিল সেটা। ওয়ালেট থেকে ছবিটা বের করে বক্স অফিসের দিকে এগোল ও। ছবিটার দিকে একবার তাকাল, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে রানা আর সুফিয়া। জহির ভাইয়ের বাসায় এক পার্টিতে তোলা ছবিটা। হাসিমুখে তাকিয়ে আছে সুফিয়া।

বক্স অফিস বন্ধ। এখন? হলে ম্যানেজার আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু ম্যানেজারের চেয়ে বক্স অফিসের মেয়েটাই সাহায্য করতে পারত বেশি। যারা যারা টিকেট কেটেছিল তাদের নিশ্চয়ই দেখে থাকবে সে। বিশেষ করে, চমৎকার একখানা সাদা কোট পরা সুন্দরী সুফিয়াকে মনে থাকারই কথা। যা হোক, চেষ্টা করে দেখা যাক, কি হয়।

একজন কর্মচারীকে ধরে ম্যানেজারের কাছে পৌঁছল রানা। গোলমুখো শক্তসমর্থ লোকটা। ডিনার জ্যাকেট পরে রয়েছে। প্যাঁচার মত ঘুম ঘুম চোখ করে বসে আছে নিজের কামরায়।

'আমি একটা...' শেষ করতে পারল না রানা কথাটা।

'ইংরেজ আপনি?' জিজ্ঞেস করল ম্যানেজার।

'না, বাঙালী। তবে আপাতত ইংল্যান্ডই আমার কর্মস্থল।'

'আমি ভাল ইংরেজি জানি না। কোন জিনিস হারিয়েছে নাকি?'

'জিনিস নয়। একজন মহিলা...'

'একজন মহিলা হারিয়ে গেছে!'

সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ঘুম ভাবটা দূর হয়ে গেল ম্যানেজারের চেহারা থেকে। বসল সোজা হয়ে। ছবিটা দেখাল রানা ম্যানেজারকে।

'না, দেখিনি আমি।' মাথা নাড়ল ম্যানেজার।

'শিওর আপনি?'

'হ্যাঁ। আমি দেখিনি।'

সত্যি কথাই বলছে লোকটা মনে হলো রানার। হারিয়ে যাওয়া মানুষের খোঁজ দেবে কি করে বেচারা! খুব বেশি হলে হারানো জিনিসের খোঁজ দিতে পারে। একটা কথা মনে হলো রানার, সিনেমা হলগুলোতে নিশ্চয়ই হারিয়ে যাওয়া জিনিস সংরক্ষণের নিয়ম আছে; দস্তানা, ছাতা, হ্যান্ডব্যাগ, এই ধরনের জিনিস যদি কোন দর্শক ফেলে যায়।

'আমার মনে হয় কিছু একটা ফেলে গেছিল ও হলে,' বলল রানা।

'কি জিনিস?' এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ম্যানেজার।

'গ্লাভ্‌স,' চটপট মিথ্যে বলল রানা। 'বাদামী রঙের।'

'আসুন আমার সাথে।'

ম্যানেজারের পেছন পেছন হলের স্টোর রুমে গিয়ে ঢুকল রানা। রোল করা পোস্টার, ফিল্ম ক্যান এইসব দিয়ে ঠাসা কামরাটা। একপাশে একটা কাবার্ড। কাবার্ডটা খুলে কার্ডবোর্ডের একটা বাক্স বের করে আনল ম্যানেজার। একগাদা গ্লাভস রয়েছে বাক্সটায়, কয়েকটা ছোট পার্স, একটা লাইটার, এক কপি স্ট্রিভবার্গ ম্যাগাজিন। জিনিসগুলো দেখতে দেখতে দ্রুত চিন্তা করছে রানা, হয়তো কিছু একটা ইচ্ছে করেই ফেলে গেছে সুফিয়া সিনেমা হলে। তাছাড়া সিনেমায় আসার আর কোন কারণই থাকতে পারে না। কিন্তু কি সেটা? বাক্সের জিনিসগুলো খুবই সাধারণ এবং স্বাভাবিক মনে হলো ওর কাছে। সুফিয়ার নয় একটাও।

'না, এর ভেতরে নেই। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।' বেরিয়ে এল ও সিনেমা হল ছেড়ে।

হোটেলে ফিরেই একটা মেসেজ পেল রানা; ভ্লাদিমির রোসভ হোটেল নর্ড-এ ফোন করতে বলেছে। মেসেজটা পকেটে ফেলে নিজের রুমে চলে এল ও। টেলিফোনের সঙ্গে লাগানো আড়িপাতার যন্ত্রটার কথা মনে পড়ল। জিনিসটাকে গ্রাহ্য না করার সিদ্ধান্ত নিল ও। ওটা যে রাশিয়ানরাই লাগিয়েছে এব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিত রানা। জরুরী কিছু খবর দেবে না কি ভ্লাদিমির?

ফোন করল রানা। কিসের জরুরী খবর, সুফিয়ার কোন খোঁজ পাওয়া গেছে কিনা জানতে চাইল ব্যাটা। সরল নিষ্পাপ একটা ভাব লোকটার গলায়।

'আশা করি শিগ্‌গিরই ভাল খবর পাব আমরা,' রানার না-সূচক জবাব শুনে বলল ভ্লাদিমির।

'আমিও তাই আশা করি,' মেপে মেপে উত্তর দিল রানা। 'আমি জানাব আপনাকে...'

'আমার উপরওলারা,' ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল ভ্লাদিমির, 'রাশিয়ান লাইফ-এর প্রকাশনার ব্যাপারে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন, মিস্টার রানা।'

'কি হয়েছে?' চোখের সামনে লাল সিগন্যাল দেখতে পেল রানা। 'আপনার উপরওলাদের বলবেন, আমাদের সুবিধামতই আমরা বের করব পত্রিকাটা। আপনার উপরওলাদের উদ্বেগের ধার ধারি না আমরা, বুঝেছেন?'

'দুঃখিত,' বলল ভ্লাদিমির। 'আমি বুঝতে পারছি আপনার মনের অবস্থা। কিছু মনে করবেন না, আমাকে জিজ্ঞেস করতে বলা হয়েছিল তাই জিজ্ঞেস করলাম।'

'ঠিক আছে, আপনার জিজ্ঞেস করা হয়েছে তো?' ঘটাং করে নামিয়ে রাখল রানা ফোনটা। খুবই দুঃখিত মিস আশরাফ নিখোঁজ হয়ে গেছেন শুনে, কিন্তু আমাদের কাজটা হচ্ছে তো? ন্যাকা আর কি! পাকা ঘুঘু একেবারে!

মেজাজটা চূড়ান্ত রকমের খারাপ হয়ে গেছে রানার ভ্লাদিমিরের সাথে কথা বলে। ফ্রান্সিসের কথা মনে পড়াতে আরও জ্বলে উঠল আগুনটা। আরেক বেআক্কেল ব্যাটা, কাজের কাজ কিছু না করে উনি পরিস্থিতির চুলচেরা বিশ্লেষণ করছেন! আর দেরি করা যায় না, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা। যেখানে গেলে কিছু সূত্র পাওয়ার সম্ভাবনা আছে সেখানেই যেতে হবে। সুফিয়ার রুমে। কিন্তু এখনও তো খাওয়া হয়নি, খিদে পেয়েছে।

দশ মিনিটের ভেতর খাওয়া সেরে লিফটে চড়ে ছ'তলায় চলে এল ও। করিডরটা দেখল, ফাঁকা। লোকজন হয় ঘুমোচ্ছে নয় তো ক্যাবারে দেখছে। ফায়ার এক্সিট দরজাটার দিকে গেল ও। ছাদে উঠতে হবে।

সমতল ছাদ। একধারে একটা বিরাট ওয়াটার ট্যাঙ্ক, পানির পাইপগুলো বেরিয়ে এসেছে ট্যাঙ্ক থেকে। ছাদের চারদিক ঘিরে বুক সমান উঁচু প্যারাপেট। একপ্রান্তে গিয়ে প্যারাপেটের উপর দিয়ে ঝুঁকে নিচে তাকাল রানা। ভুল দিকে এসেছে। উল্টো প্রান্তে চলে এল ও। নিচে দেখা যাচ্ছে কংক্রিটের ঝুলানো বারান্দা। প্রত্যেক রুমের সঙ্গে একটা। কোন্‌টা সুফিয়ার রুমের?

কয়েক সেকেন্ডের ভেতরেই বের করে ফেলল রানা রুম সিক্স-টু-এইট-এর পজিশন। ব্যালকনির মেঝেটা প্রায় বারো ফুট নিচে। সোজা নামতে পারলে বাইরে পড়বে না ও। ব্যালকনির মেঝেটাই বাঁচাবে বাইরে পড়ে যাওয়া থেকে। লাফ দেয়ার চেয়ে ঝুলে পড়াটাই সুবিধাজনক হবে, প্রায় অর্ধেক দূরত্ব কমে আসবে তাতে।

প্যারাপেটের উপর উঠল রানা। হাত বাধিয়ে ঝুলে পড়ার আগে নিচের দিকে তাকাল একবার। মাত্র ছ'তলা উঁচু হোটেল বিল্ডিংটা, কিন্তু এটুকু উপর থেকেই নিচের গাড়িগুলোকে এত ছোট দেখাচ্ছে যে ঘাবড়ে গেল ও। কোন ভাবে যদি ব্যালকনির উপর না পড়ে বাইরে গিয়ে পড়ে তো দফা রফা হয়ে যাবে একেবারে। হাড়-মাংস এক হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিল ও।

সতর্ক হতে হবে, মনে মনে বলল রানা। নামার ব্যাপারে তো বটেই, রাস্তা থেকে কেউ দেখে ফেলে হাউ মাউ করে যাতে পুলিস জড় করতে না পারে, সে ব্যাপারেও। যা হয় হবে, বলে, প্যারাপেটটা দু'হাতে ভাল করে ধরল ও। প্রথমে একটা পা নামিয়ে ডান হাত বাড়িয়ে ছাদের কার্নিসটা ধরল। এবার? এক সেকেন্ড বিরতি নিল রানা। বাঁ হাতটা প্যারাপেট থেকে সরিয়ে আনলে আবার ধরতে পারবে বলে মনে হয় না, কারণ অন্য পা-টা তখন শূন্যের উপর থাকবে, ভর দেয়ার কিছু পাবে না। অনেকটা জোর করেই বাঁ হাতের আঙুলগুলো ঢিল করে দিয়ে হাতটা নামিয়ে আনল। এখন একটু তাল হারালেই প্রায় ষাট ফুট নিচে গিয়ে ছাতু হতে হবে।

নিচে নামা ছাড়া এখন আর কোন উপায় নেই। উপরে ওঠার পথ বন্ধ। এখন বাঁ হাত দিয়েও কার্নিসটা ধরতে হবে ভাল মত, তারপর ঝুলিয়ে দিতে হবে দুই পা। এক ঝটকায় বাঁ হাতটা নিয়ে গেল কার্নিসের দিকে।

হ্যাঁ, ধরতে পেরেছে। বাঁ হাত নামানোর ছন্দেই অন্য পা-টাও নেমে এসেছে নিচে। দু'হাতে ছাদের কার্নিস ধরে ঝুলে আছে এখন ও। বাঁ হাতটা প্যারাপেট থেকে সরিয়ে আনার পরে প্রায় এক সেকেন্ড মত ওর পুরো শরীরের ওজনটা রক্ষা করতে হয়েছে শুধুমাত্র ডান হাতকে। তখন যদি একটু ফসকাত! কল্পনা করেই শিউরে উঠল রানা।

অনেক কষ্টে বেকায়দায় ঘাড় ঘুরিয়ে নিচে তাকাল ও, ব্যালকনির উপর ঠিক জায়গা মত নামছে কিনা নিশ্চিত হয়ে নিতে চায়। ঠিকই আছে পজিশন। আঙুলগুলো এর মধ্যেই টন টন করতে শুরু করেছে। আর দেরি করা ঠিক হবে

না। শরীরটাকে ঢিল করে, ছেড়ে দিল কার্নিসটা।

জায়গা মতই পড়ল ও। যেখানে নামতে চেয়েছিল ঠিক সেখানেই। সরু এবং ফাঁকা ব্যালকনির উপর পতনের শব্দটা বেশ জোরেই হলো। পড়েই হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল ও। ঝাঁকুনিটা বেশ জোরেই লেগেছে। কয়েক সেকেন্ড লাগল ব্যথাটাকে সইয়ে নিতে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল রানা। সম্ভবত কেউ খেয়াল করেনি শব্দটা। আসলে খুব একটা জোরে হয়নি শব্দ। টেনশনের মুহূর্তে কেবল ওর কাছেই অনেক জোর মনে হয়েছে।

রুম থেকে ব্যালকনিতে আসার ডবল ডোরটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। খোলা না লক করা? হ্যান্ডেল ধরে খানিকক্ষণ টানাটানি করে লাভ হলো না। তালা মারা রয়েছে। দরজার ক্ষতি না করে ঢোকা সম্ভব নয় ভেতরে। আর দরজা ভেঙে ঢুকলে টের পেয়ে যাবে ফ্রান্সিস। এবং সন্দেহজনকদের তালিকায় প্রথমেই যে ও থাকবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আঙুলের ছাপ পাবে। যাকগে, সেটা অনেক পরের ব্যাপার, তখন দেখা যাবে।

দুটো দরজার কোন্‌টা বল্টু লাগানো, আর কোন্‌টা তালার খাঁজের সঙ্গে জোড়া তা বোঝা মোটেই মুশকিলের না। রাতের এসময়ে সম্ভাবনা খুব কম হলেও, আশেপাশের অন্য কোন ব্যালকনিতে কেউ রয়েছে কিনা একবার খেয়াল করে দেখল রানা। রেলিংয়ের পাশে এসে ঝুঁকে রাস্তার দিকে তাকাল। কেউ খেয়াল করছে না এদিকে, নিশ্চিত হয়ে আবার দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কিভাবে কি করবে ঠিক করে নিল প্রথমে।

দরজার দিকে পেছন ফিরে ঝুঁকে ব্যালকনির রেলিংটা শক্ত করে ধরল ও। তার পরে দুই পা জোড়া করে পেছন দিকে—দরজার গায়ে যেখানে তালাটা বসানো সেখানে মারল প্রচণ্ড জোরে এক ঘোড়া-লাথি। যত জোরে লাথি চাপল শব্দটাও হলো ততই জোরে। ঘাবড়ে গেল রানা, কেউ শুনে ফেলল নাকি? প্রায় আধমিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। আশপাশের বারান্দাগুলোর দিকে তাকাল আবার। কেউ এসে দাঁড়ায়নি; বোধহয় শোনেনি কেউ। শুনলেও খেয়াল করেনি।

খোলেনি দরজা। হ্যান্ডেলটা নেড়ে দেখল, বেশ নড়বড়ে হয়ে গেছে। একই ভঙ্গিতে আবার এক লাথি চালাল রানা। কাজ হলো এবার, খুলে গেছে দরজা। এবারও একই রকম শব্দ হয়েছে, বরঞ্চ একটু বেশিই। দরজাটা হাট হয়ে খুলে বাড়ি খেয়েছে ওপাশে। সেই শব্দটাও যুক্ত হয়েছে এবার। দু'পাশের ফাঁকা ব্যালকনিগুলোর দিকে ত্রস্ত চোখে আরেকবার তাকিয়ে দরজা গলে ঢুকে পড়ল ও ছয়শো আটাশ নম্বর রুমে। নিঃশব্দে দরজাটা ভিড়িয়ে দিল পেছনে।

অন্ধকার কামরা। জানালা গলে যেটুকু চাঁদের আলো আসছে তাতে কোন কিছু পড়া সম্ভব নয়, তাছাড়া, রুমের কোণে ডেস্কের ওপর কাগজের গাদাটা একটু সতর্কতার সাথে দেখতে হবে। কি করবে, ভাবতে লাগল রানা। সবগুলো কাগজ নিয়ে কেটে পড়বে, না বাতি জ্বালানোর ঝুঁকি নেবে। অনধিকার প্রবেশের অপরাধটা যদি ক্ষমা করেও, প্রমাণ সরানোর অপরাধ ক্ষমা করবে না ফ্রান্সিস। তাছাড়া কাগজগুলো সত্যিই দরকার হতে পারে ইন্সপেক্টরের। যা-ই হোক, লোকটার সদিচ্ছার প্রতি কোন সন্দেহ পোষণ করে না ও, হতে পারে লোকটার বুদ্ধি একটু

কম। আসলে এধরনের কেসের মুখোমুখি আগে কখনও হয়নি ফ্রান্সিস।

এখানেই দেখবে ও কাগজগুলো। সেক্ষেত্রে বাতি জ্বালানোর ঝুঁকিটা নিতেই হবে।

পর্দাগুলো টেনে দিল রানা। খুব পুরু নয় সেগুলো। বাতি জ্বাললেই দেখা যাবে বাইরে থেকে। বিছানার ওপর থেকে ভারী বেড কভারটা তুলে কার্টেন রেইল থেকে ঝুলিয়ে দিল। এখন মোটামুটি নিশ্চিন্ত। জ্বালানো যায় বাতি। বেডসাইড ল্যাম্পটার সুইচ টিপে দিল ও। ঘরটার চারপাশে তাকিয়ে দেখল—সুফিয়ার হাতব্যাগটা পড়ে আছে একটা চেয়ারের ওপর। সম্ভবত ওখানেই ও রেখেছিল সেটা। ব্যাগটা খুলে ভেতরের জিনিসগুলো দেখল রানা। মেয়েলি সব জিনিসপত্রে ঠাসা। লিপস্টিক, পাউডার, নেইল ফাইল, একটা ছোট্ট চাকু, কয়েকটা রাশিয়ান পিকচার পোস্টকার্ড, কয়েকটা বলপয়েন্ট কলম, ট্র্যান্সপারেন্সি দেখার জন্যে ছোট্ট স্ট্যান্ড সহ ম্যাগনিফাইং গ্লাস একটা। সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া গেল না। সুটকেস, ওয়ার্ডরোব, চেস্ট অভ ড্রয়ারগুলোও দেখল ও। কাপড় ছাড়া আর কিছু নেই সেগুলোয়। ওগুলো রেখে কাগজগুলোর দিকে মন দিল এবার রানা।

একদম উপরে কয়েকটা লে-আউট। খসড়া সবগুলো, ছবি এবং টাইপ এরিয়া চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। লে-আউটগুলো দেখে কিছুই বোঝা গেল না। সেগুলো একপাশে সরিয়ে রেখে টাইপ করা কাগজগুলো দেখতে শুরু করল রানা। শ'খানেক আর্টিক্‌ল হবে। রাশিয়ানদের কর্মকাণ্ডের বিস্তৃত একটা চিত্র পাওয়া সম্ভব আর্টিক্‌লগুলো থেকে। প্রত্যেকটার উপর একটা করে নোট, কোন্ রাশিয়ান ম্যাগাজিনে এবং কখন সেটা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তা লেখা নোটে। পড়তে শুরু করল রানা।

একটু পরেই বুঝতে পারল, সবগুলো আর্টিক্‌ল শেষ করতে রাত ভোর হয়ে যাবে। সারা রাত এখানে বসে থাকা সম্ভব নয়, নিরাপদও নয়। পড়া বাদ দিয়ে একটা একটা করে পৃষ্ঠা দেখে যেতে লাগল ও। অল্প সময়েই দেখা হয়ে গেল কাগজগুলো। কয়েকটা কাগজকে সাধারণ টাইপ করা কাগজগুলো থেকে একটু আলাদা মনে হলো। সেগুলোরও কয়েকটা নিয়ে কাজ শুরু করেছিল সুফিয়া, বোঝা গেল। ছোট খাটো সাব এডিটোরিয়াল কারেকশন করেছে এবং কোন্ টাইপে ছাপা হবে তা নোট করেছে। পরিচিত শব্দগুলো দেখল রানা: বারো পয়েন্ট মিডিয়াম গোথিক লেটারিং এখানে, দশ পয়েন্ট মেট্রোলাইট ক্যাপিটাল সেখানে, আট পয়েন্ট টাইম্‌স রোমান মূল আর্টিক্‌লটার জন্যে। প্রেস সম্পর্কে যার কোন অভিজ্ঞতা নেই তার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকতে পারে, কিন্তু সাব এডিটর এবং কম্পোজিটরদের জন্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সব। স্বাভাবিক এবং সাধারণ।

দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেল রানা। মার্জিন্যাল কোয়্যারি মার্ক কয়েক জায়গায়। যেমন, See OD অর্থাৎ অক্সফোর্ড ডিকশোনারী দেখো, See BRITANICA ইত্যাদি। হঠাৎ এক জায়গায় এসে চোখ আটকে গেল ওর। See Myopic! মাইওপিক! মাইওপিক মানেটা আবার কি? কোন রেফারেন্স বই? কিন্তু জীবনে ওরকম কোন বইয়ের নাম শুনেছে বলে মনে পড়ল না রানার। হতে পারে। বহু বইয়ের নামই তো ও শোনেনি জীবনে। কিন্তু খটকাটা গেল না মন থেকে।

অনেকক্ষণ ধরে গুরুত্বপূর্ণ কিছু না দেখতে পেয়ে একটু ঢিল দিয়েছিল ও। আবার তীক্ষ্ণ হলো দৃষ্টি, সতর্ক ভাবে চেক করতে শুরু করল, বিশেষ করে সুফিয়ার লেখা কমেন্টগুলো। এক মিনিট আগেও ওর সন্দেহ হচ্ছিল, আসলে হয়তো কিছু পাওয়া যাবে না এগুলোয়। কিন্তু এখন ইন্সটিংক্ট বলছে অনেক কিছুই আছে এর ভেতরে। মাইওপিকটা কি?

দ্বিতীয় দুর্বোধ্য কথাটা পেল একটু পরেই, একটা আর্টিকল-এর ছেঁড়া একটা পৃষ্ঠায়। আংশিক সম্পাদিত পৃষ্ঠাটার প্রথম প্যারাগ্রাফটা মেট্রোলাইট বারো পয়েন্টে, দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ দশ পয়েন্ট টাইম্‌স-এ ছাপার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তৃতীয় প্যারাগ্রাফটা আট পয়েন্ট টাইম্‌স? কিন্তু না তো! টাইপ মার্কিংটা সম্পূর্ণ অপরিচিত, আগে কখনও দেখেছে বা শুনেছে বলে মনে পড়ল না। লেখা রয়েছে দশ পয়েন্ট Aggie Waggie। দশ পয়েন্টটা তো বোঝা গেল, টাইপ ইন্সট্রাকশন কিন্তু এই অ্যাগি ওয়্যাগি আবার কি?

এটা সত্যি, হাজার রকমের টাইপ ফেস হতে পারে, এবং স্বল্প সময়ের সাংবাদিক জীবনে তার অনেকগুলো সম্পর্কেই ধারণা লাভ করতে পেরেছে রানা। কিন্তু অনেক বেশি রয়ে গেছে অজানা। জানাগুলোর ভেতরেও কয়েকটা নাম বেশ অদ্ভুত। কিন্তু অ্যাগি ওয়্যাগি কখনও শুনেছে বলে মনে হলো না ওর। নতুন কোন সুইডিশ উদ্ভাবনা নাকি? গোদেনবার্গে এসেই জানতে পেরেছে সুফিয়া?

দশ মিনিট পর তৃতীয় আরেকটা ব্যাপার খেয়াল করল রানা: পেন্সিলে লেখা একটা নোট; একটা আর্টিকল-এর মাথায়। লেখা No contacts, check। কন্ট্যাক্ট, অর্থাৎ কন্ট্যাক্ট প্রিন্ট ছবি। ফটোগ্রাফিক পেপারের সঙ্গে নেগেটিভ কন্ট্যাক্ট করে অর্থাৎ স্পর্শ করে যে প্রিন্ট হয় তাই কন্ট্যাক্ট প্রিন্ট। কিন্তু এই কাগজের বোঝার মধ্যে তো কোন কন্ট্যাক্ট প্রিন্ট দেখেনি রানা; স্ট্রম ব্রাদার্সের অফিসেও না।

কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হয়ে বসে রইল সে। কিছুই বুঝতে পারছে না। এদিকে সুফিয়ার রুম ছেড়ে কেটে পড়ার একটা তাগিদ অনুভব করছে মনে মনে। প্রায় চল্লিশ মিনিট হয়ে গেছে এই রুমে ঢুকেছে ও। আর বেশিক্ষণ থাকা যাবে না এখানে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সটকে পড়া দরকার এখন। ভাগ্য প্রসন্ন হলে কাল সকালের আগে ফ্রান্সিস টের পাবে না যে কেউ ঢুকেছিল এখানে। ইতোমধ্যে অদ্ভুত কথাগুলোর অর্থ খোঁজার চেষ্টা করতে পারবে ও।

বাকি কাগজগুলো ঝটপট দেখে উঠে পড়ল রানা। আর কিছু নজরে পড়ল না। করিডরের দরজা দিয়েই বেরোতে হবে এখন। ব্যালকনি দিয়ে বেরোনোর প্রশ্নই ওঠে না। নামতেই জান খারাপ হয়ে গেছে, ওঠা তো অসম্ভব। আর কোন দরজাও নেই বেরোনোর। কাগজগুলো গুছিয়ে রেখে সুইচ টিপে বাতি নিভিয়ে দিল রানা। অন্ধকারটা চোখে সইয়ে নেয়ার জন্যে কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল। পা টিপে টিপে এগোল দরজার দিকে। হঠাৎ খেয়াল হলো, জানালার পর্দার উপর ঝোলানো বেড কভারটার এককোণায় একটু ফাঁক রয়েছে। এক চিলতে আলো এসে পড়েছে ঘরের ভেতর। সর্বনাশ! ওই ফাঁক দিয়ে বেরোনো ঘরের আলো কেউ দেখে ফেলেনি তো?

ঢোক গিলল রানা। দরজার বাইরে কেউ অপেক্ষা করে নেই তো? আলো

দেখে সন্দেহের বশে এসে হয়তো অপেক্ষা করছে জানার জন্যে, নিষিদ্ধ কক্ষে সত্যিই কেউ ঢুকেছে কিনা? দরজা খোলার আগে টের পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। চান্স নিয়ে দেখতে হবে। দরজার হ্যান্ডেলে হাত রাখল ও। আবার কি মনে করে ফিরে এল। ডেস্কের সামনের ছোট্ট চেয়ারটা দু'হাতে তুলে নিয়ে এল দরজার কাছে। দরজার হ্যান্ডেলের একটু নিচে এমন ভাবে ঠেকিয়ে রাখল চেয়ারের হেলান দেয়ার জায়গাটা যে দরজাটা একটু ফাঁক করলে চেয়ারের পেছনটা একটু উঠে গিয়ে ঠেকে যাবে হ্যান্ডেলের নিচে। ফলে আর ফাঁক হবে না দরজা। চেয়ারের সামনের পায়া দুটো শূন্যে উঠে রইল আটদশ ইঞ্চি।

সাবধানে এক হাতে চেয়ারটা ধরে অন্য হাতে নিঃশব্দে হ্যান্ডেলটা ঘোরাল রানা। হ্যান্ডেলটা পুরো ঘোরার পর আস্তে করে টেনে দরজাটা সামান্য একটু ফাঁক করল ও। ঝুঁকে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করল বাইরে কেউ আছে কি না। করিডরের দরজার সামনের অংশটুকুই দেখা যাচ্ছে ফাঁক দিয়ে। মনে হলো ফাঁকাই করিডরটা। আরও একটু ফাঁক করে আবার উঁকি দিল ও। ডানদিকটা দেখতে পেল না, বাঁদিকের খানিকটা দেখা গেল, একই অবস্থা, ফাঁকা করিডর। খুব একটা নিশ্চিন্ত হতে না পারলেও ধরে নিল করিডরটা ফাঁকা।

আচমকা একটা হাত এসে ঢুকল দরজার ওই ফাঁকটুকু দিয়ে। কালো রঙের একটা পিস্তল ওই হাতে। পর মুহূর্তে রিডের গলা শোনা গেল; 'দাঁড়াও, রানা। যেখানে আছ ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো, নড়বে না একটুও।'

নয়

'পেছনে সরে দরজাটা খোলো,' বলল রিড। 'বাতি জ্বালাবে না, সাবধান!'

'ঠিক আছে, বাবা, ঠিক আছে।' এক পা পেছনে সরে এল রানা। চেয়ারের পেছনটা এক হাতে ধরে রয়েছে এখনও। দরজার হ্যান্ডেলের নিচ থেকে চেয়ারের পিঠটা সাবধানে মুক্ত করে আরেক পা পেছনে সরল ও। পিস্তলটা আরেকটু সামনে এল। রিডের মাথাটা এল পেছন পেছন। ঘরের ভেতর অন্ধকার। করিডরের আলোয় ঝাপসা ভাবে দেখতে পাচ্ছে রিড ওর মুখটা। রানার মুখের দিকেই তাকিয়ে আছে সে, চেয়ারটা বোধহয় খেয়াল করেনি।

আচমকা হালকা চেয়ারটা তুলে রিডের পিস্তলধরা হাতটায় মারল রানা। একই সঙ্গে লাথি মেরে ঠেলে দিল দরজা। পিস্তলটা ছিটকে চলে গেল উপরে, এক সেকেন্ড পর পড়ল কার্পেট মোড়া মেঝেতে। দরজাটা বাড়ি খেয়েছে বেচারার কপালের পাশে।

ঝট করে ভেতর থেকে দরজাটা লাগিয়ে সুইচ টিপে বাতি জ্বালল রানা। তাড়াতাড়ি পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়ে বাতি নিভিয়ে দিল আবার। অনেকটা নিরাপদ বোধ করছে এখন। আমেরিকানটার কাছে আরেকটা পিস্তল থাকতে পারে।

চেয়ারটা পথের সামনে থেকে সরিয়ে দরজার হ্যান্ডেলে হাত রাখল ও। ছিটকিনিটা খুলল আগে, তারপর ঘোরাল হ্যান্ডেল। দ্রুত হাতে দরজা খুলে রুম ছেড়ে বেরিয়ে এল করিডরে।

খালি করিডর। ভেগেছে রিড। না ভেগে থাকলেও অন্তত করিডরে কোথাও নেই সে। কোন দরজার আড়ালে, লিফটের ভেতরে অথবা রানার রুমে অপেক্ষা করে থাকতে পারে। সত্যি সত্যিই ভেগে পড়েও থাকতে পারে, একবার ব্যর্থ হয়ে আরেকবার ঝুঁকি নিতে চায় না বোধহয়।

হোটেল ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রানা। একবার বেরোতে পারলে আর ঢুকছে না ও এখানে। অন্য কোন হোটেলে জায়গা খুঁজে নিতে হবে। মোটকথা এখান থেকে সরে পড়তে হবে। পুলিস এবার পেলে আর ছাড়বে না, তার ওপর রয়েছে জন রিড। এই লোকটার উদ্দেশ্য এখনও বুঝে উঠতে পারেনি রানা।

কিন্তু আপাতত এই ছ'তলা থেকে নামতে হবে। বিকল্প পথ দুটো, লিফট এবং ফায়ার এস্কেপ। রিড যদি একটায় অপেক্ষা করে তো অন্যটা সে মিস করবে। অবশ্য ওর সাথে যদি অন্য কেউ থেকে থাকে তো অন্য কথা। যাই হোক একটা পিস্তল রয়েছে কাছে, তত ঘাবড়াবার কিছু নেই।

লিফটটাই পছন্দ হলো রানার। কিন্তু দুটো লিফটের একটাও উপরে নেই। বোতাম টিপে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ও। আধ মিনিট পর উঠে এল লিফট। খালি। ভেতরে ঢুকে গ্যারেজ বাটনটা টিপে দিল।

লিফটে করে গ্যারেজে নামতেও আধ মিনিটের বেশি লাগল না। কোটের পকেটে পিস্তলের বাঁটে হাত রেখে বেরিয়ে এল ও লিফট থেকে। চারদিকে তাকাল তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টিতে। ফাঁকা গ্যারেজটা। উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। গাঢ় রঙের ছায়া সৃষ্টি হয়েছে তাতে। দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। দুটোরই মুখ বেরোনোর পথের দিকে। গ্যারেজ থেকে রাস্তায় উঠতে চায় রানা। তার আগে উঁকি দিল রাস্তায়। কয়েকজন লোক হেঁটে যাচ্ছে রাস্তার পাশের পেভমেন্টের উপর দিয়ে। কিন্তু রিডের ছায়াও দেখা গেল না কোথাও। সামনে অবশ্য অনেকগুলোই জায়গা দেখতে পেল ও রিডের পক্ষে যেখানে লুকিয়ে থাকা মোটেই অসম্ভব নয়।

গ্যারেজ ছেড়ে রাস্তায় উঠে এল রানা। স্ক্যান্ডার প্রবেশ পথটা পেছনে রেখে দ্রুতপায়ে চলতে শুরু করল পেভমেন্টের উপর দিয়ে। প্রত্যেকটা বাড়ির কোণ পার হওয়ার আগের মুহূর্তে মনে হচ্ছে এই বুঝি পাঁচিলের ওপাশ থেকে পিস্তল হাতে বেরিয়ে এল রিড।

পাঁচ মিনিটের ভেতর দুটো ব্লক পেরিয়ে এল ও। হোটেলের কাছাকাছি তাও দু'একজন লোক দেখা যাচ্ছিল, এখন রাস্তা একেবারে ফাঁকা। কোথাও থেকে যদি রিড বাবাজী উদয় হয় এবং সঙ্গে দলবল থাকে তো মুশকিলই হবে। সামনে থেকে একটা খালি ট্যাক্সি আসতে দেখে হাত উঁচু করে থামাল সেটা। স্ক্যান্ডার দিকে যাচ্ছে ট্যাক্সিটা। তাতে কিছু আসে যায় না, উঠে বসল রানা। সেই সিনেমা হলটার কাছে যেতে বলল ড্রাইভারকে। আপাতত আর কোন জায়গার কথা মনে এল না ওর। কেউ ফলো করছে নাকি? পেছন ফিরে তাকাল। না, তেমন কিছু মনে হচ্ছে না।

সিনেমা হলটার সামনে এসে দাঁড়াল ট্যাক্সি। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নেমে এল রানা। হোটেলের দিকে হাঁটতে শুরু করল আবার।

সুফিয়ার উদ্ভট সাব-এডিটোরিয়াল নোটগুলোর কথা মনে পড়ল। 'কন্ট্যাক্টস' কথাটা ঘুরপাক খাচ্ছে মাথার ভেতর। 'নো কন্ট্যাক্টস— চেক'। আর্টিক্‌ল এবং ছবির পটভূমিতে চিন্তা করলে, কন্ট্যাক্ট প্রিন্টের কথাই মনে আসে প্রথমে। কিন্তু কোন কন্ট্যাক্ট প্রিন্ট নজরে পড়েনি ওর, না সুফিয়ার রুমে না স্ট্রম ব্রাদার্সে। তাহলে?

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত মনে পড়ল কথাটা—কন্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করে সুফিয়া। মাস তিনেকও হয়নি বোধহয়, চশমা নিয়েছিল ও। সাধারণ চশমায় ওর সৌন্দর্যের অনেকটাই ঢাকা পড়ে যায় দেখে রানাই ওকে কন্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছিল। হাতব্যাগেই সাধারণত রাখত ও সেগুলো। হাতব্যাগটা একটু আগেই দেখেছে রানা। ব্যাগে ছিল না সেগুলো। ওর সাধারণ কালো ফ্রেমের চশমাটাও ছিল না ব্যাগে। তাতে কিছু বোঝা যায় না অবশ্য, ব্যাগে না রেখে অন্য কোথাও রেখে থাকতে পারে, তাড়াহুড়োয় হয়তো খেয়াল করেনি রানা। কিন্তু অত সহজে ছেড়ে দিতে মন চাইছে না, নিশ্চয়ই কিছু একটা অর্থ আছে কথাটার।

ছোট্ট একটা বাক্সে রাখত সুফিয়া কন্ট্যাক্ট লেন্সগুলো, মনে পড়ল রানার। ছোট্ট একটা প্লাস্টিক টিউব; দুই ইঞ্চির মত লম্বা এবং এক ইঞ্চি ডায়ামিটার। বাক্সটার দু'মাথায় দুটো ঢাকনা আছে। 'L' এবং `R' চিহ্ন দেয়া ঢাকনা দুটোয়। এল অর্থাৎ লেফট এবং আর অর্থাৎ রাইট। ফলে কোন্‌টা কোন্ চোখের তা আর তালগোল পাকিয়ে যাওয়ার ভয় থাকে না। আরেকটা জিনিস আছে প্লাস্টিক টিউবটায়, স্বচ্ছ একটা নাম লেখার জায়গা। ছোট একটুকরো কাগজে মালিকের নাম ঠিকানা লিখে ঢুকিয়ে দিতে হয় জায়গাটায়। হারিয়ে গেলেও ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাতে।

'নো কন্ট্যাক্টস—চেক'। এতক্ষণে যেন একটু আভাস পেতে শুরু করেছে রানা। হ্যাঁ, খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে। আমেরিকায় রানার কাছে ফোন করেছিল সুফিয়া। জানে যেখানেই থাকুক না কেন, বিপদে পড়ছে শুনলেই ছুটে আসবে মাসুদ রানা। যখন ফোনে পাওয়া গেল না ওকে তখন লিখল নোটটা এবং ফোন করল পুলিসকে। নোটটা এমন একজনের জন্যেই লেখা, যে জানে কন্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করে সুফিয়া। অন্য কেউ কোন অর্থ খুঁজে পাবে না ওটার।

নো কন্ট্যাক্টস—, অর্থাৎ হারিয়ে গেছে কন্ট্যাক্ট লেন্স। নাকি লেন্স কেস? চেক অর্থাৎ? খুঁজে বের করো? কোথায় খুঁজবে রানা?

বড় বড় বাতিগুলো দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছে ও। ছোট ছোট কয়েকটা রেস্টুরেন্ট দেখতে পেল রাস্তার ওপাশে। এগুলোর একটাতেই সকালে ব্রেকফাস্ট সেরেছিল। রাত প্রায় বারোটা, এখনও খোলা রয়েছে। রেস্টুরেন্টগুলোর পর একটা ছোট সিগারেটের দোকান, পাশে একটা নিউজ স্ট্যান্ড, তারপরেই একটা চশমার দোকান। তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হয়ে দোকানটার সামনে পৌঁছাল রানা। এত রাতেও দোকানটা খোলা দেখে একটু আশ্চর্য হলো ও। কাউন্টারে এক মহিলা বসে বসে ক্যাশ মেলাচ্ছে। পেছনে একটা রুম মত, ডাক্তারের চেম্বার বোধহয়।

প্রশ্নবোধক চোখে চাইল মহিলা ওর দিকে।

'গুড ইভনিং,' বলল রানা। 'একটা ব্যাপারে খোঁজ করছিলাম আমি।'

'বলুন।'

'আমার স্ত্রী···বোধহয় এক জোড়া কন্ট্যাক্ট লেন্স ফেলে গেছে আপনার দোকানে···'

'এক মিনিট দাঁড়ান,' বলে পেছনের রুমে চলে গেল মহিলা। কয়েক সেকেন্ড পরেই সাদা কোট পরা এক লোককে ডেকে নিয়ে এল।

'দুঃখিত,' বিনয়ের সঙ্গে বলল রানা, 'সুইডিশ ভাষা জানি না আমি।'

'ইংরেজি?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে বলুন কি করতে পারি আপনার জন্যে?'

'আমার স্ত্রীর ধারণা সে তার কন্ট্যাক্ট লেন্সজোড়া ফেলে গেছে এখানে। পরশু রাতে এসেছিল আপনার দোকানে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' হাসি ফুটে উঠল লোকটার মুখে। 'কাউন্টারের ওপর ফেলে রেখে গিয়েছিলেন। গোলাপী রঙের লেন্স কেসে ছিল তো? চিন্তা করতে মানা করবেন আপনার স্ত্রীকে।'

আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছিল রানা। জায়গামত লেগে গেছে বুঝতে পেরে মনে মনে খুশি হয়ে উঠল। বলল, 'অনুগ্রহ করে ওটা ফেরত দেবেন কি আমাকে?'

'দুঃখিত। আমি তো পোস্ট করে দিয়েছি ওটা। আমি জানি না এখানে কোথায় থাকেন মহিলা। ওটার গায়ে যে ঠিকানা ছিল ওই ঠিকানায়ই পোস্ট করে দিয়েছি। চিন্তা করবেন না, তুলো দিয়ে মুড়ে ভাল মত প্যাক করে দিয়েছি, নষ্ট হবে না।'

'ও, তাই নাকি? ভালই করেছেন। একটা কথা বলবেন?—কোন্ ঠিকানা ছিল ওটার ওপর?'

চোখ কপালে উঠে গেল লোকটার। 'কয়টা ঠিকানা আপনাদের?'

মৃদু হাসি ফুটিয়ে তুলল রানা মুখে। 'দুটো। প্লাস ওর অফিসের ঠিকানা। ঠিক কোন্ ঠিকানাটা যে ছিল ওটার ওপর তা স্মরণ নেই ওর, আমিও মনে করতে পারছি না।'

'উ-ম-ম···আমার মনে হয় নরওয়ে। হ্যাঁ, মনে পড়েছে, নরওয়েই।' আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইল লোকটা ওর দিকে। 'নরওয়ে! আপনি ইংলিশ নন?'

'না, বাঙালী। আমার স্ত্রী নরওয়েজিয়ান।' চটপট উত্তর দিল রানা।

'ও, তাই বলুন। আরেকটু হলে তো ঘাবড়ে যাচ্ছিলাম আমি,' হাসতে হাসতে বলল লোকটা। 'পুরো ঠিকানাটাই মনে পড়েছে আমার, জার্লশফ, স্যান্ডনেস জি. বি. নরওয়ে, মিস্টার হেন্ডারসন। দেখলেন তো, কেমন স্মরণশক্তি আমার?'

ঠিকানাটা লিখে নেয়ার ইচ্ছা দমন করল রানা। এমনিতেই যথেষ্ট সন্দেহ উৎপন্ন করা হয়ে গেছে লোকটার মনে। আর না। মনে মনে আউড়ে চলেছে ও, হেন্ডারসন, জার্লশফ, স্যান্ডনেস জি. বি. নরওয়ে।

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।' পকেট থেকে কয়েকটা ক্রোনার বের করল

রানা, 'ডাক খরচা…'

'না না, কি যে বলেন! এটুকু করা তো আমার কর্তব্য। এমনিতেই বোধহয় অনেক অসুবিধা হচ্ছে আপনার স্ত্রীর।'

'খুব একটা না। ওর চশমাও আছে, আপাতত সেটা দিয়েই কাজ চালাচ্ছে। তবে কন্ট্যাক্ট লেন্সগুলো ফিরে পেলে সত্যিই খুব খুশি হবে ও।'

আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল ও চশমার দোকান ছেড়ে। রাস্তায় বেরিয়ে একটা স্ট্রীট ল্যাম্পের নিচে দাঁড়িয়ে এক টুকরো কাগজে লিখে নিল ঠিকানাটা।

অবশেষে একটা সূত্র পাওয়া গেল। ওই তিন ঘণ্টায় কি করেছিল সুফিয়া তা পুরোটা না হলেও আংশিক অন্তত জানা গেছে। মনে-মনে পুরো ব্যাপারটা আরেকবার খতিয়ে দেখল রানা। প্রথমত, সুফিয়া কিছু একটা ঘাড় থেকে নামানোর জন্যে ইচ্ছে করেই হোটেল ছেড়ে বাইরে গিয়েছিল। সম্ভবত লেন্স-কেসটাই সেই কিছু একটা। দ্বিতীয়ত, লেন্স-কেসে ছোট কিছু একটা ছিল। লেন্স-কেস এবং চশমার দোকানের মাঝে অবশ্যম্ভাবী একটা যোগাযোগ আছে—ও জানে একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ কন্ট্যাক্ট লেন্স ফেরত দেয়ার ঝামেলাটুকু পোহাবে, তা যারই হোক না কেন সেটা। কিন্তু সিনেমা হলে কেন? প্রশ্নটার কোন সদুত্তর খুঁজে পেল না রানা। হয়তো লেন্স কেসটা প্রথমে সিনেমা হলে ফেলে আসার কথা ভেবেছিল, ঝাড়ুদাররা খুঁজে পাবে এরকম মনে করে। কিন্তু সিনেমা হলের লোকেরা হারানো জিনিস সংরক্ষণের ব্যাপারে তেমন যত্নবান নাও হতে পারে ভেবে বোধহয় পরে আবার সিদ্ধান্ত পাল্টায় ও। কেসটায় আছে কি? সোভিয়েট ইন্ডাস্ট্রি পত্রিকার কভার ট্র্যান্সপারেন্সিটা চুরি করে নিয়ে আসছিল সুফিয়া এটা ভাবাই যায় না। রীতিমত হাস্যকর সন্দেহটা। গোদেনবার্গে আসার পরেও যদি ও জিনিসপত্রের ভেতর দেখত ওটা তো ফেরত দিত ভ্লাদিমিরকে। তাহলে?

হঠাৎ মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল রানার: ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক একটা ট্র্যান্সপারেন্সি মস্কো থেকে নিয়ে এসেছে সুফিয়া। সম্ভবত খুবই গুরুত্বপূর্ণ ট্র্যান্সপারেন্সিটা—সোভিয়েট ইন্ডাস্ট্রির কভার এর চেয়ে অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ওটার কারণে দু'দু'জন লোক ইতোমধ্যেই খুন হয়ে গেছে এবং সুফিয়া নিজেও কিডন্যাপড হয়েছে— সম্ভবত দু'বার। এতক্ষণ বেঁচে আছে কিনা কে জানে!

নিউজস্ট্যান্ডটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। একটা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান গাইডবুক কিনল। পাশের একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে কফির অর্ডার দিল। গরম কফিতে চুমুক দিতে গিয়ে গাইডটা উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগল। নরওয়ের পরিচিতি দেয়া অংশটা যেখানে, সেখানে কয়েকটা পাতা ওলটাতেই পেয়ে গেল স্যান্ডনেস। স্ট্যাভানগারের কাছাকাছি জায়গাটা। কিন্তু জার্লশফটা পাওয়া গেল না। খুবই ছোট জায়গা বোধহয়। জি. বি. কথাটার যে কি মানে এবং নরওয়ে বা স্যান্ডনেসের সঙ্গে কি সম্পর্ক ওটার তাও বুঝতে পারল না রানা। এন্ড কোং-এর নরওয়েজিয় রূপ না কি? যেমন, সুইজারল্যান্ডে এ. জি. জার্মানিতে জি. এম. বি. এইচ। সম্ভবত। এছাড়া আর কি হতে পারে?

কিন্তু, হেন্ডারসনটা কে, আর কেনই বা সুফিয়া জিনিসটা নরওয়েতে পাঠাল।

যতটুকু জানে রানা নরওয়েতে কেউ নেই ওর। আত্মীয় না থাকতে পারে, বন্ধুও কি নেই? হতে পারে ছোটবেলার স্কুল-বন্ধু অথবা দূর সম্পর্কের কোন আত্মীয় এই হেন্ডারসন লোকটা।

ঘড়ির দিকে তাকাল রানা, প্রায় মধ্যরাত। লেন্স-কেসের গন্তব্যটা যদি স্যান্ডনেস হয় তো সেখানেই যেতে হবে, ভাবল রানা। কিন্তু আপাতত এই মাঝ রাত্তিরে ট্র্যান্সপোর্ট পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। এদিকে খিদেও পেয়েছে বেশ।

আরেক কাপ কফি আর একটা ডবল স্যান্ডউইচের অর্ডার দিল ও। পকেট থেকে ঠিকানা লেখা কাগজের টুকরোটা বের করে স্যান্ডউইচ চিবোতে চিবোতে আওড়াতে লাগল, হেন্ডারসন, জার্লশফ, স্যান্ডনেস জি. বি. নরওয়ে। স্যান্ডউইচ এবং দ্বিতীয় কাপ কফি শেষ করে কাগজের টুকরোটায় আগুন ধরিয়ে অ্যাশট্রেতে ফেলে দিল রানা। আস্তে আস্তে পুড়ে কালো খানিকটা ছাইয়ে পরিণত হলো কাগজটা। মুখস্থ হয়ে গেছে ঠিকানাটা, সম্ভবত জীবনে আর ভুলবে না।

তাহলে তিনটে জিনিস পাওয়া গেল: নরওয়ের ঠিকানাটা, আর শব্দ দুটো; মাইওপিক এবং অ্যাগি ওয়্যাগি। ঠিকানার ব্যাপারটা বোঝা গেছে: ওই ঠিকানায় পাঠিয়েছে সুফিয়া লেন্স-কেসটা, যার ভেতরে সম্ভবত একটা গুরুত্বপূর্ণ ট্র্যান্সপারেন্সি রয়েছে। বাকি রইল শব্দ দুটো, নিশ্চয়ই ওর নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে কোন সূত্র রয়েছে শব্দ দুটোতে। কিন্তু সেই সূত্র?

মাইওপ মানে দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা, আর মাইওপিক মানে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ এমন লোক। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে বলেই সুফিয়াকে চশমা পরতে হয় বা কন্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করতে হয়। কন্ট্যাক্ট লেন্সগুলো আবার জেনেশুনেই এমন এক জায়গায় ফেলে এসেছে যে ও জানে সেখান থেকে ঠিকানা মত পাঠিয়ে দেয়া হবে সেগুলো। তাহলে? একটা বৃত্তের ভেতরেই ঘুরপাক খাচ্ছে সমস্যাটা। তাছাড়া নরওয়ের ঠিকানার ব্যাপারটাও ভাল বুঝতে পারছে না রানা। স্বাভাবিক ভাবে সুফিয়ার লেন্স-কেসের ওপর নরওয়ের ঠিকানা থাকার কথা নয়, ওর নামের সঙ্গেও হেন্ডারসন নেই। তাহলে কেন ও ওই নাম ঠিকানা লেখা লেবেল এঁটেছে লেন্স-কেসে? নিশ্চয়ই ইচ্ছে করেই করেছে এ কাজটা। পুরো ব্যাপারটাই প্ল্যান মাফিক করেছে ও, সিনেমায় যাওয়া, প্রায় মধ্যরাতে চশমার দোকানে যাওয়া এবং কাউন্টারে লেন্স-কেসটা ফেলে আসা। সবগুলো ঘটনা যোগ করলে একটাই উত্তর পাওয়া যায়, তা হলো, ও বুঝতে পেরেছিল ওর ওপর নজর রাখা হচ্ছে। এবং এছাড়া আর কিছুই করার ছিল না বলেই করেছে ও কাজগুলো।

কিন্তু এখনও সন্তুষ্ট হতে পারছে না রানা। স্ক্যান্ডা হোটেলের লেটার বক্সে আগুন লাগাল কে? কেন? কিছু একটা ধ্বংস করতে চেয়েছে কেউ এবং সেটা সুফিয়ার পোস্ট করার কোন জিনিস হওয়ার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি। পোস্টে কি পাঠাতে চেয়েছিল ও এবং কোথায়? ঘটনাটা ঘটেছিল ও হোটেল ছেড়ে বেরোনোর আগে। ওর কাছে কি একাধিক গোপনীয় জিনিস ছিল? না বোধহয়। হঠাৎ করেই স্পষ্ট হয়ে গেল ব্যাপারটা রানার কাছে। বুঝতে পেরেছে ও কেন চশমার দোকানে গিয়ে লেন্স-কেসটা ফেলে এসেছে সুফিয়া।

ট্র্যান্সপারেন্সিটার কারণে আক্রান্ত হতে পারে সন্দেহ করে ওটা ও সরাতে

চায় নিজের কাছ থেকে। কিন্তু জিনিসটার গুরুত্ব বুঝে ওটা নষ্ট করে না ফেলে কোন উপায়ে গোদেনবার্গ থেকে পাচার করার সিদ্ধান্ত নেয়। ডাক মারফত পাচার করা যায় কিনা এটা পরীক্ষা করার জন্যেই কিছু একটা ও পোস্ট করে হোটেলের মেইল বক্সে। যখন দেখল মেইল বক্সে আগুন লাগিয়ে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে চিঠিপত্র, তখন ও জিনিসটা পোস্ট করার চিন্তা বাদ দিয়ে ওইভাবে চশমার দোকানে ফেলে এসেছে।

কিন্তু এখন কি করা যায়? মাঝ রাত পার হয়ে গেছে। প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে। স্ক্যান্ডায় ফেরার কথা ভুলেও ভাবল না রানা। হোটেলের বিল পরে কোন এক সময় মিটিয়ে দিলেই চলবে। আর ওখানে ওর যেসব জিনিসপত্র রয়েছে তা-ও পরে কোন এক সময় নিয়ে নেয়া যাবে, না নিলেও ক্ষতি নেই বিশেষ। ও নিজেই এখন ওর সবচেয়ে বড় সমস্যা। বিশেষ করে সকালে স্ট্রম ব্রাদার্সে করা ফটো কপিগুলো; কোটের ভেতরের পকেটটা ফুলে উঁচু হয়ে রয়েছে সেগুলোর কারণে।

এয়ারপোর্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রানা। সেখানে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে এবং প্রথম প্লেনেই পাড়ি জমাবে নরওয়ের উদ্দেশে। ভাগ্য ভাল হলে এভাবেই সবার হাত গলে বেরিয়ে যেতে পারবে ও। ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিস সম্ভবত সকালের আগে জানতে পারবে না সুফিয়ার রুমে অনধিকার প্রবেশের কথা, যদি না ইতোমধ্যে রিড জানিয়ে থাকে তাকে। তবে মনে হয় না রিড জানাবে ইন্সপেক্টরকে, কারণ তাহলে ওর নিজেরই ফেঁসে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

স্যান্ডউইচ এবং কফির বিল মিটিয়ে দিয়ে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এল রানা। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সি খুঁজতে লাগল। গোদেনবার্গ থেকে স্ট্যাভেনগার পর্যন্ত ডাইরেক্ট ফ্লাইট নেই বোধহয়; থাকলেও কাল সকালে আছে কিনা কে জানে। তবে কোপেনহেগেন পর্যন্ত স্ক্যান্ডিনেভিয়ান এয়ারলাইন্স সিস্টেমের একটা ফিডার লিঙ্কফ্লাইট থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তারপর কোপেনহেগেন থেকে স্ট্যাভেনগারের প্লেন পাওয়া বোধহয় শক্ত কিছু হবে না। অথবা অসলো হয়েও যাওয়া যেতে পারে, ভাবল রানা। যেভাবেই হোক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জার্লশফ, স্যান্ডনেসে গিয়ে পৌঁছতে হবে এটাই হলো কথা।

বেশিক্ষণ লাগল না ট্যাক্সি পেতে। এয়ারপোর্টে পৌঁছতেও লাগল না বেশিক্ষণ। মাঝ রাতের ফাঁকা রাস্তা ধরে উড়িয়ে নিয়ে এল ড্রাইভার। টার্মিনাল বিল্ডিংয়ে ঢুকে লাউঞ্জের নির্জন একটা কোণ বেছে নিয়ে বসল রানা। এই রাতেও যথেষ্ট ব্যস্ততা এয়ারপোর্টে। ভিড়ও কম নয়। ট্র্যান্স আটলান্টিক এয়ার লাইন্সের নিউ ইয়র্ক থেকে আসা একটি ফ্লাইট যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে আটকে গেছে। সন্ধ্যা ছ'টায় কোপেনহেগেন-এর পথে রওনা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আপাতত আগামী এক ঘণ্টার মধ্যে ছাড়ার সম্ভাবনা নেই প্লেনটার। এক দঙ্গল যাত্রী শুকনো মুখে অপেক্ষা করছে। কোপেনহেগেন এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে আসা আত্মীয়স্বজনের কথা মনে পড়ছে বোধহয় বেচারাদের।

স্বস্তি বোধ করছে রানা। ফাঁকা লাউঞ্জে একা একা একটা লোক বসে রয়েছে দেখলেই সন্দেহ হত পুলিসের। এয়ারপোর্ট ফাঁকা থাকলে ওদের হাতেও যথেষ্ট সময় থাকত এবং কে তুমি, কোথায় যাবে, এত রাতে এয়ারপোর্টে কেন ইত্যাকার

প্রশ্নে জর্জরিত করত ওকে।

যেখানে বসে রয়েছে ও সেখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ডিপার্চার বোর্ডটা। সকাল ছ'টায় একটা ফ্লাইট আছে কোপেনহেগেনের। চমৎকার, মনে মনে বলল রানা। কাউন্টারের দিকে এগোল ও। এস.এ.এস-এর ইনফর্মেশন ডেস্কটায় আটকে পড়া যাত্রীদের ভিড়। ক্রুদ্ধ গলা শোনা যাচ্ছে একেকজনের। কাউন্টারের মেয়ে দুটোর নাজেহাল অবস্থা। ট্র্যান্স আটলান্টিকের ডি. সি-১০টার দেরির ব্যাপারে সত্যিই ওদের কোন কারসাজি নেই বোঝাতে গলদঘর্ম অবস্থা বেচারাদের। ওই কিচিরমিচিরের ভেতর দাঁড়িয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যটা সংগ্রহ করতে নাজেহাল অবস্থা হলো রানারও। বহু কষ্টে ওর সামনে আসতে পেরে বর্তে গেল যেন মেয়েটা। জানাল, ভোর ছ'টায় কোপেনহেগেন ফ্লাইট সাতটা দশের স্ট্যাভেনগার ফ্লাইটের সঙ্গে কানেকটেড। তাড়াতাড়ি একটা টিকিট কিনে আবার আগের জায়গায় এসে বসল ও।

শেষ পর্যন্ত ভোর চারটায় ঘোষণা করা হলো পনেরো মিনিটের মধ্যে ছাড়বে ট্র্যান্স আটলান্টিকের প্লেনটা। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ইনফর্মেশন কাউন্টারের মেয়ে দুটো। কয়েক মিনিটের মধ্যে ফাঁকা হয়ে গেল লাউঞ্জটা। একমাত্র রানা বসে আছে লাউঞ্জে। কোপেনহেগেন বা অন্যান্য ভোরের ফ্লাইটে যারা যাবে তারা এসে ভিড় করতে শুরু করবে একটু পরেই। তবে আরও ঘণ্টাখানেকের আগে নয় বোধহয়। কয়েকজন ক্লিনার পরিষ্কার করতে লেগে গেল ফাঁকা এয়ারপোর্ট টার্মিনালটা। দু'একজন ইউনিফর্ম পরা লোক মাঝে মধ্যে আসা-যাওয়া করতে লাগল লাউঞ্জ পার হয়ে। তাছাড়া শান্ত আর চুপচাপ জায়গাটা। এত নিস্তব্ধ যে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল রানা। কেমন যেন অনাবৃত লাগছে নিজেকে। মনে হচ্ছে, যে-কোন মুহূর্তেই ইউনিফর্মধারী কেউ একজন এসে জিজ্ঞেস করবে, কি ব্যাপার, এখানে একা বসে কি হচ্ছে?

পুলিসের দৃষ্টিকোণ থেকে নিঃসন্দেহে গুরুতর অপরাধ করেছে ও। ফ্রান্সিস নিশ্চয়ই খুঁজবে ওকে। এবং শুধুমাত্র ফ্রান্সিস নয় আরও অনেকেই হয়তো খুঁজবে। রিড তো রয়েছেই, তাছাড়া আরও কে কে আছে কে জানে। একেকটা মিনিট পার হয়ে যাচ্ছে আর অস্বস্তির পরিমাণও বেড়ে উঠছে। এমন একটা অবস্থায়, চুপচাপ বসে থাকার অর্থ দৃষ্টি আকর্ষণ করা, হেঁটে চলে বেড়ানো অর্থও দৃষ্টি আকর্ষণ করা। তাহলে কি করা যেতে পারে?

আরও কয়েকটা মিনিট পার করে দিল ও চুপচাপ বসে থেকে। উঠে দাঁড়াল তারপর। তাকাল দরজার দিকে। ছায়া মূর্তির মত একটা লোক দেখা যাচ্ছে কাঁচের দরজার ওপাশে। কয়েক গজ দূরে থামের আড়ালে একটা চেয়ার দখল করে আবার বসে পড়ল ও। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে রানা। সময়টা যেন থমকে আছে। একবার ঘড়ি দেখার পরে যখন মনে হচ্ছে আধ ঘণ্টা পার হয়ে গেছে তখন আবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখছে মাত্র দু'মিনিট পার হয়েছে।

পকেট থেকে টিকিটটা বের করল ও, উল্টেপাল্টে দেখল। ফ্লাইট চেক ইন-এর সময় লেখা রয়েছে সাড়ে পাঁচটা। পাঁচটা সোয়া পাঁচটার দিকেই যথেষ্ট আলো হয়ে যাবে বাইরে, ভাবছে রানা। তারপরেই আসতে শুরু করবে যাত্রীরা, আবার

সরগরম হয়ে উঠবে লাউঞ্জটা।

সোয়া পাঁচটার সময় উঠল রানা। টয়লেটে গেল। খামোকা ফ্লাশ টেনে দিয়ে হাত মুখ ধুলো। স্লটারে একটা কয়েন ফেলে ইলেকট্রিক শেভার দিয়ে শেভ করল। শেভারটার গায়ে একটা স্টিকার লাগানো, তাতে লেখা: 'স্বাস্থ্য সম্মত'। স্বাস্থ্য সম্মত হোক আর না হোক, সময় কাটানো দরকার। চুল আঁচড়ে, টাইয়ের নট ঠিক করে বাইরে বেরিয়ে এল আবার।

দশ গজ দূরেই এক পুলিসকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ও। টয়লেটের দরজা বন্ধ করার শব্দে পেছন ফিরে তাকাল পুলিসটা। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসতে লাগল ওর দিকে। নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে। আশেপাশে তাকাল রানা, দৌড়ে কোথাও লুকানো যায় কি না। কিন্তু না, আরও সাত আটজন পুলিস দেখা গেল, লাউঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। কোন চান্স নেই।

'পাসপোর্টটা দেখি আপনার,' রানার সামনে এসে বলল পুলিসটা। বিনা বাক্যব্যয়ে পকেট থেকে পাসপোর্ট বের করে দিল রানা।

'মাসুদ রানা?' ভুরু কুঁচকে পড়ল লোকটা। 'আপনাকে একটু আসতে হবে আমার সঙ্গে, মিস্টার রানা।'

'দেরি হবে না তো? ছ'টার ফ্লাইটে আমাকে কোপেনহেগেন যেতে হবে,' বলল রানা।

'সেটা দেখব আমরা, আপনি আসুন আমার সাথে।'

অগত্যা অনুসরণ করল ও পুলিসটাকে। ভোর ছ'টায় কোপেনহেগেন ফ্লাইটে যাত্রীদের চেক-ইন-এর জন্যে কাউন্টারে রিপোর্ট করার ঘোষণা দেয়া হচ্ছে তখন লাউডস্পিকারে।

ওকে নিয়ে এয়ারপোর্টের পুলিস ব্লকে ঢুকল লোকটা। ফোন তুলে ডায়াল করল। লাইন পেতেই সুইডিশ ভাষায় একগাদা কথা বলে গেল তড়বড় করে। দুটো মাত্র শব্দ বুঝতে পারল রানা: ইন্সপেক্টর এবং ফ্রান্সিস। দমে গেল রানা ভেতর ভেতর। ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিস তাহলে খবর পেয়ে গেছে? এখন? হাতকড়া লাগিয়ে পুলিস স্টেশনে নিয়ে যাবে?

কিন্তু সেরকম কিছু ঘটল না। ওকে একটা চেয়ারে বসিয়ে রেখে অন্য একটা চেয়ারে বসে অপেক্ষা করতে লাগল পুলিসটা।

'এখন? আমার প্লেন তো অপেক্ষা করছে,' বলল রানা।

'আপনিও অপেক্ষা করুন।'

অপেক্ষা করতে থাকল রানা। ছ'টা বাজল, এস.এ.এস.-এর কোপেনহেগেন ফ্লাইট ছেড়ে গেল। এক কাপ কফি দিল পুলিস লোকটা। কফিটুকু শেষ করে চুপচাপ আঙুল মটকাতে লাগল রানা। আরও দু'তিনজন পুলিস এসে ঢুকল রুমটায়। কেউ কোন কথা বলল না ওর সাথে। ও-ও দু'তিনবার কথা বলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো, জবাব দিল না কেউ।

অনেকক্ষণ পর—কতক্ষণ খেয়াল করার প্রয়োজন বোধ করেনি রানা, খুলে গেল দরজা। ফ্রান্সিস এসে ঢুকল। চোখ দুটো ফোলা ফোলা, লাল; রাতে ভাল ঘুম হয়নি বোধহয়। গম্ভীর মুখ, দেখলেই বোঝা যায় বেশ চটে আছে।

'আমার সঙ্গে আসুন,' আর কোন কথা বলল না ফ্রান্সিস।

উঠে দাঁড়াল রানা। ইন্সপেক্টরকে অনুসরণ করে রুমের বাইরে গেল। কাঁচের দরজা দিয়ে দেখতে পেল, বাইরে পুলিসের একটা ভলভো দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সেদিকে গেল না ফ্রান্সিস। তার বদলে ডিপার্চার গেটগুলোর দিকে চলতে লাগল সে। বিস্ময়ের সঙ্গে পেছন পেছন যেতে লাগল রানা।

গেটে পৌঁছে সামনে দাঁড়ানো অফিসারটার হাতে একটা টিকিট ধরিয়ে দিল ফ্রান্সিস। রানার দিকে তাকিয়ে পাসপোর্ট চাইল অফিসার। কয়েক সেকেন্ড লাগল আনুষ্ঠানিকতাটুকু শেষ হতে। আবার চলতে লাগল রানা ইন্সপেক্টরের পেছন পেছন। নিঃশব্দে পেরিয়ে এল ওরা করিডরটা। করিডরের শেষে পৌঁছে ডানে ঘুরল ফ্রান্সিস। সামনে একটা গেট। গেটের মাথায় একটা বোর্ড টাঙানো। তাতে লেখা এম. কে-৬৩২, গোদেনবার্গ—লন্ডন। বাইরে টারম্যাকের উপর দাঁড়িয়ে আছে ঝকঝকে সুন্দর একটা এ-৩০০ এয়ার বাস!

রানাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে প্লেনে উঠল ফ্রান্সিস। প্লেনের লেজের দিকে একটা সীটে নিয়ে বসাল ওকে। সীটের সঙ্গে হ্যান্ড কাফ দিয়ে আটকে দিল ডানহাতটা। দু'তিন বার প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল রানা, 'কি ব্যাপার? কি করছেন?' কিন্তু লোকটার কানে যে কথাগুলো ঢুকেছে মুখে সেরকম কোন চিহ্নই দেখা গেল না। নিঃশব্দে গ্যাংওয়ের দিকে একটা সীটে বসে পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা খবরের কাগজ বের করে নিঃশব্দে পড়তে শুরু করল, যেন এই পত্রিকা পড়ার উপরেই তার ভূত-ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। কিছুক্ষণ পর পর ঘড়ি দেখছে ফ্রান্সিস। কারও জন্যে অপেক্ষা করছে বোধহয়।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে রানা। ফুয়েল ট্রাকগুলো আসা যাওয়া করছে। গ্রাউন্ড ক্রুরা ঘোরাফেরা করছে প্লেনটার চারপাশে। চোখ দিয়ে এসব দেখলেও ওর মন জুড়ে রয়েছে অন্য জিনিস। কয়েকটা প্রশ্ন খেলা করে বেড়াচ্ছে মাথার ভেতর। সঙ্গত কোন উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না। প্রথমত, চেক করা হলো না কেন ওকে? চেক করলেই তো পকেটে রয়েছে ফটোকপি করা কাগজগুলো। দ্বিতীয়ত, সুইডেন থেকে বের করে দেয়া হচ্ছে না কেন ওকে? আটকে রাখার চমৎকার সুযোগটা ছেড়ে দিচ্ছে কেন ফ্রান্সিস? ফ্রান্সিস একজন পুলিস অফিসার এবং পুলিস অফিসার হিসেবে আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে চার্জ আনাটাই তো তার কর্তব্য। তাহলে? লোকটা কি ওকে এতই অপছন্দ করেছে যে ওর বিরুদ্ধে চার্জ আনতেও ঘেন্না করছে তার? মনে হয় না। আরও কিছু আছে ভেতরে। কিন্তু কি সেটা?

অনেকক্ষণ ফাঁকা প্লেনে একা একা বসে রইল রানা। ফ্রান্সিস এখনও পত্রিকা পড়ে চলেছে। প্রায় পৌনে আটটার সময় এক সাথে সবগুলো প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেল ও। বাইরে গ্যাংওয়েতে ভারী পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল রানা। কয়েক সেকেন্ড পরেই দু'জন লোক ঢুকল প্লেনে। ওদের পায়ের শব্দ পেয়েই কাগজটা ভাঁজ করল ফ্রান্সিস। রানার দিকে একটা চাউনি হেনে উঠে দাঁড়াল সে।

লোক দুটো এগিয়ে আসছে। সীটের সারির মাঝখানে সরু প্যাসেজ দিয়ে ফ্রান্সিসের গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল রানার পাশে। ওর দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বসে

পড়ল পাশে। দু'জনের একজনকে চেনে রানা, জন রিড। অন্যজনকে জীবনে কোনদিন দেখেছে বলে মনে পড়ল না।

দশ

দশ মিনিট পর অন্যান্য যাত্রীরা এসে উঠল প্লেনে। পাশাপাশি তিনটে সীটে নিঃশব্দে বসে আছে ওরা তিনজন। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দু'একজন যাত্রী কৌতূহলী চোখে পলকের জন্য তাকাল ওদের দিকে। রানার হাতের হাতকড়াটা যাদের নজরে পড়ল তাদের চোখ দুটোর আকার বৃদ্ধি পেল। ভাবলেশহীন মুখে বসে আছে রানা।

রিড এবং তার সাথের লোকটা পাথরের মূর্তির মত বসে রয়েছে। রানার সঙ্গে তো নয়ই, নিজেদের মধ্যেও কোন কথা বলছে না ওরা। ফ্রান্সিসের কাছে বহুবারই ও জানতে চেয়েছে, কি ব্যাপার, কি হচ্ছে? কিন্তু কোন জবাব পায়নি। বুঝেছে এদের কাছেও কোন জবাব আশা করা বৃথা। সুতরাং চুপ করে থাকাই ভাল।

যাত্রীরা সবাই উঠে পড়েছে। বন্ধ করে দেয়া হয়েছে প্লেনের দরজা। সবার সীটবেল্ট বাঁধা হয়েছে কিনা দেখতে দেখতে হেঁটে এল হোস্টেস। রানা তখনও সীটবেল্ট বাঁধেনি দেখে বলল মেয়েটা, 'অনুগ্রহ করে আপনার সীটবেল্ট বেঁধে নিন, স্যার।'

'কি করে?' বলল রানা, হাতকড়া বাঁধা কব্জিটা উঁচু করে দেখাল। 'আমার হাত বাঁধা যে।'

'ও আচ্ছা!' চোখ জোড়া একটু বড় হলো মেয়েটার। 'তাহলে এই ভদ্রলোকদের কাউকে বলুন বেঁধে দিতে।'

'দয়া করে একটু বেঁধে দেবেন?' ওর পাশেই বসেছে অপরিচিত লোকটা, তাকেই বলল রানা।

কোন কথা না বলে একটু ঝুঁকে সীটবেল্টটা বাঁধতে লাগল লোকটা। ক্লিপটা আটকে এমন একটা হ্যাঁচকা টান মারল যে পেটের সঙ্গে শক্ত করে এঁটে গেল বেল্টটা। পেটে মারাত্মক একটা চাপ অনুভব করল রানা। দাঁত কিড়মিড়িয়ে নিঃশব্দে ব্যথাটা হজম করল ও।

'আমার মনে হয় এই লোক দুটো পাহারা দিচ্ছে আমাকে,' এয়ার হোস্টেসের দিকে তাকিয়ে এমনভাবে বলল রানা যেন শুধু এয়ার হোস্টেস নয়, প্লেনের আর সবাইও শুনতে পায় ওর কথা। 'কিন্তু আমি ঠিক শিওর না। আমার সাথে কথা বলছে না ওদের একজনও।'

অনিশ্চিত একটু হাসি হেসে চলে গেল মেয়েটা। প্রায় সব ক'জন যাত্রীই মুখ ঘুরিয়ে তাকাতে চেষ্টা করল ওর দিকে। কিন্তু প্লেনের সীটগুলো এমনভাবে বসানো যে কৌতূহল মেটাতে ব্যর্থ হলো লোকগুলো। একটু পরেই চালু হলো প্লেনের

শক্তিশালী এঞ্জিনগুলো। ট্যাক্সি করে রানওয়ের ওপর গিয়ে উঠল। কয়েক সেকেন্ড পরেই আকাশে উঠে পড়ল এ-৩০০। লন্ডনের দিকে উড়ে যেতে লাগল ঘণ্টায় সাড়ে পাঁচশো মাইল বেগে।

এক হাতে ব্রেক ফাস্ট সারল রানা। ভাবছে ও, রিডের সঙ্গী লোকটা কে হতে পারে? রিডই বা আসলে কে? এদের হাতে তুলে দেয়া হলো কেন ওকে? উঁচু পর্যায়ের সরকারী সহযোগিতার গন্ধ পাচ্ছে রানা। রিড আসলে অন্য কিছু, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের লোক নয়। অবশ্য আগেই ও সন্দেহ করেছিল ব্যাপারটা। ফ্রান্সিসও যে একই সন্দেহ করেছিল সে বিষয়ে নিশ্চিত ও। এক মুহূর্তেই বুঝে ফেলল রানা: রিড ফ্রান্সিসের কাছে গিয়ে জানিয়েছে সব এবং বিনা বাক্যব্যয়ে ফ্রান্সিস সাহায্য করেছে ওকে। তার মানে ব্যাটা সরকারী লোক।

রানার ঠিক পাশে অপরিচিত লোকটা, তারপরে রিড। অপরিচিত লোকটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল ও। ইংরেজই বোধহয়। পোশাক-আশাকে বোঝা যাচ্ছে সেটা। রিডকে যেমন দেখলেই বোঝা যায় আমেরিকান, একেও তেমন দেখলেই মনে হয় ব্রিটিশ। গাঢ় রঙের টুইডের স্যুট পরা। পুরানো একটা চেক শার্ট, ক্লাব টাই, ব্রাউন রঙের জুতো; সব মিলিয়ে লোকটাকে ব্রিটিশ ছাড়া আর কিছু ভাবতে ইচ্ছে করে না। আর্মি অফিসারের মত ছোট করে ছাঁটা ঈষৎ কোঁকড়া চুল। এই লোকও বোধহয় সরকারী কর্মচারী, মনে মনে ভাবল রানা।

ক্যাপ্টেনের গলা ভেসে এল মাইক্রোফোনে, 'আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমরা হিথ্রো এয়ারপোর্টে নামতে যাচ্ছি। আপনারা সবাই সীটবেল্ট বেঁধে নিন অনুগ্রহ করে।' সীটবেল্ট বাঁধার নির্দেশ লেখা লাল বাতিটা জ্বলে উঠল। প্লেনের ভেতরের ভোঁ ভোঁ আওয়াজটা একটু যেন বদলে গেল। পেটের ভেতর কেমন যেন সুড়সুড়ে অনুভূতি একটা। নামছে প্লেন। এবার আর সীটবেল্ট বাঁধার জন্যে কাউকে অনুরোধ করতে হলো না রানার। প্লেন টেকঅফ করার পর কেউ খুলে দেয়নি সেটা। এখনও পেটের সাথে শক্ত করে এঁটে রয়েছে ওটা।

শেষবারের মত একবার চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিল রানা। কোন রকমে একটু খাড়া হয়েই যে হাতটা এখনও মুক্ত আছে সে হাতে টিপে দিল 'কল হোস্টেস' লেখা বোতামটা।

হোস্টেস মেয়েটা এগিয়ে আসতেই রিড হাত নেড়ে চলে যেতে বলল ওকে। কিন্তু চলে গেল না মেয়েটা। প্রশ্নবোধক চোখে তাকিয়ে রইল রানার দিকে। 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না এরা ঠিকমত অথোরাইজড কিনা,' বলল রানা। 'হিথ্রোয় পৌঁছেই ব্রিটিশ পুলিসের সাথে কথা বলতে চাই আমি। ক্যাপ্টেনের রেডিও মারফত মেসেজটা পাঠাতে বলো, প্লীজ। আমার নাম মাসুদ রানা।'

'ঠিক আছে, স্যার, বলছি।' এক মুহূর্ত ইতস্তত করল মেয়েটা, 'কিন্তু...'

'এর ভেতরে আবার কিন্তুর কি হলো? তুমি মেসেজটা ক্যাপ্টেনকে পৌঁছে দাও শুধু।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ককপিটের দিকে চলে গেল মেয়েটা। প্লেন ল্যান্ড করার আগে আর ফিরে এল না সে। রিড আর অপরিচিত লোকটা এবারও কোন কথা বলল না রানার সাথে। উপেক্ষা করে চলেছে ওরা ওকে।

হিথ্রো এয়ারপোর্টের টারম্যাকে এসে দাঁড়াল প্লেন। ওদের তিনজনকে আগে নামতে দেয়ার জন্যে আর সব যাত্রীদের বসিয়ে রাখা হলো সীটে। অপরিচিত লোকটা পকেট থেকে চাবি বের করে সীট থেকে খুলল হ্যান্ড কাফটা। বেরিয়ে এল ওরা প্লেন থেকে। আগে আগে রিড, তারপর রানা, পেছনে অজ্ঞাত লোকটা—হ্যান্ড কাফের অন্য প্রান্তটা ধরে আছে সে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই দেখল রানা একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে সিঁড়ির গোড়ায়। গাড়িতে উঠে পড়ল ওরা।

হিথ্রো এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করার পঁচিশ মিনিটের মাথায় নর্দাম্বারল্যান্ড অ্যাভিনিউ-এর একটা বিল্ডিংয়ের সামনে এসে থামল গাড়ি। নামল তিনজনে। অপরিচিত লোকটা এখনও ধরে রয়েছে হ্যান্ড কাফের অন্য প্রান্ত। পেভমেন্ট পেরিয়ে বাড়িটার ভেতরে ঢুকল ওরা। লিফটে চড়ে তিন তলায় পৌঁছল। লিফট থেকে বেরিয়ে একটা লম্বা করিডর পেরিয়ে একটা রুমে ঢুকল ওরা। ছোট-খাটো একটা কনফারেন্স রুমের মত চেহারা ঘরটার। লম্বা পালিশ করা একটা টেবিল, চারদিকে চেয়ার সাজানো। মেঝেতে দামী বাংলাদেশী কার্পেট বিছানো। দেয়ালে কয়েকটা অপরিচিত লোকের পোরট্রেট।

এই প্রথম কথা বলল অপরিচিত লোকটা। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য, 'তোমার কাপড়চোপড়গুলো...'

'কাপড়-চোপড়গুলো আবার কি করল?' না বোঝার ভান করল রানা।

'খোলো।'

'তোমরা কে এবং কি তোমাদের উদ্দেশ্য তা না জেনে নয়,' বলল রানা। 'এতক্ষণে যতটুকু বুঝতে পেরেছি তাতে তোমাদেরকে নিছক গুণ্ডাপাণ্ডা ছাড়া আর কিছু মনে হয়নি আমার।'

'তোমাকে জোর করে উলঙ্গ করা হতে পারে, তা জানো?'

'হ্যাঁ। এবং এ-ও জানি আমাকে খুনও করা হতে পারে। এবং আমি বলছি, তা না করলে আমাকে ছেড়ে দিতেই হবে তোমাদের। একটু আগে অথবা পরে, এই যা। তা কখন ছেড়ে দিচ্ছ?'

'একটা ডি-নোটিশই যথেষ্ট তোমাকে শায়েস্তা করার জন্যে,' বলল লোকটা। স্পষ্ট ঘৃণা ফুটে উঠল লোকটার চোখে। এই ঘৃণা কি শুধু ওর প্রতি, না বাংলাদেশী, কিংবা সাংবাদিক শ্রেণীর প্রতি, বুঝে পেল না রানা।

জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে যেসব খবর প্রকাশ হওয়া অবাঞ্ছনীয় মনে করে ব্রিটিশ সরকার, সেসব খবরের ওপর ডি-নোটিশ জারি করা হয়। ব্রিটেনের কোন কাগজ কোন অবস্থাতেই প্রকাশ করতে পারে না সেসব খবর। ডি-নোটিশ উপেক্ষা করার শাস্তি হিসেবে জেল-জরিমানা ছাড়াও পত্রিকা বন্ধ করে দিতে পারে ব্রিটিশ সরকার। সাংবাদিকতা করতে এসে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে রানা, পাশ্চাত্যের সাংবাদিকরাও সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকের স্বাধীনতার প্রশ্নে দু'দিন পরপরই আন্দোলনে নামে কেন।

'আমেরিকা, জার্মানী এবং পৃথিবীর আরও অনেক দেশেই তোমার ডি-নোটিশ কোন কাজে আসবে না, তা জানো, মিস্টার মাথা মোটা?'

গলার পেশীগুলো হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল লোকটার। 'আমি মিনিস্ট্রি অভ

ডিফেন্সের একজন অফিসার, এবং ব্যাপারটা জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত।'

'কিন্তু এই লোকটা কে?' রিডের দিকে আঙুল দিয়ে খোঁচাবার ভঙ্গি করল রানা। 'আমি ঠিক ঠিক সবকিছু জানতে চাই, এবং কাগজপত্রে প্রমাণ চাই। তা না হলে স্বেচ্ছায় একটা কথাও বলব না।'

কয়েক মুহূর্ত গম্ভীর মুখে তাকিয়ে রইল লোকটা রানার দিকে। রানাও তাকিয়ে আছে তার দিকে, ভাবলেশহীন মুখ। সাংবাদিকের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে লেকচার দিতে গিয়ে এধরনের পরিস্থিতিতে পড়ার সম্ভাবনার কথা বহুবারই বলেছেন জহির ভাই, মনে পড়ল রানার।

'তোমার হাতে ক্ষমতা নেই···?'

কি যেন জিজ্ঞেস করতে গেল রিড, কিন্তু থামিয়ে দিল রানা। বলল, 'না। ওর হাতে কোন ক্ষমতা নেই। থাকলে এতক্ষণ চুপচাপ বসে থাকত নাকি? অনেক আগেই অ্যাকশন শুরু হয়ে যেত। উপরওলাদের কাছে জিজ্ঞেস না করে কিছুই করতে পারবে না ও। আমার কথা বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞেস করে দেখো ওকে।' বেশ রসিয়ে রসিয়ে বলল ও কথাগুলো।

আগুন ঝরা চোখে চাইল লোকটা রানার দিকে। তারপর নিঃশব্দে উঠে গেল টেলিফোনের কাছে। নিচুস্বরে কি যেন বলল ফোনে। কয়েক মিনিট পর আরেকজন লোক এসে ঢুকল কামরায়। চিনতে পারল রানা লোকটাকে। মাস দুয়েক আগে এক পার্টিতে আলাপ হয়েছিল। নাম হফম্যান, মিনিস্ট্রি অভ ডিফেন্সের প্রেস ব্রিফিংয়ের দায়িত্ব পালন করে। এখন দেখা যাচ্ছে অন্য আরও দায়িত্ব পালন করতে হয় ভদ্রলোককে।

'গুডমর্নিং,' বলল রানা। পরিচয়ের হাসি ফুটিয়ে তুলল মুখে।

মাথাটা একটু নেড়ে সম্বোধনের জবাব দিল হফম্যান। খুব একটা বিগলিত হলো না রানার হাসি দেখে। কালো জ্যাকেট আর স্ট্রাইপ দেয়া ট্রাউজার পরে রয়েছে লোকটা।

'শুনলাম আপনি নাকি সহযোগিতা করতে চাইছেন না, মিস্টার রানা?' একটু দুঃখিত ভঙ্গিতে বলল হফম্যান।

'আমি কিছুই করছি না,' বলল রানা। 'কার সঙ্গে কথা বলছি তা-ই যতক্ষণ পর্যন্ত না জানতে পারছি ততক্ষণ সহযোগিতাও করছি না, অসহযোগিতাও করছি না।'

'বুঝতে পেরেছি। কথাটা আমার আগেই ভাবা উচিত ছিল,' দুঃখের সঙ্গে লজ্জা এসে মিশল লোকটার কণ্ঠে। দুটোই যে কৃত্রিম সে ব্যাপারে নিশ্চিত রানা।

'তুমি পরিচয় দাওনি, মিস্টার রানাকে?' কোঁকড়া চুলের দিকে ফিরে বলল হফম্যান।

'হ্যাঁ, স্যার, দিয়েছি।'

'ও শুধু বলেছে, ও মিনিস্ট্রি অভ ডিফেন্সের অফিশিয়াল একজন, ব্যস,' বলল রানা।

'সত্যি কথাই তো বলেছে। ওর মত অফিশিয়ালরা সাধারণত তাদের নাম প্রকাশ করে না।'

'তাহলে অথোরাইজেশন?'

'আচ্ছা! ঠিক আছে।' খেপা গলায় বলল কোঁকড়াচুলো। দ্রুত হাতে পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে রানার নাকের সামনে নাড়ল কয়েক সেকেন্ড।

এক সেকেন্ডের জন্যে দেখতে পেল ও কার্ডটা। মিনিস্ট্রি অভ ডিফেন্সের মার্কা মারা কার্ড। 'লেখা, বিয়ারার অভ দিস কার্ড ইজ ডিউলি অথোরাইজড টু...'

'লোকটাকে আমার কেমন যেন সামরিক ছোঁয়া লাগা ভাঁড়ের মত লেগেছে,' বলল রানা। 'আর মনে হয়েছে আমি বোধহয় ওর ভাষায় কথা বলতে জানি না।'

'খুবই অফেনসিভ আপনার শব্দ ব্যবহার, মিস্টার রানা।'

'হ্যাঁ। এফ. ই. স্মিথের একটা কথা মনে পড়ছে, আমি অফেনসিভ হতে চাইলে তুমি কি করতে পারো?'

হফম্যানের লজ্জাশীলতা, নম্রতা এবং দুঃখিত ভাব বিদায় নিয়েছে মুহূর্তেই। 'কার সঙ্গে কথা বলছেন জানেন আপনি?'

'হ্যাঁ, জর্জ হফম্যানের সঙ্গে।'

একটু থতমত খেলো যেন হফম্যান। 'সেটুকুও আপনার জানার কথা নয়। যা হোক...। ঠিক আছে। এঁর সঙ্গে পরিচয় আছে তো? মিস্টার জন রিড, ইউ. এস. গভর্নমেন্টের ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির একজন অফিশিয়াল।'

'এভাবে তো আগে আমার কাছে পরিচয় দেয়নি ও।'

'না। তা দেয়ার কথাও নয়।' রানার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল হফম্যান। তারপর কোঁকড়াচুলোর দিকে ফিরে বলল, 'আচ্ছা, তুমি যাও এখন। আমিই দেখছি আপাতত ব্যাপারটা।'

ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্সের লোকটা বেরিয়ে গেল কামরা ছেড়ে। যাওয়ার আগে তীব্র দৃষ্টিতে একবার দেখে গেল রানাকে। পারলে বোধহয় চিবিয়ে খেত।

'এবার আপনি দয়া করে বলবেন কি, কি জানেন আপনি?' আবার রানার দিকে ফিরল হফম্যান।

'খুব সামান্য। তেমন একটা সুযোগ পাইনি জানার। মাত্র ছত্রিশ ঘণ্টা ছিলাম ওখানে।'

'যেটুকু জানেন সেটুকুই বলুন।'

'মিস সুফিয়া আশরাফ নিখোঁজ হয়ে গেছে,' বলল রানা। 'এবং কেউ জানে না কেন। কোথা থেকে খোঁজা শুরু করবে তাও জানা নেই কারও। আমি না, রিড না, এমন কি সুইডিশ পুলিসের ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিসও না। আমি চেষ্টা করছিলাম...'

'আপনার ওখানে যাওয়াই উচিত হয়নি।'

'কেন, উচিত হয়নি কেন? জহিরুল ইসলামের হাত-পা বেঁধে রেখেছেন আপনারা, তাই?'

'এ ধরনের ব্যাপারে মাঝে মাঝে ওরকম না করে উপায় থাকে না,' ধৈর্যের সঙ্গে বলল হফম্যান। 'এখন বলুন, আপনি কিভাবে জানলেন মিস আশরাফকে পাওয়া যাচ্ছে না?'

'ও ফোন করেছিল আমাকে।'

চোখ কপালে উঠে গেল হফম্যানের। 'ফোন করেছিল? কিন্তু আমি যতদূর

জানি ফোন করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল সে। রিড?'

'ঠিকই জানেন আপনি।' রানার দিকে নিরুদ্বেগ চোখে তাকিয়ে বলল রিড। 'ফোনে পায়নি ও রানাকে।'

'আশাকরি আপনি স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করবেন আমাদের সাথে, মিস্টার রানা।' আবার দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে উঠতে চাইছে হফম্যানের গলা।

'যদি না করি?'

'আপনার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টান, মিস্টার রানা।'

'ঠিক আছে, শুনুন,' বলল রানা, 'ভুল কিছু বললে সংশোধন করে দেবেন। আমি মনে করি মিস সুফিয়া আশরাফকে ব্যবহার করছেন আপনারা। ও কিছুই জানে না এ ব্যাপারে। ফলে বেচারা এমন একটা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে যা থেকে বেরিয়ে আসার পথ জানা নেই ওর, এবং সম্ভবত তারই ফলে ভয়ানক কোন বিপদে পড়েছে ও। বেঁচে আছে না মরে গেছে তাও বলতে পারে না কেউ। সেক্ষেত্রে কেন আমি আপনাদের সাহায্য করব?'

'ব্রিটেনে বসবাস বা চাকরি করতে হলে এটুকু করতে হবে আপনাকে।'

'বুঝলাম, ব্রিটেনে থাকতে হলে আপনাকে সাহায্য করতে হবে, কিন্তু রিডকে কেন?'

'কারণ রিডের দেশের সঙ্গে আমার দেশ মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ, আপনি নিশ্চয়ই জানেন সেটা? আপনার সাদামাঠা কর্তব্য হচ্ছে...'

'না,' বলল রানা। 'অত সহজ নয়। আমার প্রশ্নের জবাব দিন আগে, তারপর সন্তুষ্ট হলে সাহায্য করব আমি, নয়তো নয়। যদি বুঝি যে আরও বিপদে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে সুফিয়ার, তাহলে সাহায্যের প্রশ্নই ওঠে না। ব্রিটেনে থাকতে না দিলে চলে যাব আমি। বাংলাদেশের একজন লোককে সুইডেন থেকে ধরে এনেছেন, এই বেশি—বিনা অপরাধে আটকে রাখতে পারেন না আপনারা।'

'একটু বুঝতে চেষ্টা করুন, মিস্টার রানা,' বলল হফম্যান। অনেক নরম হয়ে গেছে গলা। বারবার ওর পেছনে কিছু একটার দিকে তাকাচ্ছে সে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা, দেয়ালে একটা ঘড়ি। ওটার দিকেই বারবার তাকাচ্ছে হফম্যান।

'আমি তো যা বলার বলে দিয়েছি, মিস্টার হফম্যান। আগে আমাকে জানতে হবে সুফিয়ার আর কোন বিপদের সম্ভাবনা আছে কি না।'

'পকেট খালি করুন।' মুহূর্তে কঠোর হয়ে উঠল হফম্যানের চেহারা।

'আপনি চার্জ করছেন আমাকে?'

'ভদ্রভাবে আমার কথমত কাজ না করলে অসুবিধে হবে আপনার,' আবার শান্ত হয়ে গেছে হফম্যান। 'কিন্তু আমার মনে হয় না তার কোন দরকার পড়বে; মিস্টার রানা। আপনি ইচ্ছে করেই একটা অত্যন্ত জরুরী রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তামূলক ব্যাপারে বিঘ্ন সৃষ্টি করছেন। আপনার ওপরে শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা থাকলেও তা আমি খাটাতে চাই না।'

'ঠিক আছে। কি জানতে চান বলুন?'

'আপনার কাছে কি কি আছে তা দেখতে চাই প্রথমে।'

'দেখুন।' এক এক করে পকেটগুলো খালি করতে লাগল রানা। আধময়লা

রুমালটাই প্রথমে বের করে টেবিলের উপর রাখল ও। তারপর একে একে রিডের পিস্তল, ওর পাসপোর্ট, ওয়ালেট, প্রেস কার্ড, টাকা, চেকবই, চাবি, নোটবুক, কলম এবং সবশেষে খসড়া লে আউটের ফটোকপিগুলো বের করে রাখল টেবিলের উপর।

আস্তে হাত বাড়িয়ে পিস্তলটা তুলে নিয়ে পকেটে চালান করে দিল রিড। পাসপোর্টটা হাতে নিল হফম্যান। উল্টে পাল্টে দেখল কিছুক্ষণ। 'এই ক্রোনারগুলো দেখছি এনডোর্স করা নেই?'

'নেই।'

'এই কারণেই তো দেখেছি চার্জ আনা যায় আপনার বিরুদ্ধে। কিন্তু…'

'দেখুন, আমাকে ভয় দেখিয়ে লাভ হবে না,' বলল রানা। 'সুফিয়া আশরাফের ব্যাপারে উৎসাহী আমি। কেবল সুফিয়া। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক ও কি বহন করছিল না করছিল সে ব্যাপারে কোন মাথা ব্যথা নেই আমার। ও যেখানেই থাকুক, ওকে সুস্থভাবে বের করে আনার পথ যদি বাতলাতে পারেন তো আমার স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা আপনারা পাবেন। বুঝতে পেরেছেন? তা না হলে লাভ হবে না কোন।'

'সেটাই তো স্বাভাবিক,' নরম করে বলল হফম্যান। রানার মুখের দিকে তাকাল একবার, পরমুহূর্তেই পেছনের ঘড়িটার উপর গিয়ে স্থির হলো তার চোখ। তারপর আবার ওর চোখে চোখ রাখল হফম্যান। বলল, 'কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, আমাদের হাতে সময় খুব…'

'কিন্তু আপনাদের হাবভাবে তা মনে হচ্ছে না আমার। মুখে যতখানি বলছেন সত্যিই যদি তত অভাব থেকে থাকে সময়ের তো আমার কাছে খুলে বলতে হবে সব। ইতিমধ্যেই অনেকটা সময় নষ্ট করে ফেলেছেন।'

'হ্যাঁ? আচ্ছা, আচ্ছা…' লজ্জিত শোনাল হফম্যানের গলা। টেবিলের ওপর রানার জিনিসগুলোর দিকে মন দিল এবার। একটা একটা করে সবগুলো জিনিস পরীক্ষা করে সব শেষে হাতে নিল ফটোকপিগুলো। কাগজের তাড়াটার ভাঁজ খুলতে খুলতে বলল, 'এগুলো কি?'

'ফটোকপি।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিসের?'

'লে-আউটের। কিছু নেই ওতে।'

'তাহলে কপি করে আনলেন কেন এগুলো?'

'কারণ এগুলো ছিল ওখানে। ভাবলাম এগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে কোন সূত্র হয়তো পেয়ে যাব, তাই কপি করে নিয়ে এলাম।'

'পেয়েছেন কিছু?'

'না।'

হাত দুটো ভাঁজ করে রাখল রানা বুকের ওপর। সিদ্ধান্ত নিল আর কিছু বলবে না। ও জানে অন্তত একটা লে-আউট সুফিয়া রাশিয়া ছাড়ার আগে তৈরি করেছে। এছাড়া আরও কিছু একটা ও সঙ্গে করে এনেছে এবং ঘাড় থেকে নামাতে চাইছে সেটা। যা-ই হোক না কেন এই লোকগুলো চায় সেটা। যা হোক, শেষ পর্যন্ত

সুফিয়া ঘাড় থেকে নামাতে পেরেছে সেটা, এখন যদি এরা তা জানতে পারে তো ওর প্রয়োজন শেষ হয়ে যাবে এদের কাছে।

রানার দিকে একবার তাকাল হফম্যান। তারপর রিডকে বলল, 'তুমি কি মিস সুফিয়ার জিনিসপত্রগুলো নিয়ে এসেছ সঙ্গে?'

'না।'

'তাহলে যাও, ফ্রান্সিসকে ওগুলো পাঠিয়ে দিতে বলো।'

এবার রিডও তাকাল ঘড়ির দিকে। বলল, 'ঠিক আছে। কিন্তু ফ্রান্সিস কি রাজি হবে?'

'রাজি না হলে যাতে রাজি হয় সে ব্যবস্থা করো। তাড়াতাড়ি যাও, প্লীজ।'

'ঠিক আছে,' উঠে ফোনের দিকে গেল রিড।

'তাহলে, মিস্টার রানা, আপনার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে আমাদের। অন্ততপক্ষে কিছুদূর পর্যন্ত, তাই না?'

'ভাল কথা।'

মাথা নাড়ল হফম্যান। 'ওভাবে এমন নিরাসক্ত ভঙ্গি করলে চলবে কেন? দয়া করে বুঝতে চেষ্টা করুন ব্যাপারটার গুরুত্ব।'

'আমি খুব ভাল বুঝতে পারছি। আপনার কোন প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন।'

একটু শ্রাগ করল হফম্যান। 'ঠিক আছে। ঠিক আছে এখন বলুন, আপনি কিভাবে নিশ্চিত হলেন যে মিস আশরাফ কিছু একটা আনছিলেন?'

নিখাদ বিস্ময়ের সঙ্গে তাকাল রানা হফম্যানের দিকে। 'আপনি বলতে চান আনছিল না?'

'প্রশ্নটা আমাদেরও। এখনও নিশ্চিত হতে পারিনি আমরা।'

'নিশ্চয়ই সবকিছু জানেন আপনারা? ফোন কলটা—তাতে বলা হয়েছে, মারাত্মক বিপদে পড়েছে ও। নিহত ফ্রেঞ্চম্যান দু'জন, সে-রাতে ওর পাশের রুমেই ছিল ওরা। তারপর সত্যি সত্যিই মারাত্মক বিপদে পড়ল ও, নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। তাছাড়া রাশিয়া ত্যাগের আগমুহূর্তে মস্কো এয়ারপোর্টে সার্চের ঘটনা—এসব কেসের ইঙ্গিত দেয়?'

'রাশিয়া ত্যাগের আগে সার্চের ঘটনাটা বিদেশীদের পক্ষে তো বটেই, এমনকি রাশিয়ানদের পক্ষেও অস্বাভাবিক কিছু নয়।'

'কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটু অস্বাভাবিকই মনে হয়েছে আমার।'

'আমার হয়নি,' মৃদু হেসে বলল হফম্যান।

ফোন রেখে ফিরে এল রিড। 'বিকেলের প্লেনে পাঠাতে চেষ্টা করবে বলল। সুইডিশ পুলিস পছন্দ করছে না ব্যাপারটা। যাই হোক, আমরা হলেও করতাম না।'

হঠাৎ করেই বদলে গেল হফম্যানের আচরণ, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল গলার স্বর। 'বসুন, রানা। শুনুন...'

আড়মোড়া ভাঙার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছিল রানা। বসে পড়ল নিঃশব্দে। যে সহজ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল কামরার আবহাওয়ায়, মুহূর্তেই দূর হয়ে গেছে তা। গম্ভীর মুখে বলতে শুরু করল হফম্যান। 'সোভিয়েত ইউনিয়নে এক লেখক আছেন,

যাঁর রচনা পছন্দ নয় কর্তৃপক্ষের।'

'একটা কেন, এ রকম তো শত শত ঘটনা পাওয়া যাবে সোভিয়েত ইউনিয়নে।'

'দয়া করে চুপচাপ শুনুন, ব্যাঘাত সৃষ্টি করবেন না। এই লেখকের নাম, গিওর্গি লুতিকভ। জানেন এঁর সম্পর্কে?'

মাথা নাড়ল রানা। বলে যেতে লাগল হফম্যান, 'লুতিকভ লোকটা ইহুদী এবং তাঁর মেয়ে আছে একটা। ভদ্রলোক ইজরাইলে ইমিগ্রেট করতে চান, কিন্তু মেয়েকে রাশিয়ায় রেখে যাবেন না। এদিকে রাশিয়ান সরকার মেয়েকে মাইগ্রেট করার অনুমতি দেবে না, কারণ মেয়ের মা তা চায় না। এক্স মিসেস লতিকভ চাইছে মেয়ে তার কাছেই থাকুক। বুঝতেই পারছেন, স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে ভদ্রলোকের; বাজে একটা পরিস্থিতি। রাশিয়ার সরকার পক্ষের বক্তব্য হচ্ছে: যেখানে খুশি যেতে পারে লুতিকভ, আমাদের কোন আপত্তি নেই। এদিকে রাশিয়ায় কোন কাজ নেই লুতিকভের সুতরাং আয়ও নেই। কয়েকজন বন্ধুর দয়ার উপর নির্ভর করে বেঁচে আছেন বেচারা। শোনা যায় ওঁর স্ত্রী নাকি কে. জি. বি-র অফিসার। মেয়ের মতামতের কথা কেউ জানে না, কারণ, ব্ল্যাক সি-র ওদিকে কোন এক ট্রেনিং ক্যাম্পে আছে সে। রাশিয়ানরা বলছে মাকে ছেড়ে যেতে রাজি নয় সে, আর লুতিকভ বলছেন তাঁর সঙ্গেই থাকতে চায় মেয়ে। এই হচ্ছে পরিস্থিতি।'

দম নেয়ার জন্যে একটু থামল। এই সুযোগে জিজ্ঞেস করল রানা, 'কিন্তু এর সঙ্গে সুফিয়ার নিরুদ্দেশ হওয়ার যোগাযোগ কোথায়?'

'চুপচাপ শুনুন, একটু পরেই বুঝতে পারবেন।' আবার শুরু করল হফম্যান। 'সমস্ত চেষ্টা যখন ব্যর্থ হলো তখন রাশিয়ান ইহুদীদের একটা গ্রুপ—লুতিকভের ভক্ত সবাই, সিদ্ধান্ত নিল সোভিয়েত সরকারের ওপর সরাসরি চাপ সৃষ্টি করবে। জানেন বোধহয়, এখনও সোভিয়েত ইউনিয়নে অনেক উচ্চপদ দখল করে রয়েছে ইহুদীরা। ওরা কি করল? একটা গুরুত্বপূর্ণ মিলিটারি ইনফর্মেশন সংগ্রহ করল। ইনফর্মেশনটা রাশিয়ার বাইরে পাচার করার সব ব্যবস্থাও পাকা করে ফেলল। ওদের পরিকল্পনা হচ্ছে, লুতিকভকে মেয়েসহ সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে যেতে না দেয়া হলে ইনফর্মেশনটা আমেরিকা অথবা পশ্চিমা কোন দেশের হাতে তুলে দেয়া হবে বলে সোভিয়েত সরকারকে ভয় দেখানো। বুঝতে পারছেন আমার কথা?'

'পরিষ্কার।' এতক্ষণে সত্যিই একটু একটু বুঝতে পারছে যেন রানা।

'ভাল কথা। সত্যি সত্যিই ইনফর্মেশনটা কারও হাতে পড়ুক তা কিন্তু চায়নি ওরা। রাশিয়ান ইহুদীদের কেউই এসপিওনাজ এজেন্ট অথবা দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক নয়। সোভিয়েত সরকারের নীতি-আদর্শের প্রতি আস্থাশীল তারা কেবলমাত্র লুতিকভের স্বার্থেই ওরা করেছে কাজটা।'

'তা যদি হয় তো আপনারা কিভাবে জানলেন ওদের পরিকল্পনার কথা?'

'আমাদের সোর্স আছে।'

'ওদের কেউ একজন ফাঁস করে দিয়েছে নিশ্চয়ই। তারমানে বিশ্বাসঘাতক আছে ওদের মধ্যে।'

'আমি আবারও বলছি,' দৃঢ়স্বরে শুরু করল হফম্যান, 'পশ্চিমা দুনিয়া···অ্যাঁ··· যাই হোক···যেভাবেই হোক জানতে পেরেছি আমরা। প্রথমজন ইনফর্মেশনটা নিয়ে প্লেনে করে আসছিল। অবশ্যই রাশিয়ান অর্থাৎ অ্যারোফ্লোটের প্লেনে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত প্লেনটা ল্যান্ড করতে গিয়ে ভিয়েনার কাছে ক্র্যাশ করে। তিন সপ্তাহ আগের ঘটনা সেটা। তারপর ওরা আরেকটা মাধ্যম খুঁজে নেয়।'

'সুফিয়া সেই আরেক মাধ্যম?'

'সম্ভবত।'

'কি ফর্মে আছে ইনফর্মেশনটা জানতে পেরেছেন?'

'আমাদের ধারণা ফটোগ্রাফিক। নিশ্চিত নই আমরা।'

'লিখিত আকারে অথবা মুখের কথায় হলে অসুবিধা কি ছিল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইল হফম্যান রানার দিকে। তারপর বলল, 'জানি না।'

'ইনফর্মেশনটা কি?'

'সেটাও জানতে পারিনি আমরা।'

'কেমন একটু উদ্ভট নয় ব্যাপারটা?'

'প্রথমে আমরাও তাই ভেবেছিলাম। মিস্টার রিডের অর্গ্যানাইজেশনের পক্ষ থেকে প্লেনের ভেতরেই ক্যারিয়ারকে ধরবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু ক্র্যাশের কারণে ব্যাপারটা ভণ্ডুল হয়ে যায়।'

'ক্র্যাশটা কি দুর্ঘটনা ছিল না?'

একটু দ্বিধান্বিত মনে হলো হফম্যানকে। 'বাহক লোকটা ছিল প্লেনে। যদি ইচ্ছে করেই প্লেনটা ধ্বংস করা হয়ে থাকে তো বলতে হবে সত্যিই তথ্যটা মারাত্মক গুরুত্বপূর্ণ।'

'একশো বত্রিশজন লোক মারা গেছে,' এতক্ষণে কথা বলল রিড।

'তাহলে ব্যাপারটা দুর্ঘটনাই। রাশিয়ানরাও বোধহয়···,'

বলতে গেল রানা। কিন্তু বাধা দিল হফম্যান। বলল, 'রাশিয়ানরা ব্যাপারটাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে। মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হয়েছে ওদের ভেতর। রাশিয়ার ভেতরেই বহু লোককে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। এদিকে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি তাদের সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেতরের কোন সূত্র থেকে জানতে পেরেছে যে, স্টেট পাবলিশিং হাউস নাম্বার ওয়ান-এর মাধ্যমে ইনফর্মেশনটা পাচার করার আরেকটা প্রচেষ্টা নেয়া হয়। আমরা সন্দেহ করছি, মিস আশরাফকে ওরা মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে।'

'কেন?'

এবার জবাব দিল রিড। 'উনি সরকারী ব্যবস্থাপনায় গিয়েছিলেন এবং প্রচুর ফটোগ্রাফিক মেটেরিয়াল আনছিলেন।'

'এবং এখনও আপনারা বলতে চান যে তথ্যটার ব্যাপারে কিছুই জানেন না আপনারা?'

অসহায় ভঙ্গিতে দু'হাত ছড়িয়ে দিল হফম্যান। পরমুহূর্তে আবার নামিয়ে

আনল নিচে। 'না, মিস্টার রানা, সত্যিই আমরা জানি না। তবে জিনিসটা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই আমাদের।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল রিড। 'লুতিকভের বন্ধুরা মিস আশরাফের কাছ থেকে জিনিসটা উদ্ধারের জন্যে ঠিক কি প্ল্যান করেছিল তা জানতে পারিনি আমরা, তবে এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম, শেষ পর্যন্ত ধরবে ওরা ওকে।'

'কিন্তু খুন করা হয়েছে ওদের। কে করেছে? তোমার লোক? হোটেলে সুফিয়ার অন্যদিকের রুমে দু'জন আমেরিকান ছিল, তারা?' তীক্ষ্ণগলায় প্রশ্ন করল রানা।

'না, স্যার,' বলল রিড। 'আমার লোকেরা পুরো ব্যাপারটাই মিস করেছে। তবে বার্গসন আর ব্রেইলিকে যে-ই খুন করে থাকুক না কেন, সে-ই তোমার সুফিয়াকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারো।'

'তাহলে, কারা ওরা?'

কিন্তু রিড কোন উত্তর দেয়ার আগেই উত্তরটা বুঝতে পেরেছে রানা। রাশিয়ানদের হাতে বন্দী এখন সুফিয়া। নিশ্চয়ই ওদের কাছে সব কিছু ফাঁস করতে হবে ওকে, তাছাড়া কোন উপায় নেই। কথা আদায় করার বহু পদ্ধতি জানা আছে কে. জি. বি-র। জিনিসটা কোথায় পাঠিয়েছে ও তা জেনে নিতে পারলেই ওর প্রয়োজন ফুরোবে রাশিয়ানদের কাছে। তারপরে কি ওরা ছেড়ে দেবে ওকে, না খুন করবে?

খুন করাটাই সুবিধাজনক। তাহলে সুফিয়ার অন্তর্ধানটা রহস্য হয়েই থাকবে। রাশিয়ানদেরকে সন্দেহ করলেও নিশ্চিত করে কোন অভিযোগ তুলতে পারবে না কেউ। ছেড়ে দিলে হয়তো সমস্ত ঘটনা প্রকাশ পেয়ে যাবে। এই ঝুঁকিটা নিশ্চয়ই নিতে চাইবে না ওরা।

'এখন বুঝতে পারছেন, বারবার কেন ঘড়ি দেখছি আমি?' বলল হফম্যান।

এগারো

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে হফম্যান। স্পষ্ট বুঝতে পারছে লোকটা রানার মনের গতি। ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্সের লোকটা চলে যাওয়ার পর রুমের আবহাওয়ায় যে সামান্য উন্নতিটুকু হয়েছিল তাতে পরিস্থিতির মৌলিক কোন পরিবর্তন হয়নি। হফম্যান বোধহয় মনে করছে ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা জানে। মনে করছে কি, আসলে হফম্যান সম্ভবত স্থির নিশ্চিত, ও কিছু না কিছু জানেই। এবং সেটুকু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব'সে-ও জেনে নিতে চায়।

ইনফর্মেশনটার প্রকৃতি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা করতে পারছে না রানা। এখানে বসে বসে হফম্যান আর রিডের সঙ্গে গালগল্প করলে সেটা যে জানা সম্ভব হবে না তাও বুঝতে পারছে। তাছাড়া কোন রকমে মাইওপিক এবং অ্যাগি ওয়্যাগি

শব্দ দুটোর অর্থ উদ্ধার করতে পারলেও, নিশ্ছিদ্র গ্যারান্টি ছাড়া এদেরকে তা জানানোর প্রশ্নই আসে না। পুরো একদিনের বেশি হতে চলল সুফিয়াকে গোদেনবার্গে আটকে রেখেছে রাশিয়ানরা। নিশ্চয়ই হাত গুটিয়ে বসে নেই ওরা। যেভাবেই হোক কথা বের করবে ওরা সুফিয়ার পেট থেকে। ওর ওপর এমন কোন দুর্বলতা থাকার কথা নয় ওদের যাতে ভাবা যেতে পারে শারীরিক ভাবে নির্যাতন করবে না ওকে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই জেনে গেছে ওরা, কখন এবং কিভাবে লেন্স-কেসটা নিজের কাছ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল সুফিয়া এবং কোথায় গেলে ওটা আবার পাওয়া যাবে।

কিন্তু সত্যিই কি এত সহজে সব বলে দেবে সুফিয়া? রানা এজেন্সির বিশেষভাবে ট্রেনিং পাওয়া অপারেটর ছিল ও। ওর কাছ থেকে কথা আদায় করাটা তত সহজ হবে না বোধহয়। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত একটা কথা মনে পড়ল রানার। তাই তো! কথা বলবে না সুফিয়া, প্রাণ গেলেও না। তারপর? সুফিয়াকে মেরে ফেলে জিনিসটা উদ্ধার করার শেষ ভরসাটাও হারাতে চাইবে না নিশ্চয়ই রাশিয়ানরা। এদিকে জিনিসটা সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্যগুলোও জানা দরকার ওদের এবং সুফিয়া বলছে না কিছুই। এই পরিস্থিতিতে কি করবে রাশিয়ানরা? সুফিয়াকে দিয়ে কথা বলানোর জন্যে ওকে হত্যা করা ছাড়া যেকোন উপায় অবলম্বন করবে। সবচেয়ে সহজ উপায় কোন্‌টা? চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেল রানা, জামিলকে আটকে ফেললেই গড় গড় করে সব বলে দেবে সুফিয়া।

এদের হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার পর প্রথম কর্তব্য হবে জামিলকে হোস্টেলে দেখতে যাওয়া। ওর নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করে আর এক পা-ও এগোবে না রানা। কিন্তু এদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কখন?

ও যা যা জানে তা বলে দিলে আপাতত হয়তো ওকে ছেড়ে দেবে এরা। কিন্তু তারপর? পরিষ্কার জানে রানা, কোন্ পথে এগোবে এরা। ইনফর্মেশনটাই দরকার এদের। তারচেয়ে এক বিন্দু বেশিও না কমও না। সুফিয়ার ব্যাপারে এদের কোন আগ্রহ নেই। ইনফর্মেশনটার পেছনে ছুটতে ছুটতে যদি ওকে মুক্ত করার কোন সুযোগ আসে তো এরা সেটা গ্রহণ করবে হয়তো, কিন্তু সেরকম সুযোগ এরা আদৌ পাবে কি না তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অর্থাৎ এই মুহূর্তে রানা ছাড়া আর কেউ সুফিয়ার কথা ভাবছে না। না, ও একা নয় বোধহয়, জহির ভাইও হয়তো ভাবছেন, কিন্তু তাঁর হাতে করার কিছু নেই। মেজর জেনারেল রাহাত খানেরও বোধহয় কিছুই করার নেই; বি. সি. আই-এর এজেন্ট নয় সুফিয়া, এমন কি বাংলাদেশের নাগরিকও নয়। অর্থাৎ কিছু করতে হলে করতে হবে ওকেই।

'আপনারা এরকম ধারণা করছেন কেন, যে, রাশিয়ানরাই আটকেছে ওকে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমরা যতটুকু জানি আপনিও ততটুকুই জানেন, মিস্টার রানা,' শান্ত স্বরে বলল হফম্যান।

'আপনি যতটুকু জানেন সেটুকুই বলুন।'

'মিস আশরাফ জিনিসটা নিয়ে এসেছেন বলেই বার্গসন এবং ব্রেইলি ধরে ওঁকে,' বলল রিড। 'এবং এ কারণেই রাশিয়ানরা ইহুদী দু'জনকে খুন করে ওঁকে

কব্জা করেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোথায় লুকিয়েছেন ওটা উনি?'

'কেমন সুফিয়া আশরাফ?' জিজ্ঞেস করল হফম্যান। 'আপনি তো চেনেন ওকে। ওঁর পছন্দ-অপছন্দ বা স্বভাবের খুঁটিনাটি দিকগুলো সম্পর্কে নিশ্চয়ই ভাল ধারণা আছে আপনার। এক্ষেত্রে কোথায় জিনিসটা লুকোতে পারেন উনি বলতে পারেন?'

এক মুহূর্ত ভাবল রানা। 'যেভাবে বললেন, ওর স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে অত ডিটেইল্‌স্ আমি আসলে জানি না,' সত্যি কথাই বলল ও। 'তবে যতটুকু জানি, খুবই শান্ত মেয়ে সুফিয়া, সহজে ঘাবড়ায় না, এবং কোন কাজ করার আগে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবেচিন্তে তারপর করে।'

'খুব চালু···মানে, রিসোর্সফুল?'

'সে রকমই মনে হয় আমার। খুবই ভাল সাংবাদিক ও।'

চিন্তিতভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল হফম্যান ওর দিকে। 'আপনি ভালবাসেন ওঁকে?'

'অর্থাৎ?'

'এই ধরুন, বিয়ে করবেন ওঁকে?'

'সে প্রশ্ন এখনও ওঠেনি, উঠবে কিনা জানি না, উঠলে ভাবা যাবে। আপাতত বন্ধু আমরা।'

'উনি কি ভালবাসেন আপনাকে?'

খুব যেন মজা পেয়েছে এমনিভাবে বলল রানা, 'তা আমি কি করে জানব? ওর মনের ভেতর ঢুকে দেখেছি নাকি?'

'ইচ্ছে করলেই জানা যায়। বুঝতে পারছি, বলবেন না আপনি। ঠিক আছে, জরুরী মুহূর্তে কার কাছে ছুটে যান উনি?'

'তা জানি না। তবে এবার ও ফোন করেছিল আমাকে।'

'জহিরুল ইসলামের কাছে না করে আপনার কাছে ফোন করলেন কেন? পত্রিকার কাজে গিয়েছিলেন, বিপদ আপদে তো সম্পাদকের কাছেই ফোন করার কথা?'

'এ প্রশ্নেরও সঠিক উত্তর আমার জানা নেই। তবে আমার ধারণা, জহির ভাইকে জানিয়ে লাভ হবে না, অযথা উদ্বিগ্ন করা হবে ভেবেই হয়তো কিছু জানায়নি।'

'কেন, লাভ হবে না কেন?'

'ভদ্রলোক একটু খেপাটে ধরনের। খবরের কাগজ আর খবর ছাড়া আর কিছু বোঝেন না উনি। কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে জড়ালে তালগোল পাকিয়ে ফেলেন।'

'একটু আশ্চর্য নয় ব্যাপারটা?' প্রশ্নটা রানার উদ্দেশে যতটা তারচেয়ে যেন রিডের উদ্দেশেই বেশি।

'দেখুন, আগেই তো বলেছি, এগুলো সবই আমার ধারণা। কি মনে করে ও সম্পাদককে না জানিয়ে আমাকে জানাতে চেয়েছিল আসলে তা জানি না আমি।'

'আপনার সুপারিশেই দ্য নিউজ-এ কাজ পেয়েছিলেন মিস আশরাফ, তাই না?'

'ওর সম্পর্কে ফাইল আছে নাকি আপনাদের?'

'হ্যাঁ, সম্প্রতি খোলা হয়েছে। তবে খুব একটা তথ্য নেই তাতে। ওঁর জীবনের প্রথম দিকের কিছু এবং সাম্প্রতিক কিছু তথ্য আমরা জোগাড় করতে পেরেছি, কিন্তু মাঝখানের কয়েকটা বছর শূন্য। আশাকরি আপনি আমাদের ফাইলে যোগ করার মত কিছু তথ্য দেবেন। আমরা জানতে চাই, ওঁর বন্ধু-বান্ধব কারা, সুইডেনে বা স্ক্যান্ডিনেভিয়ার অন্য কোন দেশে ওঁর পরিচিত কেউ আছে কিনা। আপনি চেনেন ওঁর বন্ধুদের?'

শ্রাগ করল রানা। 'দু'জনকে। ফ্লিট স্ট্রীটে থাকে সবাই। ওর ফ্ল্যাটটা নিশ্চয়ই সার্চ করা হয়েছে?'

'নিশ্চয়ই।'

হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়েছে এমন ভঙ্গিতে বলল রানা, 'অফিসের খবর কি? চেক করেননি?'

'না। জহির সাহেবের সঙ্গে আলাপ করেছি আমরা...'

'অনেক জার্নালিস্ট আছে, অফিসই তাদের বাড়িঘর,' বলল রানা। 'বাড়িটা হচ্ছে শরীরটাকে একটু বিশ্রাম দেয়ার জায়গা...'

কিন্তু বুঝতে পারছে রানা, অফিসটা কেন এখনও চেক করা হয়নি। সুফিয়ার নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা এখনও বোধহয় গোপন রাখা হয়েছে। অফিসে সার্চ করতে গেলে গোপনীয়তা আর থাকবে না। একটা সুযোগ পাওয়া গেছে, ভাবল ও।

'অফিসে ওর কোন কন্ট্যাক্টস বুক থাকতে পারে,' সাবধানে বলল ও। 'ফোন নাম্বার, ঠিকানা ইত্যাদি লেখা থাকতে পারে ওতে।'

'ওঁর ডেস্কে?'

'সম্ভবত।'

'আমি আর উইল তাহলে যাই,' উঠে দাঁড়াল রিড।

'মাথা খারাপ নাকি! দাঁড়াও!' বলল রানা।

'কেন মাথা খারাপের আবার কি হলো?'

হফম্যানের দিকে তাকাল রানা, 'আপনারা দ্য নিউজ অফিসে যাননি কেন? গোপনীয়তা ফাঁস হওয়ার ভয়ে তো?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে এখনও সে ভয় আছে।'

'কি রকম?' জিজ্ঞেস করল রিড।

'যে মুহূর্তে তোমরা দ্য নিউজ-এর রিপোর্টারস রুমে তোমাদের চেহারা দেখাবে, সেই মুহূর্তেই একগাদা প্রফেশনালি সেনসিটিভ নাক...'

'কিন্তু, আমরা যদি মিস্টার জহিরের মাধ্যমে যাই?' বাধা দিয়ে জানতে চাইল হফম্যান।

'জহির ভাই যে মুহূর্তে নিজের গুহা ছেড়ে রিপোর্টারস রুমে নেমে আসবেন ঠিক সেই মুহূর্তে সবাই কানাকানি শুরু করবে। কেন, বুঝতে পেরেছেন?'

'আপনি বোঝাতে চাইছেন,' সূক্ষ্ম একটা হাসি খেলে গেল হফম্যানের মুখে, 'আমি যদি ভুল না বুঝে থাকি তো, আপনার উপস্থিতিতে ওখানে কেউ কিছু সন্দেহ

করতে পারবে না, তাই না?'

'ঠিক তাই। আমি গেলে কারও সন্দেহের কোন অবকাশই থাকবে না। রিপোর্টার রুমে একজন রিপোর্টার গেলে সন্দেহ করার কি থাকতে পারে বলুন?'

ওর দিকে তাকিয়ে আছে হফম্যান। সন্দেহের দোলায় দুলছে। পরমুহূর্তে আবার ঘড়ির দিকে চোখ গেল তার। চুপ করে অপেক্ষা করছে রানা, ভাবনা চিন্তা শেষ করার সময় দিচ্ছে হফম্যানকে। এখনও সন্দেহপূর্ণ চোখে তাকিয়ে আছে লোকটা। বোধহয় আঁচ করার চেষ্টা করছে, সত্যিকথা বলছে কিনা ও।

'আপনার সঙ্গে আমাদের লোক থাকবে,' শেষ পর্যন্ত বলল হফম্যান।

উঠে দাঁড়াল রানা। 'আপনি নিজেই আসুন আমার সাথে,' হফম্যান যাবে না জেনেও বলল ও।

'আমি না। মিস্টার রিড।'

'উঁহুঁ, রিড নয়,' বলল রানা। 'গোদেনবার্গে ওর ব্যবহারটা মোটেই পছন্দ হয়নি আমার।'

'তাহলে তো উইল...'

থামিয়ে দিল রানা হফম্যানকে। 'উইলিয়ামস? অথবা উইলসন, উইলটন, উইলিংহ্যাম, যে-ই হোক না কেন অসুবিধে নেই।'

'উইলকিনসন,' নিরাসক্ত গলায় বলল হফম্যান।

'ঠিক আছে, চলবে।' হফম্যানকে আশ্চর্য চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে আবার বলল, 'ওর কাছে তো আর জবানবন্দী দিতে হবে না আমাকে, তাহলে আর অসুবিধা কি?'

কয়েক মিনিট পরেই নিজের সম্পত্তিগুলো সব পকেটে ভরে বেরিয়ে এল রানা মিনিস্ট্রি অভ ডিফেন্সের অফিস বিল্ডিং থেকে। সঙ্গে আগের সেই কোঁকড়াচুলো লোকটা, উইলকিনসন যার নাম। গাড়িতে উঠে বসল দু'জন। হিথ্রো থেকে যে গাড়িটা নিয়ে এসেছিল ওদের, সেই গাড়িটাই। পেছনের সীটে সতর্ক ভঙ্গিতে বসে আছে উইলকিনসন। পাশে রানা, ভাবছে কিভাবে ধুলো দেয়া যায় লোকটার চোখে। হফম্যান অবশ্য সন্দেহজনক কোন আচরণ করতে বারণ করে দিয়েছে উইলকিনসনকে। কিন্তু এ লোক যে কড়া নজর রাখবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ভরা দুপুর এখন। অফিসের লোকেরা সব লাঞ্চে গেছে বোধহয়। নিউজ এডিটর আতাউল করিম খুব সম্ভব ক্যান্টিনে গিয়ে কফি নিয়ে বসেছে। প্রত্যেক দিন লাঞ্চের পর দীর্ঘ সময় নিয়ে ঢাউস এক কাপ এসপ্রেসো কফি খায় আতাউল করিম। রিপোর্টারস রুমের এক প্রান্তে কাঁচের পার্টিশন দেয়া চেম্বার নিউজ এডিটরের। ওখান থেকে প্রায় বিশ ফুট দূরে সুফিয়ার ডেস্ক। সুফিয়ার ডেস্কটার কথা গুরুত্বের সাথে ভাবছে ও। কন্ট্যাক্টস বুকটা কি আছে ডেস্কে? অ্যাগি ওয়্যাগি এবং মাইওপিক শব্দ দুটোর সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু পাওয়া গেলে ওখানেই পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

দ্য নিউজ বিল্ডিংয়ের সামনে এসে দাঁড়াল গাড়ি। গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে ঢুকে পড়ল দু'জন। রিসেপশন রুমের দরজায় দাঁড়ানো দারোয়ানের সালাম নিয়ে কাউন্টারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। কাউন্টারের মেয়েটা মিষ্টি হেসে নড করল

একটু। ফোনটা তুলে নিয়ে জহির ভাইয়ের নাম্বারে ডায়াল করল রানা। ভ্রূজোড়া কুঁচকে উঠল উইলকিনসনের, কিন্তু বাধা দিল না কোন। ওপাশে রিসিভার তোলার শব্দ পাওয়া গেল। সেক্রেটারি ধরেছে ফোন।

'জহির ভাইকে দাও,' বলল রানা।

খুট করে একটা শব্দ হলো তারপরেই ভেসে এল জহির ভাইয়ের গলা, 'কে?'

'আমি রানা, জহির ভাই।'

'কি খবর, কখন ফিরলে?'

'খবর খারাপ,' বলল ও। বাংলায় কথা বলছে দু'জনেই। 'আপনার সেই অফিশিয়াল সার্কেলের একজন রয়েছে আমার সাথে। সুফিয়ার ডেস্কটা ঘাঁটাঘাঁটি করতে যাচ্ছি আমি।'

'কিছু দরকার?'

'না। অনুমতি নিয়ে নিলাম আপনার।'

'ঠিক আছে। গোদেনবার্গে গিয়ে লাভ হলো কোন?'

'এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না। কিছু তথ্য অবশ্য পেয়েছি, তবে কতটুকু কাজে লাগবে তা এখনও বুঝতে পারছি না।'

'কারা ধরেছে ওকে বুঝতে পেরেছ কিছু?'

'সম্ভবত শ্বেত ভল্লুক। এখনও নিশ্চিত প্রমাণ পাইনি।'

'ঠিক আছে, আমাকে জানিয়ো কি ঘটে। ভীষণ দুশ্চিন্তায় আছি।'

রেখে দিল রানা ফোন। রিসেপশন রুম থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল ও। হঠাৎ পেছন ফিরে দেখল দারোয়ান পথ আটকে আছে উইলকিনসনের; দ্য নিউজের স্টাফ ছাড়া অন্য কারও বিনা অনুমতিতে ওপরে ওঠা নিষেধ।

লম্বা-চওড়া বিশাল চেহারা দারোয়ানের। এক্স মেরিন। পঞ্চাশের ওপর বয়স হলেও এখনও যথেষ্ট শক্তি রাখে শরীরে। কয়েক ধাপ উঠে গিয়েছিল রানা, নেমে এসে বলল, 'ঠিক আছে, টম, ছেড়ে দাও, আমার সঙ্গে এসেছে ও।' একটু মাথা ঝাঁকিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল টম।

যা ভেবেছিল তাই, রিপোর্টারস রুমটা প্রায় ফাঁকা। কয়েকজন বসে বসে খটখটিয়ে টাইপ করছে, আর কেউ নেই ঘরে। আতাউল করিমের চেম্বারও ফাঁকা। উইলকিনসনকে ওখানেই বসাল রানা। ইশারায় দেখাল সুফিয়ার ডেস্কটা। বলল, 'এখানে বসো তুমি। আমি ঝটপট দেখে আসি ডেস্কটা। তুমিও থাকতে পারো আমার পাশে, কিন্তু ওরা দেখলেই সন্দেহ করে বসবে,' টাইপরত লোকগুলোকে দেখাল ও।

খুব একটা খুশি হয়েছে উইলকিনসনের মুখ দেখে এমন মনে হলো না। রানাও অবশ্য আশা করেনি খুশি হবে লোকটা। অন্যান্য ডেস্কগুলো পেরিয়ে সুফিয়ার ডেস্কের কাছে গেল ও। উইলকিনসনের দিকে তাকাল একবার, আঠার মত সেঁটে রয়েছে ওর ওপর কোঁকড়াচুলোর দৃষ্টি।

সবেমাত্র একটা ড্রয়ার খুলেছে ও এমনসময় অ্যাসিস্টেন্ট নিউজ এডিটর এসে হাজির হলো। 'কি হে, লিপস্টিক ধার নিচ্ছ নাকি?'

জোর করে একটু হাসল রানা। 'একটা ঠিকানা খুঁজছি, আর কিছু না। ও দেবে

বলেছিল আমাকে।'

'আমার সঙ্গে একটা ডেট ছিল, সেটাও রাখেনি। কোথায় যে ভাগল!'

'দেখা হলে বলব ওকে তোমার দুঃখের কথা,' প্রতিশ্রুতি দিল রানা। একটু হেসে চলে গেল অ্যাসিস্টেন্ট নিউজ এডিটর।

ডানদিকের উপরের ড্রয়ারেই পেল রানা সুফিয়ার কন্ট্যাক্টস বুকটা। বেশির ভাগ রিপোর্টারই সচরাচর এই জায়গায় রাখে জিনিসটা। ওটা ড্রয়ার থেকে বের না করে দ্রুত পৃষ্ঠাগুলো উল্টে গেল ও। অ্যাগি ওয়্যাগি বা মাইওপিক কোনটারই কোন উল্লেখ নেই তাতে।

এবার নোটবুকগুলো ঘাঁটতে শুরু করল ও। গোটা বিশেক হবে। প্রত্যেকটায় তারিখ দেয়া এবং নানারকম বিষয়ের উপর শর্টহ্যান্ড নোট লেখা। এগুলোতেও প্রচুর ফোন নাম্বার দেখল রানা। প্রয়োজনীয় মনে হলো না একটাও। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারল ও, যা খুঁজছে তা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই এখানে। বিশটা নোটবুক খোঁজার ইঙ্গিত দেয়নি সুফিয়া, অন্য কিছু বোঝাতে চেয়েছে শব্দ দুটোর মাধ্যমে।

কিন্তু কি তা? চেয়ারে বসে ডেস্কের উপর দু'আঙুলে কিছুক্ষণ তবলা বাজাল রানা। কিছুই ঢুকছে না মাথায়। সুফিয়া এমনভাবে সূত্রটা দিয়েছে যেন একমাত্র রানাই তা বুঝতে পারে, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। অতএব সে আশা করেছে নির্দিষ্ট কোন বিশেষ জায়গায় খুঁজবে ও। ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল রানা, কাঁচের ভেতর দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে উইলকিনসনকে। রাগে গরগর করছে তা মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। লাঞ্চ সেরে ইতোমধ্যেই আসতে শুরু করেছে অন্যান্য রিপোর্টাররা। কাজ শুরু করে দিয়েছে সবাই। আরও কয়েকটা টাইপরাইটার চলতে শুরু করেছে। হাতে কাজ নেই যাদের, আড্ডা মারছে তারা। কিছুক্ষণ পরপরই ফোন বাজছে। একজন মেসেঞ্জার একটু পরপরই পেপার কাটিংয়ের ফাইল আনা-নেয়া করছে লাইব্রেরি থেকে, নিউজ ডেস্কে।

লাইব্রেরি? অ্যাগি ওয়্যাগি নামের কোন ফাইল আছে নাকি ওখানে? লক্ষ লক্ষ কাটিং আর ছবি ফাইল করে সংরক্ষণ করা হয়েছে ওখানে। দ্য নিউজ এর সূচনা থেকে এ পর্যন্ত যতগুলো কপি বেরিয়েছে প্রত্যেকটা আছে লাইব্রেরিতে। অ্যাগি ওয়্যাগি নামের কোন ফাইল থাকতেও পারে ওখানে।

লাইব্রেরিতে যাওয়ার জন্যে প্রায় উঠে দাঁড়িয়েছিল রানা। মত বদলাল আবার। আরেকটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। লাইব্রেরির কাটিং নয়, সুফিয়ার নিজস্ব কাটিংগুলো দেখতে হবে আগে। এ পর্যন্ত যত লেখা বেরিয়েছে ওর তার প্রত্যেকটার কাটিং রেখেছে সুফিয়া। ব্যাপারটাকে ওর একটা অদ্ভুত খেয়াল বলা যেতে পারে। অফিসের আর কেউ বোধহয় নিজের লেখার কাটিং সংরক্ষণ করে না এভাবে।

বাঁদিকের একেবারে নিচের ড্রয়ারে পাওয়া গেল ফাইলটা। মোটাসোটা ভল্যুম একটা। ফাইলটা ড্রয়ার থেকে বের করে ডেস্কের উপর রাখল রানা। উইলকিনসনের দিকে একবারও না তাকিয়ে পড়তে শুরু করল কাটিংগুলো। সাবধানে, মন দিয়ে কিন্তু দ্রুত পড়ে যেতে লাগল প্রত্যেকটা আর্টিক্‌ল।

একদম উপরে রয়েছে সাম্প্রতিক লেখাগুলোর কাটিং। ধীরে ধীরে যত নিচে যাচ্ছে ততই পুরানো লেখার কাটিং পাওয়া যাচ্ছে। চল্লিশ মিনিট পর, সুফিয়া

পুরোদস্তুর রিপোর্টার হিসেবে কাজ শুরু করার জায়গাটা পার হলো রানা। এর আগে দ্য নিউজ-এর মহিলা পাতায় কাজ করত সুফিয়া। লেখার কাজ বেশি ছিল না, এক সপ্তাহ পর পর একটা করে বুক রিভিউ করত, ব্যস। প্রোডাকশনের ব্যাপারেই বেশি কাজ করতে হত ওকে। যাহোক এ সময়কার লেখাগুলোও সমান মনোযোগের সঙ্গে দেখতে লাগল রানা। এই ফাইলটা শেষ না করে নড়ছে না ও, যতক্ষণই লাগুক না কেন। জাহান্নামে যাক উইলকিনসন। এর ভেতরেই কোথাও আছে সূত্রটা।

সাধারণ পুস্তক সমালোচনা বেশির ভাগই। গ্রামের এক মিডওয়াইফের স্মৃতিকথা, স্কুল সাজানোর নিয়ম কানুন, পোশাক তৈরি, টুকটাক স্বাস্থ্যবিধি, শিশু পরিচর্যা ইত্যাকার সব বিষয়ের বইয়ের সমালোচনা। দুই-এক প্যারাগ্রাফের বেশি নয় একটাও। প্রত্যেকটার সমালোচনার শেষে বইয়ের নাম, লেখক বা লেখিকার নাম, প্রকাশকের নাম এবং দাম লিখে দেয়া হয়েছে। দ্রুত উল্টে যাচ্ছে ও একেকটা কাটিং।

নামটা একটু অস্বাভাবিক বলেই হয়তো খেয়াল করল ও। এর মধ্যেই একঘেয়ে লাগতে শুরু করেছিল, পাতা উল্টে যাচ্ছিল কেবল। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ই বোধহয় সজাগ করে দিল ওকে। একগাদা খুদি খুদি ছাপা অক্ষরের ভেতরে হঠাৎ করে নামটা দেখেই ভ্রূজোড়া কুঁচকে উঠল—ওপি (Opie)! বইটার নাম দেখল ও, Children's Games in street Playground, by Tona & Peter Opie, (Oxford University Press), Price-2 Sterling। উইলকিনসনকে দেখানোর জন্যেই পৃষ্ঠাগুলো উল্টে যেতে লাগল ও, কিন্তু মাথার ভেতর দিয়ে ঝড়ের গতিতে ছুটে চলেছে চিন্তার ট্রেন। Opie! My opie? My opie? My opie? হাতে লেখা ছিল শব্দটা, এবং c আর e হাতের লেখায় সহজেই গুলিয়ে যেতে পারে। সি মাই ওপিক কথাটা কোন অর্থ বহন করে না, কিন্তু সি মাই ওপি? হতে পারে। লাইব্রেরিতে বইটার কোন কপি আছে নাকি?

উইলকিনসনের কাছে গেল রানা। জানাল, কপাল খারাপ, কিছুই পায়নি ও এখনও; তবে আরও কিছুক্ষণ খুঁজবে, তার আগে একটু জেন্টস রুমটা ঘুরে আসতে যাচ্ছে, সে যেন কিছু মনে না করে।

ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল উইলকিনসনের চেহারা, কিন্তু কিছু বলতে পারল না বেচারা।

একেক বারে তিনটে করে সিঁড়ি টপকে লাইব্রেরিতে পৌঁছাল ও।

'একটা বই খুঁজছি আমি, আছে নাকি আপনার কাছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কি বই?'

'চিলড্রে'স গেমস ইন স্ট্রীট অ্যান্ড...'

লাইব্রেরিয়ান ভদ্রলোক শেষ করতে দিল না কথাটা। বলল, 'ওপি? ওই যে ওপরে। ওই নীলটা।'

ত্রিশ সেকেন্ডের মাথায় অ্যাগি ওয়্যাগি সম্পর্কে জেনে ফেলল ও। বাচ্চাদের খেলা একটা। তবে আরও কিছু আছে ব্যাপারটায়; সারা ব্রিটেনে প্রচলিত খেলাটা, তবে একেক জায়গায় একেক নামে। অ্যাগি ওয়্যাগি নামটা এক জায়গায়ই প্রচলিত,

লোক বসতি খুবই কম সেখানে, শেটল্যান্ডস।

সুফিয়ার ডেস্কে ফিরে এল রানা। একই সঙ্গে মুক্তির আনন্দ আর হতাশায় ছেয়ে যাচ্ছে মনটা। অ্যাগি ওয়্যাগি তো বোঝা গেল, কিন্তু লাভ হলো কি তাতে? আবার কাটিং ফাইলটার পাতা ওল্টাতে শুরু করল ও। শেটল্যান্ড সম্পর্কে কোন আর্টিকল্ থাকতেও পারে এতে।

হঠাৎ করে মনে পড়ল রানার—জামিল বলেছিল কথাটা, ওদের এক খালার বাড়ি আছে শেটল্যান্ডে। ছোটবেলায় দু'একবার গেছেও ওরা সেখানে, ওদের খালা-খালু দু'জনেই বেঁচে ছিল তখন। খালু মারা যাওয়ার পরেও একবার গিয়েছিল ওরা সেখানে, কিন্তু তারপর আর যাওয়া হয়নি। ওরা যখন আফ্রিকায় ছিল সেই সময়ই মারা গেছে খালা। শেটল্যান্ডের ঐতিহ্যবাহী রংচঙে পোশাক পরা ভাইকিংদের গল্প শুনিয়েছিল জামিল। ধৈর্য ধরে শুনেছিল রানা ওর একনিষ্ঠ ভক্ত জামিল আশরাফের গল্প।

এরপর কাটিং ফাইলটায় দুটো বড় আর্টিকল্ পেল ও। দুটোই মনোযোগ দিয়ে পড়ল। প্রথমটায়, উত্তর সাগরে তেল পাওয়ার পর একটা দ্বীপরাষ্ট্র অর্থাৎ ব্রিটেনের সাধারণ মানুষের প্রথম অনুভূতির কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় আর্টিকল্টা অদ্ভুত এক লোকের সম্পর্কে। সমুদ্রের মাঝে এক দ্বীপে বসে কিভাবে লোকটা সামুদ্রিক পাখিদের জীবনাচরণ লক্ষ করে বেড়িয়েছে; কিভাবে তারা ওড়ে, কখন ডিম দেয়, কয়টা বাচ্চা ফোটে এইসব তথ্য সংগ্রহ করেছে। ভাইকিং কিসিমের বোধহয় লোকটা, নিদেনপক্ষে বাউণ্ডুলে, ভাবল রানা। কিন্তু লোকটার নাম দেখেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠল ওর কলজেটা। হেন্ডারসন, জেমস হেন্ডারসন! শেটল্যান্ডের স্যান্ডনেসে বাড়ি। হেন্ডারসন, জার্লশফ, স্যান্ডনেস জি. বি. নরওয়ে? কিন্তু নরওয়ে কোথা থেকে আসছে এখানে? নামের মিলটা কাকতালীয় নাকি? মানতে পারছে না রানা। সবই ঠিক কেবল এই নরওয়েটাই ডোবাচ্ছে।

আরও কিছুক্ষণ খুঁজল রানা। কিন্তু আর কিছু পাওয়া গেল না কাটিং ফাইলে। না নরওয়ে সম্পর্কে, না স্যান্ডনেস, না জার্লশফ, না হেন্ডারসন।

শেষ পর্যন্ত ফাইলগুলো ড্রয়ারে রেখে কন্ট্যাক্টস বুকটা নিয়ে উঠল রানা। ফিরে এল উইলকিনসনের কাছে।

'কিছু পেলে?' জানতে চাইল উইলকিনসন। গলার স্বরেই বোঝা গেল রেগে কাঁই হয়ে রয়েছে সে।

'আমার কাছে কিছুই তেমন ইম্পর্ট্যান্ট মনে হয়নি। এই যে ওর কন্ট্যাক্টস বুকটা, এটা নিয়ে চলো দেখি হফম্যান কিছু উদ্ধার করতে পারে কিনা।'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে উঠে দাঁড়াল উইলকিনসন। রানার পেছন পেছন এগোল লিফটের দিকে। লিফটে করে নামতে নামতে ইচ্ছে করেই খোঁচাল রানা লোকটাকে। পোশাক পরিচ্ছদ, চেহারা, স্বভাব এগুলো নিয়ে এমন সব কথা বলল যে অপমানে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল উইলকিনসন। কিন্তু লিফটের ভেতরে বলেই হয়তো কিছু বলল না, দাঁতে দাঁত কামড়ে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। আগুনঝরা দৃষ্টি হানল একবার।

নিচতলায় নামার পর লিফটের দরজা খুলতেই আগে নামার জন্য এগিয়ে গেল

উইলকিনসন। ঠিক এই সময়ে লোকটার বাম পায়ে হালকা এক লাথি মারল রানা। উপুড় হয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিল উইলকিনসন। 'বাস্টার্ড কোথাকার!' চিৎকার করে উঠল সে। ব্যথায় আর রাগে লাল হয়ে গেছে চেহারা। গোলমাল শুনে দারোয়ান টম এগিয়ে এসেছে, চোখে কৌতূহল।

'টম,' বলল রানা। 'ভীষণ ঝামেলা করছে এই লোকটা। জহির সাহেবের সঙ্গে নাকি মারপিট করবে। মাথায় বোধহয় ছিট আছে, ঢুকতে দিয়ো না।'

'ঠিক আছে, আমি দেখছি, মিস্টার রানা,' বলে উইলকিনসনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল টম। 'এইদিকে, স্যার।'

লিফটের দিকে না গিয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটল রানা। উপরে উঠতে উঠতে পেছন ফিরে দেখল একবার, শক্ত হাতে উইলকিনসনের ডান কনুইটা ধরে পথ আটকে আছে টম। দ্রুতপায়ে সিঁড়ি টপকাতে টপকাতে শুনতে পেল, 'আমরা কোন ঝামেলা চাই না, স্যার, আপনিও নিশ্চয়ই চান না?' বলছে টম।

দোতলায় উঠে সোজা অ্যাসিস্টেন্ট এডিটরের কাছে গেল ও। হাঁপাতে হাঁপাতে জানতে চাইল, 'শেটল্যান্ডে আমাদের রিপোর্টার কে?'

'শেটল্যান্ডে আমাদের কোন রিপোর্টার নেই,' জানাল অ্যাসিস্টেন্ট এডিটর। 'একজন ফ্রীল্যান্সার কাজ করে আমাদের হয়ে।'

'ও, আচ্ছা। লোকটার নাম ঠিকানা দেন তো দয়া করে।'

প্রায় দৌড়ে আবার বেরিয়ে এল ও অ্যাসিস্টেন্ট এডিটরের রুম ছেড়ে।

নিচে না নেমে মেশিন রুমের ভেতর দিয়ে ছুটল রানা। মেশিন রুমের ভেতরের অন্য একটা সিঁড়ি বেয়ে আবার নিচে ডেসপাচ বে-তে নেমে এল। ডেসপাচ বে থেকে মফস্বলের বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হচ্ছে সংবাদপত্র। নানা আকৃতির প্যাকেট, আর ডেলিভারি নিতে আসা লোকে গিজ গিজ করছে জায়গাটা।

তিন মিনিট পর দেখা গেল বেডফোর্ড প্লেসের চ্যান্সারি লেন ধরে দ্রুতপায়ে হাঁটছে রানা। হলবর্ন লাইব্রেরির দিকে যাচ্ছে ও। প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যগুলো দ্য নিউজের লাইব্রেরি থেকেই সংগ্রহ করতে পারত ও, কিন্তু এই মুহূর্তে খুবই ঝুঁকির কাজ হবে সেটা। উইলকিনসনকে খুব অল্প সময়ের জন্যেই বেকায়দায় ফেলা গেছে। আর পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই দ্য নিউজ বিল্ডিং বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে ওর জন্যে।

হলবর্ন লাইব্রেরিতে ঢুকে সোজা দোতলায় উঠে গেল ও। মোটাসোটা বিশালাকৃতির একটা বইয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নর্দার্ন স্কটল্যান্ডের টেলিফোন ডাইরেক্টরি সেটা। দেখা গেল, হেন্ডারসন নামটা খুব একটা আনকমন নয়। একাধিক জেমস হেন্ডারসন পাওয়া গেল, এদের যে কেউই সুফিয়ার জেমস হেন্ডারসন হতে পারে। টেলিফোন গাইডটা রেখে শেলফের সামনে গিয়ে Survey Gazetteer of the British Isles বইটা খুঁজে বের করল। 'J' অক্ষরের নামগুলো দেখে যেতে লাগল। প্রথম দিকেই পেয়ে গেল, 'JARLSHOF (Earls Court) ruin, in South of mainland, Shetland।'

এরপর স্যান্ডনেস নামটা খুঁজল ও। এখানে লেখা, 'PI 8 miles North-West of Walls, Shetland, PO. TO.'

বারো

বিরস মুখে তাকিয়ে আছে রানা গ্যাযেটিয়ারটার দিকে। শেষ পর্যন্ত বিষয়গুলোকে একসূত্রে গাঁথা যাচ্ছে ঠিক, কিন্তু কেমন যেন একটু ভুলভাবে। একটু যেন এলোমেলোই থেকে যাচ্ছে। স্যান্ডনেসের কথা ধরা যাক, শেটল্যান্ডের স্যান্ডনেস আর নরওয়ের স্যান্ডনেসের বানান এক নয়। প্রথমটার শেষে দুটো এস আর পরেরটার শেষে একটা এস। তারপর, হেন্ডারসন নামটা: নরওয়ে এবং ব্রিটেন দুটো দেশেই সমান প্রচলিত নাম ওটা।

শেলফ থেকে একটা অ্যাটলাস নামিয়ে খুঁজতে শুরু করল ও। দেখা গেল, জার্লশফ জায়গাটা অনেক দূরে শেটল্যান্ডের স্যান্ডনেস থেকে। তাহলে; জার্লশফ, স্যান্ডনেস ঠিকানা হয় কি করে? জি. বি. কথাটার মানেই বা কি? লাইব্রেরির প্রায় অর্ধেকটা ঘেঁটে একটা নরওয়েজিয়ান ট্রেড ডাইরেক্টরি খুঁজে বের করল ও। কিন্তু জি. বি-র কোন অর্থ পাওয়া গেল না তাতে। যা ভেবেছিল তা নয়, শব্দটা 'এন্ড কোং' জাতীয় কোন সংক্ষিপ্ত অর্থ প্রকাশ করে না। তাহলে কি এর মানে গ্রেট ব্রিটেন?

জানালার পাশে এসে দাঁড়াল রানা, হাতে ট্রেড ডাইরেক্টরিটা। থিওবল্ড'স রোডটা দেখা যাচ্ছে নিচে, লাইব্রেরির পাশ দিয়ে চলে গেছে। এক জোড়া পুলিস কার দেখা গেল রাস্তায়। ঝট করে বইটা বন্ধ করে একটা ডেস্কের উপর রেখে দরজার দিকে এগোল ও। ঝড়ের বেগে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিচে, একেবারে রাস্তায়। আশ্চর্য লাগছে, এত তাড়াতাড়ি মেট্রোপলিটান পুলিসকে খবর দিল কি করে হফম্যান? নিশ্চয়ই উইলকিনসন খবর দেয়নি পুলিসকে, ও সশরীরে গিয়ে অথবা ফোন করে জানিয়েছে হফম্যানকে, তারপর হফম্যান পরিস্থিতি বুঝে পুলিসকে জানিয়েছে। যথেষ্ট এফিশিয়েন্ট মনে হচ্ছে এদের! ডিভিশনাল পুলিস হেডকোয়ার্টার যে একটা ব্লক পরেই তা জানলে অবশ্য আর আশ্চর্য হত না রানা। সেক্ষেত্রে হয়তো এই লাইব্রেরিতে ঢুকতই না ও।

হফম্যান নিঃসন্দেহে এতক্ষণে বুঝে ফেলেছে যে পেটে কথা আছে রানার। এমন কিছু, যা ফাঁস করেনি ও হফম্যানের কাছে। আর দ্য নিউজ অফিসে উইলকিনসনের সঙ্গে যে আচরণ করেছে তাতে একটা দুগ্ধপোষ্য শিশুও বুঝতে পারবে যে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছে ও। পুরো ব্যাপারটাকে রিড যতটা গুরুত্ব দিচ্ছে, হফম্যানও যদি ততটা দেয় তো এতক্ষণে হন্যে হয়ে উঠেছে ওরা ওকে পাওয়ার জন্যে।

এখন কি করবে ও? যাওয়ার মত একটা নয়, তিনতিনটে জায়গা রয়েছে; আর সেটাই হয়েছে সবচেয়ে বড় সমস্যা। গোদেনবার্গ; স্যান্ডনেস, নরওয়ে আর স্যান্ডনেস, শেটল্যান্ড। তিনটের মধ্যে গোদেনবার্গের জন্যেই মনে মনে টান অনুভব

করছে রানা, কারণ সুফিয়া রয়েছে ওখানে। কিন্তু, সুফিয়াকে কি সত্যিই এখনও গোদেনবার্গে রেখেছে রাশিয়ানরা? সন্দেহ আছে। কিন্তু লেন্স-কেসের উপর যে ঠিকানা দিয়েছে ও, তাতে সেটা স্যান্ডনেস, নরওয়েতে গিয়ে পৌঁছোবে; যদিও আসলে ও বোধহয় ইঙ্গিত করছে স্যান্ডনেস, শেটল্যান্ডের দিকে। কেন? একটাই উত্তর দেখতে পাচ্ছে রানা—স্যান্ডনেস, শেটল্যান্ডে গিয়ে হেন্ডারসনের সঙ্গে দেখা করুক ও তাই চায় সুফিয়া। একটু আশ্চর্য না হয়ে পারল না ও, এই লোকটা এর ভেতরে আসছে কি ভাবে, একজন ওরিন্থোলজিস্ট—নিবেদিত প্রাণ পক্ষীবিশারদ, জনশূন্য বুনো দ্বীপে পাখি দেখে বেড়ায়—তার সঙ্গে এ ব্যাপারের সম্পর্ক কি? যাই হোক, আগে স্যান্ডনেস, শেটল্যান্ডে গিয়ে দেখা যাক। তিনটের মধ্যে এটাই সবচেয়ে কাছে।

একটু পরেই বুঝতে পারল রানা, শেটল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জে যাওয়ার কথা ভাবা যত সহজ, ভাবনাটাকে কাজে পরিণত করা তত সহজ নয়। এখান থেকে হাজার মাইলের মত দূরে শেটল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ, একমাত্র আকাশ-পথেই তাড়াতাড়ি যাওয়া সম্ভব ওখানে। কিন্তু আকাশ পথটা ব্যবহার করতে পারছে কোথায় ও? এতক্ষণে নিশ্চয়ই হিথ্রো এয়ারপোর্টে নজর রাখার বন্দোবস্ত করে ফেলেছে হফম্যান।

হেঁটে চলেছে রানা পেভমেন্টের উপর দিয়ে। শত শত লোকের ভিড়ে মিশে যেতে চেষ্টা করছে। হফম্যান আর তার দলবল আর কি কি উপায়ে ওকে ধরার চেষ্টা করতে পারে? দ্য নিউজ-এর কথাই মনে হলো প্রথমে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই ওখানকার প্রতিটি ফোন ট্যাপ করার ব্যবস্থা করে ফেলেছে ওরা। অবশ্য এই একটা ব্যাপারই ওদেরকে যথেষ্ট ব্যস্ত রাখতে পারবে। পি. বি. এক্স সিস্টেমের অধীনেই আছে ষাটটা লাইন, তাছাড়া আরও বোধহয় বিশটা মত আছে ডাইরেক্ট লাইন। এতগুলো লাইন ট্যাপ করতে হলে কতজন লোককে লাগাতে হবে?

সবগুলো লাইন যদি ওরা ট্যাপ না-ও করে তো যে কয়টা করবে তার ভেতরে প্রথমেই থাকবে জহির ভাইয়েরগুলো। মোট তিনটে ফোন জহির ভাইয়ের, এর দুটোই আবার ডাইরেক্ট। কতক্ষণ লাগে ফোন ট্যাপ করার ব্যবস্থা করতে, মনে মনে প্রশ্ন করল রানা। উত্তরটাও পেয়ে গেল সহজেই, সরকারী ভাবে করা হলে খুব বেশিক্ষণ লাগার কথা নয়। অর্থাৎ এই মুহূর্তে জহির ভাইয়ের কাছে ফোন করার চেষ্টা করা বোকামিই হবে।

হঠাৎ কেমন একটু অদ্ভুত অনুভূতি হলো রানার। একদিকে হফম্যান, তার লোকবল আর প্রবল পরাক্রমশালী ডিপার্টমেন্টের প্রভাব, প্লাস রিড এবং তার এজেন্সি। অন্যদিকে রাশিয়ানরা, রাশিয়া থেকে পাচার করে আনা জিনিসটা উদ্ধার করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই দুই বিরাট দৈত্যের মাঝখানে দুটো পিঁপড়ের মত উপস্থিতি—রানা আর সুফিয়া। একজন আবার এই দৈত্যদেরই একটার হাতে বন্দী। রানা এখনও মুক্ত আছে বটে, তবে কতক্ষণ থাকতে পারবে তা নিজেও জানে না। চারদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলেছে ওকে প্রতিপক্ষ এবং দ্রুত ছোট করে আনছে বৃত্তটা।

থিওবল্ড'স রোড গ্রে'জ ইন রোডের সঙ্গে যেখানটায় মিশেছে সেখানে এসে দাঁড়াল রানা। গ্রে'জ ইন রোডের দিকে তাকাল। সানডে টাইমস বিল্ডিংটা দেখতে

পেল। চকচকে ধাতব ফ্রেমে আটকানো কাঁচের জানালাগুলো চকচক করছে রোদ পড়ে। রাস্তা পেরোবার জন্যে পা বাড়াতে গিয়েও থেমে গেল ও। সানডে টাইমস-এর অফিসে যাবে ভেবেছিল, কিন্তু কি মনে করে সিদ্ধান্ত পাল্টাল। ওখানে গিয়ে লাভ হবে না কোন। সাংবাদিকতার সূত্রে ওখানকার দু'একজনের সঙ্গে পরিচয় থাকলেও সাহায্য করার মত ঘনিষ্ঠ কেউ নেই ওখানে। এই মুহূর্তে রানা এজেন্সি বা বি. সি. আই-এর কোন সাহায্যও নিতে পারবে না, সাংবাদিকের কভারটা ফাঁস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তাতে।

কে সাহায্য করতে পারে? স্যান্ডনেস, শেটল্যান্ডে যেতে হবে, পাড়ি দিতে হবে হাজার মাইল পথ। সমুদ্র দিয়ে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। আকাশ পথেই যেতে হবে, কিন্তু এয়ারপোর্টের মাধ্যমে যাওয়া চলবে না। তাহলে? ভাবতে ভাবতে গ্রে'জ রোড ধরে হেঁটে চলেছে ও। লন্ডনের পরিচিত, স্বল্পপরিচিত, সব ধরনের লোকের নামগুলো একে একে স্মরণ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু প্রত্যেকটা নামই বাতিল করে দিতে হচ্ছে। এই মুহূর্তে যেটা সবচেয়ে প্রয়োজন তা হলো একটা অ্যারোপ্লেন। ছোট হোক, বড় হোক একটা প্রাইভেট প্লেন দরকার ওর।

একটা টেলিফোন করেই প্লেন চার্টারের ব্যবস্থা করে দিতে পারে এমন অনেককেই চেনে ও। ইচ্ছে করলে ও নিজেও আধ ঘণ্টার ভেতরেই একটা প্লেন চার্টার করে নিতে পারে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, সবাই কারণ জানতে চাইবে। যে কোন চার্টার এয়ার লাইন্সে ফোন করলে ওরাও প্রথমে জানতে চাইবে কারণ। তাছাড়া চার্টার এয়ার লাইন্সগুলোর উপরেও হফম্যান নজর রাখার ব্যবস্থা করেছে কিনা কে জানে!

ঠিক আছে, এবার দেখা যাক এমন কারও সঙ্গে পরিচয় আছে কিনা যে ফ্লাই করতে পারে, ভাবল রানা। কয়েকজনের নামই মনে এল, কিন্তু একজনকেও পছন্দ হলো না। ওদের কাউকে নিলে শেষ পর্যন্ত বিপদে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

হঠাৎ করেই মনে পড়ল জন গ্যাভিনের কথা। অস্ট্রেলিয়ান, ডেইলি মিররে কাজ করে। প্রেসক্লাবে পরিচয় রানার সাথে। প্রথম পরিচয়েই ভাল লেগে যায় ওর ছোকরাকে। অহেতুক অতিরিক্ত কৌতূহল খুবই বিরক্তিকর লাগে ওর কাছে, আর প্রতিটা রিপোর্টারই এই বিরক্তিকর গুণটার ষোলো আনা অর্জন করে ফেলেছে। কৌতূহল না থাকলে রিপোর্টার হিসেবে চকচক করারও কোন সম্ভাবনা নেই। গ্যাভিনের মধ্যে এই বিরক্তিকর উপাদানটা প্রায় নেই বললেই চলে। এবং সেই কারণেই ওকে পছন্দ হয়েছিল রানার।

গ্রে'জ ইন রোডের প্রায় শেষ মাথায় এসে পড়েছে ও হাঁটতে হাঁটতে, সামনেই কিং'স ক্রস। একটা ফোন বুদ দেখে ঢুকে পড়ল সেটার ভেতর। ডেইলি মিররের নাম্বারে রিং করতেই পি. বি. এক্স অপারেটর ধরল ফোন। ফিচার সেকশনে লাইন দিতে বলল ও। চেষ্টা করে কৃত্রিম একটা অস্ট্রেলিয়ান টান আনার চেষ্টা করল কথায়।

ফিচার সেকশনে ফোন ধরল যে লোকটা তার কাছে গ্যাভিনের কথা জিজ্ঞেস করল ও।

'একটু ধরুন, দেখছি,' ব্যস্ত গলায় বলল লোকটা।

রিসিভার কানে ঠেকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল রানা। এখন অফিসে থাকলেই হয় গ্যাভিন। কাঁচের ভেতর দিয়ে সতর্ক চোখে তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে, পুলিস এসে পড়লে বিপদ হবে। ইতোমধ্যেই ওরা ওর ছবি সংগ্রহ করে ফেলেছে কিনা কে জানে। জহির ভাইকে চাপ দিলে উনি না দিয়ে পারবেন না বোধহয়।

'জন গ্যাভিন বলছি।'

'আমার সঙ্গে একটু দেখা করতে পারো?' বলল রানা। 'খুব জরুরী দরকার।'

'কে?'

'মাসুদ রানা। মনে আছে আমার কথা?'

'ওহ, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। তা, তুমিই চলে এসো না আমার অফিসে। হাতে কিছু কাজ ছিল আমার।'

'আসতে পারলে তো চলেই আসতাম, ফোন করতাম না। যাহোক খুব বেশি কাজ থাকলে অবশ্য...'

'না না, ঠিক আছে, আসছি আমি। কোথায় আছ তুমি?'

'কিং'স ক্রস-এর সাথে গ্রে'জ ইন রোডটা যেখানে মিশেছে, সেইখানে থাকব আমি।'

'ঠিক আছে, বিশ মিনিটের ভেতর আসছি।'

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে বেরিয়ে এল রানা বুদ থেকে। কাছের একটা আর্মি সারপ্লাস শপ থেকে একটা নীল রঙের ডাফি জ্যাকেট, একটা টুপি আর একজোড়া সানগ্লাস কিনে অপেক্ষার সময়টুকু পার করল ও।

প্লেন চালানো হবি গ্যাভিনের। সময় বা সুযোগ পেলেই ও উঠে পড়ে আকাশে। ছোট একটা ফোর সিটার সেসনার অর্ধেক শেয়ার রয়েছে ওর। যথেষ্ট টাকা কামায় ও ডেইলি মিরর থেকে, তার প্রায় সবটাই উড়িয়ে দেয় প্লেন চালানোর পেছনে। প্লেন চালানোর বাতিক ছাড়া আর কোন বদ-অভ্যাস নেই ছেলেটার। এয়ারফোর্সে না গিয়ে বা কমার্শিয়াল পাইলট না হয়ে জার্নালিজমে এল কেন ছেলেটা ভেবে পায় না রানা।

গ্যাভিনের আসার সময় হওয়ার কয়েক মিনিট আগে বেরিয়ে এল ও দোকান ছেড়ে। পেভমেন্টের উপর দাঁড়িয়ে ট্যাক্সি খুঁজতে লাগল। ট্যাক্সিতে উঠে আপাতত কিং'স ক্রসের দিকে যেতে নির্দেশ দিল ড্রাইভারকে। মোড়টার কাছে পৌঁছতেই দেখতে পেল, দাঁড়িয়ে আছে গ্যাভিন। থামতে বলল ড্রাইভারকে।

'গ্যাভিন! এদিকে!' জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে চিৎকার করে ডাকল রানা।

ট্যাক্সিতে এসে উঠল গ্যাভিন। 'কি ব্যাপার? রহস্য রহস্য গন্ধ পাচ্ছি যেন!'

ড্রাইভারকে সেন্ট প্লাসিড'স রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে যাওয়ার কথা বলে গ্যাভিনের দিকে ফিরল ও।

'হ্যাঁ, একটু রহস্য আছে। তোমার প্লেনটা কি ফ্লাই করছে আজ?'

একটু চুপ করে রইল গ্যাভিন। তারপর বলল, 'সকালে করেছিল। আমার পার্টনার একটা খ্যাপ মেরেছে জানি। কিন্তু এখনকার খবর তো জানি না। বোধহয় ফ্রী আছে। কেন?'

'কারণ, আমি চার্টার করতে চাই প্লেনটা, আর পাইলট হিসেবে চাই

তোমাকে। অন্য কেউ হলে চলবে না।'

'পাগল না মাথা খারাপ!' জবাব দিল গ্যাভিন। 'চার্টার্ড ফ্লাইট চালানোর লাইসেন্স নেই আমার। খুব শিগ্‌গিরই পেয়ে যাব অবশ্য। তাছাড়া, আজ ডেস্কে আছি আমি।'

'খুবই দুঃখ পেলাম,' যথার্থই দুঃখ দুঃখ ভাব ফুটিয়ে তুলল রানা গলায়। 'ভেবেছিলাম একজন বন্ধুর কাছ থেকে একটু উপকার পাব। তোমার যা ন্যায্য ভাড়া হয় তা অবশ্য দিতাম আমি, বিনা পয়সায় সার্ভিস নেব সে-রকম ইতর নই আমি।'

কয়েক মুহূর্ত গুম মেরে বসে রইল গ্যাভিন। 'কোথায় যেতে চাও?' জানতে চাইল সে।

'লারউইক।'

'ঠাট্টা করছ?' চোখ জোড়া বড় বড় হয়ে গেছে গ্যাভিনের।

'না, গ্যাভিন, ঠাট্টা নয়।'

'তারমানে? সত্যিই তুমি লারউইকে যেতে চাও? ঠাট্টা করছ না...'

'ঠাট্টা করার মত মনের অবস্থা নেই আমার,' বলল রানা। 'শোনো, নগদ দুশো পাউন্ড, প্লাস ফুয়েল, আর মেইনটেন্যান্স খরচা।'

'কি এমন জরুরী দরকার তোমার লারউইকে?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল গ্যাভিন।

'বলা যাবে না।' ভাগ্য ভাল, কমার্শিয়াল এয়ারলাইনে না গিয়ে চার্টার্ড প্লেনে কেন যাবে জিজ্ঞেস করেনি গ্যাভিন।

'হুঁ। আর আমার সম্পাদক টের পেলে?'

'কিভাবে জানবে? তুমি যদি না বলো জানার প্রশ্নই আসে না। আর ডেস্কের ডিউটি? তোমার আশি বছরের বুড়ি খালা এসেছে সিডনী থেকে, লন্ডন শহরটা ঘুরে ফিরে দেখতে চায় এবং হাতের কাছে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই।'

'ঠিক আছে, এসে গেছে খালা!' এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল গ্যাভিন। 'শোনো, এয়ারপোর্টটা লারউইকে নয়, জানো তো? সামবার্গে।' তারপর হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'ও খোদা! পাঁচ ছয় ঘণ্টার ফ্লাইট!'

'সে-সব জানি আমি,' চাপা ঝাড়ল রানা। 'তুমি যাচ্ছ কিনা তাই বলো।'

'দুই পেন্সের কয়েন আছে তোমার কাছে? ফোন করতে হবে একটা।'

একটা না, কয়েকটা কয়েন দিল রানা ওর হাতে। 'প্লেনটা রেডি আছে কিনা সেটাও জেনে নিয়ো ফোন করে।'

একটা ফোন বুদের সামনে ট্যাক্সি দাঁড় করতে বলল রানা ড্রাইভারকে। গ্যাভিন বেরিয়ে গেল অফিসে ফোন করার জন্যে। রানা বসে রইল ট্যাক্সিতে। কয়েক মিনিট পর গ্যাভিন বেরিয়ে এল বুদ থেকে।

'ঠিক আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ, খালাম্মা। কিন্তু বুঝলাম না অফিসের ওরা আমার ব্যাখ্যায় ঠিক সন্তুষ্ট হলো কিনা।'

'আর প্লেনটা?'

'রেডি।' সীটে হেলান দিয়ে বসতে বসতে বলল গ্যাভিন, 'এলস্ট্রির দিকে যেতে বলো ড্রাইভারকে। প্রাইভেট এয়ারফিল্ডটা এলস্ট্রিতেই।'

'আগে সেন্ট প্লাসিড'স স্কুলটা ঘুরে যেতে হবে। এই তো এসে গেছি।'

'কেন? ওখানে আবার কি?'

'দরকার আছে।'

সেন্ট প্লাসিড'স রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের সামনে এসে দাঁড়াল ট্যাক্সি। হোস্টেল বিল্ডিংটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে বলল রানা ড্রাইভারকে।

গ্যাভিনকে ট্যাক্সিতে বসতে বলে নেমে গেল রানা। হোস্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের অফিসে গিয়ে ঢুকল ও। হোস্টেল সুপার প্রশ্নবোধক চোখে চাইতেই বলল, 'আমি মাসুদ রানা, জামিল আশরাফের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে উঠল সুপার।

'মিস্টার মাসুদ রানা! আপনি তো জামিলের লোকাল গার্জিয়ানদের একজন, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এদিকে তো একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেছে। গতকাল থেকে জামিলকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

চমকে উঠল রানা। 'মানে?'

'মানে পাওয়া যাচ্ছে না। কালকে ওদের ক্লাসের সঙ্গে অন্য একটা ক্লাসের খেলা ছিল, ওদের ক্লাসের পক্ষে খেলার কথা ছিল ওর। কিন্তু মাঠে আসেনি সে। খেলার সময় যখন প্রায় পেরিয়ে যাচ্ছে, তখন খোঁজ নিতে যাই আমি, কিন্তু দেখি রুমেও নেই। তারপর সমস্ত হোস্টেলে খোঁজ নেয়া হয়েছে কিন্তু পাওয়া যায়নি।'

যা ভেবেছিল রানা ঠিক তাই ঘটেছে। সুফিয়াকে চাপ দেয়ার জন্যে জামিলকেও আটকেছে ওরা।

'পুলিসকে জানাননি আপনারা?' জিজ্ঞেস করল ও।

'না, এখনও জানানো হয়নি। আমরা কনফার্ম ছিলাম না ওর বোনের সাথে বা আপনার সাথে কোথাও গেছে কিনা, তাই জানানো হয়নি পুলিসকে। মিস আশরাফের নাম্বারে ফোন করার চেষ্টা করেছি আমরা কয়েকবার। ওনার বাসায় ফোন তোলেনি কেউ। অফিসে চেষ্টা করেছি আমরা, অফিস থেকে জানিয়েছে, লন্ডনে নেই উনি, মস্কো না কোথায় যেন গেছেন বেশ ক'দিন আগে। তখন ভাবলাম আপনার সঙ্গে যদি কোথাও গিয়ে থাকে। আপনার ফ্ল্যাটে ফোন করেও পাওয়া যায়নি কাউকে। আজ সকালেও ফোন করেছি আপনার ফ্ল্যাটে।'

'আমাদের কারও সঙ্গেই যায়নি ও, বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই এতক্ষণে। কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে হঠাৎ করে ওকে নিয়ে যাওয়ার মত কাণ্ড জ্ঞানহীন নই আমরা এটুকু আশা করেছিলাম আপনারা বুঝবেন। যাহোক, পুলিসে খবর দিন। এদিকে আমি চেষ্টা করে দেখি কোন খোঁজ পাওয়া যায় কিনা। আরও আগেই পুলিসকে জানানো উচিত ছিল আপনাদের।'

'সরি, মিস্টার রানা, ঠিক বুঝতে পারিনি আমরা। কোন কোন গার্জেন এমনি হঠাৎ করে...'

'ঠিক আছে, আমি আসি এখন।'

'একটা কথা, মিস্টার রানা, আপনি কোন খবর পেলে জানাবেন আমাদের।'

'নিশ্চয়ই। আচ্ছা···ঠিক কখন থেকে পাওয়া যাচ্ছে না ওকে তা বলতে পারবেন?'

'ঠিক জানি না। সকালে ক্লাসে গিয়েছিল। সবগুলো ক্লাসও করেছিল ঠিকমত। ক্লাস শেষ হওয়ার পর থেকে ওকে আর দেখেনি কেউ।'

এলস্ট্রি থেকে একটা ফোন করল রানা জহির ভাইকে। প্রাইভেট লাইনে। কে ট্যাপ করল না করল এখন আর পরোয়া করে না ও। 'সরকারী কর্মকর্তাদেরকে হেন্ডারসনের খোঁজ করতে বলুন। ঠিকানা জার্লশফ, স্যান্ডনেস, নরওয়ে।' রেখে দিল রানা ফোন। এক ঘণ্টার ভেতরেই মাটি ছেড়ে আকাশে উঠল গ্যাভিনের সেসনা। ফ্লাইট প্ল্যানটা কোন ঝামেলা না করেই অ্যাকসেপ্ট করেছে কর্তৃপক্ষ, সৌভাগ্যই বলতে হবে।

কন্ট্রোলের উপর নানা ধরনের সুইচ টিপে চলেছে গ্যাভিন গর্বের সাথে, থ্রটলটা ধরে আছে এক হাতে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে রানা, একজন সাংবাদিককে পাইলট হিসেবে দেখতে মন্দ লাগছে না। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে ভালই চালায় গ্যাভিন। ঘুণাক্ষরেও জানতে দিল না, ও নিজেও একজন দক্ষ পাইলট।

'ক'ঘণ্টা লাগবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ছ'ঘণ্টার মত। একেবারে নিখুঁত ভাবে বলতে গেলে পাঁচ ঘণ্টা ছাপ্পান্ন মিনিট, টেক অফ আর ল্যান্ডিংয়ের সময় সমেত। তার মানে গড়ে ঘণ্টায় প্রায় ত্রিশ পাউন্ড করে পড়ছে তোমার। কিন্তু এত খরচ করছ কেন তুমি?'

'বলা যাবে না। তবে এটুকু জেনে রাখো, মজা করার জন্যে অবশ্যই নয়।'

'সেটা বুঝতে পারছি। লাখোপতি না হলে এত খরচায় মজা করে না কেউ। নিশ্চয়ই বড়সড় কোন স্টোরি আছে। পারলে লেগে থাকব আমিও। আমার নিজের পত্রিকার প্রতিও একটা দায়িত্ব আছে তো আমার।'

'শোনো, গ্যাভিন,' শান্ত অথচ গম্ভীর গলায় বলল রানা। একটু চমকে ওর দিকে না তাকিয়ে পারল না গ্যাভিন। 'ল্যান্ড করার পর এক কাপ চা অথবা কফি খেয়েই ব্যাক করবে তুমি। বিশ্রাম বা খাওয়া-দাওয়ার জন্যে যদি থামতেই হয় তো স্কটল্যান্ডের ওদিকে কোথাও থামবে। শেটল্যান্ডে এক মুহূর্তও অপেক্ষা করবে না। বোঝা গেছে?'

'ঠিক আছে, বাবা, ঠিক আছে,' একটু হেসে বলল গ্যাভিন। 'তোমার স্টোরি তোমারই থাক। এবার একটু উপকার করো আমার, দয়া করে চুপ করে থাকো।'

বাধ্য ছেলের মত চুপ করে গেল রানা। স্তরে স্তরে জমে থাকা নানা আকারের মেঘ দেখতে লাগল বসে বসে। মেঘ ও রোদের লুকোচুরি খেলার মধ্য দিয়ে উড়ে চলেছে সেসনা। এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার আকাশ দিয়ে উড়ছে প্লেন, পরমুহূর্তে ঢুকে পড়ছে গাঢ় মেঘের মধ্যে। মেঘের মতই এলোমেলো হয়ে নানা রকমের চিন্তা উড়ে বেড়াচ্ছে ওর মাথায়। স্ট্রম ব্রাদার্সে করা লে-আউটের ফটোকপিগুলো বের করল পকেট থেকে। গভীর মনোযোগে দেখতে লাগল কপিগুলো, যদি আর কোন সূত্র পাওয়া যায়। আগে খেয়াল করেনি. এখন হয়তো

চোখে পড়বে। কিন্তু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবগুলো লে-আউট আরও দু'বার দেখার পরও নতুন কিছু নজরে পড়ল না ওর, বুঝতেও পারল না কিছু।

রি-ফুয়েলিংয়ের জন্যে অ্যাবার্ডিনের ডাইস-এ থামতে হলো ওদের। তারপর আবার অবিরাম উড়ে চলা। পেন্টল্যান্ড ফার্থ পেরোবার পর বিদায় নিয়েছে মেঘের দল। পরিষ্কার মেঘমুক্ত আকাশের বুক চিরে উড়ে চলেছে ছোট্ট সেসনা। ওর্কনি বেকন পার হয়ে আসার পর গ্যাভিন একবার কথা বলল সামবার্গ কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে। উৎফুল্ল মুখে তাকাল রানার দিকে। 'বিশ নট গতির ক্রসউইন্ড বইছে ওখানে। ল্যান্ডিংয়ের সময় একটু সাবধান হতে হবে। মজা হবে যাহোক, এখন মনে হচ্ছে এসে ভালই করেছি।'

বেশ ছোকরা, মনে মনে ভাবল রানা। জোর বাতাসের ভেতর প্লেন ল্যান্ড করানোর অভিজ্ঞতা হবে ভেবে কেমন ডগমগ হয়ে উঠেছে। একে অন্য আরও কাজে ব্যবহার করা যাবে, ভাবল রানা। মুখে বলল, 'সাবধানে ল্যান্ড করবে।'

'সে কথা বলতে হবে না, খালা। এটার অর্ধেকের মালিক না আমি? দেখো কেমন পালকের মত নামিয়ে আনি, একটু ঝাঁকিও লাগবে না!' হাসছে গ্যাভিন।

কিন্তু বাস্তবে কথা মত কাজ করল না গ্যাভিন। প্লেনটা একদিকে কাত করে দিয়ে ঝড়ের মুখোমুখি হলো ও। মারাত্মকভাবে কেঁপে উঠল ছোট্ট প্লেনটা। মুখে পরিতৃপ্তির হাসি নিয়ে পর পর চার পাঁচবার একইভাবে বাউন্স করাল প্লেনটাকে। তারপর নামিয়ে আনল মাটিতে।

'দুঃখিত। চেষ্টা করেছিলাম সফটলি নামাতে। কি করব বলো, এর চেয়ে নরম ভাবে পারলাম না। পরের বার চেষ্টা করব, কেমন!' দুঃখের লেশমাত্রও দেখা গেল না ওর চেহারায়।

'পরের বার। পরের বারটা যদি জীবনে কখনও আসে তবে তো!' প্লেন থেকে নামতে নামতে বলল রানা।

এঞ্জিন বন্ধ করে নেমে এল গ্যাভিনও। 'আসবে। নিশ্চয়ই আসবে কোনদিন,' দু'শো পাউন্ড পকেটে রাখতে রাখতে বলল গ্যাভিন।

'হ্যাঙ্গারেজ আর মেইনটেন্যান্স বিলটা জহিরুল ইসলাম সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিয়ো,' বলল রানা।

'ঠিক আছে। অনেক নাম শুনেছি ভদ্রলোকের, এবার পরিচিত হওয়া যাবে।'

'আমিই ভাল করে পরিচয় করিয়ে দেব একদিন।'

'ঠিক আছে, ফিরে আসো তুমি লন্ডনে; তারপর দেখা যাবে।'

একটু লাফালাফি করে হাত পায়ের জড়তা কাটিয়ে নিয়ে আবার সেসনায় উঠে পড়ল গ্যাভিন। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'থ্যাঙ্কস!' জানালার কাঁচ তুলে দিয়ে এঞ্জিনে স্টার্ট দিল সে। রানা এয়ারপোর্ট বিল্ডিংয়ে ঢুকতে ঢুকতে মাটি ছেড়ে আকাশে উঠে পড়ল সেসনা। দক্ষিণ দিকে মুখ করে ফিরে যাচ্ছে গ্যাভিন।

পুরো শেটল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের বিরাট একটা অর্ডন্যান্স সার্ভে ম্যাপ লাগানো রয়েছে এয়ারপোর্ট টার্মিনাল বিল্ডিংয়ের এক জায়গায়। ম্যাপটার সামনে একটু দাঁড়াল রানা, জায়গাটা সম্পর্কে একটু ধারণা নিয়ে নিতে চায়। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেটল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী লারউইকে পৌঁছতে চায় ও। রওনা

দিতে যাচ্ছে, এমন সময় ম্যাপের ওপর এমন একটা জিনিস নজরে পড়ল যে না থেমে পারল না ও। একটা মাত্র শব্দ: জার্লশফ। পুরানো ধাঁচের টাইপে ছাপা নামটা। এই ধরনের টাইপ ফেস প্রাচীনতা এবং দুষ্প্রাপ্যতা বোঝাতেই ব্যবহার হয় অর্ডন্যান্স সার্ভে ম্যাপে। দাঁড়িয়ে পড়ার আরেকটা কারণ এয়ারপোর্ট থেকে জায়গাটার দূরত্ব মাত্র এক মাইলের মত।

টার্মিনাল বিল্ডিং ছেড়ে বেরিয়ে এল রানা। আশপাশে একবার তাকিয়ে দেখল, ফাঁকা। কোন কমার্শিয়াল ফ্লাইট আসার সময় নয় এখন, বোধহয় সেই কারণেই কোন রকম যানবাহন নেই এয়ারপোর্ট বিল্ডিংয়ের সামনে। একমাত্র রাস্তাটা ধরে হাঁটতে শুরু করল ও। কিছুদূর যাওয়ার পরই দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল রাস্তা। মেইন রোডটা চলে গেছে পুব দিকে; আর ছোট একটা রাস্তা মেইন রোড থেকে বেরিয়ে চলে গেছে দক্ষিণ দিকে। মোড়ের কাছে একটা সাইনপোস্ট দেখল রানা। দুটো তীর চিহ্ন দিয়ে দেখানো রয়েছে, 'লারউইক' আর 'জার্লশফ'। পুবদিকেরটা লারউইক আর দক্ষিণদিকেরটা জার্লশফ। জার্লশফের রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করল ও। একটু যেতেই চোখের সামনে ভেসে উঠল পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো।

জায়গাটাকে নির্জন মনে হলো। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, তাছাড়া ট্যুরিস্ট সিজন বোধহয় শেষ হয়ে গেছে। মাথার উপর দিয়ে গর্জন করে একটা টুইন জেট উড়ে গেল। সামবার্গে ল্যান্ড করবে বোধহয়। মুহূর্তে খান খান হয়ে ভেঙে পড়ল নির্জন জায়গাটার নিস্তব্ধতা। চোখ তুলে প্লেনটা দেখল রানা। লেজের কাছে এয়ারলাইন্সের চিহ্নটা পরিচিত মনে হলো না। প্রাইভেট প্লেন বোধহয়। ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরবে এমন সময় দেখতে পেল ও গাড়িটা। আচ্ছা! একেবারে নির্জন নয় তাহলে জায়গাটা। পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর সামনে ঘুরে বেড়াতে লাগল ও। বড় বড় নোটিশ বোর্ডে ছোট ছোট অক্ষরে জায়গাটার ইতিহাস লেখা রয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় কয়েকটা নোটিশবোর্ড দেখল রানা। কৌতূহলী হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল একটা বোর্ডের লেখা। ভাইকিং যুগ থেকে মধ্যযুগ, লোহার যুগ থেকে ব্রোঞ্জ যুগ পর্যন্ত মানুষের জীবন যাপনের রীতিনীতি সম্পর্কে জানা গেছে এখানকার মাটি খুঁড়ে। কিন্তু এই সব পুরানো পাথরের সযত্ন সংগ্রহের সঙ্গে কি করে ওর নিজের সমস্যা যুক্ত হয়ে গেছে, অবাক হয়ে ভাবছে রানা।

দেখলেই বোঝা যায় যথেষ্ট যত্ন নেয়া হয় জায়গাটার। বাংলাদেশের পাহাড়পুর বা শালবন বিহারের মত অবস্থা নয় মোটেই। দেয়ালের কিনার দিয়ে ঘাসগুলো সুন্দর করে ছাঁটা। কোথা দিয়ে কোথা দিয়ে হাঁটতে হবে তা-ও সযত্নে চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে। উদ্দেশ্যহীনভাবে বেশ কিছুক্ষণ হেঁটে বেড়াল রানা। একটা গাড়ি দেখা গেলেও কোন মানুষের দেখা এখনও পায়নি ও। ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসছে। আর ঘোরার কোন মানে হয় না, এবার ফিরতেই হয়। লারউইক পর্যন্ত অনেকটা পথ যেতে হবে। এমন সময় পেছন থেকে ভেসে এল শব্দটা, 'কোন সাহায্যে আসতে পারি আপনার?'

ঘুরে দাঁড়াল রানা। একথা বলেছে যে লোকটা, সত্তরের কম হবে না তার বয়স। বেশ লম্বা এবং সে কারণেই বোধহয় একটু ঝুঁকে আছে সামনের দিকে। পণ্ডিত পণ্ডিত চেহারা। ধূসর চুলের এক মহিলা দাঁড়িয়ে লোকটার পাশে। 'এটাই

তাহলে জার্লশফ?' ওর নিজের কাছেই কেমন যেন অর্থহীন মনে হলো কথাটা।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মৃদু একটু হাসি বিনিময় করল বুড়ো-বুড়ি।

'জায়গাটা চমৎকার, তাই না?' বলল মহিলা।

'হ্যাঁ, চমৎকার,' স্বীকার করল রানা।

রানার মনের অবস্থা বোধহয় কিছুটা আঁচ করতে পেরেছে বৃদ্ধ। বলল, 'কিন্তু আপনার এক্সপেক্টেশনের সঙ্গে ঠিক মিলছে না বোধহয়?'

'আসলে ঠিক কি যে আশা করেছিলাম তা আমি নিজেও জানি না। একজনকে খুঁজছি আমি।'

'জার্লশফে?' নির্ভেজাল বিস্ময় ফুটে উঠল লোকটার মুখে।

'আমার কাছে যে ঠিকানাটা আছে তার একটা অংশ জার্লশফ,' বলল রানা। 'এয়ারপোর্টের কাছে সাইন পোস্ট দেখে চলে এসেছি এদিকে।'

'কার কাছে যাবেন বলুন তো, দেখি সাহায্য করতে পারি কিনা।'

'মিস্টার জেমস হেন্ডারসন, জার্লশফ, স্যান্ডনেস, শেটল্যান্ড।'

'স্যান্ডনেস?' চোখ কপালে উঠে গেল বৃদ্ধের। 'সে তো অনেক দূর। চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল তো হবেই। আপনি কি ছুটিতে এসেছেন?'

'এই, বেড়াতে আর কি।'

'সবাই ভাবে শেটল্যান্ডের দ্বীপগুলো খুব ছোট্ট,' এবার কথা বলল মহিলা। 'আমার মনে হয়, দ্বীপগুলোকে ম্যাপে সব সময় আলাদা ছোট বাক্সে দেখানো হয় বলেই লোকে এমনটা ভাবে।' স্বামীর দিকে ফিরে ভদ্রমহিলা বলল, 'এই ভদ্রলোক এখন স্যান্ডনেসে যাবেন কি করে বলো দেখি?'

'ওঁকে প্রথমে লারউইকে যেতে হবে।'

'একটা গাড়িভাড়া করে নেব আমি,' বলল রানা।

'সেজন্যেও আগে লারউইকে যেতে হবে আপনাকে। অন্য কোথাও গাড়িভাড়া করতে পারবেন না। আপনি চাইলে আমরা অবশ্য লারউইক পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারি আপনাকে। ওদিকেই যাচ্ছি আমরা।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ...' সত্যিই গদগদ হয়ে উঠল রানা। লারউইক পর্যন্ত অনেকটা পথ। আসার সময়ই এয়ারপোর্টের সামনেটা গাড়িশূন্য দেখে এসেছে। এখন যদি হেঁটে লারউইক পর্যন্ত যেতে হয় তো বারোটা বাজবে ওর।

'আরে না-না, কি যে বলেন,' বলল বৃদ্ধ। 'এটা তো আমাদের কর্তব্য, তাই না, ডার্লিং? দেখেই বুঝতে পারছি বিদেশী আপনি।'

রানার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল মহিলা। 'হেন্ডারসন! নামটা শুনেছি মনে হয়...। ওহ্ সেই পাখিওলা, তাই না?'

'হ্যাঁ। ওরিন্থোলজিস্ট ভদ্রলোক।'

'হ্যাঁ, ঠিক,' বলল মহিলা। 'ওর সঙ্গে একবার আলাপও হয়েছিল আমাদের। তোমার মনে আছে, ডার্লিং?'

'এখন মনে পড়েছে,' বলল বুড়ো। 'কতলোকের সাথে যে পরিচয় হয়, সবার কথা কি আর মনে থাকে, না মনে রাখা যায়?'

'তা ঠিক,' স্বীকার করল রানা। 'এই ধরুন আমার সঙ্গে আজ পরিচয় হলো

আপনাদের; ক'দিন মনে থাকবে এই পরিচয়ের কথা বলুন?'

'না না, ওভাবে বলবেন না, হয়তো অনেকদিন মনে থাকবে আপনার কথা,' বলল মহিলা।

'সেটা আমার সৌভাগ্য,' একটু বিনয়ী হতে চেষ্টা করল রানা। 'তবে আপনাদের কথা অনেক দিন মনে থাকবে আমার।'

'ধন্যবাদ,' বলল বুড়ো। 'ওহ্-হো, এখনও তো পরিচয়ই দিইনি আমাদের। আমি ম্যাকলিওড আর ইনি মিসেস ম্যাকলিওড। এখানে আমরা অবসর জীবন কাটাচ্ছি।'

'আমি মাসুদ রানা,' শেকহ্যান্ডের জন্যে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল রানা। 'সত্যিই খুব খুশি হলাম আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে।'

বুড়ো-বুড়ির ছোট গাড়িটায় উঠে বসল রানা। একটু পরেই জার্লশফ ছেড়ে চলে এল ওরা। এরকম হুট করে চলে আসাটা ঠিক হলো কিনা বুঝতে পারছে না ও। আরেকটু খোঁজখবর নিয়ে দেখলে হত। যাকগে, এঁরা দু'জন তো বলেছেন এঁরা পাখিওলা হেন্ডারসনকে চেনেন, আর সে লোক থাকে না এখানে। আসলে কোন লোকই থাকে না এখানে। আশপাশে কোন লোকবসতি নেই।

'একটা গুজব শুনেছেন, মিস্টার রানা?' জিজ্ঞেস করল মিসেস ম্যাকলিওড। 'আপনার হেন্ডারসন নাকি আরেকজোড়া শ্বেত প্যাঁচা আবিষ্কার করেছে। শরৎকালের কথা অবশ্য সেটা।'

'সত্যি নাকি?' বলল রানা, 'শ্বেত প্যাঁচা। শুনিনি তো!'

'হ্যাঁ। আগেও আবিষ্কার করেছে ও। দু'জোড়া বোধহয়। আনস্ট না ফেটলার কি যেন নাম দ্বীপটার। যাহোক, ও দুটোতে না হলে অন্য কোন দ্বীপে, ঠিক মনে করতে পারছি না। এখনও ব্যাপারটা গুজবই। খুব উত্তেজিত হয়ে আছে এ নিয়ে হেন্ডারসন—গোপন রাখার চেষ্টা করছে।'

'তাই নাকি?'

একজোড়া শ্বেত প্যাঁচার কথা গোপন রাখার চেয়ে অনেক বড় সমস্যা এখন তোমার সামনে, হেন্ডারসন, মনে মনে বলল রানা।

মোড়টার কাছে এসে মেইন রোড ধরে পুবদিকে গাড়ি চালাতে লাগল মিস্টার ম্যাকলিওড।

রাত নেমে আসছে। সামবার্গ এয়ারপোর্টের আলোকিত রানওয়ের পাশ দিয়ে চলছে এখন গাড়ি। এক ঝাঁক সাদা-কালো পাখি দেখতে পেল রানা আকাশে। সার বেঁধে উড়ে আসছে টারম্যাকের উপর দিয়ে। অনেক নিচু দিয়ে বিরাট একটা হেলিকপ্টার উড়ে গেল টারম্যাকের দিকে। এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে গেল পাখিগুলো হেলিকপ্টারের শব্দে।

'এই তেল কোম্পানীগুলোই শেষ করে ফেলবে আমাদের সুন্দর দ্বীপগুলোকে,' দাঁত কিড়মিড় করে বলতে বলতে রানার দিকে ফিরল মিসেস ম্যাকলিওড। হেলিকপ্টারটা তেল কোম্পানীগুলোরই কোন একটার সম্পত্তি। ওটা দেখেই মহিলা বলল কথাগুলো।

'আমি অবশ্য ভাল করে জানি না কি করছে তেল কোম্পানীগুলো,' ভয়ে ভয়ে বলল রানা। জবাবে পরবর্তী বিশমিনিট একনাগাড়ে বক্তৃতা দিল মহিলা। তেল কোম্পানীগুলো তাদের প্রয়োজনে যেসব জমি পছন্দ করে কিনেছে তা নিয়ে স্থানীয় জনসাধারণের বিক্ষোভের কথা ব্যাখ্যা করে বোঝাল মিসেস ম্যাকলিওড। আশঙ্কা প্রকাশ করল, একদিন না একদিন দুর্ঘটনাক্রমে হলেও তেল গড়িয়ে পড়বে সমুদ্রে এবং তখন স্থানীয় সামুদ্রিক পাখিগুলো একেবারে শেষ হয়ে যাবে। আর এই যে তেল উঠছে এর লাভের অঙ্কটা কার পকেটে যাচ্ছে? নিশ্চয়ই স্থানীয় লোকদের কল্যাণে তার এক পয়সাও খরচ করা হচ্ছে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব ব্যাপারে রীতিমত বিশেষজ্ঞ মনে হলো মহিলাকে। একনাগাড়ে গড় গড় করে কথা বলে চলেছে মহিলা, একটু পর পরই ঠিক কিনা, তাই না, এসব বলে সমর্থন চাইছে রানার। এমন সময়, 'লারউইক' লেখা একটা সাইন পোস্টের উপর পড়ল হেডলাইটের আলো। কয়েক মিনিট পরই ঢালু পাহাড়ী পথে নামতে শুরু করল গাড়ি। দূরে দেখতে পেল রানা ছোট শহরটা।

মহিলার বকবকানিতে বাধা দেয়া সহজ কাজ নয়। পর পর তিনবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হতে হলো ওকে। সময়ের কথা ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়েছে ও। চতুর্থবারের চেষ্টায় কথা বলতে পারল রানা। জিজ্ঞেস করল, 'রাতের বেলা কি গাড়ি ভাড়া করা যাবে লারউইকে?'

'ওহ, নিশ্চয়ই। অন্য জায়গার মত নয় শেটল্যান্ড। এখনও তত কৃত্রিম আর নাগরিক হয়ে ওঠেনি এখানকার মানুষ। যথেষ্ট বন্ধু ভাবাপন্ন। একে অন্যকে সাহায্য করতে চায় তারা, বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই। সে কারণেই আরও বেশি চিন্তিত আমরা, এখানকার লোকদের চরিত্র বদলে দেবে তেল কোম্পানীগুলো।' আবার তেলের প্রসঙ্গে ফিরে এল মহিলা। ওর প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছে রানা, চিন্তা নেই। চুপচাপ শুনে যেতে লাগল বক্তৃতা।

হারবারটা ছাড়িয়ে একটা গ্যারেজের সামনে নামিয়ে দিল ওকে মিস্টার ম্যাকলিওড। ধন্যবাদ জানাল রানা। আরে না না, কি যে বলেন, কি যে বলেন করতে করতে গাড়ি চালিয়ে চলে গেল বুড়ো।

তেল আর তেল কোম্পানী সম্পর্কে যা-ই বলুক না কেন, গাড়ি ভাড়া সম্পর্কে ঠিক কথাই বলেছিল মহিলা। দশ মিনিট পর প্রায় নতুন একটা মিনি অস্টিন নিয়ে বেরিয়ে এল ও গ্যারেজ থেকে।

গাড়িটার যন্ত্রপাতিগুলো ভীষণ শক্তভাবে অ্যাডজাস্ট করা। স্টিয়ারিং হুইল ঘোরাতে বা ব্রেক করতে হলে রীতিমত শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। কি আর করা যাবে, এর চেয়ে ভাল গাড়ি পাওয়া গেল না। আরও দুটো গাড়ি অবশ্য ছিল গ্যারেজে, একটা অস্টিন আর একটা মরিস, কিন্তু সে দুটোর অবস্থা আরও খারাপ।

যে লোকটা গাড়িটা ভাড়া দিল সে বলে দিল স্যান্ডনেসের পথের নিশানা। একটা ম্যাপও দিয়ে দিল এবং সাবধান করে দিল, 'সবসময় ম্যাপের দিকে খেয়াল রাখবেন, নয়তো পথ ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রায় নতুন লোকই রোডসাইনগুলো পড়তে ভুল করে, কেন যে বুঝি না!'

ঝড়ের গতিতে গাড়ি ছোটাল রানা। ফাঁকা রাস্তা। খুব কম শেটল্যান্ডারেরই

বোধহয় নিজস্ব গাড়ি আছে। কয়েক মাইল পথ পেরিয়ে আসার পরও মাত্র দু'বার বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়ির মুখোমুখি হতে হলো। দু'বারই স্পীড কমিয়ে রাস্তার পাশেই সরিয়ে নিয়ে যেতে হলো গাড়ি। রাস্তার মাঝ থেকে একটুও না সরে সাঁ করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল গাড়ি দুটো। রাস্তার মাঝখান দিয়ে গাড়ি চালাতেই যেন পছন্দ করে শেটল্যান্ডাররা।

এরপর থেকে একটু আস্তে আস্তেই গাড়ি চালাতে লাগল ও। একটু সরু রাস্তাটা, হাইওয়ের মত নয় মোটেই। ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে গাড়ি চালানো। পাহাড়ের ধার দিয়ে চলে গেছে রাস্তাটা। বাঁকের কাছগুলোর একদিকে পাহাড় আর অন্যদিকে খাদ, খাড়া নেমে গেছে নিচে সমুদ্র পর্যন্ত। চাঁদের আলোয় ঝিলমিলে পানি দেখা যাচ্ছে নিচে। কিছুক্ষণ পরপরই হেডলাইটের আলোয় দেখতে পাচ্ছে রানা, একটা দুটো ভেড়া দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ওপর। আলো দেখে বা হর্নের শব্দ শুনেও কোন বিকার নেই সেগুলোর। একেবারে গায়ের কাছে গিয়ে স্কিড করে থামার আগ পর্যন্ত নড়ার কোন লক্ষণই দেখাচ্ছে না। আর প্রতিবারই ব্রেক করতে গিয়ে প্রাণ বেরিয়ে যাবার দশা হচ্ছে রানার। পুরো শরীর শক্ত করে জঘন্য রকম শক্ত ব্রেক পেডালে চাপ দিতে হচ্ছে। ব্রেক পেডালে পা দিতে হবে মনে হতেই গায়ে জ্বর এসে যাচ্ছে ওর।

লারউইক থেকে রওনা হবার পর ইতোমধ্যেই প্রায় ছ'মাইল পথ পার হয়ে এসেছে রানা। লোকালয় চোখে পড়েনি কোন। জনবসতি খুব কম বোধহয় শেটল্যান্ডে। দু'একটা আলো মাঝে মাঝে ঘন কালো অন্ধকারের ভেতর মিটমিটিয়ে উঠছে। পাহাড়ের পাশে খেতে পাহারা দেয়ার জন্যে তৈরি চাষীদের কুটির থেকে আসছে আলোগুলো। মিটমিটে আলোগুলো দেখে অদ্ভুত এক অনুভূতি হচ্ছে রানার মনে। পৃথিবীতে ও একা নয়, আরও লোক রয়েছে, তারই প্রমাণ যেন সেগুলো।

কিন্তু যতই পশ্চিম দিকে এগিয়ে যেতে লাগল রানা আলোর সংখ্যাও কমে আসতে লাগল ততই। অনেকক্ষণ পরপর একটা দুটো আলো দেখা যাচ্ছে এখন। রাস্তা ক্রমশ ঃ সরু আর খারাপ হয়ে আসছে। জায়গায় জায়গায় খোয়া উঠে গেছে। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগছে। স্পীড আরও কমিয়ে আনল ও। ওর পুরো মনোযোগ এখন রাস্তার ওপর। রাস্তার পাশে কোন তীরচিহ্ন দেয়া সাইনপোস্ট দেখলেই গাড়ি থামিয়ে ম্যাপের সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছে।

সামনে এক জায়গায় অনেকগুলো ছোট ছোট ঘর গুচ্ছবদ্ধ হয়ে রয়েছে। আলোকিত কাঁচের জানালাগুলো দেখেই বুঝতে পারল রানা ব্যাপারটা। ওটাই বোধহয় স্যান্ডনেস, ভাবল ও। লারউইক থেকে রওনা হওয়ার আগেই মনে মনে মাইলেজের একটা হিসেব করে নিয়েছিল। যথাসম্ভব দ্রুত গাড়ি চালিয়ে এসেছে ও, তারপরেও বত্রিশ মাইল পথ আসতে এক ঘণ্টা বিশ মিনিট সময় লেগেছে।

আরও কিছুদূর এগিয়ে একটা কটেজের সামনে গাড়ি পার্ক করল রানা, নেমে এল গাড়ি থেকে, ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগছে মুখে। গাড়ির উষ্ণ আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়েই শীত শীত লাগতে শুরু করেছে। এখান থেকে মাইলখানেকও নয় বোধহয় আটলান্টিক মহাসাগর। নক করল ও কটেজের দরজায়।

'কে? কি চাই?' ভেতর থেকে জবাব দিল এক বুড়ি। স্পষ্ট স্ক্যান্ডিনেভীয় টান

বুড়ির কথায়।

'আমি মিস্টার হেন্ডারসনকে খুঁজছি,' বলল রানা। 'কোথায় থাকেন উনি বলতে পারেন?'

দরজা খুলল মহিলা। বলল, 'দু'জন হেন্ডারসন আছে স্যান্ডনেসে। কোনজনকে খুঁজছ তুমি? বুড়ো হেন্ডারসনকে খুঁজে লাভ নেই, লারউইকে গেছে সে।'

'না না। আমি পাখিওলা হেন্ডারসনকে খুঁজছি, জেমস হেন্ডারসন।'

'ও, কমবয়েসী জন। ও তো পাহাড়ে গেছে বোধহয়।'

যথেষ্ট বয়স্কা মহিলা। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে। কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় এখনও যথেষ্ট কর্মঠ আর সতর্ক। কাঁধের ওপর একটা কালো শাল জড়িয়ে হেন্ডারসনের বাড়ির পথ দেখিয়ে দেয়ার জন্যে বাইরে এসে দাঁড়াল।

ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়ির কাছে ফিরে এল রানা। কি মনে হতে আবার এগিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, বলতে পারেন, আর কেউ খোঁজ করছিল নাকি মিস্টার হেন্ডারসনের?'

'আমি তো সে রকম কিছু শুনিনি,' কাটা কাটা গলায় জবাব দিল মহিলা। কিন্তু এমন কিছু একটা রয়েছে তার বলার ভঙ্গিতে যে রানার মনে হলো নিশ্চয়ই কিছু শুনেছে মহিলা।

আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে চলে এল ও। উঠে বসল অস্টিনে। একটু ব্যাক করে গাড়ি ঘুরিয়ে স্যান্ডনেস হিলের দিকে চলে যাওয়া অমসৃণ একটা রাস্তায় উঠল গাড়ি নিয়ে। পাহাড়ের গায়ে চাঁদের আলোর মাখামাখি। এতই উজ্জ্বল যে, মেঘের ছায়া দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। ছায়াগুলোও চলছে। রাস্তা থেকে প্রায় পাঁচশো গজ দূরে শুরু হওয়া একটা ঢাল বেয়ে উঠলে হেন্ডারসনের বাড়ি। ঢালটা যেখানে শুরু হয়েছে সে পর্যন্ত গেল ও গাড়ি নিয়ে। গাড়ি ঘুরিয়ে রেখে এঞ্জিন বন্ধ করে নেমে এল। পায়ে হেঁটে উঠতে লাগল ঢাল বেয়ে।

ধূসর রঙের পাথরে তৈরি ছোট্ট কটেজ। ছাদটা দু'দিকে ঢালু হয়ে নেমে এসেছে। দোতলায় ছাদের কাছ দিয়ে তিনকোনা কয়েকটা জানালা। বাড়িটার ভেতরে আলোর কোন চিহ্ন দেখতে পেল না রানা। চাঁদের আলোয় আবছাভাবে বাড়ির অবয়বটা শুধু দেখা যাচ্ছে। সাবধানে হেঁটে চলেছে ও বাড়িটার দিকে। সবকিছু থেকে আলাদা বিচ্ছিন্ন বাড়িটা দেখে ওর মধ্যেও কেমন একটা বিচ্ছিন্নতার বোধ দানা বেঁধে উঠতে লাগল। বাতাস ছাড়া আর কিছু নড়ছে না। নিজের পা ফেলার শব্দ আর বাতাসের শোঁ শোঁ ছাড়া আর কোন শব্দও নেই। বুড়ির কথা পাত্তা দেয়নি রানা, হেন্ডারসনকে বাড়িতে পাবে ভেবেছিল। কিন্তু অন্ধকার বাড়িটা দেখে বুঝতে পারছে সেরকম কোন আশা নেই।

কটেজের সামনের দরজাটা সাদা রং করা। ছোট ছোট কালো অক্ষরে লেখা কথাগুলো সহজেই পড়া যাচ্ছে তাতে। বাড়িটার নাম একটামাত্র শব্দ, 'জার্লশফ'। হুঁ, এতক্ষণে জার্লশফের রহস্যটা বোঝা গেল।

দরজায় নক করল রানা। ভেতর থেকে ফাঁকা একটা প্রতিধ্বনি ভেসে এল শুধু। বাতিও জ্বলল না, দরজাও খুলল না। আবার চেষ্টা করল ও। একনাগাড়ে

অনেকক্ষণ দরজা ধাক্কিয়ে গেল, কিন্তু কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না ভেতর থেকে। খালিই মনে হচ্ছে বাড়িটা।

দরজার সামনে থেকে সরে এসে জানালায় উঁকি দিল ও। বড়সড় একটা কামরা, জানালার কাঁচ ভেদ করে যেটুকু জ্যোৎস্না ঢুকেছে তাতে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে ভেতরটা। পুরো একটা দেয়াল জোড়া বুক শেল্‌ফ, বই দিয়ে ঠাসা; খালি একটা টেবিল, দু'তিনটে কাঠের চেয়ার সেটার চার দিকে; কয়েকটা পুরানো আমলের গদিমোড়া আর্মচেয়ার। হেন্ডারসন সম্পর্কে লেখা সুফিয়ার আর্টিক্‌ল্‌টায় যেরকম বর্ণনা আছে ঘরের চেহারাটা ঠিক তাই। নিবেদিতপ্রাণ নিঃসঙ্গ একটা লোকের ঘর এটা, জানে রানা। আরাম আয়েশের দিকে যার নজর নেই, নির্জনতাই যার পছন্দ, বৈষয়িক জগতের কোন কিছুই যাকে আকর্ষণ করে না, এমন একটা লোকের ঘর।

পুরো বাড়িটা একবার চক্কর দিল রানা। কয়েকটা জানালায় পর্দা দেয়া, সেগুলো ছাড়া প্রত্যেকটা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে উঁকি দিল ভেতরে। শেষ পর্যন্ত আবার সাদা ফ্রন্ট ডোরটার সামনে এসে দাঁড়াল। কেমন বোকা বোকা লাগছে নিজেকে, কি করবে এখন ও? দুটো সম্ভাবনার কথা মনে এল, কিন্তু পছন্দ হলো না একটাও। প্রথমত, এখানে দরজার সামনে বসে থেকে অপেক্ষা করতে পারে, যদিও জানা নেই কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। যদি লম্বা কোন অবজার্ভেশনে গিয়ে থাকে হেন্ডারসন, তো কয়েকদিনও অপেক্ষা করতে হতে পারে। আর দ্বিতীয় যে বুদ্ধিটা এল মাথায় তা হলো, হেন্ডারসনকে খুঁজতে যাওয়া। এটা আরও অসম্ভব আর হাস্যকর মনে হলো। কয়েকশো দ্বীপ আছে শেটল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জে, তার কোন্‌টায়, কোন্ পাহাড়ের চূড়ায় বা গাছের উপর বসে পাখিদের দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা তা একমাত্র খোদাই বলতে পারবেন।

কোথায় যাচ্ছে তা কাউকে বলে যায় কিনা হেন্ডারসন কে জানে। বলে গেলেও, কাকে? সেই লোককেই বা কিভাবে খুঁজে বার করবে রানা? ম্যাকলিওড দম্পতির কথা মনে পড়ল, শ্বেত প্যাঁচা আবিষ্কারের গুজবটা। আবিষ্কারের কথা যদি সত্যি হয়ে থাকে তো ব্যাপারটা গোপনই রাখবে হেন্ডারসন।

তাহলে, আর কি করা যেতে পাবে? লোকটাকে খুঁজে বের করতেই হবে। কিন্তু কিভাবে? ঘরের ভেতর কোন সূত্র পাওয়া যেতে পারে? সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা, দরজা ভেঙে হলেও ঢুকতে হবে ভেতরে।

দরজা ভাঙার কোন প্রয়োজন পড়ল না। বিন্দুমাত্রও আশা না করেই হ্যান্ডেলটা ঘোরাল রানা, এবং চমকে গিয়ে দেখল খুলে গেছে দরজা। এতটা ভুলো মন নাকি হেন্ডারসনের? একটু শ্রাগ করে ঢুকে পড়ল ও ভেতরে। লাইটার জ্বেলে সুইচ খুঁজল। পেল না। কোন সুইচ নেই কোন দেয়ালে। ইলেকট্রিসিটি আসেনি বোধহয় এ বাড়িতে। টেবিলের উপর একটা টিলি ল্যাম্প দেখল ও। আগে কখনও এ ধরনের ল্যাম্প জ্বালেনি রানা, দু'একজনকে জ্বালতে দেখেছে অবশ্য। স্মৃতি হাতড়ে হাতড়ে টিলি ল্যাম্প জ্বালাবার নিয়মটা মনে করার চেষ্টা করল। বাতিটার নিচে লাগানো তেল ভর্তি ট্যাঙ্কে খানিকক্ষণ পাম্প করে লাইটার জ্বেলে ম্যান্টলটায় আগুন ধরাল, তারপর আবার পাম্প করতে শুরু করল। ধীরে ধীরে ম্যান্টলের লাল রঙের

আগুনটা উজ্জ্বল সাদা আলোয় পরিণত হলো। পুরো ঘরটা আলোকিত হয়ে উঠল।

দরজার ঠিক পেছনেই মেঝেটা দেখল রানা, কোন চিঠি এসে পড়ে আছে কিনা। সেরকম কিছু পাওয়া গেল না, তবে একটা সাইড বোর্ডে দুটো মুখ খোলা খাম পেল ও। চিঠি দুটো উল্টে পাল্টে দেখল। একটা এসেছে ইংল্যান্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট থেকে, লারউইকের এক গ্যারেজ থেকে অন্যটা। লারউইক পোস্ট অফিসের তিনদিন আগের পোস্টমার্ক দুটোর উপরেই। এগুলোর পরে পোস্টে আর কিছু আসেনি এ বাড়িতে? স্যান্ডনেস নরওয়ের ঠিকানায় পোস্ট করা প্যাকেটটার কি দশা হয়েছে? নরওয়ের স্যান্ডনেসের পোস্ট অফিস কি বুঝতে পারবে ভুলটা এবং প্যাকেটটা রি-ডাইরেক্ট করে পাঠাবে স্যান্ডনেস শেটল্যান্ডে? শেটল্যান্ডে যে একটা স্যান্ডনেস আছে তা কি জানে ওরা? নরওয়ের স্যান্ডনেসে কোন জার্লশফ আছে নাকি? প্রশ্নগুলো ঘুরে বেড়াতে লাগল ওর মনের ভেতর, কিন্তু উত্তর পেল না কোন।

ঘরের জিনিসপত্রগুলো উল্টে পাল্টে দেখতে লাগল রানা। ড্রয়ার, কাবার্ডগুলো খুলে খুলে দেখল, উল্লেখযোগ্য কিছু নজরে পড়ল না। শেষে হেন্ডারসনের পুরানো স্টীলের ডেস্কটার উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কাগজপত্রগুলো দেখতে শুরু করল, যদি কোন ডায়েরী বা লগবুক জাতীয় কিছু পাওয়া যায়, লোকটার কাজকর্মের ধারা সম্পর্কে কিছু জানা যাবে তাহলে।

কিন্তু সেরকম কিছু পেল না রানা। পাখি সংরক্ষণের ব্যাপারে রয়্যাল সোসাইটির সার্কুলার কয়েকটা, অন্যান্য পক্ষীবিশারদদের কাছ থেকে আসা চিঠি, কয়েকটা ফটোগ্রাফ, কিছু নোট; আর কিছু নেই সেখানে। কয়েকটা ট্র্যান্সপারেন্সি দেখে ধ্বক করে লাফিয়ে উঠল ওর হৃৎপিণ্ডটা। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে নিল সেগুলো রানা। আলোর সামনে ধরে মনোযোগ দিয়ে দেখল সবগুলো। কিন্তু ভাগ্য খুলল না। ওগুলোও পাখির ছবি।

কিন্তু না। শুধুমাত্র পাখির ছবি না ট্র্যান্সপারেন্সিগুলো! কিছু একটা গোলমাল আছে সেগুলোতে, বুঝতে পারল রানা। কিনারায় ধরে সাবধানে নাড়াচাড়া করছিল ও সেগুলো। ফটোগ্রাফি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র জ্ঞান আছে যার সেই জানে, সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হয় ট্র্যান্সপারেন্সি, নইলে স্ক্র্যাচ পড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এই ট্র্যান্সপারেন্সিগুলো তত সাবধানে নাড়াচাড়া করা হয়নি। টিলি ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোয় স্পষ্ট কয়েকটা আঙুলের ছাপ লক্ষ করল ও সেগুলোর উপর। ঘামে ভেজা হাতে আনাড়ি কেউ ধরেছিল এগুলো। হেন্ডারসন নিশ্চয়ই এত অসাবধান নয়। সম্ভবত ওর নিজের তোলা ট্র্যান্সপারেন্সি এগুলো, সুতরাং এত অসাবধান হতেই পারে না। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে ছবি তুলে এনে অসাবধান হাতে সেগুলো নষ্ট করতে পারে একমাত্র পাগলেই।

ও এখানে আসার আগে নিশ্চয়ই কেউ ঢুকেছিল এ ঘরে। জিনিসপত্রও ঘেঁটেছে সে। সম্ভবত ট্র্যান্সপারেন্সিগুলোয় যার হাতের ছাপ, সে-ই খুলেছে চিঠি দুটো। হেন্ডারসন হয়তো কয়েকদিন ধরেই বাড়িতে নেই। প্রমাণ হিসেবে খুব জোরাল নয় অবশ্য এগুলো, কিন্তু খচখচে ভাবটা যাচ্ছে না ওর মন থেকে।

আর কিছু নেই ডেস্কে। ঘরের অন্য কোথায়ও কিছু নেই। কোন কিছুই খুঁজতে

বাকি রাখেনি ও। ল্যাম্পটা হাতে নিয়ে ছোট অগোছাল কিচেনটায় ঢুকল ও। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বুঝতে পারল এখানেও নেই কিছু। গ্রাউন্ড ফ্লোরে আর একটাই রুম আছে, সেটা এখনও দেখেনি ও।

রান্নাঘরটা পার হয়ে রুমটায় ঢুকল রানা। ওয়ার্কশপ এটা। দুটো বেঞ্চ। অ্যাঙ্গেলওলা ড্রইংবোর্ড লাগানো একটায়, একপাশে আর্টিস্টের সাজসরঞ্জাম কিছু। অন্যটা কাঠের কাজ করার জন্যে। ছুতোর মিস্ত্রির যন্ত্রপাতি সুন্দর করে সাজানো রয়েছে একটা র‍্যাকে। এলোমেলো ভাবে কিছুক্ষণ রুমটা দেখল ও, মোটামুটি বুঝে ফেলেছে, জার্লশফে কিছুই জানতে পারবে না ও। অর্থহীন জেনেও দোতলাটা চেক না করে ফিরে যেতে মন চাইল না।

ওয়ার্কশপ থেকে বেরিয়ে লিভিং রুমে ফিরে এল রানা। লিভিং রুমের ভেতর থেকেই সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। দরজার গোড়ায় এসেই পাথর হয়ে গেল ও। গদিমোড়া আর্মচেয়ারগুলোর একটাতে বসে আছে এক লোক। শান্ত অনড়। লোকটার বাঁ হাতে একটা টর্চ লাইট মুহূর্তের জন্যে দেখতে পেল রানা। স্পষ্ট দেখল ও লোকটার বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা একটু নড়ে উঠল, পরমুহূর্তে উজ্জ্বল আলো ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। লোকটার ডানহাতে একটা পিস্তল। সোজা তাক করে আছে ওর দিকে।

রিপোর্টার-২

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৪

এক

এক সেকেন্ডের জন্যে লোকটার মুখ দেখতে পেল রানা। পরমুহূর্তে টর্চের উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল। চোখ বন্ধ করে ফেলল ও। লোকটাকে পরিচিত লাগছে, কোথায় যেন দেখেছে আগে। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আগেরবার যখন দেখেছিল তখন অন্য পোশাকে ছিল লোকটা, সেজন্যেই হঠাৎ করে দেখে চিনতে পারেনি। আর কখনও যে দেখবে একে তাও ভাবতে পারেনি আগে।

গাঢ় রঙের ডাফ্কি জ্যাকেট পরে রয়েছে এখন লোকটা, মাথায় সি-ম্যানদের মত টুপি। টুপির সামনেটা নামানো, কপাল আর মুখের অনেকখানিই ঢাকা পড়ে গেছে তাতে। প্রথমে একটু অসুবিধা হলেও শেষ পর্যন্ত চিনতে পেরেছে রানা লোকটাকে। আগেরবার যখন দেখে তখনও এরকম একটা টুপিই ছিল লোকটার মাথায়।

চোখ খুলল রানা। মুখের ওপর থেকে সরে আলোটা ওর শরীরের ওপর স্থির হয়েছে। কি একটা শব্দ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল ও। সিঁড়ির দিকে দরজায় আরেকজন লোককে দেখা গেল। বিশাল শরীর লোকটার। একই রকম জ্যাকেট আর সি-ম্যান ক্যাপ পরা। টিলি ল্যাম্পের আলো পড়েছে তার মুখে। একেও চিনতে পারল রানা। হোটেল স্ক্যান্ডায় ওর রুমে দেখেছিল একেও। নকল সার্জেন্ট টমাস। মৃদু বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

চেয়ারে বসা লোকটার দিকে ফিরল আবার রানা। কথা বলে উঠল নকল ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিস।

'টেবিলের উপর রাখো বাতিটা।'

ভাবছে রানা, কিন্তু খুব ধীরে ধীরে, অনেক সময় নিয়ে। বাতিটা হাত থেকে ফেলে দিলে কেমন হয় এখন? বাতিল করে দিল ও চিন্তাটা। লাভ নেই, চেয়ারে বসা নকল ফ্রান্সিসের কাছে টর্চ রয়েছে। টিলি ল্যাম্পটা নিভে গেলেও টর্চ জ্বেলে পরিষ্কার দেখতে পাবে লোকটা। মুহূর্তের ওই অন্ধকার থেকে কোন সুবিধাই আদায় করতে পারবে না ও। নকল ফ্রান্সিসকে গুলি করতে উৎসাহিত করাই হবে কেবল। টেবিলের ওপর আস্তে নামিয়ে রাখল ও বাতিটা।

'এখন, সরে যাও ওটার কাছ থেকে,' আদেশ করল লোকটা। 'ফায়ার প্লেসের কাছে গিয়ে দাঁড়াও।'

রানার গতিবিধি অনুসরণ করল পিস্তলের নল। ওর তলপেটের দিকে তাক করা রয়েছে সেটা।

'তুমি এসে পড়ায় অন্তত এটুকু নিশ্চিত হওয়া গেল যে ঠিক জায়গায়ই এসেছি আমরা,' বলল নকল ফ্রান্সিস। 'এবার বলো দেখি, কোথায় গেছে হেন্ডারসন?'

'কে?!' বিস্ময় ফুটিয়ে তুলল রানা গলার স্বরে।

'দেখো, মাসুদ রানা, বিরক্তিকর খেলাটা কি না খেললেই নয়? তোমারও কষ্ট

কমবে আমাদেরও কষ্ট কমবে তাতে। কোথায় হেন্ডারসন?' শেষ বাক্যটা বেশ একটু কড়া গলায়ই উচ্চারণ করল লোকটা।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা, 'আমি কিভাবে জানব?'

চিন্তিত মুখে তাকিয়ে আছে লোকটা রানার দিকে। 'তোমার যদি জানা থাকত, তাহলে এখানে আসতে না তুমি, তাই না?' নিজেকেই যেন শোনাল সে কথাগুলো।

'এই তো, ঠিক ধরেছ,' আবার একটু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল রানা।

'তোমার আসার শব্দ পেয়ে ভেবেছিলাম, হেন্ডারসনই বুঝি। কয়েক ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছি আমরা। আশা করি হেন্ডারসন সম্পর্কে অনেক কিছুই বলতে পারবে তুমি।'

'জীবনে কোনদিন দেখিনি লোকটাকে, এটুকুই বলতে পারি।'

'মানে? এত তাড়াতাড়ি তাহলে পৌঁছলে কি করে এখানে? আমরা এখানে পৌঁছুনোর তিন ঘণ্টার মাথায়ই পৌঁছে গেছ তুমি!'

'কেন? লারউইক থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করলাম, তারপরে সাঁ সাঁ করে চালিয়ে চলে এলাম এখানে।'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু তুমি জানলে কিভাবে?'

'আমার একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে, বুঝলে?' বলল রানা। 'সেটা ব্যবহার করলেই বুঝতে পারি সব। অনেকটা পায়রার মত আর কি। পায়রাকে যতদূরে নিয়েই ছেড়ে দাও না কেন ঠিকই আবার পথ চিনে ফিরে আসে নিজের বাসায়।'

'হুঁ, পায়রা! খুব দ্রুতগামী, কিন্তু অমর নও, জানো তো, রানা?' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল লোকটা, তারপর আবার বলল, 'স্বীকার করছি, ভীষণ অবাক হয়েছি তোমাকে এখানে দেখে। তুমি আমাকে দেখে যতটা হয়েছ তার চেয়ে কম নয় মোটেই।'

'আমি তোমাকে দেখে যতটা না আশ্চর্য হয়েছি তারচেয়ে বেশি আশ্চর্য হয়েছি তোমার আনাড়িপনা দেখে,' বলল রানা। 'প্রত্যেকটা ট্র্যান্সপারেন্সিতে তোমার নোংরা হাতের ছাপ ফেলেছ। একমাত্র ক্ষ্যাত ছাড়া আর কেউ ওরকম করে ট্র্যান্সপারেন্সি ধরবে না। তোমাকে দেখার অনেক আগেই বুঝতে পেরেছি, এখানে এসেছে কেউ।'

ক্ষ্যাত বলতেও চটল না লোকটা। 'দারুণ বুদ্ধি তো তোমার! তবে একটু ঘাটতি আছে আর কি, নইলে এখানে বসে না থেকে পালাতে তক্ষুণি। ধরা পড়তে না তাহলে। যাহোক, এখন বলো হেন্ডারসন সম্পর্কে।'

'সুফিয়া আশরাফ সম্পর্কে আগে বলো।'

মৃদু একটু হাসল নকল ফ্রান্সিস, 'চাবি তোমার কাছে না, আমাদের কাছে, মিস্টার মাসুদ রানা। তালা আমরাই খুলব, তুমি না। সুতরাং, যা জানো তা ঝটপট বলে ফেলাই তোমার জন্যে মঙ্গলজনক হবে।'

'জামিলকে কিডন্যাপ করেছ তোমরা?'

'জামিল! সেটা আবার কে? তোমার ভাই নাকি?'

'সুফিয়ার ভাই। ওর কিছু হলে ছাল তুলে নেব তোমার, মনে রেখো।'

হা হা করে হাসল কিছুক্ষণ নকল ফ্রান্সিস। হেঁড়ে গলার হাসির দমকে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল হেন্ডারসনের ছোট্ট কটেজটা। আচমকা হাসি থামিয়ে বলল লোকটা, 'সেটা আমরা দেখব, কে কার ছাল তোলে।'

'কোথায় সুফিয়া?' দৃঢ় গলায় জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওকে পাওয়া গেছে ভাবছ? গেলেও আমি কিভাবে জানব? নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ গোদেনবার্গ পুলিসের ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিস নই আমি।'

'হ্যাঁ, দু'দিন আগেই সেটা টের পেয়েছি।'

'তাহলে বলো, সুফিয়ার খবর আমি কিভাবে জানব?'

'ওর কাছ থেকে হেন্ডারসনের কথা শুনেই তোমরা এসেছ এখানে। তাছাড়া আর কোনভাবেই...'

'ঠিকই ধরেছ,' মাথাটা একটু ঝাঁকিয়ে বলল নকল ফ্রান্সিস। 'কিন্তু, এখন আমার প্রশ্ন, তুমি সেটা জানলে কিভাবে, রানা? বলো।'

'কি ঠেকা পড়েছে আমার বলতে যাব? যাহোক, কে তুমি? তোমার সঙ্গের এই গুণ্ডাটাই বা কে?' নকল সার্জেন্ট টমাসের দিকে ইশারা করল রানা।

'আমি যে-ই হই না কেন, কথা তোমাকে বলতেই হবে। কারণ, আমি জানতে চাই। সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুল বাঁকা করতে হবে আমাদের, এই যা।'

'ঠিক আছে আঙুলটা বাঁকাই করে ফেলো।'

'আমি পারি, রানা, খুব সহজেই পারি। দরকার হলে করবও। কিন্তু তোমাকে জানিয়ে রাখি, তুমি যতটা ভাবছ তার চেয়ে অনেক বেশি জানি আমরা। আসলে হেন্ডারসন সম্পর্কে কিছুই জানো না তুমি।'

কিছু বলল না রানা, শুনে যেতে লাগল চুপচাপ।

'যেমন ধরো,' বলল লোকটা, 'মিস সুফিয়া আশরাফের মিসেস সুফিয়া হেন্ডারসন হওয়ার কথা ছিল শিগগির।'

মনে মনে একটু ক্ষুব্ধ না হয়ে পারল না রানা। আশ্চর্য নারীচরিত্র, এতদূর এগিয়ে গেছে ওরা ভেতরে ভেতরে, কিন্তু একবারও জানায়নি ওকে!

'সত্যি নাকি?' জোর করে হাসার চেষ্টা করল ও। 'তোমরা তাহলে ভাল একটা ভোজ থেকে বঞ্চিত করলে আমাদের!'

'বিশ্বাস হচ্ছে না? যেহেতু তুমি...,' একটু হাসল লোকটা। 'বন্ধুত্ব, বুঝলে বন্ধুত্ব..., তোমাকে স্রেফ বন্ধু হিসেবে নিয়েছিল। অবশ্য কতটা আন্তরিক ভাবে তা জানি না আমি। কিন্তু বিয়ে করত ও হেন্ডারসনকেই। প্রমাণ চাও?'

মাথা নাড়ল রানা, 'কোন দরকার নেই।'

'কিন্তু প্রমাণ না পেলে তুমি বিশ্বাস করবে কেন আমার কথা?'

পকেট থেকে একটা ফটোগ্রাফ বের করে নকল ফ্রান্সিস বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। ফায়ার প্লেসের কাছ থেকে এক পা এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে নিল ও ফটোগ্রাফটা।

বছর তিরিশেক বয়সের শক্তসমর্থ এক লোকের সঙ্গে সুফিয়া। বড় একটা সামুদ্রিক পাখি দু'হাতে ধরে রাখার চেষ্টা করছে ও, আর ডানা ঝটপটিয়ে ছুটে যেতে

চাইছে পাখিটা। উদ্ভাসিত হাসি সুফিয়ার মুখে, লোকটার মুখে একই সঙ্গে প্রশান্তি আর পরিতৃপ্তি। একেবারে জীবন্ত লাগছে দেখতে। ফ্যামিলি অ্যালবামে রাখার জন্যে চমৎকার একটা ছবি।

'এছাড়া মুখেও আরও অনেক কথা বলতে পারি আমি,' বলল লোকটা।

'বলো তাহলে, শুনি।' টেবিলের উপর রাখল রানা ছবিটা। সুফিয়ার মুখটা ভেসে উঠেছে মনের পর্দায়। পরমুহূর্তে নিজে নিজেই লজ্জা পেল ও, কি আবোল তাবোল ভাবছে! হেন্ডারসন, উইলিয়ামসন, জনসন, পিয়ারসন যার সঙ্গে খুশি বিয়ে হোক না কেন সুফিয়ার, তাতে ওর কি আসে যায়? ঘর বাঁধার জন্যে তো জন্ম হয়নি ওর। একাধিকবার চেষ্টা করেও দেখেছে, কিন্তু সফল হয়নি সে-চেষ্টা। আবারও সে ধরনের ঝুঁকি নিতে যাবে, মাথা খারাপ? তারচেয়ে এই তো ভাল, একা একা, কোন পিছুটান নেই। সময়মত ঘরে না ফিরলে কেউ কিছু বলবে না। শুধু ছুটে চলা আর ছুটে চলা।

'এবার তুমি নিশ্চয়ই জানতে চাইবে, বেঁচে আছে না মরে গেছে তোমার সুফিয়া, বা ওকে হত্যা না করলে কি চলত না, তাই না?'

'হ্যাঁ, জানতে চাইছি আমি।'

'ইন্টারোগেশনের সময় মাঝে মাঝে লোক মারা যায়, বুঝলে? সেটা নির্ভর করে, ধরো, লোকটা কতখানি বাধা দিতে পারে তার ওপর। ইনফর্মেশনটা জানা ইন্টারোগেটরদের জন্যে কতটুকু জরুরী তার ওপরেও অবশ্য নির্ভর করতে পারে।'

ভয় দেখাচ্ছে নকল ফ্রান্সিস, বুঝতে অসুবিধে হলো না মোটেই। একই সঙ্গে রানার ওপর মানসিক চাপ প্রয়োগেরও চেষ্টা করছে। ব্যাকুল হওয়ার নিখুঁত অভিনয় করল রানা।

'বেঁচে আছে তো ও?'

জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল লোকটা। 'ভদ্রলোকের মত আমরা তথ্য বিনিময় করতে পারি, মিস্টার রানা। সত্যি তোমাকে কোন কষ্ট দেয়ার ইচ্ছে আমার নেই। কেমন করে তুমি হেন্ডারসন সম্পর্কে জানলে তা বলবে, অন্য কিছু জানলে তাও–বিনিময়ে আমিও তোমাকে মিস আশরাফের খবর জানাব।'

একটু আগের ব্যাকুলতা দূর হয়ে গেছে রানার গলা থেকে। 'আমি জানি বেঁচে আছে সুফিয়া,' বলল ও। 'ওকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে তোমাদের। এখন ও-ই তোমাদের একমাত্র অবলম্বন। অন্তত যতক্ষণ পর্যন্ত হেন্ডারসনের কোন খোঁজ না পাচ্ছ তোমরা। হেন্ডারসনের ওপর চাপ প্রয়োগের জন্যেও জ্যান্ত সুফিয়ার প্রয়োজন রয়েছে। ওকে মারার কথা...'

'হ্যাঁ, আশা করাটা ভাল,' রানাকে থামিয়ে দিয়ে বলল নকল ফ্রান্সিস। 'আশাবাদী লোকদের পছন্দ করি আমি। কিন্তু কথা হচ্ছে, ও বেঁচে আছে না মরে গেছে, ও আমাদের একমাত্র অবলম্বন কিনা এসব ব্যাপারে কিছুই জানে না হেন্ডারসন।'

তাকিয়ে আছে রানা লোকটার দিকে। বিক্ষিপ্ত চিন্তাস্রোতকে একটা নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে। আশা করছে এখনও বেঁচে আছে সুফিয়া, কিন্তু নকল ফ্রান্সিসের মুখ থেকে সে ধরনের কোন কথাই উচ্চারিত হয়নি এখন পর্যন্ত।

লোকটার ভাব ভঙ্গি দেখেও কিছুই আন্দাজ করা যাচ্ছে না। বেঁচে থাকলেও কি অবস্থায়ই বা আছে সে, জামিলের খবরই বা কি? আপোষে নিশ্চয়ই কোন কথা ফাঁস করেনি সুফিয়া, তাহলে ট্র্যান্সপারেন্সিটা প্রথমেই ভ্লাদিমিরের হাতে তুলে দিত ও।

সন্দেহ নেই ওরা টর্চার করেছে ওর ওপর। টর্চারের পরেও যখন কিছু ফাঁস করেনি, তখন ধরে নিয়ে গেছে জামিলকে। এবং জামিলকে টর্চারের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যেই ফাঁস করেছে ও কথাগুলো। কিন্তু জামিলকে ধরবার আগে কতটুকু টর্চার করা হয়েছে ওর ওপর? শারীরিক না মানসিক? তাছাড়া, কতটুকু বলেছে সুফিয়া? জামিলকেও নিশ্চয়ই কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেছে? ও-ই বা কতটুকু বলেছে? এই লোকটার কনফিডেন্স দেখে তো মনে হচ্ছে অনেক কথাই ওরা আদায় করতে পেরেছে দু'জনের কাছ থেকে। এবং এখন দরকার হলে রানার ওপরেও চাপ প্রয়োগে কুণ্ঠিত হবে না। হয়তো শারীরিকভাবে নির্যাতন করতেও ছাড়বে না। ও একা আর ওরা দু'জন, তার ওপর ওদের কাছে অস্ত্র রয়েছে, ও নিরস্ত্র।

কিছু একটা কৌশল অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে কোন কৌশলই খাটবে বলে তো মনে হচ্ছে না। ওরা দু'জনেই রয়েছে ওর নাগালের বাইরে। তাছাড়া পিস্তলের নলটা একচুলও সরায়নি নকল ফ্রান্সিস। কথাবার্তা বলেই সময় কাটানোর সিদ্ধান্ত নিল রানা।

'এটা ঠিক, আমি একা একা এসেছি এখানে,' বলল ও। 'কিন্তু সত্যিই আমি একা, এরকম ভাবলে ভুল করবে তোমরা।'

'আচ্ছা! তোমার পেছনে নিশ্চয়ই পুরো এক ডিভিশন আর্মি রয়েছে? পাহাড়ের খানাখন্দে পজিশন নিয়ে বসে রয়েছে, তুমি ইশারা করলেই এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তাই না? ফালতু কথা রেখে আমার কথার জবাব দাও তো, বাছা।'

'তোমার কাছে ফালতু মনে হলেও এটা সত্য। আজ সকালেই আমার কথা হয়েছে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের অফিসারদের সঙ্গে।'

'এবং নিঃসন্দেহে সি.আই.এ-র অফিসারদের সঙ্গেও,' টিটকারী মারল নকল ফ্রান্সিস।

'না, সি.আই.এ. নয়, ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি।'

এবার যেন একটু চমকাল লোকটা। তাকিয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড রানার দিকে। তারপর সংক্ষেপে কি যেন বলল সঙ্গের বিশালদেহী লোকটার উদ্দেশ্যে। আঞ্চলিক টান রয়েছে কথায়।

'রাশিয়ান,' বলল রানা। 'ভাষাটা অত ভাল জানি না, তবে শুনলেই বুঝতে পারি।'

ভ্রূকুটি করে একবার তাকাল লোকটা ওর দিকে তারপর আবার ফিরল বিশালদেহীর দিকে। বিশালদেহী নকল সার্জেন্ট টমাস ততক্ষণে রাইফেল নামিয়ে রেখে কাঁধ থেকে চারকোনা একটা বাক্স খুলে ফেলেছে। দ্রুতহাতে বাক্সের উপরের চামড়ার ফ্ল্যাপ সরিয়ে চারফুট লম্বা টেলিস্কোপিক এরিয়ালটা ছড়িয়ে দিল। একটা সুইচ টিপে দিয়ে যন্ত্রটা মুখের কাছে নিয়ে গড়গড় করে কথা বলতে শুরু করল রাশিয়ান ভাষায়। জবাবে একগাদা ঘড়ঘড়ে যান্ত্রিক শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা গেল

না। আবার চেষ্টা করল সে। এবারও একই জবাব ভেসে এল। গজগজ করতে করতে চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল বিশালদেহী। দু'তিন মিনিট একনাগাড়ে চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল সে।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কি একটা অর্ডার দিল নকল ফ্রান্সিস। বিনীতভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে একটু হেসে বাইরে চলে গেল নকল টমাস।

বুঝতে পারল রানা কারণটা, হাসিটার অর্থ ধরতেও অসুবিধা হয়নি। স্বাভাবিক উচ্চতায় ওয়াকিটকি কাজ না দিলে উচ্চতা বাড়াও, ঠিক কাজ দেবে। বেচারা নকল টমাসকে এই ঠাণ্ডায় পাহাড়ে চড়তে হবে এই যা সমস্যা এখন।

'এবার?' প্রশ্ন করল রানা।

'অপেক্ষা করব।'

'ইন্সট্রাকশনের জন্যে? এত তাড়াতাড়িই নিজের বুদ্ধির স্টক শেষ, উপরওয়ালার কাছ থেকে ধার না নিলে চলছে না!'

ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল নকল ফ্রান্সিসের চেহারা। 'তুমি একটা পাকা শয়তান। যখনই হোক হেন্ডারসন ফিরে আসবে এখানে। ও না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমরা। কিন্তু তার আগে এখান থেকে সরাতে হবে তোমাকে।'

তারমানে রি-ইনফোর্সমেন্টের জন্যে পাঠিয়েছে ও। ভাবছে রানা, রিইনফোর্সমেন্টটা পাবে কোত্থেকে? পশ্চিমে সামান্য একটু গেলেই আটলান্টিক। তাহলে জাহাজ? সারা দুনিয়া চষে বেড়ানো রাশান ট্রলারগুলোর কোন একটা নিঃসন্দেহে। কিন্তু পশ্চিম দিকে কোন পাহাড় নেই তার মানে, খুব কাছে নেই ওদের ট্রলার, রয়েছে দ্বীপের অন্যদিকে। লম্বাটে দ্বীপটার মাঝামাঝি অঞ্চলেই পাহাড়ী উচ্চভূমি। এখানে আসার সময় ওই পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে আসতে হয়েছে ওকে। অর্থাৎ ভাগ্য ভাল হলে রিইনফোর্সমেন্টের জন্যে সময় লাগবে। দ্বীপের ও মাথা থেকে এ মাথা পর্যন্ত গাড়ি চালিয়ে এসেছে ও, তাছাড়া মিসেস লিওডের বক্তৃতা–সব মিলিয়ে বোধহয় শেটল্যান্ড দ্বীপের ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কে এই রাশিয়ানগুলোর চেয়ে অনেক বেশি জানে ও। আসার সময় পথের পাশে কয়েকটা খাঁড়ি দেখেছে ও। সেগুলোর কোন একটার ভেতরে দিব্যি ছোটখাট একটা জাহাজ লুকিয়ে থাকতে পারে, আর ট্রলারের মত ছোট জাহাজের তো কথাই নেই। সবচেয়ে কাছের খাঁড়িটা কতদূরে? কি ধরনের ট্র্যান্সপোর্ট রয়েছে এদের?

আর একটাও কথা বলেনি নকল ফ্রান্সিস, কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও চোখ সরায়নি রানার ওপর থেকে। বসে আছে লোকটা আর দাঁড়িয়ে আছে ও। দু'জনেই জানালার কাঁচের ওপর আছড়ে পড়া বাতাসের গুঞ্জন শুনছে। পাহাড়ের ওপর কোথাও বিশালদেহী লোকটা পরিষ্কারভাবে ওয়্যারলেস মেসেজ পাঠানোর জন্যে উপরে আরও উপরে উঠে চলেছে; বেচারা, মনে মনে ভাবল রানা।

কিন্তু অনেকক্ষণ হয়ে গেল চুপচাপ রয়েছে ওরা। ক্রমেই অসহনীয় হয়ে উঠছে নীরবতা। কিছু একটা বলার প্রয়োজন বোধ করল রানা। নইলে ইতোমধ্যে আরও কিছু বুদ্ধি পাকিয়ে ফেলতে পারে লোকটা।

'তোমার অযোগ্যতার আরেকটা দিক দেখাই,' বলল রানা। 'তোমরা সার্চ

করোনি আমাকে।'

'কি দরকার? জানি, আমার কোন বিপদই ঘটাতে পারবে না তুমি। তাছাড়া আমার কৌতূহল মেটানোর মত কোন কিছু তোমার কাছে আছে বলে মনে করি না আমি। মূল্যবান কিছু যদি থাকে তোমার কাছে তো তোমার মাথার ভেতরেই আছে তা। সুতরাং সার্চ করার কোন দরকার নেই।'

'এত নিশ্চিত হচ্ছ কিভাবে তুমি? তোমার ধারণায় ফাঁক থাকতে পারে তো।'

'চালাকি করে লাভ হবে না, রানা। এক চুলও যদি নড়ো তো তোমার মৃত্যু ঠেকাতে পারবে না কেউ। সাবধান!'

'তারমানে ভয় পাচ্ছ তুমি। এই না বললে কোন বিপদই ঘটাতে পারব না আমি?'

'যাই বলে থাকি না কেন, নড়বে না তুমি।'

দোতলার কোথাও একটা জানালা বোধহয় ঠিক মত লাগানো হয়নি। বাতাসের ধাক্কায় একটু পরপরই মৃদু ঠকঠক আওয়াজ হচ্ছে। এতক্ষণ কোন শব্দ হচ্ছিল না, অর্থাৎ বাতাস বেড়েছে একটু। ওই শব্দের অনুসরণে লোকটার চোখ নড়ল কয়েকবার। অবস্থান বিন্দুমাত্র না বদলে একটু উসখুস ভঙ্গি করল রানা।

'বসতে পারি আমি?' বলল ও।

'না,' খেঁকিয়ে উঠল নকল ফ্রান্সিস।

মাথাটা একদিকে একটু হেলিয়ে কান খাড়া করে আছে সে। বিশালদেহীর আগমনের প্রতীক্ষা করছে। ভেতরে ভেতরে একটু নার্ভাস বোধ করছে বোধহয়। মাথার ওপর আবার মৃদু ঠক্ ঠক্ আওয়াজটা শোনা গেল। প্রায় চমকে উঠল লোকটা।

প্রতি মুহূর্তেই বিন্দু বিন্দু লালা বেরিয়ে আসে মানুষের লালাগ্রন্থিগুলো থেকে। স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশে মানুষ গিলে ফেলে সেই লালা। কিন্তু এ মুহূর্তে রানা মুখের ভেতর জমাচ্ছে সেগুলো। অনেকখানি লালা মুখে জমা হওয়ার পর মাথাটাকে সামান্য একটু পেছনে হেলিয়ে তরল পদার্থটুকু গলায় গড়িয়ে যেতে দিল ও। সামান্য একটু লালা গলা বেয়ে নেমে যেতেই আল জিহ্বাটা উঁচু করে গল-নালিটা বন্ধ করে দিল রানা এবং একই সঙ্গে মুখ খুলে শ্বাস নিল লম্বা করে। সঙ্গে সঙ্গে বাকি লালাটুকু হঠাৎ করে ঢুকে গেল গলার ভেতরে। ভয়ানক ভাবে কেশে উঠল রানা। কাশির দমকে একদলা থুথু বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে। ছিটকে গিয়ে পড়ল লোকটার সামনে। কাশি সামলানোর জন্যে তাড়াতাড়ি হাত ঢুকিয়ে পকেট থেকে রুমালটা বের করল। সতর্ক চোখে তাকিয়ে আছে নকল ফ্রান্সিস ওর দিকে। রানার প্রতিটা নড়াচড়া অনুসরণ করছে তার হাতে ধরা পিস্তলের নল।

রুমালের সঙ্গে একটা কয়েন বের করে এনেছে রানা। হাতের মধ্যে আঙুলের ভাঁজে মুদ্রাটা লুকিয়ে রেখে নাক ঝাড়ল ও। চোখ মুছল একবার রুমাল দিয়ে। ওয়াক করে খানিকটা থুথু ফেলল মেঝের ওপর। তারপর রুমালটা আবার চালান করে দিল পকেটে।

'ভয়ে অনেক সময় গলার মেমব্রেনগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়,' বলল লোকটা।

ডান হাতের মুঠোর ভেতরে মুদ্রাটা লুকিয়ে রেখে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল রানা। এখনও কেশে চলছে একটু একটু। কাশতে কাশতে খুব ধীরে ধীরে মুঠোর ভেতরে পয়সাটা অল্প অল্প করে সরাচ্ছে। বুড়ো আঙুলের নখ আর তর্জনীর মাঝে না পৌঁছনো পর্যন্ত চালিয়ে গেল ও কাজটা।

'হেন্ডারসন একজন ওরিন্থোলজিস্ট তা জানো তো?' বলল রানা। 'পাখি পর্যবেক্ষণ করে বেড়ায়। নির্জন নিরিবিলি জায়গায় ক্যামেরা, বিনকিউলার নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে। কয়েকদিনও হয়ে যেতে পারে ও ফিরতে ফিরতে?'

অবজ্ঞার হাসি হাসল লোকটা। 'এটা শীতকাল, মিস্টার রানা। মাইগ্রেশন শেষ হয়ে গেছে। ব্রিডিং সিজন শুরু হওয়ারও দেরি আছে। আমাকে কি বুদ্ধু পেয়েছ।'

'ছি ছি, কি বলছ! বুদ্ধু মনে করব কেন তোমাকে? তবে পথে আসতে আসতে শুনছিলাম একজোড়া শ্বেত প্যাঁচা না কি যেন আবিষ্কার করেছে হেন্ডারসন।'

'তাতে কি হলো?'

'মাইগ্রেট করে না ওরা। খুবই বিরল প্রজাতির পাখি ওগুলো।' সত্যি ওগুলো মাইগ্রেট করে কিনা সে সম্পর্কে কোন ধারণা নেই ওর। অবশ্য তাতে কিছু আসে যায় না। কিছু একটা বলে ব্যস্ত রাখতে হবে নকল ফ্রান্সিসকে, ব্যস।

'তুমি যদি ওকে না-ই চেনো তো এত কথা জানলে কি করে?' সন্দেহ ফুটে উঠল নকল ফ্রান্সিসের গলায়।

'সুফিয়া একটা ফিচার লিখেছিল ওর সম্পর্কে, সেটা পড়েছি আমি। আর শ্বেত প্যাঁচার কথাটা বলেছিল সামবার্গ থেকে লারউইক পর্যন্ত আমাকে লিফট দিয়েছিল যে মহিলা সে।'

'হুম।' কিছুক্ষণ চুপ করে রইল লোকটা। 'আশা করি ওই প্যাঁচা না ফ্যাঁচা যাই হোক না কেন, খুব বেশি দেরি করাবে না ওকে।'

'ওই যে দেখো,' আচমকা বলল রানা।

'কি?'

'একটা শ্বেত প্যাঁচা। ওই যে ওপরে,' মাথা নেড়ে হেন্ডারসনের ওয়ার চার্টের দিকে ইশারা করল রানা। রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল লোকটা বাম পাশে।

'এটা দেখি···।' কথাটা শেষ করতে পারল না নকল ফ্রান্সিস, রানা ছুঁড়ে দিয়েছে মুদ্রাটা। লোকটার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে পড়ল দরজার সামনে। ঠক্ করে শব্দ হলো একটা। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল রানা–

'পালাও হেন্ডারসন, ঘরে ঢুকো না।'

সাঁ করে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল লোকটা। নকল ফ্রান্সিস মুখ ঘোরাতেই লাফ দিল রানা। এক লাফে টেবিলের কাছে পৌঁছে আবার চিৎকার করে উঠল, 'পালাও'। একই সঙ্গে টিলি ল্যাম্পটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল লোকটার কোলের ওপর।

তরল প্যারাফিন গড়িয়ে পড়ল নকল ফ্রান্সিসের কাপড়ে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ধরে গেল। আগুন খুব বেশি ধরার আগেই উঠে দাঁড়িয়েছে লোকটা, হাত-পা নেড়ে গা থেকে সরাতে চেষ্টা করছে আগুন।

দ্বিতীয় লাফে লোকটার সামনে পৌঁছুল রানা। সর্বশক্তিতে ঘুসি মারল লোকটার

নাকের উপর। ঠিক একই সময়ে গুলি করল লোকটা। রানার কোমরের কাছ দিয়ে বেরিয়ে গেল গুলি। দ্বিতীয়বার গুলি করার আগেই আবার হাত চালাল রানা। এবার কপালের পাশে কানের ঠিক উপর। আগের ঘুসিটা খেয়ে কোন শব্দ করেনি নকল ফ্রান্সিস। এবার গোঙানির মত একটা শব্দ করে বসে পড়ল চেয়ারে। তৃতীয় ঘুসিটা মারল রানা ওর চোয়ালে। তারপর তিন লাফে বেরিয়ে এল জার্লশফ ছেড়ে। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে দৌড় দিল গাড়ির দিকে।

কৌতূহল মেটানোর মত কিছু নেই পকেটে! বুদ্ধু! ভাগ্যিস সার্চ করেনি নকল ফ্রান্সিস। মিনি অস্টিনের চাবিটা পকেটেই রয়েছে। সার্চ করলে পেয়ে যেত ওটা। দ্রুতবেগে ঢাল বেয়ে নেমে এল রানা। গাড়ির পাশে পৌঁছে এক সেকেন্ডও সময় নষ্ট না করে ঝট করে খুলে ফেলল দরজা, প্রায় লাফ দিয়ে উঠে বসল স্টিয়ারিঙের পেছনে। ছেড়ে দিল অস্টিন। অমসৃণ রাস্তার ওপর দিয়ে ছোটাল মেইন রোডের দিকে। হেড লাইট নেভানো।

একশো গজও যায়নি রানা, এমন সময় ঠকাস করে কি যেন এসে লাগল গাড়ির গায়ে। গুলি? নকল সার্জেন্ট টমাসের কাছে একটা রাইফেল ছিল। ট্র্যান্সমিটার নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় রাইফেলটাও সঙ্গে নিয়েছিল সে। ফিরে এসেছে নাকি লোকটা? পিস্তলের গুলি তো এতদূর আসার কথা নয়।

গতি একটুও কমাল না রানা। এবড়োখেবড়ো পথের উপর দিয়ে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেতে খেতে ফুলস্পীডে ছুটছে অস্টিন। পুরো দাবিয়ে রেখেছে ও এক্সিলারেটরটা। মেইন রোডের কাছে এসেও কমাল না গতি। একই স্পীডে উঠে পড়ল পাকা সড়কে। সাঁ করে স্টিয়ারিংটা ঘুরিয়ে গাড়ি সোজা করল ও।

মেইন রোডে উঠে পেছন ফিরে একবার তাকাল ও। হেন্ডারসনের কটেজটা দেখতে পেল, জানালাগুলো কমলা আভা ধারণ করেছে। নকল ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াতেই–টিলি ল্যাম্পটা মেঝেতে পড়েছিল। তরল প্যারাফিন গড়িয়ে পড়ে ঘরের জিনিসপত্রে আগুন ধরে গেছে বোধহয়। নকল ফ্রান্সিসের অবস্থা কি, কে জানে! নিজের তেলে ভাজা হচ্ছে বোধহয় লোকটা। খুবই ভাল। সেক্ষেত্রে কোন ভাবেই ফলো করতে পারবে না ওরা। বিশালদেহীকেও ব্যস্ত থাকতে হবে বসকে নিয়ে। যদিও কোন গাড়ি দেখেনি রানা, কিন্তু, কে জানে আশেপাশে কোথাও লুকোনো রয়েছে কিনা একটা।

অন্ধের মত গাড়ি চালাচ্ছে রানা। অন্ধকারে সামনে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। হেডলাইট না জ্বালিয়ে আর উপায় নেই। টিপে দিল ও সুইচটা। সামনে অনেকদূর পর্যন্ত আলোকিত হয়ে উঠল রাস্তা। সাবলীলভাবে ছুটে চলেছে মিনি অস্টিন সরু অথচ মসৃণ রাস্তার ওপর দিয়ে।

এবার কি করা যায়, ভাবছে রানা। কোথায় যাবে ও? আপাতত রাস্তা যেদিকে নেয়, সেদিকেই। ড্রাইভিঙের দিকেই পুরো মনোযোগ নিবিষ্ট করল ও। তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে রিয়ারভিউ মিররের দিকে, পেছনে কোন গাড়ি দেখা যায় কিনা।

সাহায্য করার মত কেউ নেই এই দ্বীপে। পরিচিত তো দূরের কথা,

স্বল্পপরিচিতও কেউ নেই এখানে। পরিচিতের মধ্যে আছে একমাত্র ম্যাক লিওড দম্পতি। ওদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা করা বাতুলতা মাত্র। তাছাড়া, কি সাহায্য করবে তারা?

পরিচিত লোক নেই ঠিক, কিন্তু ওকে সাহায্য করতে পারে এমন একটা লোকও কি নেই এখানে? হঠাৎ মনে পরল রানার দা নিউজের শেটল্যান্ড সংবাদদাতা ফ্রি-ল্যান্সার লারসনের ঠিকানা রয়েছে ওর পকেটে। তাই তো, লারসনের কাছে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। দা নিউজের স্টাফ রিপোর্টার নয় সে, এমনি এমনি সাহায্য না করতে চায় যদি তো টাকার বিনিময়ে নিশ্চয়ই সাহায্য করবে। বড় বড় পত্রিকার কাছে নিউজ অর্থাৎ ইনফর্মেশন বিক্রি করে টাকা কামায় লোকটা। রানা যদি বোঝাতে পারে ঠিকমত, তো ওর কাছেও ইনফর্মেশন বিক্রি করবে সে।

লারসনের সঙ্গেই কথা বলতে হবে, ঠিক করল রানা। ও নিশ্চয়ই নিজের হাতের তালুর মতই ভাল করে চেনে দ্বীপটাকে। শেটল্যান্ডের মত জায়গায় বাস করলে ফ্রি-ল্যান্সারদেরকে চৌকস হতেই হয়। এরকম ছোট জায়গায় প্রতিদিন ডজন ডজন লোমহর্ষক, রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটে না নিশ্চয়ই; সুতরাং, ভাল খবর আর ঘটনার সন্ধানে পুরো এলাকা চষে বেড়াতে হয় ফ্রি-ল্যান্সারদের। লারসনের নাম ঠিকানা ফোন নম্বর লেখা কাগজটা পকেটে আছে কিনা একবার দেখে নিয়ে নিশ্চিন্ত হলো রানা।

রাস্তার পাশের ছোট ছোট গ্রামগুলো প্রায় উড়ে পেরিয়ে যাচ্ছে অস্টিন। চোখে পড়ার সাথে সাথেই পার হয়ে যাচ্ছে রাস্তার পাশের স্বল্প আলোকিত ফোন বক্সগুলো। প্রথম ফোনবক্সটা দেখার পর লারসনের নাম্বারে ফোন করার জন্যে গাড়ি থামিয়ে ফেলেছিল ও, এখনই কোন খোঁজ পাওয়া যায় যদি এই আশায়। পরমুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদলাল ও। লারউইকে পৌঁছেই ফোন করা যাবে। গাড়িটাকে দৃষ্টির আড়ালে রেখে ফোন করা সম্ভব হবে তাহলে। এখানে রাস্তার ওপর গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে ফোন করা উচিত মনে হলো না ওর। অনাবশ্যক ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে, নকল সার্জেন্ট টমাস নিজে অনুসরণ করতে না পারলেও যদি অন্য কারও সঙ্গে রেডিও কন্ট্যাক্ট করে পার্পল রঙের মিনি অস্টিনের কথা জানিয়ে থাকে আর সে যদি রওনা হয়ে থাকে ওকে ধরার জন্যে তো মুশকিল হয়ে যাবে। রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে ফোন বুদে ঢোকার পরমুহূর্তে যদি কেউ এসে হাজির হয়, তাকে ঠেকাবে কি করে রানা? এবার ধরা পড়লে অত সহজে ছাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। পেছন বা সামনে, যে কোন দিক থেকেই আসতে পারে ওরা। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লারউইকে পৌঁছানোই মঙ্গলজনক।

ফেরার পথে আর অত ভেড়া দেখা গেল না পথে। এক ঘণ্টায় দুটো কি তিনটে মাত্র চোখে পড়ল, দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার মাঝখানে। প্রায় গায়ের ওপর গিয়ে ব্রেক কষতেই চাকার আওয়াজে ভয় পেয়ে দৌড়ে সরে গেল রাস্তার পাশে। দ্রুত ছুটছে রানা। স্পীড না কমিয়েই ঘুরল ঝুঁকিপূর্ণ তির্যক বাঁকগুলো। রাস্তার পাশে যেখানে খাড়া খাদ নেমে গেছে সেখানেও খুব একটা কমল না গতি। একমাত্র ভয়, কেউ যদি এসে পড়ে সামনে বা পেছন থেকে। রাশিয়ানরা এত অল্প সময়ে এখানে

তেমন কিছু অর্গানাইজ করতে পেরেছে বলে বিশ্বাস হলো না রানার। তাছাড়া প্রয়োজনটাই বা কি ওদের? হেন্ডারসনই ওদের একমাত্র টার্গেট এখানে। রানার উপস্থিতির সম্ভাবনা বোধহয় স্বপ্নেও ঠাঁই পায়নি ওদের মনে।

দুই

মোটেই বড় নয় লারউইক শহর, এটা টের পাওয়ার আগেই প্রায় হারবার ফ্রন্টে গিয়ে উপস্থিত হলো রানা। ডানে মোড় নিয়ে এক সারি বাড়ির মাঝখান দিয়ে এগিয়ে যাওয়া একটা স্ট্রীটে উঠল, তারপর আরেকটা মোড় নিয়ে সরু একটা গলিতে ঢুকে পড়ল। রাস্তার একপাশে নিয়ে দাঁড় করিয়ে নেমে এল অস্টিন থেকে। ড্রাইভিং সীটের ফুটখানেক পেছনে গাড়ির বাঁ দিকের প্যানেলে বুলেটের ছিদ্র দেখতে পেল একটা। আর ফুটখানেক উপরে এবং ফুটখানেক সামনে দিয়ে যদি আসত বুলেটটা তাহলে নির্ঘাত খুলি উড়িয়ে নিয়ে যেত, ভাবল রানা। রাতের বেলা, চলমান, তার ওপর প্রায় অদৃশ্য একটা টার্গেটে এত নিখুঁত ভাবে গুলি লাগাতে পেরেছে যে লোক, তার হাতের নিশানার প্রশংসা না করে পারল না ও। আর যদি দু'সেকেন্ড সময় পেত নকল সার্জেন্ট টমাস তাহলে ঠিক ঘায়েল করে ফেলত ওকে।

রাস্তায় এক লোকের কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল টাউন হলের কাছে একটা ফোন বক্স আছে। টাউন হলটা কোন্‌দিকে জেনে নিয়ে ছুটল ও সেদিকে। গাড়িটা রইল আগের জায়গায়ই।

বেশ খাড়াভাবে ঢালু হয়ে নেমে গেছে রাস্তাটা। তাল সামলে টাউন হল পর্যন্ত পৌঁছতে জান বেরিয়ে যাবার দশা হলো ওর। ঢালু পথে জোরে ছুটতে গিয়েই বিপত্তিটা হলো বেশি করে। টাউন হল পেরিয়ে কয়েক গজ যেতেই দেখতে পেল ও ফোন বুদ। চারদিকে একবার দেখে নিয়ে ঢুকে পড়ল বুদে। দরজাটা লাগিয়ে দিল ভেতর থেকে। রিসিভার তুলে পকেটে হাত দিয়ে দেখল একটাও দুই পেন্স কয়েন নেই। হেন্ডারসনের কটেজে যেটা ছুঁড়ে মেরেছিল সেটা ছিল দুই পেন্সের, মনে পড়ল রানার। যাক সৎ কাজেই ব্যয় হয়েছে পয়সাটা। কি আর করা, দশ পেন্সের একটা মুদ্রাই স্লটারে ফেলল।

লারসনের স্ত্রী ধরল ফোন। একটু উদ্বিগ্ন গলা। জার্নালিস্টদের বউরা এত রাতে ফোন ধরে অভ্যস্ত, তবু বোধহয় মেনে নিতে পারে না ব্যাপারটাকে। নিজের পরিচয় দিল রানা, অবশ্যই বর্তমান পরিচয়–দা নিউজ-এর রিপোর্টার।

'ও তো বাইরে, মিস্টার রানা।' স্কটিশ অ্যাকসেন্ট মিসেস লারসনের কথায়।

'মুশকিল হলো তো। খুবই জরুরী দরকার ছিল আমার ওকে।'

'ও ফিরলে কি লন্ডনে আপনার কাছে ফোন করতে বলব তাহলে?' লারসনের বউ বোধহয় ভেবেছে লন্ডন থেকে ফোন করছে রানা।

'না,' বলল রানা, 'লন্ডন থেকে না, লারউইক থেকেই ফোন করছি আমি,

একটা ফোন বুদ থেকে। আপনি জানেন নাকি এখন কোথায় আছে ও?'

'কোথায় যাচ্ছিল তা জানি, সেইন্ট স্যানিভা স্ট্রীটের গ্যালি শেডে! তবে এখনও ও ওখানে আছে কিনা ঠিক বলতে পারছি না আমি।'

'ওখানে না থাকলে কি কোন পাবে থাকবে?'

'আমার মনে হয় শেডেই পাবেন ওকে, মিস্টার রানা! চেনেন তো জায়গাটা?'

'না। অসুবিধা [illegible], খুঁজে নেব।'

'কাউকে জিজ্ঞেস করলেই দেখিয়ে দেবে।'

'থ্যাঙ্কস্,' বলে নামিয়ে রাখল রানা ফোন। বেরিয়ে এল বুদ ছেড়ে। গ্যালি শেডটা কোথায় তা জিজ্ঞেস করার জন্যে কাউকে দেখল না রাস্তায়। ফাঁকা রাস্তা। বেশ রাত হয়েছে আসলে।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ও ফোনবক্সের সামনে। শেষ পর্যন্ত একটা বাচ্চা ছেলের দেখা পাওয়া গেল। তিন-চার বছরের বেশি হবে না বয়স। আশ্চর্য না হয়ে পারল না রানা, এই পিচ্চিটা এতরাতে কি করছে রাস্তায়! এখন তো ওর বিছানা ভাসানোর কথা! যা হোক ওকেই জিজ্ঞেস করল, 'গ্যালি শেডটা কোন্‌দিকে বলতে পারো, বাবু?'

'হ্যাঁ? গ্যালি?' ভাঙা ভাঙা ভাবে জবাব দিল বাচ্চাটা, 'ওই তো, ওই দিকে।'

বাচ্চাটার ইশারা অনুসরণ করে তাকাল রানা, আধমাইল দূরে কয়েকটা পাথরের বাড়ির আশেপাশে উজ্জ্বল অনেকগুলো আলো ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না। একেবারে দিনের মত হয়ে আছে জায়গাটা।

'ওতাই গ্যালি,' আবার বলল বাচ্চাটা।

হঠাৎ সবকটা দাঁত বের করে একটা হাসি দিয়ে আপনমনে একটা লাফ মেরে দৌড়ে চলে গেল পিচ্চি, তবে বিছানার দিকে নয় অবশ্যই।

বাচ্চাটার হাসি আর লাফানোর ভঙ্গি দেখে রানাও না হেসে পারল না। নিষ্পাপ বাচ্চাটার আরও নিষ্পাপ অভিব্যক্তি দেখে মনটা ভাল হয়ে গেল ওর। হাঁটতে শুরু করল আলোর দিকে।

এখনও বাতাস বইছে, তবে লারউইকে তার প্রভাব বড় একটা পড়ছে না। উত্তরের বড় পাহাড়টায় বাধা পেয়ে শক্তি হারিয়ে ফেলছে বাতাস। ফোন বুদ থেকে স্যানিভা স্ট্রীট পর্যন্ত আধমাইল রাস্তা বেশ আরামেই হেঁটে এল ও। দ্রুত ছোটার চেষ্টা করেনি একদম, তা ছাড়া রাস্তাটা সমতল এখানে। টেনশন এখনও দূর হয়নি, তবে এখন অনেক ভাল বোধ করছে রানা।

ছোট্ট একটা সমাবেশ। একশোর মত লোক হবে। ভিড় করে আছে উজ্জ্বল টেলিভিশন লাইটগুলোর নিচে। মানুষগুলোর মাথার উপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা টেলিভিশন ক্যামেরা, লেন্সগুলো তাকিয়ে আছে শেডটার দিকে। শেডের ভেতরটা যতক্ষণ না দেখতে পেল ততক্ষণ হেঁটে গেল রানা। শেটল্যান্ডের ফায়ার ফেস্টিভ্যাল 'আপ-হেলি-আ'-র প্রস্তুতি চলছে এখানে।

বিরাট রঙচঙে সুন্দর ভাইকিং গ্যালিটা দেখল রানা। গ্যালি হলো এক পাটাতনওয়ালা ছোট পালতোলা জাহাজ; বড় নৌকাও বলা যেতে পারে। নরওয়েজীয়

জলদস্যুরা এগুলোতে চড়ে ডাকাতি করে বেড়াত সমুদ্রে। এইসব নরওয়েজীয় জলদস্যুরাই ভাইকিং নামে পরিচিত ছিল। গ্যালির একটা সাধারণ অথচ বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, ভাইকিংরা সবসময় সাদার ওপর কালো ডোরাকাটা পাল ব্যবহার করত ওগুলোতে। ডাকাতি করার জন্যে ছড়িয়ে পড়ত দূর সমুদ্রে। সমুদ্রে ঘুরতে ঘুরতেই ওরা আবিষ্কার করে নতুন নতুন দ্বীপ। অনেকে দস্যুবৃত্তির পুরানো পেশা ছেড়ে নতুন আবিষ্কৃত দেশগুলোয় বসবাস শুরু করে। কালক্রমে গ্যালি এবং ভাইকিংবৃত্তি হয়ে ওঠে নরওয়েজীয়দের গর্বের বস্তু। আইসল্যান্ড এবং গ্রীনল্যান্ডের মত ভূ-খণ্ডগুলো ভাইকিংদেরই আবিষ্কার।

সম্ভবত শেটল্যান্ডের দ্বীপগুলোতেও জনবসতি গড়ে তোলে ভাইকিংরাই। শেটল্যান্ডের বেশির ভাগ লোকই অতীতের কোন এক সময়ে স্ক্যান্ডিনেভিয়া, বিশেষ করে নরওয়ে থেকে এসে বসতি স্থাপন করেছিল এখানে। ওরাই মূলত পালন করে আপ-হেলি-আ ফেস্টিভ্যাল। এখন ব্রিটিশ নাগরিক হলেও স্ক্যান্ডিনেভিয়া বা নরওয়েজীয় হিসেবে ওদের যে অহঙ্কার তার প্রকাশ ঘটায় ওরা এই ফেস্টিভ্যালের মাধ্যমে।

হুবহু সেই প্রাচীন আদলে তৈরি গ্যালিটা। চমৎকার কয়েকটা ঢাল লাগানো রয়েছে দু'পাশে। উজ্জ্বল আলো পড়ে চকচক করছে সেগুলো। মাস্টহেডে গুটিয়ে রাখা একটা সাদার উপর কালো ডোরাকাটা পাল। রঙচঙে কাগজ কেটে সাজানো হয়েছে সেটাকে। আশপাশ দিয়ে জটলা পাকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে লোকজন। আধখাওয়া হুইস্কির বোতল অনেকেরই পকেটে। কয়েকজন লোক পুরোদস্তুর ঐতিহ্যবাহী ভাইকিং সাজ পরেছে।

বেশ উৎসুক চোখে তাকাল রানা গ্যালিটার দিকে। আপ-হেলি-আ ফেস্টিভ্যালের সময় মশাল মিছিল করে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় গ্যালিটা। সামনে পেছনে মশাল হাতে চলতে থাকে আধুনিক যুগের ভাইকিংরা, মাঝখানে চাকাওয়ালা ট্রলির উপর থাকে গ্যালি। কয়েকজন লোক টেনে নিয়ে চলে ওটাকে। সমুদ্রের কূলে গিয়ে শেষ হয় মিছিল। গ্যালিটা তখন পুড়িয়ে ফেলা হয়। হাজার হাজার বাজি পুড়তে থাকে আশেপাশে, মাথার উপরে; আর সমুদ্র সৈকতে পুড়তে থাকে গ্যালি।

মুগ্ধ হয়ে দেখছিল রানা রঙচঙে গ্যালি আর ভাইকিং পোশাক পরা লোকগুলোকে, আর ভাবছিল গ্যালিটাকে পুড়িয়ে ফেলার মধ্য দিয়ে কি প্রকাশ করতে চায় আজকালকার ভাইকিংরা? এমন সময় কে যেন এসে কনুই দিয়ে গুঁতো দিল ওকে। চমকে ঘাড় ফিরিয়েই দেখতে পেল এক লোক একটা দানবাক্স বাড়িয়ে ধরেছে সামনে।

'সুন্দর, তাই না?' গ্যালিটার দিকে ইঙ্গিত করল লোকটা।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল রানা।

'অনেক পয়সা খরচ হয় ওটা তৈরি করতে,' মৃদু হাসি লোকটার মুখে। 'প্রতি বছরই খরচ বেড়ে চলেছে আমাদের। ওরা বলে ইনফ্লেশনের কারণেই এমন হচ্ছে।'

এক পাউন্ডের একটা নোট বের করল রানা পকেট থেকে। ভাঁজ করে উপরের

ফুটো দিয়ে ঢুকিয়ে দিল বাক্সের ভেতর। তার পর বলল, 'একজনের খবর দিতে পারেন আমাকে?'

'কে?'

'মিস্টার লারসন।'

'ওই, সেই রিপোর্টার ভদ্রলোক?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রানা।

'এখানেই কোথাও আছে। এই তো একটু আগেই দেখলাম ওপাশটায়।' মুখ ঘুরিয়ে টি.ভি. ক্যামেরাটার দিকে তাকাল লোকটা তারপর আবার ফিরল রানার দিকে। 'ওই যে, আছে এখনও ওখানে।' বছর পঁয়ত্রিশেক বয়সের এক লোকের দিকে ইশারা করল সে।

সুন্দর করে ছাঁটা চুল, একটু মোটাসোটা, ফিটফাট কাপড় পরা লোকটা টি.ভি. ক্যামেরাম্যানদের কাজ দেখছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। এগিয়ে গেল রানা লোকটার দিকে।

'আপনি মিস্টার লারসন?'

'হ্যাঁ। আপনি?' প্রশ্ন লোকটার চোখে।

'আমি মাসুদ রানা, দা নিউজ থেকে।'

'ও, কি ব্যাপার?' হাত বাড়িয়ে দিল লোকটা শেক-হ্যান্ডের জন্যে। 'আপ-হেলি-আ উৎসব কভার করতে এসেছেন? চমৎকার ফিচার হবে কিন্তু। গত দু'তিন বছরে ব্যাপারটা নিয়ে কোন পত্রিকা কোন ফিচার করেনি।'

'না, আমি আসলে ঠিক আপ-হেলি-আ'র ব্যাপারে আসিনি।'

'তাহলে?'

'একজন লোককে খুঁজছি আমি।'

'ও, এই কারণেই আমাকে দরকার?' হেসে উঠল লোকটা। 'আমি তো ভাবলাম বড়সড় একটা কাজ পাওয়া গেল বুঝি।'

'কাজ পেলেন না তাই বা ভাবছেন কেন?'

'একজন লোকের খোঁজ দেয়া আবার একটা কাজ হলো?'

'কিরকম কাজ রয়েছে এখন আপনার হাতে?' লারসনের কথায় গুরুত্ব না দিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'সামান্য।' আবার হাসল লারসন, প্রাণখোলা হাসি। একজন ফ্রি-ল্যান্সার কারও জন্যে কাজ করতে বাধ্য নয়। পছন্দ না হলে কোন কাজ নাও করতে পারে সে, এমন কি একটা কাজ অর্ধেক করে এনেছে এসময়ও বাদ দিতে পারে বেশি পয়সায় অন্য কাজ পাওয়া গেলে। 'এবার বলুন?' জানতে চাইল সে।

'আমি একটা স্টোরি করছি, সেটার ব্যাপারে সাহায্য দরকার, এটুকুই বলতে পারি আপাতত।'

'আচ্ছা?!' একই সঙ্গে প্রশ্ন আর আগ্রহ ঝরে পড়ল লারসনের কণ্ঠে।

'ব্যাপারটা এক্সক্লুসিভ,' বলল রানা। 'এবং সম্পূর্ণ গোপন রাখতে চাই আমি। প্রতিটা ইনফর্মেশনের জন্যে কুড়ি পাউন্ড করে। রাজি থাকলে বলুন, নয়তো অন্য

লোক দেখতে হবে আমাকে। আপনি দা নিউজের এনলিস্টেড ফ্রি-ল্যান্সার বলেই আপনাকে খুঁজে বের করা।'

এবার একটু সিরিয়াস দেখাল লারসনকে। বলল, 'উপযুক্ত মূল্য পেলে যে কোন ইনফর্মেশনই এক্সক্লুসিভ রাখি আমি, মিস্টার রানা। এখন বলুন কাকে খুঁজছেন?'

'জেমস হেন্ডারসন। ওরিন্থোলজিস্ট।'

'জিম হেন্ডারসন! ওকে তো চিনি আমি। দা নিউজ হঠাৎ করে পাখির ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড হয়ে উঠেছে এটা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতে বলবেন না আমাকে।'

'আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই শুধু।'

'কয়েক মিনিট আগেও তো এখানে ছিল।'

'এখানে?' আশ্চর্য হয়ে গেল রানা। লারউইকেই রয়েছে হেন্ডারসন আর ওকে খুঁজতে পঁয়তাল্লিশ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে স্যান্ডনেসে গিয়েছিল ও!

'আপ-হেলি-আ উৎসবের কারণে স্কটল্যান্ডের বেশির ভাগ লোকই এখন লারউইকে,' বলল লারসন। 'এখনও ওই ভিড়ের মধ্যে থাকতে পারে ও।' গ্যালির পাশের জটলার দিকে নির্দেশ করল লারসন।

'চলুন দেখি খুঁজে দেখা যাক।'

'অবশ্য এতক্ষণ আছে কিনা কে জানে!' একটু চিন্তিত শোনাল লারসনের গলা।

'কেন, কোথায় যাবে?'

'আগুনের কথা শোনেননি?'

'আগুন? কিসের আগুন?'

'ওর বাড়িতে। কিছুক্ষণ আগে পুলিসের কাছে শুনে ঘটনাটা জানাই ওকে আমি। মারাত্মক কিছু না, বোধহয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে দ্বীপের একেবারে পশ্চিম প্রান্তে থাকে ও। অনেকক্ষণ লাগবে ফায়ার এঞ্জিনের ওখানে পৌঁছুতে।'

'ধুত্তোরি!' হতাশ শোনাল রানার গলা। 'তার মানে বাড়িতে চলে গেছে ও?'

'মনে হয় না,' বলল লারসন। 'কতটা ক্ষতি হয়েছে জানার জন্যে ফোন করতে গেছে বোধহয়। একটু আগে ওদিকেই গেল বলে মনে হলো।'

'কোথা থেকে ফোন করবে ও?'

একটা আঙুল নাকের ওপর বুলাতে বুলাতে বলল লারসন, 'লারউইকে এলে সাধারণত মিস মার্থার ওখানে থাকে হেন্ডারসন। এখানকার স্কুলের টীচার ছিলেন ভদ্রমহিলা, এখন রিটায়ার্ড।'

'ঠিকানা কি মিস মার্থার? জলদি!'

কৌতূহল বেড়ে উঠল লারসনের। রানার ব্যস্ততা দেখে ব্যাপার কি জানার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে মনে মনে। ঠিকানাটা দিল সে। কিভাবে পৌঁছুনো যাবে তাও বলে দিল। 'বেশি দূর না, হেঁটে গেলেও দশ মিনিটের রাস্তা,' সব শেষে যোগ করল সে।

অর্ধেক হেঁটে অর্ধেক দৌড়ে পাঁচ মিনিটের মাথায় পৌঁছে গেল রানা মিস মার্থার কটেজের সামনে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছোট একটা গ্রানাইট কটেজে থাকে মিস মার্থা। টাউনের এদিকের ঘরবাড়িগুলো বেশ পুরানো। বাড়িঘরের ডিজাইনে অন্তত আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি এখনও লারউইকের এদিকটায়। জানালা দরজা সব বন্ধ। একেবারেই সাড়াশব্দ নেই প্রায়-অন্ধকার কটেজটায়। হেন্ডারসন এখানে আসেনি, এলেও ঘুমিয়ে পড়েছে, ভাবল রানা।

ঝকঝকে পালিশ করা পেতলের কড়া ধরে কয়েকবার নাড়ল রানা। কিছুক্ষণ পর একটা বাতি জ্বলে উঠল বাইরের কামরায়। তালা খোলার শব্দ পাওয়া গেল, তারপর একটা বল্টু সরার শব্দ। একটু ফাঁক হলো দরজা।

সত্তরের কাছাকাছি হবে মিস মার্থার বয়স। ধবধবে সাদা হয়ে গেছে সব চুল। কয়েক জায়গায় রিপু করা ভারী একটা উলেন ড্রেসিং গাউন পরে রয়েছে মহিলা। অসাধারণ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত চেহারা মিস মার্থার। কঠোর এবং কোমল, প্রভুত্বব্যঞ্জক অথচ শান্ত। এই মুহূর্তে রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে তাকিয়ে আছে মহিলা রানার দিকে।

'মিস মার্থা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ।' শান্ত নিরাসক্ত ভঙ্গিতে জবাব দিল মহিলা।

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, মিস মার্থা। কিন্তু খুব জরুরী দরকার, নইলে এতরাতে ঘুম থেকে জাগাতাম না আপনাকে।'

'ঘুমাচ্ছিলাম না আমি। যা হোক, কি দরকার বলুন।' ছুরি দিয়ে কেটে রানাকে সাইজে আনছে যেন, এমনি গলায় বলল মিস মার্থা।

'এই মুহূর্তে হেন্ডারসনের সঙ্গে কথা বলা দরকার আমার।'

'তাহলে অন্য কোথাও যেতে হচ্ছে আপনাকে। ও নেই এখানে।' একই রকম নিরুত্তাপ গলা মহিলার।

'ওকে দেয়ার জন্যে জরুরী একটা ইনফর্মেশন ছিল আমার কাছে। আমার নাম...'

'না।' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল মহিলা। অল্প অল্প কাঁপছে তার হাতগুলো। বয়সের জন্য না নার্ভাসনেসের কারণে বুঝতে পারল না রানা। বয়সই হবে। সারাজীবন মাস্টারী করে এসেছে মিস মার্থা। এ রকম মহিলারা সহজে নার্ভাস হয় না বলেই ধারণা ওর।

'প্লীজ, মিস মার্থা,' যথার্থই করুণ হয়ে উঠেছে রানার চেহারা। 'তাহলে অন্তত একটা মেসেজ রাখুন ওর জন্যে।'

'কোথায় তা-ই জানি না আমি, কবে আসবে তারও ঠিক নেই কোন, তো কি মেসেজ রাখব। আমার এবং আপনার দু'জনেরই মূল্যবান সময় নষ্ট করছেন আপনি। গুড নাইট।' দরজাটা বন্ধ করে দিতে গেল মহিলা।

মরিয়া হয়ে বাধা দিতে চেষ্টা করল রানা। বলল, 'এরকম কিছু বলেছে নাকি হেন্ডারসন, যে ওর পেছনে কেউ...'

কিন্তু ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে দরজা। বল্টু টানার, তালা বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনল রানা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। বোকা বোকা লাগছে নিজেকে। কড়াটা ধরল আবার হাত বাড়িয়ে। পরমুহূর্তেই ছেড়ে দিল সেটা। আবার নক করে লাভ হবে না কোন।

চেহারা দেখে কিন্তু এরকম মনে হয়নি মিস মার্থাকে। কি কারণে এরকম রূঢ় ব্যবহার করল মহিলা? এখানে আসতে আসতেও সন্দেহ ছিল রানার, হেন্ডারসন মিস মার্থার এখানে সত্যিই এসেছে কিনা। ঘরে আগুন লেগেছে খবর পেলে কেউ চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। কিন্তু এখন কোন সন্দেহ নেই ওর মনে, এখানেই আছে হেন্ডারসন।

বৃদ্ধা মহিলার অস্বাভাবিক রূঢ় আচরণে আরও নিশ্চিত হয়েছে রানা, প্রিয়জন কাউকে আগলাচ্ছে মহিলা। এবং সে ব্যাপারে কোন রকম দ্বিধা নেই তার, যেকোন উপায়েই হোক আগলাতে হবে সেই প্রিয়জনকে, অর্থাৎ হেন্ডারসনকে। কিন্তু কিসের ভয় হেন্ডারসনের, ভেবে পেল না রানা। কি জানে সে?

আগুন তো আগুনই, দুর্ঘটনার জন্যেও তা লাগতে পারে। যে ভাবেই লাগুক, ঘরে আগুন লাগলে তো নেভাতে ছোটাটাই ঘরের মালিকের পক্ষে স্বাভাবিক আচরণ। কিন্তু তা না করে লুকিয়ে পড়তে চাইছে হেন্ডারসন। অর্থাৎ সে এমন কিছু জানে যার গোপনীয়তা রক্ষা করা আগুনের হাত থেকে নিজের ঘর রক্ষা করার চেয়েও বেশি জরুরী। নিশ্চয়ই খুবই সন্দেহ প্রবণ হয়ে উঠেছে সে, এবং মিস মার্থার ভেতরেও সংক্রমিত হয়েছে সেই সন্দেহ।

মিস মার্থা আপাতত দুর্ভেদ্য এক ব্যূহ রচনা করেছে হেন্ডারসনকে ঘিরে। অন্তত এই মুহূর্তে সেই ব্যূহ ভেদ করা সম্ভব নয় রানার পক্ষে। রেগে-মেগে ফিরে আসতে লাগল ও গ্যালিশেডের দিকে। লারসন বোধহয় এখনও আছে সেখানে কোথাও।

মোড় ঘুরে সেন্ট স্যানিভা স্ট্রীটে ঢুকল রানা। দেখল, ভিড়টা আছে এখনও, তবে টেলিভিশন ক্যামেরাটা কাজ বন্ধ করেছে। মনে মনে প্রার্থনা করল, লারসন যেন থাকে এখনও।

শেডের কাছে পৌঁছে খুঁজল ওকে রানা। কিন্তু কোথাও দেখা গেল না লারসনকে। হতাশায় ছেয়ে যেতে চাইছে ওর মনটা। ঠোঁট কামড়ে ধরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। এবার কোন্ পথে এগোবে ও? একে একে সবগুলো পথই বন্ধ হয়ে আসছে যেন।

'রানা!'

মাথার উপর থেকে হঠাৎ ভেসে এল শব্দটা। ঝট করে উপরে তাকাল রানা। শেডের এক প্রান্তে দরজাগুলোর উপরে একটা ব্যালকনি মত। রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লারসন। আধখালি একটা বোতল তার হাতে। সিঁড়ি টপকে প্রায় দৌড়ে উঠে গেল রানা ব্যালকনিতে। বোতলটা এগিয়ে দিল লারসন।

'এসে গেছেন? ধরুন ভিজিয়ে নিন গলাটা। আপনার চেহারাই বলছে, এ জিনিসের দরকার এখন আপনার।'

'থ্যাঙ্কস।' বোতলটা মুখের কাছে নিয়ে এক ঢোক গিলল রানা। 'নেই ও সেখানে।'

'নেই? আশ্চর্য! আমি শিওর ছিলাম, ওখানেই থাকবে ও!'

তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে লারসন ওর দিকে। মুখ দেখেই মনের কথাগুলো

বুঝে নিতে চাইছে যেন, ওর দুশ্চিন্তা, হতাশা সব। চেষ্টা করলেও রানা লুকাতে পারত না ভাবগুলো। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর বলল লারসন, 'তাহলে? আপনার স্টোরির কি হবে এখন?'

'বুঝতে পারছি না,' বলল রানা। 'হেন্ডারসনের সঙ্গে দেখা করাটা খুব জরুরী...'

'সেটা আপনার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি,' বলল লারসন। এক মুহূর্তের জন্যেও চোখ সরায়নি সে রানার মুখের উপর থেকে। 'আজকের দিনটা একটু অদ্ভুত। বার বার কেন জানি মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘটছে এখানে।'

'কেন, অদ্ভুত কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তিনটে ঘটনা। সবগুলোই এই শেটল্যান্ডে ঘটেছে বা ঘটছে, স্যান্ডনেসের পথে, স্যান্ডনেসে, লারউইকে।'

'যেমন?'

'প্রথমত, আজ সকালে একটা পোস্টভ্যান আক্রান্ত হয়েছে। স্যান্ডনেসের দিকে যাচ্ছিল। স্যান্ডনেসে পৌঁছুনোর ঠিক আগে আগে একটা নির্জন জায়গায় দুষ্কৃতকারীরা হামলা চালায় ওটার ওপর। পোস্টম্যানকে আটকে রেখে চিঠিপত্রগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করে ওরা।' রানার ওপর কেমন প্রতিক্রিয়া হয় দেখার জন্যই যেন ধীরে ধীরে সময় নিয়ে পেট থেকে বের করল সে কথাগুলো।

মুখে নির্বিকার একটা ভাব ফুটিয়ে রাখলেও ভেতরে ভেতরে চমকে উঠল রানা। সন্ধ্যার খবরের কাগজটা দেখা উচিত ছিল। সেটা দেখলেই জানতে পারত ও ঘটনাটা।

'আর দ্বিতীয়?'

'দ্বিতীয়ত, হেন্ডারসনের স্যান্ডনেসের বাড়ি জার্লশফে আগুন লেগেছে কিছুক্ষণ আগে।'

'তৃতীয়?'

'আপনি প্রায় মাঝ রাতে জরুরীভাবে খুঁজছেন হেন্ডারসনকে। কেন? কি একটা স্টোরি করবেন নাকি।'

'হ্যাঁ, খুবই দরকার আমার হেন্ডারসনকে। আচ্ছা, এখন বলুন তো, সকালের হামলাটা চালিয়েছিল কারা? সাধারণ ছিঁচকে গুণ্ডা না অন্য কেউ?' পোস্টভ্যানের ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল কারা তা স্পষ্ট বুঝতে পারছে রানা তবু আরও বিস্তারিত কিছু জানা যায় যদি, তাই জিজ্ঞেস করল ও।

'কারা যে আসলে চালিয়েছিল আক্রমণটা তা জানা যায়নি এখনও। পুলিস তদন্ত করছে ব্যাপারটা।'

'হতাহত হয়েছে নাকি কেউ?'

'না বোধহয়।'

'ঠিক কি ঘটেছিল বলতে পারবেন?'

'হাত দেখিয়ে কেউ একজন দাঁড় করায় ভ্যানটা। পিস্তলের মুখে ড্রাইভারকে আটকে রেখে চিঠিপত্রগুলো চেক করে ওরা। একজনকেও চিনতে পারেনি

ড্রাইভার। মুখে রুমাল বাঁধা ছিল সব ক'জনের।'

'ক'জন ছিল ওরা?'

'পোস্টম্যান তো বলছে, তিনজন ছিল।'

'চুরি গেছে কি কি?'

'যতদূর জানি খোয়া যায়নি কিছু। বিশেষ কিছু ছিল না অবশ্য ভ্যানে। অল্পকিছু চিঠিপত্র, বুড়ো বাপ-মাদের কাছে লেখা সব। মেইনল্যান্ডের পশ্চিম অঞ্চলের মত বুড়ো লোকের সংখ্যাই এখানে বেশি।'

'কিন্তু নেয়ার মত কিছুই পায়নি ওরা?' প্রশ্নটা আবার করল রানা।

'বললাম তো, না। চার পাঁচটা রেজিস্টার্ড চিঠি ছিল, দু'একটার ভেতর সামান্য কিছু টাকাও ছিল হয়তো। কিন্তু সেগুলো ছোঁয়নি ওরা। অন্যগুলো সম্পর্কে জানার কোন উপায় নেই। পোস্টম্যানও দেখতে পায়নি কিছু। রাস্তার এক পাশে নিয়ে গিয়ে পিস্তলের মুখে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল বেচারাকে। কি নাটক জমে উঠেছে শেটল্যান্ডে, মিস্টার রানা?'

'আমি কি করে জানব! হেন্ডারসনের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি আমি এবং শেটল্যান্ডে পৌঁছেছি ঠিক সন্ধ্যার সময়। সকালে কি ঘটেছে না ঘটেছে তা আমার জানার কথা নয়।' একটু বিরতি নিল রানা! 'আচ্ছা, ওকে কতখানি চেনেন আপনি?'

'এই আর কি,' একটু কাঁধ ঝাঁকাল লারসন। 'আমার পেশা সম্পর্কে তো জানেনই। মাঝে মধ্যে ভালমন্দ কাহিনীর জন্ম দেয় যারা তাদেরকেই বেশি চিনতে হয় আমার। পাখিরা বিশেষ কোন ঘটনা না ঘটালেও ওরাই মাঝে মধ্যে ঘটনা হয়ে ওঠে, আর সে ঘটনার সঙ্গে যোগাযোগ থাকে হেন্ডারসনের।' অর্থপূর্ণভাবে একটু হাসল সে।

রানাও হাসল একটু, 'শ্বেত প্যাঁচা?'

'ওগুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না। ওই সব খবর পেয়েই তো আসে ট্যুরিস্টরা। ফেটলার আইল্যান্ডের শ্বেত প্যাঁচা সম্পর্কে আমি কয়েকটা স্টোরি করে ফেলেছি আগেই।'

'ফেটলার আইল্যান্ড! কোথায় সেটা?'

'ছোট ছোট দ্বীপগুলোর একটা। এখান থেকে অনেকটা উত্তরে। অল্প কয়েকঘর লোকের বাস। আমার মনে হয় সেই কারণেই প্যাঁচাগুলো আছে ওখানে।'

'হেন্ডারসন তো আরও কয়েকটার সন্ধান পেয়েছে, তাই না?'

'বাদ দিন তো! আপনি নিশ্চয়ই ওই শ্বেত প্যাঁচার কারণে আসেননি?'

'আমার কথার জবাব দিন আগে, পেয়েছে কি না?'

একটু থতমত খেলো লারসন। 'লোকে অবশ্য তাই বলছে...'

'কোথায়?'

'এ ব্যাপারের সঙ্গে আপনার আগ্রহের ব্যাপারের কোন সম্পর্ক নেই। হেন্ডারসনের খোঁজ নিতে নিতে আবার শ্বেত প্যাঁচার খোঁজ নিতে শুরু করলেন কেন? আপনি আমাকে টাকা দেবেন এক ব্যাপারে কিন্তু একই সঙ্গে অন্যান্য ব্যাপারগুলোও জেনে নিতে চাইলে চলবে কেন? শ্বেত প্যাঁচার ব্যাপারটা আমি

গোপনই রাখতে চাই। আমার জীবিকা ধরে টান দেবেন না।'

'আপনার জীবিকা অর্জনে সাহায্য করতেই চাই আমি।'

'অর্থাৎ এ খবরটাও কিনবেন আপনি?'

'হ্যাঁ।'

'সেক্ষেত্রে বলা যেতে পারে। নস-এ দেখা গেছে ওগুলো। অন্য আরেকটা দ্বীপ ওটা। ঠিক ক্র্যাড্‌ল হোম-এর উপরেই আছে প্যাঁচাগুলো। হেন্ডারসন আর আরেকটা লোক, দু'জনে পালা করে কয়েক সপ্তাহ যাবৎ পর্যবেক্ষণ করছে ওগুলো।'

'অন্য লোকটা আবার কে?'

'জানি না। একজন ভলান্টিয়ার। আইরিশ। ডিসেম্বর এবং জানুয়ারিতে এসে থাকে এখানে। হেন্ডারসনের মতই পাখি পাগল ছোকরা। অবশ্য পাখিওয়ালা লোকগুলোর প্রত্যেকটাকেই আমার পাগল মনে হয়।'

'ওই ক্র্যাড্‌ল হোমটা কি?'

'উঁহুঁ, ওটা বলা যাবে না। চমৎকার একটা স্টোরি হবে। রঙিন পিকচার স্টোরি পয়সার জিনিস।'

'আপনার স্টোরির ব্যাপারে ইন্টারেস্ট নেই আমার,' ধৈর্য বজায় রাখা কঠিন হয়ে উঠল রানার পক্ষে। 'একমাত্র হেন্ডারসনের ব্যাপারেই উৎসাহী আমি।'

'কিন্তু পরে যদি ইন্টারেস্টেড হয়ে পড়েন, তখন?'

'দেখুন, মিস্টার লারসন, আমি শপথ করে বলতে পারি...'

'আপনাদের রিপোর্টারদের শপথ জানা আছে আমার। আমি নিজেও কত করে থাকি অমন।'

'আপনি চাইলে লিখে দিতে পারি আমি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল রানা। 'আমি মাসুদ রানা, দা নিউজ-এর পক্ষ থেকে, স্বেচ্ছায় ঘোষণা করছি যে, আমরা ক্র্যাড্‌ল হোম-এর ব্যাপারে জ্যাক লারসনের অনুমতি ব্যতীত একটা লাইনও প্রকাশ করব না। যদি প্রকাশ করি তো, জ্যাক লারসনকে পাঁচশো পাউন্ড দিতে বাধ্য থাকব। চলবে এতে?'

'হ্যাঁ, এখন চলতে পারে।' একটু শান্ত হয়েছে লারসন, দা নিউজ-এ ক্র্যাড্‌ল হোম স্টোরি ছাপা হলে পাঁচশো পাউন্ড, যে-সে কথা নয়।

লারসনের নোটবুকের একটা পৃষ্ঠায় কথাগুলো লিখে নিচে সই করে দিল রানা। পদত্যাগ করে এসেছে ও, সুতরাং এই অঙ্গীকারপত্রের কোন মূল্য নেই। যাহোক, লারসন জানে না তা এবং সত্যিই বিন্দুমাত্রও উৎসাহ নেই ওর স্টোরিটার ব্যাপারে।

নোটবুকটা পকেটে রেখে দিল লারসন। বলল, 'তাহলে, ক্র্যাড্‌ল হোম সম্পর্কে জানাতেই হবে আপনাকে?'

'নিশ্চয়ই।'

'ক্র্যাড্‌ল মানে জানেন তো, দোলনা আর হোম মানে নদী বা সমুদ্রতীরের উর্বর সমতল ক্ষেত্র। তাহলে ক্র্যাড্‌ল হোম মানে দাঁড়াচ্ছে কি: দোলনার উপর উর্বর সমতল ক্ষেত্র। আসলে দোলনার উপর নয়, দোলনায় চড়ে যেতে হয় জায়গাটায় তাই এরকম নাম হয়েছে। আসল নাম হচ্ছে, হোম অভ নস। হোম অভ নস আসলে

একটা সি স্ট্যাক। প্রায় দু'শো ফিট উঁচু, চারদিক থেকেই খাড়া উঠে গেছে। চূড়াটা সমতল।'

'তারপর?' বলল রানা।

'পুরো নস আইল্যান্ডটাই পাখিদের একটা অভয়াশ্রম। ক্র্যাড্‌ল হোমটা দক্ষিণ-পুব কোনায়। নস-এর দক্ষিণ-পুব কোণের চূড়া দি ন্যুপ থেকে হোম-এর উত্তর-পশ্চিম দিকের পাশ পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ গজের ব্যবধান। দুই চূড়ার মাঝখানের এই জায়গার নিচে অসংখ্য ছোট ছোট ডুবো পাহাড়ে ভর্তি সমুদ্র। ডুবো পাহাড়গুলোয় বাধা পেয়ে সমুদ্রের স্রোত এবং ঢেউ ওখানে দশগুণ হয়ে উঠেছে। সমুদ্র ওখানে ফুঁসছে সব সময়। সব মিলিয়ে জায়গাটা ভয়ানক।'

একটু থামল লারসন। তারপর আবার শুরু করল, 'পুরানো একটা গল্প প্রচলিত আছে হোম অভ নস সম্পর্কে। নস-এর যে চূড়াটাকে আমরা ক্র্যাড্‌ল হোম বলছি, সেটার উপরটা সমতল এবং সত্যিই বেশ উর্বর। এক একরের কিছু বেশি হবে জায়গা। অনেক আগে, আঠারো শতকের কোন এক সময় স্থানীয় এক ভূ-স্বামী ভাবল, এক একরেরও বেশি চারণ-ভূমি অব্যবহৃত থেকে যাবে এটা হতে পারে না। জায়গাটাকে ব্যবহার করতে হবে। সি-লেভেল থেকে অত উপরে পানির অভাব, সুতরাং চাষবাস সম্ভব নয়, চারণ ভূমি হিসেবেই ব্যবহার করা হবে ঠিক হলো। কিন্তু সমস্যা হলো অত ওপরে ওঠা যাবে কি করে? পাহাড়ের গাটা এমন খাড়া আর মসৃণ যে ওটা বেয়ে ওঠার কথা স্থানীয় কেউ স্বপ্নেও ভাবে না। শেষ পর্যন্ত আমাদের ভূ-স্বামী কি করল, অন্য আরেকটা দ্বীপ ফাউলা থেকে দুর্ধর্ষ এক পর্বতারোহীকে নিয়ে এল। জনশ্রুতি আছে, পাহাড় চূড়ার ওই উর্বর সমতল ক্ষেত্রে উঠতে পারলে তাকে একটা গরু দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ভূ-স্বামী।'

'ফাউলা দ্বীপের সেই পর্বতারোহী উঠেছিল ওপরে?'

'জনশ্রুতি তো তাই। একটা বড় নৌকার মাস্তুল বেয়ে উঠে যায় লোকটা। অনেক-উঁচু মাস্তুল, হোম অভ নস-এর মাথা ছাড়িয়েও কয়েক গজ উঁচু। মাস্তুলের উপর থেকে কোমরে দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়ে সে। তারপর দোল খেতে খেতে লাফিয়ে গিয়ে পড়ে হোমের ওপর। অন্য লোকেরা একটা হাতুড়ি আর কয়েকটা খুঁটি ছুঁড়ে দেয় ওপরে। হাতুড়ির সাহায্যে খুঁটিগুলো পুঁতে ফেলে লোকটা, তারপর লম্বা মজবুত একটা দড়ি বেঁধে দেয় খুঁটিগুলোর সঙ্গে। দড়িটার অন্যমাথা বাঁধা ছিল নস-এর স্বাভাবিক চূড়া অর্থাৎ দি ন্যুপ-এর সঙ্গে। বুঝতে পারছেন?'

'হ্যাঁ, তারপর?'

'তারপর বড়সড় একটা কাঠের বাক্স দোলনার মত ঝুলিয়ে দেয়া হলো দড়িটা থেকে। তারপর থেকে রাখালরা একেক বারে একটা করে ভেড়া বাক্সে ভরে নিজেরা পাশে বসে বা দাঁড়িয়ে দড়ি টেনে টেনে হোমের উপর নিয়ে গিয়ে ঘাস খাইয়ে আনত। আধুনিক রোপওয়ের একটু প্রিমিটিভ সংস্করণ বলতে পারেন।'

'আর সেই পর্বতারোহী? গরুটা পেয়েছিল?'

মাথা নাড়ল লারসন। 'পেত। কিন্তু লোকটা ছিল ভয়ানক আত্মবিশ্বাসী আর জেদী। ও বলল, যেভাবে উঠেছে সেভাবেই নামবে। কিন্তু পারেনি।'

'কি হয়েছিল?'

'পড়ল আর মরল।'

'আপনার সেই প্রিমিটিভ রোপওয়ে কি চালু আছে এখনও?'

'না। এতদিন থাকে নাকি? অল্প কয়েকদিন ওখানে ভেড়া চরিয়েছিল ভূ-স্বামী। পরে যখন দেখা গেল খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি তখন পরিত্যক্ত হয় ওটা। এখন আর কিছুই নেই, খুঁটি, দড়ি, দোলনা কিচ্ছু না।'

'চমৎকার গল্প। কিন্তু এর সঙ্গে হেন্ডারসনের সম্পর্কটা কি?'

'সম্পর্ক নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে,' জবাব দিল লারসন। 'জিম হেন্ডারসন বোধহয় দ্বিতীয় ব্যক্তি যে ওই চূড়ায় উঠেছে। কয়েক সপ্তাহ আগে। একা। পাগল ছাড়া কেউ ওরকম দুঃসাহস দেখায় না। তারপর অন্য লোকটা যখন এল, ওরাও দড়ি দিয়ে সরল একটা রোপওয়ে বানিয়ে নিল। ওরা এখন পিংপং বলের মতই এ মাথা ও মাথা করছে।' একটু শিহরিত হলো লারসন। 'যদি কখনও দেখার সুযোগ হয় তো দেখবেন–মাথা ঘুরে উঠবে।'

'ঠিক আছে, সুযোগ হলে চেষ্টা করব,' বলল রানা। 'হ্যাঁ, এই স্টোরির জন্যে পাঁচশো পাউন্ড দাম দেওয়া যেতে পারে। আমাদের জন্যে তুলে রাখুন স্টোরিটা।'

'আমি তো আগেই বলেছি, আমার উপর নির্ভর করতে পারেন আপনি।'

'এবার অন্য আরেকটা কথা বলুন দেখি, মিস মার্থাকে জানেন আপনি? আমি বলতে চাচ্ছি, ভাল করে?'

'হ্যাঁ।'

'কেমন মহিলা?'

'চমৎকার বুড়ি। আসলে জাঁদরেল মাস্টারনী ছিল। এখানকার যুবক আর প্রৌঢ়দের অনেকেই তাঁর ছাত্র। প্রচণ্ড পরিশ্রম করাত ছাত্রছাত্রীদের। ছাত্রছাত্রীরা তাতে কিন্তু অপছন্দ করত না তাকে, বরঞ্চ উল্টোটা। বর্তমান শেটল্যান্ডের একটা স্মৃতিস্তম্ভ বলা যেতে পারে মহিলাকে।'

'আপনাকে বিশ্বাস করে মহিলা?'

'বিশ্বাস করে কিনা জানি না, তবে আমাকে জানে ভাল করে। আমি স্থানীয়দের সঙ্গে পুরোদস্তুর মিশে যাওয়ার চেষ্টা করছি। দশ বছর ধরে আছি এখানে কিন্তু মাত্র কিছুদিন হলো এরা নিজেদের একজন বলে ভাবতে শুরু করেছে আমাকে। স্থানীয়রা একে অন্যকে সহজেই বিশ্বাস করে, কিন্তু বাইরের কাউকে নয়।'

'তাহলে আমার একটু উপকার করবেন আপনি? আমার হয়ে ওঁকে বলবেন, আমি ঠিক আছি। দৃষ্টি দিয়ে যদি কাউকে খুন করা সম্ভব হত এযুগে তো এতক্ষণ আমার লাশ পড়ে থাকত ভদ্রমহিলার দোরগোড়ায়। আমি কথা বলতে চাই ওঁর সাথে, কিন্তু উনি উত্তর দেবেন না বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।'

'মানে? কি কারণে কথা বলতে চান ওঁর সঙ্গে?'

'হেন্ডারসনের ব্যাপারেই কথা বলা দরকার।'

'আজ রাতেই?'

'হ্যাঁ, আজ রাতেই।'

এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল সে। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, একটু অপেক্ষা করুন এখানে, আমি আসছি। দশ মিনিটের বেশি লাগবে না। টেলিভিশনের ওদের সঙ্গে একটু কথা বলে আসি। ততক্ষণ বোতলটা থাক আপনার কাছে।' পকেট থেকে আধখালি হুইস্কির বোতলটা রানার হাতে দিল লারসন।

'থ্যাঙ্কস,' বলল রানা।

'এখানেই থাকবেন আপনি?'

'না, বাইরে অপেক্ষা করব ওই সামনের মোড়টায়।'

'ঠিক আছে।'

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত পায়ে নেমে গেল লারসন। এক মুহূর্তে হারিয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে। এক ঢোক হুইস্কি গলায় ঢেলে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে রইল রানা কিছুক্ষণ। একটু পর নেমে এল সে-ও। কিছুক্ষণ ভিড়ের মধ্যে ঘোরাঘুরি করে মোড়টার দিকে এগোল ও। এখনও প্রচুর লোক ভিড় করে আছে জায়গাটায়। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ করছে। হাসি ঠাট্টায় মেতে উঠেছে কেউ কেউ। মোড়ের কাছে পৌঁছে একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল রানা।

বাতাস আড়াল করে একটা সিগারেট ধরানোর জন্যে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়েছে ও এমন সময় শুনতে পেল কথাটা, 'মিস্টার মাসুদ রানা মনে হচ্ছে।'

ঝট করে ঘুরে সোজা হয়ে সামনে তাকাল রানা। চওড়া মত লোকটাকে দেখতে পেল। টুপিটা শক্তভাবে এঁটে আছে মাথায়। উইলকিনসন। উল্টোদিকে ঘুরে ছুটতে যাবে, কিন্তু পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে জন রিড।

তিন

হতাশা আর বিতৃষ্ণা নিয়ে তাকিয়ে আছে রানা ওদের দিকে। মার-খাওয়া লোকের মত লাগছে নিজেকে। ভীষণ আশ্চর্য হয়েছে ও, ভেবে পাচ্ছে না এত তাড়াতাড়ি এখানে এসে পৌঁছল কি করে ওরা।

এতক্ষণ নিশ্চিন্ত মনে ছিল ও। কেউ ওর খোঁজ জানে না ভেবে একটু উৎফুল্লও। অফিশিয়াল সার্কেলের লোকদের জানানোর জন্যে জহির ভাইকে দেয়া জার্লশফ, স্যান্ডনেস, নরওয়ের ঠিকানাটা ওদেরকে বিপথে পরিচালিত করবে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না রানার। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ভুল ধারণা করেছিল ও, ঠিক সময়ে ঠিক জায়গামতই হাজির হয়েছে ব্যাটারা। এবার আর বোধহয় বোকা বানানো যাবে না ওদের।

গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে রিড। মুহূর্তের জন্যে তাকাল একবার রানার চোখের দিকে। তারপর বলল, 'চলো আমাদের সঙ্গে। কোনরকম চালাকির চেষ্টা কোরো না, লাভ হবে না।'

রানাও তাকাল রিডের চোখে চোখে। যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না ওর

উপস্থিতি। তারপর মৃদু হেসে শান্তকণ্ঠে বলল, 'কেমন করে বুঝলে তোমরা?'

'খুবই স্মার্ট তুমি, রানা,' কর্কশস্বরে জবাব দিল উইলকিনসন, পারলে খেয়ে ফেলে ওকে। 'বহুত ভুগিয়েছ আমাদের। এবার আর...'

'হয়েছে হয়েছে, থামো তো, উইল,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল রিড। 'মিস্টার রানাকে একটু সামলে নিতে দাও আগে।' তারপর রানার দিকে ফিরে বলল, 'চলো এগোনো যাক, কি বলো? মনে আছে তো কথাটা, চালাকির চেষ্টা করে লাভ হবে না।'

স্যুনিভা স্ট্রীটের শেষ মাথায় ওদের একটা গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখা ছিল। কিন্তু দরকার পড়ল না গাড়িটার। গাড়িটা পেরিয়ে কয়েক গজ যেতেই চারকোনা পাথরের তৈরি একটা ভিক্টোরিয়ান ডিজাইনের বিল্ডিংয়ের সামনে উপস্থিত হলো ওরা। ছোট্ট একটা পাহাড়ের উপর বাড়িটা, ওপাশেই লারউইক হারবার। বিল্ডিঙের বাইরে পরিচিত একটা ল্যাম্প সাইন টাঙানো। নীলের ভেতর স্পষ্ট ঝকঝকে সাদা হরফে লেখা কথাটা: 'লারউইক পুলিস স্টেশন'।

ভেতরে ঢুকল তিনজন। সামনে উইলকিনসন, মাঝখানে রানা আর শেষে রিড। ডিউটি কনস্টেবল ওক কাঠের ভারী কাউন্টার ফ্ল্যাপটা উঁচু করে ধরল। নিঃশব্দে কাউন্টারের ওপাশে চলে গেল ওরা। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠল। একই রকম সারিবদ্ধভাবে হেঁটে চলেছে তিনজন। বড়সড় একটা কামরার সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে উইলকিনসন। হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে দরজাটা খুলে ঢুকল ভেতরে। দরজার মুখে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। পেছন থেকে ঠেলা দিল রিড। ঘাড় ফিরিয়ে রিডের দিকে একঝলক আগুনে দৃষ্টি হেনে ঢুকে পড়ল ও। রিডও ঢুকল পেছন পেছন। উইলকিনসন তালা লাগিয়ে দিল দরজায়, চাবিটা রেখে দিল পকেটে।

বড় একটা টেবিলের চারদিকে কয়েকটা চেয়ার সাজানো। ছোটখাট একটা কনফারেন্সরুমের মত চেহারা কামরাটার। দুটো চেয়ার দখল করে বসল রিড আর উইলকিনসন। তৃতীয় আর একটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে ইশারা করল রানাকে। বসল না রানা। ধীর পায়ে হেঁটে গেল জানালার দিকে। তাকাল বাইরে। আলো ঝলমলে ছোট্ট হারবারটা দেখতে পেল। ফ্লাড লাইটের উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত জেটিগুলো। এত রাতেও যথেষ্ট ব্যস্ত। ছোট বড় নানা আকারের জাহাজ আসছে, যাচ্ছে। জেটির পাশে দাঁড়ানো কয়েকটা জাহাজ থেকে ক্রেনের সাহায্যে মাল খালাস করা হচ্ছে। ডক শ্রমিকরা হাঁকডাক করে কাজ করছে। পেছন থেকে উইলকিনসনের গলা শোনা গেল, 'আর চালাকি চলবে না, মিস্টার, বেরোনোর কোন উপায় নেই।'

ঘুরে দাঁড়াল রানা। মুখোমুখি হলো দু'জনের। বিপরীত চেহারার লোক দু'জন: হালকা পাতলা, গম্ভীর রিড, সতর্ক দৃষ্টি চোখে। উইলকিনসন, লাল মুখো, দেখলেই মনে হয় রেগে আছে, একটু ভারী শরীর, মোটাই বলা যায়, যেন বুনো শুয়োরের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে সব সময়।

স্থির দুই চোখ মেলে তাকিয়ে আছে রিড। 'খেলা মনে কোরো না ব্যাপারটাকে, রানা। আমরা খেলা করছি না তোমার সাথে।'

লম্বা করে একটা শ্বাস নিল রানা, 'আমিও না।'

'কিন্তু তোমার হাবভাবে অন্য কিছু মনে হচ্ছে না আমার। ব্যাপারটাকে চমকপ্রদ কোন নিউজ পেপার স্টোরি বা মজাদার কোন গল্প কিংবা লুকোচুরি খেলা ভাবলে ভুল করবে তুমি।'

ওর দৃষ্টিই ওকে ফিরিয়ে দিল রানা। 'তাহলে তুমিই বলো ব্যাপারটা কি? খেলা নয়, গল্প নয়, নিউজ পেপার স্টোরি নয় তো কী আসলে? যতটুকু জানি, আজ সকাল পর্যন্তও তোমরা জানতে না ব্যাপারটা কি। কিন্তু এর ভেতরে এমন কি ঘটে গেল যাতে তোমরা টের পেয়ে গেলে খেলা নয় ব্যাপারটা?'

রানার টিপ্পনিতে চটল না রিড। বলল, 'সকালে যা জানতাম এখনও তার চেয়ে বেশি কিছু জানি না আমরা। প্ল্যানটা জানি, কিন্তু ইনফর্মেশনটার সম্পর্কে কিছুই জানি না। কেমন করে ইনফর্মেশনটা সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে এসেছে তাও জানি, তুমিও জানো।'

'ইনফর্মেশনটা যে সত্যি গুরুত্বপূর্ণ এরকম ভাবছ কেন তোমরা? ফালতু একটা ব্যাপারও তো হতে পারে?'

মাথা ঝাঁকাল রিড। 'হ্যাঁ, হতে পারে। অনেক ইনফর্মেশনই ফালতু হতে পারে, কিন্তু এটা নয়। রাশিয়ান গভর্নমেন্ট খুবই হিংস্র প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে। ফালতু হলে মিস আশরাফ নিখোঁজ হত না, রাশিয়ান সরকারও অত হিংস্র হয়ে উঠত না বা রাশিয়ান ইহুদীগুলোও সোভিয়েট সরকারের হাত মুচড়ে ধরার কাজে ব্যবহার করতে পারত না ওটাকে। অর্থাৎ আমরা ধরে নিচ্ছি ব্যাপারটা শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয় ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, আর তা যদি হয় তো সেটা কি জানতে হবে আমাদের। বুঝতে পেরেছ? আমাদেরকে···জানতে হবে···ব্যাপারটা। ব্রিটিশ সরকারকে এবং আমার সরকারকেও।'

'আর তোমরা ভাবছ আমি জানি?'

'অন্তত মুখে যতটুকু বলছ তারচেয়ে যে বেশি তাতে কোন সন্দেহ নেই,' কর্কশ স্বরে বলে উঠল উইলকিনসন। 'অনেক বেশি জানো তুমি।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, শান্ত হও তুমি, উইল,' বড়ভাইয়ের ভঙ্গিতে বলল রিড। 'মনের মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ নিয়ে এগোতে পারব না আমরা। এবার বলো, রানা, কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ তুমি এখানে?'

'সুফিয়ার এক নানী থাকে এখানে, আসলে ওর নিখোঁজ হওয়ার খবরটা জানাতে এসেছিলাম তাকে। খুবই ভালবাসে মহিলা সুফিয়াকে।' পরিহাস তরল কণ্ঠে কথাগুলো বলল রানা।

শক্ত হয়ে গেল রিড, সশব্দে চেয়ারটা পেছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল উইলকিনসন। এবার বোধহয় ফেটে পড়বে দু'জনেই, আশঙ্কা করল রানা। কিন্তু পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল রিড। উইলকিনসনের দিকে তাকিয়ে বসতে ইশারা করে শান্ত কণ্ঠে বলল, 'আমরা খুঁজে বের করব, রানা, চিন্তা কোরো না। যেমন করে লন্ডন থেকে তুমি কোথায় গেছ তা খুঁজে বের করেছি, ঠিক সেইভাবে।'

'এবং যথাসময়ে, তাই না?' বলল রানা।

'সম্ভবত না।'

'তাহলে, টর্চার করবে? তোমার বন্ধু বোধহয় পারবে আমার হাত-পা ভেঙে পেট থেকে কথা বার করতে। চেহারা দেখে তো প্রফেশন্যাল খুনীই মনে হয়!'

ভয়ানক রেগে গেল উইলকিনসন। এবারও আরেকটু হলেই লাফ দিয়ে উঠে ধরে ফেলেছিল রানাকে। রিডের দিকে তাকিয়ে সামলে নিল। বলল, 'ভেবো না যে পারব না।'

'কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ, রানা?' শান্ত ভাবে আবার জিজ্ঞেস করল রিড।

'দুঃখিত।'

'দেখো, রানা, তুমি খুবই বুদ্ধিমান বলে ধারণা আমার। নিশ্চয়ই জানো...?'

'হ্যাঁ, জানি, কি শাস্তি হতে পারে আমার তাই তো বলতে চাইছ? সরকারী কাজে বাধা সৃষ্টি, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তামূলক জরুরী ইনফর্মেশন চেপে রাখা—গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ সব। খুঁজলে আরও কিছু পেয়ে যাবে তোমরা। তবে কেয়ার করি না ওসব আমি।'

'জানি আমি।' ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রিড। 'আচ্ছা, এসো অন্য একটা দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে দেখি আমরা ব্যাপারটা। কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ তুমি সেটা ভুলে যাই আমরা, অন্য আর কি জানো তুমি সেটা দেখা যাক, ঠিক আছে? দেখা যাক আমরা আরেকটু কাছাকাছি আসতে পারি কিনা তাতে?'

'তারপর?'

'যেমন ধরো, তুমি গোদেনবার্গে মিস সুফিয়ার রুমে কিছু একটা সূত্র খুঁজে পেয়েছ। কি সেটা?'

'দুঃখিত, বলতে পারছি না সেটাও।'

'লন্ডনেও পেয়েছ আরও কিছু, যে কারণে এপর্যন্ত ছুটে এসেছ তুমি, সেটাই বা কি?'

'আবারও বলছি দুঃখিত।'

'সহজ সরল প্রশ্নগুলো, যে কারও মনে দেখা দিতে পারে এসব প্রশ্ন। সারারাত ধরে এরকম প্রশ্ন করে যেতে পারি আমরা, কিন্তু সব সময়ই যে এমন নির্বিরোধী থাকব এরকম ভেবো না।'

'অনুমান করতে পারছি।'

'সন্দেহ আছে আমার,' বলল উইলকিনসন।

'আমার সন্দেহ নেই,' বলল রানা। 'ভালই বুঝতে পারছি আমি। কিছুক্ষণ পরেই তোমার দাঁত আর নখ বেরিয়ে পড়বে, আসল রূপে মঞ্চে অবতীর্ণ হবে তুমি, তাই তো?'

ভীষণ চোখ করে তাকাল আবার উইলকিনসন। 'তোমাকে কিভাবে শায়েস্তা করতে হবে তা ভাল করেই জানি আমি।'

'নিশ্চয়ই! তা না জানলে তোমাকে পাঠিয়েছে কেন, ঘাস খেতে?' একটু বিরতি নিয়ে আবার বলল রানা, 'একজন ভাল মানুষ, খুব ভাল ভাল কথা বলে, অন্যজন ঠিক তার বিপরীত, এরকম দুজনকেই জোড় মিলিয়ে পাঠানো হয় সাধারণত, সেটা জানি আমি। টেলিভিশনের সিরিজগুলোতে প্রায়ই দেখা যায় এরকম। মানিকজোড়। একজন ধমাধম ঘুষি মেরে বসে তলপেটে, কখনও সিগারেটের আগুন ঠেসে ধরে

গায়ে; অন্যজন তখন নরম সুরে, আদর করে কথা বলে, আমি তোমার দলে আছি, তোমার যাতে কোন ক্ষতি না হয় সে চেষ্টা করব, ইত্যাদি ইত্যাদি।'

সূক্ষ্ম হাসি হাসল একটু রিড। 'তাতেও মাঝেমধ্যে কাজ দেয়, বিশ্বাস করো। কিন্তু সেরকম কিছু দরকার পড়বে না এখানে, রানা। শোনো, শেষ পর্যন্ত আমরা মেয়েটার রুমের কাগজপত্রগুলো হাতে পেয়েছি। সুইডিশ পুলিস যদিও পছন্দ করেনি ব্যাপারটা, তবু আমরা পেয়েছি সেগুলো। উচ্চ পর্যায়ের কথাবার্তা আর কি-সে কারণে সময়ও লেগেছে জিনিসগুলো হাতে পেতে। সবগুলো কাগজপত্রই চেক করছি আমরা, কিছু পাওয়া যায়নি ওগুলোর ভেতর। একেবারে কিছুই না। কিন্তু তোমার জন্যে নিশ্চয়ই কিছু ছিল ওগুলোতে, ঠিক?'

কোন জবাব দিল না রানা।

'গোদেনবার্গে তোমার উপস্থিতি আশা করেছিলাম আমরা, কারণ, মেয়েটাকে চেনো তুমি ভালমত। তোমার সুপারিশেই নাকি ওর চাকরি হয়েছিল দা নিউজ-এ।'

'তোমরা আমার উপস্থিতি আশা করেছিলে?' সত্যি সত্যিই আশ্চর্য হলো রানা। 'তাহলে দা নিউজ-এর পক্ষ থেকে কাউকে পাঠাতে বারণ করা হয়েছিল কেন?'

'হ্যাঁ, আমরা তোমার উপস্থিতি আশা করেছিলাম এবং সে কারণেই অন্য কাউকে ওখানে পাঠানোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। আমরা জানতাম নিষেধাজ্ঞা থাক আর না থাক তুমি যাবেই, তাই অন্য কাউকে পাঠিয়ে তোমার যাওয়াটা বন্ধ হোক তা চাইনি আমরা।'

কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল রানা রিডের দিকে। 'কিন্তু কিভাবে সম্ভব সেটা? ঘটনাক্রমেই আমি শেষ পর্যন্ত উপস্থিত হয়েছিলাম ওখানে।'

'না, বন্ধু-তা নয়। ভেগাসে ছিলে তুমি। তাই না?' বলল রিড। 'প্লেনে তুমি বলছিলে সে কথা। আমি আগেই জানতাম। মিস আশরাফ নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে এবং পুলিস কোন কিনারা করতে পারছে না, পারবে বলে মনেও হচ্ছে না। আর তোমার উপস্থিতিতে কোন সূত্র পাওয়াও যেতে পারে এই পরিস্থিতিতে তুমি ভেগাসে বসে থাকো এটা চাইনি আমরা। তোমার উপস্থিতিতে কিছু না কিছু সূত্র পাওয়া যাবে হয়তো, এই আশায় তোমাকে ভেগাস থেকে ভাগানোর ব্যবস্থা করি আমরা।' সূক্ষ্ম একটা আত্মপ্রসাদের সুর শোনা গেল তার কণ্ঠে।

এতক্ষণে বুঝতে শুরু করেছে রানা। 'শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি? লেকের মধ্যে ক্রুজার আর রাইফেলধারীদের তাড়া?'

মাথা ঝাঁকাল রিড। 'এই তো বুঝতে পারছ।'

'তোমরা...,' বলতে গেল রানা।

বাধা দিয়ে বলল রিড, 'দেখো, রানা, তুমি ভেগাস ছাড়ো এটাই চাইছিলাম আমরা। কিন্তু নিছক গলা ধাক্কা দিয়ে তো আর বের করে দেয়া যায় না তোমাকে। প্রথম শ্রেণীর একটা দৈনিকের প্রথম শ্রেণীর একজন রিপোর্টার তুমি। তোমাকে ওভাবে বের করে দেয়াটা সহজ ছিল না আমাদের পক্ষে। সারা দুনিয়ার সাংবাদিক মহলে হৈ চৈ পড়ে যেত তাহলে। সুতরাং ওভাবে ছাড়া আর কোন পথ ছিল না আমাদের।'

'আরেকটু হলেই তো ওরা খুন করছিল আমাকে।'

'না, করছিল না। রাইফেল হাতে চার পাঁচজন লোক একটার পর একটা গুলি করে চলেছে কিন্তু লাগছে না একটাও, একটু খতিয়ে দেখলেই বুঝতে পারার কথা, তাই না?'

'আমি তো ব্যাপারটার শেষ দেখে ছাড়বার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম। খালি জহির ভাইয়ের জরুরী মেসেজ পেয়েই চলে আসতে হলো। এসে শুনলাম সুফিয়া নিখোঁজ।'

'ওই তাড়া খাওয়ার পরও যদি তুমি ভেগাসে রয়ে যেতে, স্বীকার করছি, তাহলে গলাধাক্কা দেয়া অথবা অফিশিয়ালি তোমাকে সাহায্য করতে অনুরোধ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকত না আমাদের।

'অফিশিয়ালি রিকোয়েস্ট না করে ওরকম ভয়ানক ব্যবহার করেছিলে শুধু এই অপরাধেই তো কোন কথা প্রকাশ করা উচিত নয় আমার।' ভয়ানক স্মৃতিটা ঘুরে বেড়াচ্ছে ওর মনের ভেতর দিয়ে। ভ্যালি অভ ফায়ারের প্রচণ্ড গরম, মরুপ্রায় পাহাড়ী এলাকায় প্রাণভয়ে ছুটছে ও। পেছনে তাড়া করে আসছে চার পাঁচজন লোক, প্রত্যেকের হাতে রাইফেল, গুলি করছে, কল্পনা করেই শিউরে উঠল রানা।

'মিস সুফিয়াকে খুঁজে পেতে চাইছিলাম আমরা,' বলল রিড।

'আচ্ছা!' ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল ওর কণ্ঠে। 'আমাকে বিশ্বাস করতে বলো এই কথা?'

'সত্যিই বলছি...'

'ওকে নয়, কোন্ বাস্টার্ড কি চাপিয়ে দিয়েছে ওর ঘাড়ে, সেটাই চাও তোমরা।'

হতাশ ভঙ্গিতে চুপচাপ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল রিড রানার দিকে। তারপর বলল, 'সোভিয়েটদের সম্পর্কে হাফ ডজনেরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এই মুহূর্তে প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা আমাদের দরকার। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, এবং উত্তরগুলো এক্ষুণি জানা দরকার, বুঝেছ, রানা? বিশ্ব শান্তির ব্যাপারে একগাদা ফিরিস্তি দিতে যাচ্ছি না তোমাকে, কিন্তু সত্যি সত্যিই বিশ্ব শান্তির চাবিটা রয়েছে প্রশ্নগুলোর উত্তরে। সুতরাং বুঝতেই পারছ, উত্তরগুলো জরুরী ভিত্তিতে জানা দরকার আমাদের। উত্তরগুলো জানতে পারলে তোমাকে সাহায্য করাও সহজ হবে আমাদের পক্ষে। একটা নিষ্পাপ মেয়ের অকারণ মৃত্যু আমরা কেউই চাই না।'

'তোমরা কি চাও ভাল করেই জানা আছে আমার!' বাঁকা হাসি হাসল রানা। 'সুফিয়া মারা পড়লে একটু চুকচুক করবে কেবল।'

একমুহূর্ত ইতস্তত করল রিড। 'ঠিক। মারা পড়লে ব্যাপারটা দুঃখজনকই হবে। কিন্তু আমি তো বলছি, সম্ভব হলে যথাসাধ্য সাহায্য করব আমরা তোমাকে। এছাড়া আর কোন বিকল্প পথ জানা আছে তোমার? তুমি আমাদের হাতের মুঠোয়। অসহায় তুমি। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে না পারছি আমরা ততক্ষণ লক-আপে রাখা হবে তোমাকে। বুঝতে পারছ? কিছুই করার নেই তোমার।'

বুঝতে পারছে রানা, ভাল ভাবেই বুঝতে পারছে। রিড যে কথাগুলো বলেছে, প্রত্যেকটাই সত্যি। পথের শেষ প্রান্তে এসে ছোট্ট একটা বাক্সে আটকা পড়ে গেছে

ও। এই বাক্স থেকে বের হওয়াটা সহজ হবে না। বাইরের কারও কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার কোন আশাও নেই। হেন্ডারসনের কাছে পৌঁছুনোর কোন উপায় আপাতত নেই। চিন্তিতভাবে একটু মাথা নাড়ল ও।

'আমাদের সাহায্য করো,' বলল রিড, 'আমরা তোমাকে সাহায্য করব। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আমি।'

'ওরকম বহু প্রতিশ্রুতিই আমি পেয়েছি জীবনে।'

বিজয়ীর ভাব রিডের ভেতরে। সন্তুষ্টির ভঙ্গিতে একটু মাথা নাড়ল সে। কোমলস্বরে বলল, 'প্রতিশ্রুতিটা খুব জোরাল হচ্ছে না, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কি করবে বলো, কোন উপায় নেই তোমার হাতে। আজকের দুনিয়াটাই এরকম, বুঝলে, ক্ষমতা আর শক্তি যার করায়ত্ত, সে-ই চুক্তির শর্ত নির্ধারণের মালিক। প্রতিপক্ষের সেই শর্ত মেনে না নিয়ে উপায় নেই।' শেষের দিকে একটু দার্শনিক দার্শনিক হয়ে উঠল রিডের গলা।

'ধরো তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দিলাম তারপরেও নিশ্চয়ই লক্-আপ এড়াতে পারব না আমি?'

'সেটা এখুনি বলা যাচ্ছে না। তোমার উত্তরে আমাদের সন্তুষ্ট হওয়ার ব্যাপার আছে। তাছাড়া যে-কোন মুহূর্তে খুঁটিনাটি বিষয় জানার জন্যে তোমার প্রয়োজন হতে পারে, সুতরাং বুঝতেই পারছ। এখন বলো, কি কি জানতে পেরেছ তুমি?'

'খুবই সামান্য,' জবাব দিল রানা।

আবার হতাশ হয়ে পড়ছে রিড। 'বুঝতে পারছি, সামনে খুব কঠিন রাত।'

'এই উজবুকটার সঙ্গে অত কোমল ভাবে চলবে না, বুঝলে?' বলে উঠল উইলকিনসন।

'চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি,' দরাজ গলায় বলল রিড। 'কোমলভাবে চললে কঠিন হওয়ার দরকার কি? তাহলে, রানা, মেয়েটার রুমে কি জানতে পেরেছ তুমি?'

'কিছুই না।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রিড। 'ওহ খোদা! আমি ভেবেছিলাম...'

'আমি বলছি কেন এসেছি এখানে,' ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল রানা। 'সুফিয়ার এক বন্ধু আছে এখানে। তাকে খুঁজতে এসেছি।'

'কে?'

'এখনও জানতে পারিনি,' বলল রানা। 'লন্ডনে জানতে পেরেছিলাম, স্কটল্যান্ডে ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু আছে ওর।'

'বুঝলাম, কিন্তু ওর এক বন্ধু আছে এটুকু শুনেই এ পর্যন্ত উড়ে চলে এসেছ এটা কোন পাগলেও বিশ্বাস করবে না।'

'খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু।' রিডের কথায় বিচলিত না হয়ে বলে যেতে লাগল রানা, 'ও হোটেল থেকে কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে বেরিয়েছিল, মনে আছে? তোমাদের মত আমারও ধারণা ওই সময়েই ও জিনিসটা কোথাও চালান করে দেয়। আমার মনে হয় হোটেলের লেটার বক্সে আগুন লাগায় ভয় পেয়ে যায় ও, এবং অন্য কোথাও থেকে পোস্ট করে জিনিসটা।'

'হেন্ডারসন জার্লশফ, স্যান্ডনেস, নরওয়ে, এই লোকটা কে?' গোঁয়ারের মত জানতে চাইল উইলকিনসন। বুনো শুয়োরের ঘোঁৎ ঘোঁতানির সঙ্গে আবার সাদৃশ্য খুঁজে পেল রানা।

'কে জানে!' নিরাসক্ত ভঙ্গিতে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে জবাব দিল ও। 'ব্রাউন, স্মিথস্ট্রীট, কার্ডিফ, ওয়েলস্–লোকটা কে? তোমাদেরকে ভুল পথে চালিত করার জন্যেই ফোনটা করেছিলাম আমি।'

জার্লশফ, স্যান্ডনেস, নরওয়ে ছাড়াও আরেকটা জার্লশফ, আরেকটা স্যান্ডনেস যে আছে সেটা এখনও ওরা আবিষ্কার করতে পারেনি ভেবে স্বস্তি পেল রানা। লারউইকের পুলিস স্টেশনে বসে থেকেও ওরা ব্যাপারটা জানতে পারেনি দেখে একটু আশ্চর্য না হয়ে পারল না ও। আসলে এরকমই হয়: ওদের মাথার ভেতরে এখন মস্কো, গোদেনবার্গ আর নরওয়ে ঘুরছে, তাই ঘরের ভেতরের জিনিসটাই চোখে পড়ছে না। শব্দ দুটোর একটাও যদি স্থানীয় কোন পুলিসের সামনে উচ্চারণ করত ওরা···কিন্তু গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে না!

দাঁত বের করে একটু হাসল উইলকিনসন। 'ব্যাপারটা তোমার জন্যে একটু দুঃখজনক হলেও, অত্যন্ত সহজে ফলো করা গেছে তোমাকে। এলস্ট্রি থেকে করেছিলে না কলটা? প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুলিসের ডিটেক্টর ভ্যান তোমাদের ফলো করতে শুরু করে। তারপর প্লেনে পুরোটা পথ রাডারে তোমাদের ছবি দেখতে দেখতে এলাম। আহা, বেচারা অ্যামেচাররা!'

'আমরা কি সিরিয়াস কোন বিষয়ে আলাপ করছি?' রিডের দিকে ফিরে বলল রানা।

'তাই তো মনে হয়,' প্রশ্নটা শুনে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে যেন রিড।

'তাহলে তোমার পোষা কুত্তাটা এত ঘেউ ঘেউ করছে কেন?'

সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল উইলকিনসন। আগুন ঝরে পড়ছে দু'চোখ দিয়ে। রিড ব্যস্তভাবে থামাল ওকে। তারপর শান্তভাবে বলল, 'হ্যাঁ, কি বলছিলে যেন, রানা?'

'এখানে, শেটল্যান্ডে সুফিয়ার ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু থাকে এবং সম্ভবত সেই বন্ধুর ঠিকানায় কিছু একটা পোস্ট করেছে ও; এরচেয়ে বেশি আমিই জানি না সুতরাং তোমাদের পক্ষেও জানা সম্ভব নয়। ও জানত, এখানে কেউ খুঁজবে না। আমার পিছু পিছু না এলে এবং আমি না বললে তোমাদের পক্ষেও জানা তো দূরের কথা, ধারণা করাও সম্ভব ছিল না। আসলে ঠিক ঠিক বলতে গেলে তোমরা কেন, পৃথিবীর কারও পক্ষেই জানা সম্ভব ছিল না। ঠিক কিনা?'

'তোমার কথা বিশ্বাস করার কোন কারণ দেখছি না, রানা,' তিক্তকণ্ঠে বলল রিড।

একটু শ্রাগ করল রানা। 'সেটা তোমার ব্যাপার, তুমি বিশ্বাস করো বা না করো তাতে কিছু এসে যায় না আমার। একটু আগেই তুমি বলছিলে না, তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়া ছাড়া আমার সামনে আর কোন পথ নেই। ভেবে দেখো, তোমাদেরও নেই। আমি উত্তরে যা বলব তাই বিশ্বাস করতে হবে তোমাদের। থাক, বাদ দাও

ওসব কথা, আরেকটা জিনিস আছে আমার কাছে।'

'কি?'

পকেট থেকে ফটোকপির বান্ডিলটা বের করল রানা। ভাঁজ খুলে টেবিলের উপর রাখল সেগুলো।

'এই জন্যেই তো গোদেনবার্গ থেকে আসা কাগজপত্রগুলোয় পাওয়া যায়নি কিছু, তুমি নিয়ে এসেছিলে এগুলো!' কিছু একটা আবিষ্কার করার আনন্দে উদ্ভাসিত উইলকিনসনের চেহারা।

মাথা নাড়ল রানা। 'না, এগুলো সুফিয়ার রুমে ছিল না।'

'তাহলে ওর ডেস্কে?'

'কোনটাই না, যা জানো না তা নিয়ে কথা বলাটা তোমার একটা অভ্যাস বোধহয়,' ভ্রূকুটি করে বলল রানা। 'রিড, তুমি হফম্যানের অফিসে এগুলো দেখেছিলে সকালে?'

'হ্যাঁ, তখন তো বলছিলে কিছু নেই ওগুলোতে।'

বান্ডিলটা থেকে একটা বিশেষ ফটোকপি বেছে বের করল রানা। হাত দিয়ে ঘষে ঘষে ভাঁজগুলো সমান করতে করতে উইলকিনসনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে করেছিলাম কপিগুলো।'

এমনিতেও ভাল হয়নি কপিগুলো। স্ট্রম ব্রাদার্সের কপিয়ার মেশিনটা খারাপ বোধহয়। কালো রঙের জেরোক্স কালিতে জাবড়ে গেছে একেবারে। তাছাড়া সবগুলো কপি এক সঙ্গে ভাঁজ করে কোটের পকেটে রাখায় আরও দুরবস্থা হয়েছে এগুলোর। কপিটা ভাল করে দেখার জন্যে চেয়ার ছেড়ে উঠে রানার পাশে এসে দাঁড়াল রিড। লে-আউটটার উপর ব্লক লেটারে স্কেচ করা রয়েছে 'রাশিয়ান লাইফ' শিরোনাম।

'ফ্রন্ট কভার, তাই না?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা।

'কে এঁকেছে?'

'জানি না, তবে সুফিয়া নয় এটা নিশ্চিত।'

পাশ থেকে চকিতে একবার তাকাল রিড ওর দিকে, 'কিভাবে বুঝলে?'

'অন্যগুলোর সাথে এটার পার্থক্য দেখে। পাকা হাতের কাজ এটা, অন্যগুলো ওর নিজের হাতে করা। ওর হাতের লেখা চিনি আমি। এটা কোন আর্টিস্টকে দিয়ে করানো।'

'তাহলে?'

'তাহলে প্রশ্ন হলো, কে আঁকল এটা এবং কোথায়ই বা সুফিয়া পেল এটা? সুইডেনে ওর হাতের কাছে কোন আর্টিস্ট ছিল না, মস্কোতেও ওর হয়ে কাজ করার জন্যে কোন আর্টিস্ট থাকার কথা নয়। তাহলে ওটা ওর কাছে এল কি করে? হয় অন্যান্য মেটেরিয়ালের সঙ্গে এটাও ও নাম্বার ওয়ান স্টেট পাবলিশিং হাউস থেকে সংগ্রহ করেছিল অথবা এটার সম্পর্কে কিছুই জানত না ও। পরের সন্দেহটাই সত্যি

বলে মনে হয় আমার। অর্থাৎ সম্ভবত এটা দ্বিতীয় একটা জিনিস যেটা অন্য কেউ ওর জিনিস-পত্রের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছে।'

'হুম্‌ম্‌!' মনোযোগ দিয়ে দেখছে রিড ডিজাইনটা, চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেছে। 'ওই ফ্ল্যাগগুলো··· কি মনে হয় তোমার? কি বোঝাচ্ছে ওগুলো?'

'এটা একটা লে-আউট গিমিক। একটু ভাবতে হবে আমাকে, আগেও দেখেছি এটা ভাল করে, কিন্তু···' চুপচাপ কিছুক্ষণ ভাবল রানা, তারপর রিডের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, 'দেখতে পাচ্ছ, ফ্ল্যাগগুলোর আউটলাইন আঁকা হয়েছে শুধু। আমার ধারণা, প্রতিটা ফ্ল্যাগের ভেতরে একটা করে ছবি সেঁটে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে আর্টিস্ট। আইডিয়াটা একটু অভিনব হলেও মৌলিক কিছু নয়। একটু সেকেলে ধরনেরই বলা চলে। এটা পছন্দ হওয়ার কথা নয় সুফিয়ার। তাহলে কেন অন্য একজন আর্টিস্টকে দিয়ে রাশিয়া থেকে করিয়ে আনবে এটা?'

চুপচাপ অনেকক্ষণ ধরে দেখল রিড ফটোকপিটা। সে-ও হাত বুলিয়ে কয়েকবার সমান করার চেষ্টা করল ভাঁজগুলো। তারপর চিন্তিত স্বরে বলল, 'সম্ভবত কিছু আছে এটার ভেতর, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, কি। সাধারণ একটা লে-আউটের মতই তো দেখা যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, আর একটু ভাল করে তাকাও তো। কপিটা খুবই বাজে, লাইনগুলো ঝাপসা ভাবে উঠেছে। কিন্তু ফ্ল্যাগগুলো ইউরোপিয়ান রাশিয়ার একটা ম্যাপের ওপর কল্পনা করো তো।'

আবার কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল রিড। 'হ্যাঁ, এখন বুঝতে পারছি।' উত্তেজনার আভাস পেল রানা তার কণ্ঠস্বরে। 'ফ্ল্যাগগুলো কি বোঝাচ্ছে, সে সম্পর্কে কোন ধারণা আছে তোমার?'

'না।'

একটু ঝিমিয়ে পড়ল যেন রিডের উত্তেজনা। 'ও যদি ফ্ল্যাগগুলোর মধ্যে ছবি সাঁটার পরিকল্পনা করে থাকে তো কি ছবি হতে পারে সেগুলো?'

'আগেই তো বলেছি, লে-আউটটা সুফিয়ার করা নয়, সুতরাং পরিকল্পনাটাও ওর নয়। ফ্ল্যাগগুলো রাশিয়ার বড় বড় শহরকে নির্দেশ করছে হয়তো। কিন্তু জিনিসটা নিখুঁতভাবে করা হয়নি, ফ্রি হ্যান্ড ড্রয়িং···' বলতে বলতে রানা খেয়াল করল জিনিসটা। আগে যে ক'বার দেখেছে একবারও চোখে পড়েনি। রিডের দিকে তাকিয়ে বলল, এবার ওর গলায়ও একটু উত্তেজনার ছোঁয়া, 'এই দাগগুলোর দিকে দেখো, এই ফ্ল্যাগস্টিকগুলো। পেন্সিলের লাইনগুলো স্পষ্ট না এখানে? আঁচড়গুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং স্পষ্ট, বেশ সময় নিয়ে করা তাই না?' কাগজটা তুলে নিয়ে আলোর সামনে মেলে ধরল ও। 'দেখো, প্রতিটা আঁচড়ের শুরুগুলো দেখো! কেমন পরিষ্কার, স্কেল ধরে করা। অন্য দাগগুলো অস্পষ্ট আর মোটা আঁচড়ে, কিন্তু এই কটা নয়। যে-ই এঁকে থাকুক এটা, এই ফ্ল্যাগস্টিকগুলো আঁকার সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করেছে। সবগুলো আঁচড়ই শেষে এক জায়গায় এসে মিলিত হয়েছে আর সেই পয়েন্টটাকে নিখুঁতভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। উপরের দিকের লাইনগুলো দেখো, আবার ফ্রি হ্যান্ডে করা হয়েছে ওগুলো। কোন আর্টিস্টই খসড়ায় এতখানি

পরিশ্রম করবে না।'

উইলকিনসনের দিকে তাকাল রিড। 'দৌড়াও! রাশিয়ার ম্যাপ নিয়ে এসো একটা জলদি। যে কোন ধরনের ম্যাপ, অ্যাটলাস হলেও চলবে।'

বিব্রত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল উইলকিনসন। 'প্রায় মাঝরাত এখন, এত রাতে কোথায়...?'

'জানি না কোথায় পাবে,' ঝামটে উঠল রিড। 'তোমার দেশে আছি আমরা, তুমিই জোগাড় করবে। তাড়াতাড়ি যাও।' বসে রইল রানা আর রিড। প্রায় দশমিনিট পর নক হলো দরজায়। রিড উঠে গিয়ে খুলল দরজা। নীল রঙের একটা স্কুল অ্যাটলাস হাতে স্টেশন সার্জেন্ট ঢুকল রুমে। 'এটায় হবে, স্যার?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ হবে,' তাড়াতাড়ি অ্যাটলাসটা নিতে নিতে বলল রিড। 'ধন্যবাদ তোমাকে, সার্জেন্ট।'

'একটা কথা, স্যার, অ্যাটলাসটা আমার ছেলের। বাসায় যেতে হয়েছিল আমাকে এটা আনতে। কাল সকালে এটা ছাড়া স্কুলে যেতে পারবে না ছেলেটা।'

'ঠিক আছে, সার্জেন্ট, ঠিক আছে,' বিস্মিত এক টুকরো হাসি রিডের ঠোঁটে, 'কাল সকালের আগেই তোমার ছেলে ফেরত পাবে এটা। মিস্টার উইলকিনসন কোথায়?'

'নিচে, স্যার, এক্ষুণি চলে আসবেন বোধহয়।'

অ্যাটলাসটার করুণ অবস্থা দেখে হাসি পেল রানার। সার্জেন্টের ছেলে বোধহয় বিদ্যাশিক্ষার চেয়ে অন্য কাজেই বেশি ব্যবহার করে জিনিসটা। দ্রুত অ্যাটলাসের পৃষ্ঠা উল্টে যেতে লাগল রিড।

'এই যে পেয়েছি, ইউরোপিয়ান রাশিয়া।' ফটো কপিটা উঠিয়ে ম্যাপের উপর রাখল সে। এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে দাঁত বের করে হাসল একটু, 'যা ভেবেছিলাম, দুটোর স্কেল আলাদা।'

'আমার মনে হয় এটা দিয়েই কাজ চলবে,' বলল রানা। 'ডেস্ক ল্যাম্পটা আনো তো এখানে।'

অ্যাটলাসের ইউরোপিয়ান রাশিয়ার পৃষ্ঠাটা একদিকে রেখে বাকি পৃষ্ঠাগুলো অন্যদিকে মুড়ে আলোর বিপরীতে ধরতে বলল রিডকে। ফটোকপিটা তুলে নিল নিজে। কাগজটা মোটা ধরনের, তবে কাজ হবে বোধহয়। মেলে ধরল ও সেটা ম্যাপের সামনে। সামনে পেছনে করে মেলাল অ্যাটলাসের ম্যাপে নির্দেশিত বাউন্ডারি লাইনের সঙ্গে ফটোকপির ম্যাপের বাউন্ডারি লাইনটা।

মোটামুটি নিখুঁত ফটোকপির ম্যাপটা। ইউরোপিয়ান রাশিয়ার পূর্ব সীমান্ত, বোথানিয়া উপসাগর, শ্বেতসাগর, কৃষ্ণসাগর, প্রায় মিলে গেল দাগে দাগে। এবার সীমানাগুলো যাতে নড়ে না যায় সেজন্যে স্থির হাতে ফটোকপিটা ধরে ফ্ল্যাগস্টিকের মাথাগুলো কোথায় শেষ হয়েছে তা দেখতে চেষ্টা করল রানা। কয়েক মিনিট লাগল সবগুলো জায়গা খুঁজে পেতে। একটা একটা শহর সনাক্ত করে রানা, উচ্চারণ করে নামটা, রিড অ্যাটলাসের উপর শহরগুলোতে কলম দিয়ে একটা করে চিহ্ন দেয়। এইভাবে একে একে ফ্ল্যাগ দিয়ে নির্দেশ করা সবগুলো শহরই সনাক্ত করল ওরা।

ফটোকপিটা নামিয়ে রাখল রানা। জানা হয়ে গেছে নামগুলো। রিডকে বলল সবগুলো নাম আবার পড়তে। একে একে পড়ে গেল রিড, 'মস্কো, ওরেল, সুমি, ক্রেসেনবাগ, গরলভ্কা, জাপোরোঝেই, পারভোমাইস্ক, ভিনিৎসা।'

'এবার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ধুত্তোরি ছাই, ছোট ছোট জায়গা সবগুলো। অনেকগুলোর তো নামই শুনিনি,' বলে উঠল রিড। হতাশ হয়ে পড়ছে ও।

'তার মানে কোন কাজে লাগছে না জিনিসটা তোমার?'

ভুরু কুঁচকে আবার পড়ে চলেছে রিড। নামগুলোর ভেতর থেকে কোন সূত্র বেরিয়ে আসে কিনা দেখছে। "মস্কো। হ্যাঁ, মস্কো", আপন মনে বলল সে। 'অনেক কিছুই ঘটতে পারে সেখানে এবং ঘটছেও। কিন্তু, অন্যগুলো? আরও ভাল ভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার ব্যাপারটা, কিছু একটা নিশ্চয়ই লুকিয়ে আছে নামগুলোর ভেতরে। কিন্তু অনেক সময় লাগবে যে তাতে!'

'এমনও হতে পারে, নিছক একটা খসড়া লে-আউটই এটা, অন্য কিছু নয়,' বলল রানা।

'হতে পারে,' বলল রিড। গলার স্বরেই বোঝা গেল মানতে পারছে না সে ব্যাপারটা। রানাও ঠিক মেনে নিতে পারছে না। বার বার মনে হচ্ছে, কিছু একটা আছে নামগুলোর ভেতর। কিন্তু কি?

'মিসাইল সাইট হতে পারে,' মন্তব্য করল রানা।

'উঁহুঁ, না। মিসাইল সাইটগুলোর নাম জানা আছে আমাদের।' আবার শব্দ করে পড়তে লাগল রিড নামগুলো। একটু বিরতি নিয়ে নিয়ে প্রতিটা নামের ওপরই জোর দিয়ে দিয়ে উচ্চারণ করছে ও, হঠাৎ করেই যদি কোন পয়েন্ট মনে এসে যায়। অ্যাটলাসের টাইপগুলো ছোট ছোট, ছোট জায়গাগুলোর নাম আরও ছোট হরফে ছাপা। ঝুঁকে পড়ল সে ম্যাপটার ওপর।

হঠাৎ করেই মনে হলো রানার, এখন তো আক্রমণ করা যায় লোকটাকে। সোজা হয়ে দাঁড়াল ও। রাশিয়ান নামগুলো অনেক কষ্ট করে উচ্চারণ করে চলেছে রিড। '...গরলভ্কা, জাপোরোঝেই, উঁহুঁ, রানা, চেষ্টা করে লাভ হবে না। তৈরি আছি আমি। চুপ করে বসে থাকো।'

'কিছুই চেষ্টা করছি না আমি। বুঝতে পারলে কিছু?'

'না,' সোজা হলো রিড। 'কিছুই না।' লে-আউট এবং অ্যাটলাসটা রানার দিকে ঠেলে দিল সে।

হাত বাড়িয়ে টেনে নিতে গেল রানা সেগুলো। হঠাৎ করেই চোখে পড়ল জিনিসটা। হয়তো ম্যাপটা ওর চোখ থেকে তিন চার ফুট মত দূরে রয়েছে বলেই খেয়াল করল ও। তাড়াতাড়ি কাছে টেনে নিল অ্যাটলাসটা। 'কলমটা দেখি, রিড, জলদি!'

'কি ব্যাপার, কোন চালাকি নয় তো?'

'আহ্, কলমটা দাও। চালাকি করলে অনেক আগেই করতে পারতাম!' ধমক দিল রানা।

একটু আশ্চর্য হয়ে কলমটা বাড়িয়ে দিল রিড।

'হ্যাঁ, এবার ওই বইটা দাও।'

বিনা বাক্যব্যয়ে আদেশ পালন করল রিড।

বইয়ের সমান ধারটাকে রুলার হিসেবে ব্যবহার করে কয়েকটা সরল রেখা টানল রানা। মস্কো থেকে ওরেল, সুমি এবং ক্রেসেনবাগ পর্যন্ত একটা; গরলভ্কার সঙ্গে জাপোরোঝেইকে জুড়ে দিয়ে একটা; শেষে, ভিনিৎসা এবং পার্ভোমাইস্ককে জুড়ে আরেকটা। সবশেষে তিনটে লাইনকেই অনেক দূর পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতেই লাইন তিনটে এসে মিলিত হলো একটা বিন্দুতে।

সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা। নিরাসক্ত মুখ করে এতক্ষণ দেখছিল রিড ওর কাজ। এবার এগিয়ে এল কাছে। টেবিলের উপর থেকে অ্যাটলাসটা নিয়ে দেখতে লাগল। কয়েক সেকেন্ড পরেই প্রায় আর্তচিৎকার করে উঠল, 'হায় যীশু, মোটেই সরল নয় তো ব্যাপারটা!'

তিনটে সরলরেখা এক বিন্দুতে মিলে একটা তীর চিহ্ন তৈরি করেছে। ব্ল্যাকসি'র কাছাকাছি একটা জায়গায় এসে মিলছে রেখা তিনটে। আবার চোখের কাছে নিয়ে খুদি খুদি অক্ষরে ছাপা নামটা পড়তে গেল রিড। ওর কষ্ট বাঁচিয়ে দিল রানা। 'নিকোলায়েভ,' বলল ও। 'নিকোলায়েভ শব্দটার কোন অর্থ আছে তোমার কাছে?'

'নিকোলায়েভ!' আপন মনে উচ্চারণ করল রিড, যেন শুনতেই পায়নি রানার কথা। এখনও চোখের সামনে মেলে রেখেছে অ্যাটলাসটা। 'সত্যিই, নিকোলায়েভ!'

চার

স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল রিড। তাকিয়ে আছে ম্যাপটার দিকে। ভিনগ্রহের কোন অত্যাশ্চর্য অজ্ঞাত বস্তু দেখছে যেন। ধীরে ধীরে বিস্ময়ের ভাবটা চলে গেল ওর মুখ থেকে, সেখানে এসে বাসা বাঁধল উদ্বেগ। ঝট করে ফিরল রানার দিকে।

'শোনো, রানা, ভাল করে শোনো,' বলল সে। 'প্রায়োরিটি চেনো, প্রায়োরিটি? এটাও একটা প্রায়োরিটি কেস। গ্রেড এ, ক্লাস ওয়ান, বুঝেছ? এবার ঝটপট যা জানো বলে ফেলো। অনেক সময় এর ভেতরেই নষ্ট করে ফেলেছি আমরা। ভয়ানক জরুরী ব্যাপার এটা। আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করা চলবে না।'

'বুঝলাম,' কর্কশ হয়ে উঠল রানার গলা। 'এবার একটু শান্ত হয়ে খুলে বলো দেখি ব্যাপারটা কি?'

এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল রিড ওর দিকে। তারপর বলল, 'সত্যি সত্যিই বলছি, রানা, পুরো সহযোগিতা করতে হবে তোমাকে। হ্যাঁ, পুরো...নয়তো...' থেমে গেল রিড। অনেক শান্ত শোনাল এবার ওর গলা, তবে উত্তেজনায় এখনও কাঁপছে একটু

একটু। 'প্রতিটা ইনফর্মেশন চাই আমি। খুঁটিনাটি সব, এবং এই মুহূর্তে। নষ্ট করার মত একটুও সময় নেই হাতে।'

'সহযোগিতা করছি আমি। যেটুকু জানতে পেরেছ সেটুকু কে জানিয়েছে তোমাকে?'

উত্তেজনায় এখনও টগবগ করে ফুটছে রিড। কয়েক সেকেন্ড শক্ত করে চোখ বন্ধ করে থেকে উত্তেজনা সামলানোর চেষ্টা করল সে।

'নিকোলায়েভের ব্যাপারটা কি শুনি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ঠিক আছে, বলছি শোনো। ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারবে তাহলে তুমি। আশাকরি তারপর হারামীপনা একটু কম করবে।'

'তোমার গোপন কথাটা আগে শুনেই দেখি, তারপর হারামীপনার মাত্রা নির্ধারণ করা যাবে,' হাসতে হাসতে বলল রানা। রিড এখন বোধহয় স্বাভাবিক অবস্থায় নেই, থাকলে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠত। খেয়ালই করল না ও রানার কথা।

'নিকোলায়েভ হচ্ছে একটা শিপ বিল্ডিং টাউন! ঠিক?' শুরু করল রিড।

'জানি না,' বলল রানা।

'না জানলেও ক্ষতি নেই, শুধু এটুকু জেনে রাখো, কথাটা সত্য। রাশানরা যুদ্ধ জাহাজ তৈরি করে ওখানে। সব ধরনের যুদ্ধ জাহাজ। ক্রুজার থেকে শুরু করে নিউক্লিয়ার সাবমেরিন পর্যন্ত, সব। বেশ কয়েক বছর ধরেই গোয়েন্দা উপগ্রহের মাধ্যমে আমরা নজর রাখছি ওর ওপর।'

'আচ্ছা!' বিস্মিত হলো রানা। বিস্ময়টা আসল না কৃত্রিম বোঝা গেল না ঠিক।

'কিন্তু বছর খানেক আগে একটা কন্সট্রাকশন ইয়ার্ডের ওপর ছাদ দিয়ে দিয়েছে ওরা। পুরো ইয়ার্ডটাই এখন ছাদের নিচে আড়াল হয়ে গেছে। আমাদের ধারণা, নতুন কিছু একটা বানাচ্ছে ওরা সেটার নিচে।'

'ওয়ার্কারদের রোদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যও তো ছাদ দিতে পারে ওরা,' ফাজলেমির লোভটা চেষ্টা করেও সামলাতে পারল না রানা।

'কি?' ভয়ানক হয়ে উঠল রিডের চেহারা। 'মিলিয়ন মিলিয়ন রুবল খরচ করে ওরা রোদের হাত থেকে বাঁচাবে ওয়ার্কারদের, মাথা খারাপ হয়েছে তোমার?'

'কেন? শ্রমিকদের রাজত্ব সোভিয়েত ইউনিয়নে। শ্রমিকদের সুবিধার জন্যে বুঝি ওরা এটুকু করতে পারে না?' নিষ্পাপ একটা ভঙ্গি রানার স্বরে।

'না, পারে না,' চিৎকার করে উঠল রিড। 'তাহলে অন্য ইয়ার্ডগুলোয় ছাদ দেয়নি কেন?'

এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে যেন এমন একটা ভঙ্গিতে বলল রানা, 'তাই তো! তাহলে কি বানাচ্ছে ওরা সেখানে?'

'হ্যাঁ। কি? সেটাই আমরা জানতে চাই। গত এক বছর অনেক চেষ্টা করেও কিচ্ছু জানতে পারিনি আমরা। এটুকুই শুধু জানা গেছে, প্রোজেক্টটা বেশ বড়সড় এবং টপ সিক্রেট। কত খরচ হয়েছে অতবড় একটা ইয়ার্ডে ছাদ দিতে আল্লা মালুম। খামোকা তো আর ওরা খরচটা করেনি! আমরা সন্দেহ করছি...সন্দেহ করছি...' চুপ করে গেল রিড। আরেকবার বোধহয় ভেবে নিচ্ছে কথাগুলো বলা ঠিক হচ্ছে কিনা।

শব্দ করে লম্বা একটা দম নিল সে।

'নিশ্চয়ই একটা জাহাজ বানাচ্ছে ওরা?' বলল রানা। 'একটা মাত্র জাহাজ, তা যা-ই হোক না কেন এত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না। অন্ততপক্ষে আমেরিকানদের ভয় পাওয়ার মত গুরুত্বপূর্ণ কিছু হতে পারে না।'

রানার কথাটা শোনার পরও কিছুক্ষণ চুপ করে রইল রিড। ইতস্তত করতে করতে শুরু করল তারপর, 'গুজব হচ্ছে···আমরা সন্দেহ করছি···আমাদের ঝানু ঝানু বিশেষজ্ঞরা শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত টেনেছেন, ওরা সম্ভবত এয়ারক্র্যাফ্ট ক্যারিয়ার তৈরি করছে!'

'ভাল কথা, ওরা আরেকটা এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ার তৈরি করছে। তাতে এমন কি এসে গেল?'

'আরেকটা এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ার বানাচ্ছে, তাতে কি হলো, কথাটা বলা যত সহজ ব্যাপারটা মোটেই তত সহজ নয়। ওদের একটা এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ার আছে, "কিয়েভ", খুব ছোট সেটা। ট্রায়াল শিপ বলা যেতে পারে ওটাকে। নতুনটা অনেক বড় হতে পারে, রীতিমত অ্যাটাক-ক্যারিয়ার!'

ভালই বোঝে রানা রিডের অর্থাৎ আমেরিকানদের দুশ্চিন্তার কারণ। তবু না বোঝার ভান করল ও, একজন রিপোর্টারকে এত বেশি বুঝলে চলে না। বলল, 'কিন্তু তাতেই বা কি হলো? রাশিয়ানরা আরেকটা এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ার তৈরি করছে–হলোই বা সেটা বড় অ্যাটাক-ক্যারিয়ার, তাতে তোমরা আমেরিকানরা অত ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন? তোমাদের তো হাফ ডজনের ওপরে অ্যাটাক ক্যারিয়ার রয়েছে। দরকার হলে আরও একটা বানিয়ে নেবে।'

'বলছি শোনো,' নরম গলায় বলল রিড, একটা বাচ্চা ছেলেকে বোঝাচ্ছে যেন। 'যতই হম্বিতম্বি করুক না কেন রাশিয়ানরা, ওদের নেভি বেসিক্যালি একটা ডিফেন্সিভ ফোর্স হিসেবেই রয়ে গেছে তাই বলে আমি আন্ডার এস্টিমেট করছি না ওদের নেভিকে। অনেক কম সময়ের মধ্যে যথেষ্ট আধুনিক এবং এফিশিয়েন্ট একটা নেভি গড়ে তুলতে পেরেছে ওরা। কিন্তু যত যা-ই হোক, আসলে আধুনিক অর্থে অ্যাটাকিং পাওয়ার অর্জন করতে পারেনি ওরা এখনও। ওদের আসল কাজ হচ্ছে সাগরে ইউ. এস.এ-র অবাধ স্বাধীনতায় বাধা সৃষ্টি করা। আর যে-সব এলাকায় আমাদের আর ওদের উভয়েরই স্বার্থ রয়েছে সে-সব এলাকায় আমেরিকান হস্তক্ষেপের মোকাবিলা করা।'

'হুঁ, বুঝলাম।'

'এখন, ওরা যদি অ্যাটাক-ক্যারিয়ার তৈরি করতে শুরু করে তাহলে তার অর্থ কি দাঁড়াবে আন্দাজ করতে পারো?'

'কি?'

'ডিফেন্সিভ থেকে অফেন্সিভ পাওয়ারে পরিণত হবে সোভিয়েট নেভি। তখন সারা বিশ্ব এসে পড়বে ক্রেমলিনের নাগালের মধ্যে। অ্যাটাক-ক্যারিয়ার অর্থ, ওরা ওদের নেভিকে সি গোয়িং এয়ার পাওয়ারে পরিণত করতে যাচ্ছে। পৃথিবীর জলভাগের ওপর ইউ.এস. নেভির একাধিপত্য তখন কোথায় যাবে?'

'আচ্ছা! ব্যাপারটা তাহলে এরকম। আমি তো ভাবতাম, এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ার জিনিসটা আউট ডেটেড হয়ে গেছে।'

'উঁহুঁ, মোটেই তা নয়। গভীর সমুদ্রে, বা ওদের উপকূলীয় এয়ারবেসগুলো থেকে কয়েক হাজার মাইলের বাইরে এয়ারক্র্যাফট পাঠানোর সামর্থ্য নেই ওদের। যদি এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ার বানায় ওরা তখন সমুদ্রেও তৎপর হয়ে উঠতে পারবে ওদের ফাইটার বম্বারগুলো।'

'স্ট্র্যাটেজিস্ট নই আমি,' বলল রানা। 'ভাল বুঝি না এসব ব্যাপার। তবে তোমার কথা শুনে এটুকু বুঝতে পারছি, স্ট্র্যাটেজি বদলাচ্ছে ওরা। ডিফেন্সিভ অবস্থানটাকে অফেন্সিভে রূপান্তরিত করতে যাচ্ছে সোভিয়েট ইউনিয়ন। অন্ততপক্ষে অফেন্সিভ একটা চেহারা দেয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু...'

অবাক চোখে তাকিয়ে রইল রিড ওর দিকে। একটা হদ্দ বোকাকে দেখছে যেন। 'এর ভেতর কোন কিন্তু নেই, রানা, বুঝতে পারছ তুমি...? আমার মনে হয় না তোমার মাথায় ঢুকছে ব্যাপারটা। শোনো, ওরা যদি একটা অ্যাটাক-ক্যারিয়ার তৈরি করে তো বিশেষ চিন্তা নেই। তেমন কোন কাজে আসবে না একটা এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ার। সত্যিই একটা আক্রমণাত্মক নেভিতে রূপান্তরিত করতে হলে একাধিক এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ার লাগবে ওদের। ইউ. এস নেভির সমান সমান হতে হলেও অন্ততপক্ষে আটটা তৈরি করতে হবে। কারণ ওদের প্রতিটি ফ্লীটেই অন্তত একটা করে ক্যারিয়ার থাকতে হবে, নয় তো উইক পয়েন্ট থেকে যাবে এবং পুরো ব্যাপারটাই নিরর্থক হয়ে পড়বে। সমস্যা হচ্ছে, আমি যেভাবে বলছি ওরাও ঠিক একই রকম ভাবে ভাবছে, অর্থাৎ একটা বানিয়েই বসে থাকবে না ওরা।'

চুপচাপ শুনে যাচ্ছে রানা রিডের বক্তৃতা। বলে চলেছে রিড, 'এখন একটা অ্যাটাক-ক্যারিয়ার তৈরির খরচ এত বিশাল যে দেশের সম্পূর্ণ অর্থনীতিকেই প্রচণ্ড চাপের সম্মুখীন হতে হবে। পাশাপাশি কারিগরি দিকটার কথা ভাবো, সেখানেও প্রয়োজন হবে বিশাল আয়োজনের। স্পেস প্রোগ্রামের মত উন্নত প্রযুক্তিগত প্রকল্পগুলো থেকে বিপুল জনশক্তি ডাইভার্ট করে এনে লাগাতে হবে এই কাজে। তোমার বিশ্বাস হতে চাইছে না হয়তো, কিন্তু সত্যি কথাই বলছি আমি। শুধু তাই না, এয়ার-ক্র্যাফট ক্যারিয়ার মেইনটেনেন্সের খরচও এত বিশাল যে, কিছুদিন পর ব্রিটেনের মত দেশও হয়তো আর ওগুলো পোষার মত খরচ জোগাড় করতে পারবে না। জানো তা?'

'না, আমার কোন ধারণা নেই এ ব্যাপারে।'

'ডিসিশনটার কথা ভাবো। রাশিয়ান লীডারদের দারুণ একটা উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা এটা, ঠিক?'

'হতে পারে।'

'চূড়ান্ত পরীক্ষার সময় উপস্থিত ওদের। বিপুল সম্পদ আর বিশাল জনশক্তির সমাবেশ করতে হবে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে। প্রোজেক্টটা সম্পূর্ণ করতে দশ বারো বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম দরকার। অর্থাৎ বাজেটের অন্যান্য খাতে ব্যয় কমিয়ে এই খাতে অর্থ জোগাতে হবে ওদের। সাধারণ ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনও

হয়তো বিঘ্নিত হবে। আরও কত কি যে করতে হবে তা একমাত্র খোদাই বলতে পারবে।'

একটু থেমে দম নিয়ে আবার শুরু করল রিড, 'দেশের ভেতর রাজনৈতিক মহলের প্রতিক্রিয়াও বড় ধরনেরই হবে। কিন্তু, সবচেয়ে গুরুতর বিষয় হচ্ছে এসব জেনে শুনেই সোভিয়েট গভর্নমেন্ট এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। আন্দাজ করতে পারো, রানা, ওদের মাথায় কি ঘুরছে? প্রভাবের সীমানা প্রসারিত করতে যাচ্ছে ওরা, ডিফেন্সিভ থেকে আসতে যাচ্ছে অফেন্সিভ অবস্থানে।'

আবার একটু থামল রিড। চুপচাপ শুনে যাচ্ছে রানা। আমেরিকার উপর মহলেও কি এর মতই ঘাম ছুটে গেছে?–ভাবছে ও মনে মনে। মাঝে মাঝে এই দুই পরাশক্তির রশি টানাটানির কথা ভাবলে, চূড়ান্ত বিতৃষ্ণায় ছেয়ে যায় ওর মনটা। আশ্চর্য, পৃথিবীতে কয়েকশো কোটি লোক এখনও দারিদ্রসীমার নিচে অনাহারে বা অর্ধাহারে ধুঁকে ধুঁকে জীবন ধারণ করছে। জীবনটা ওদের কাছে যাপন করার জিনিস নয়, কোন রকমে ধারণ করার জিনিস।

'দেখো, রানা,' আবার শুরু করল রিড। 'তুমি জিজ্ঞেস করছিলে একটা অ্যাটাক-ক্যারিয়ারে এমন কি এসে যাবে, তাই না? জেনে রাখো, পৃথিবীতে এযাবৎ কালের মধ্যে যতগুলো জাহাজ তৈরি হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে রাশানদের এই জাহাজটা। এটা নিজে যতটা গুরুত্বপূর্ণ তার চেয়ে হাজারগুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো এটা নির্মাণের কারণ। বুঝলে? সত্যিই যদি রাশিয়ানরা অ্যাটাক-ক্যারিয়ার তৈরি করে তবে তার অর্থ হবে, ওরা ওদের কম্যুনিস্ট ভাবাদর্শের আন্তর্জাতিক সম্প্রসারণের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করতে যাচ্ছে। তার মানে, দুনিয়া জুড়ে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক স্ট্র্যাটেজির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন।'

তাকিয়ে আছে রানা রিডের দিকে। জানে প্রতিটা কথাই সত্যি বলছে সে। ভুরুর কাছ দিয়ে সূক্ষ্ম একটা ঘামের রেখা দেখা যাচ্ছে রিডের। আলো পড়ে চিক চিক করছে। এখনও শেষ করেনি সে তার কথা। শুরু করল আবার।

'নিকোলায়েভ ডকের ছাদের নিচে জাহাজটা যদি সত্যি একটা অ্যাটাক-ক্যারিয়ার হয় তো নতুন করে আবার অস্ত্র প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পড়ব আমরা।'

এক মুহূর্ত থামল রিড। এই সুযোগে বলে উঠল রানা, 'সত্যি সত্যিই তুমি বিশ্বাস করো এরকম একটা ইনফর্মেশন বয়ে এনেছে সুফিয়া?' শান্ত ওর গলার স্বর।

পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে কপাল মুছল রিড। 'অসম্ভব কিছু না,' বলল সে। 'তুমি হয়তো কখনও শোনোনি, কিন্তু জেনে রাখো, রানা, নিকোলায়েভ ডকের ছাদের রহস্য বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর আর্মামেন্ট মিস্ত্রিগুলোর ভেতরেও এক নম্বর, যেটার কোন কাল্পনিক সমাধানও করা যায়নি এখন পর্যন্ত। শুধু আর্মামেন্টই নয়, অর্থনৈতিক দিক থেকেও ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উভয় পক্ষের জন্যেই; ওদেরও, আমাদেরও।'

'তোমাদের কি রকম? ওদেরটা নাহয় বুঝলাম, সাত-আটটা এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ার তৈরি করতে গেলে পাতলা পায়খানা শুরু হয়ে যাবে ওদের। তাতে তোমাদের কি?'

'আমাদর অবস্থাও তথৈবচ। মুদ্রার এ পিঠ তো দেখেছ, এবার অন্য পিঠটা দেখো–হারামীপনায় রাশিয়ানগুলোর বুদ্ধি খেলে ভাল। ওরা হয়তো একটা অ্যাটাক-ক্যারিয়ার তৈরি করছে হয়তো নয়। হয়তো নিছক ভান করছে, "বড় একটা কিছু করছি" এরকম আর কি। ওরা আমাদের ফটো রিকনিস্যান্স স্যাটেলাইটের অস্তিত্বের কথা জানে ভাল করেই। ওদেরও নিশ্চয়ই সেরকম বহু উপগ্রহ আছে, সুতরাং খুবই সম্ভব জানাটা। তো কি হলো? এক দিন ক্রেমলীনের চৌকস কোন একজনের মাথায় একটা বুদ্ধি গজিয়ে গেল। "আসুন, কমরেডরা, আমরা আমাদের একটা শিপ কন্সট্রাকশন ওয়ার্ডের উপর ছাদ দিই", বলে উঠল লোকটা। ওরা নিশ্চয়ই স্যাটেলাইট থেকে তোলা ছবি দেখে জানতে পারবে ব্যাপারটা, এবং আশ্চর্য হয়ে বসে বসে ভাবতে থাকবে, কি হচ্ছে এটার নিচে, কেন এই অতিরিক্ত গোপনীয়তা? আমরা সাবমেরিন থেকে শুরু করে সব ধরনের জাহাজই তো খোলা ইয়ার্ডে বানাই, তাহলে এখানে ছাদ দেয়া হলো কেন? শেষ পর্যন্ত ওরা সিদ্ধান্ত টানবে নিশ্চয়ই, আমরা এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ার তৈরি করছি বলেই এই গোপনীয়তা। এই সিদ্ধান্ত টেনে চুপচাপ বসে থাকবে না ওরা, ওদেরকেও করতে হবে কিছু একটা, যেমন, আমাদের চেয়ে এগিয়ে থাকতে হলে অতিরিক্ত আরও ক্যারিয়ার বানানোর কাজ শুরু করতে হবে··· বুঝলে, রানা, চিন্তার ধারাটা?'

'হ্যাঁ, বুঝলাম। যদি তাই হয়, তাহলে চমৎকার একটা বুদ্ধি ঠাউরেছে ব্যাটারা। ওরা সত্যিই যদি কিছু বানায় তো জানতে পারবে না তোমরা। আর যদি অ্যাটাক-ক্যারিয়ার বানাচ্ছে সন্দেহ করে তোমরাও বানাতে শুরু কর আরও, কিন্তু ওরা কিছুই বানাল না; সেক্ষেত্রে তোমাদের অর্থনীতির বারোটা বেজে যাবে। তাই তো?'

'ঠিক তাই। যদি সোভিয়েটরা অ্যাটাক-ক্যারিয়ার বানায় তো ওদের চেয়ে এগিয়ে থাকার জন্যে আমাদেরও বানাতে হবে, ওরা যতগুলো বানাবে ঠিক ততগুলোই। তারমানে, আমাদের আর্মস বাজেটে বিশাল অঙ্কের অতিরিক্ত টাকা বরাদ্দ করতে হবে। বিপুল অঙ্কের অর্থ অন্য খাত থেকে এনে এই খাতে ব্যয় করতে হবে। একটা এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ার বানাতে কয়েক বছর লেগে যায়। ওরা যদি ইতিমধ্যেই বানাতে শুরু করে থাকে তো আমাদেরও শুরু করতে হবে এক্ষুণি। স্ট্র্যাটেজিকালি, ওরা ওটা জলে ভাসানো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি না আমরা।'

আবার একটু থামল রিড। লম্বা করে দম নিয়ে আবার শুরু করল, 'কিন্তু, রানা–এই কিন্তুটাই আসল সমস্যা আমাদের–ধরো ওরা যদি ওই ছাদের তলে একটা অয়েল ট্যাঙ্কার বা যাত্রীবাহী জাহাজ তৈরি করে, তাহলে? আমরা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করব ক্যারিয়ার বানাতে, পুরো টাকাটাই তখন পানিতে যাবে না? পুরো ট্রিকে ফেলে দিয়েছে আমাদের। দু'ভাবেই ঠেকে গেছি আমরা। যদি ওরা তৈরি করে আমরা বসে থাকি, তো পুরো স্ট্র্যাটেজিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে, আর ওরা বানাল না আমরা বানালাম, তখন অর্থনৈতিকভাবে বড় রকমের একটা রদ্দা খাব আমরা। এদিকে ওরা যদি অন্যান্য সামরিক সজ্জার কাজ চালিয়ে যেতে থাকে–যেমন ধরো, অ্যান্টি মিসাইল বা ওই ধরনের কিছু তো কি অবস্থা হবে আমাদের ভাবতে পারো?'

'এবং এইসব কিছু হবে,' বলল রানা, 'একটা টিনের চালের কারণে?'

ছোট্ট একটু শ্রাগ করল রিড। 'ওই ব্যাটারা যে দাবা খেলে, খামোকা খেলে না। আমাদের এত দুশ্চিন্তা কেন বুঝতে পারছ এখন? ওই টিনের চালটা কি একটা বোড়ে মাত্র, না আরেকটা মন্ত্রী?'

দরজায় নক হলো একটা। রিড উঠে গিয়ে তালা খুলে দিল দরজার। উইলকিনসন ঢুকল ভেতরে। ওর মুখের ভাবটা মোটেই ভাল মনে হলো না রানার। কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুলতে গেল উইলকিনসন। কিন্তু ওকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বলে উঠল রিড, 'নিকোলায়েভ!'

একটুখানি ফাঁক হয়েছিল উইলকিনসনের মুখটা, রিডের কথাটা শুনে পুরো হাঁ হয়ে গেল সেটা। পরমুহূর্তেই সচেতন হয়ে মুখ বন্ধ করে ফেলল সে। তারপর বলল, 'আমার মনে হয় ওকে আর দরকার নেই আমাদের।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল রিড।

হিংসুটে, বিজয়ীর দৃষ্টিতে চকিত একবার রানার দিকে তাকাল উইলকিনসন। 'এখানেই একজন হেন্ডারসন আছে। একটা জার্লশফ আর স্যান্ডনেসও।'

এতক্ষণ যে ওরা তথ্যটুকু কেন জানতে পারেনি, ভেবে আশ্চর্য হলো রানা। আগে হোক বা পরে হোক ব্যাপারটা যে ওরা জানবেই এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না ওর। যাহোক, জেনে ফেলেছে ওরা, আপাতত বোধহয় ওদের কাছে ওর প্রয়োজন শেষ হয়েছে।

হঠাৎ করেই প্রচণ্ড ক্লান্তি এসে ভর করল ওর শরীরে। সারাদিনের জমে ওঠা ক্লান্তি যেন একসঙ্গে আক্রমণ করে বসল। উইলকিনসনের মুখ থেকে কথাটা শুনে মনে হলো, যেন চুপচুপে ভেজা, ঠাণ্ডা একটা কম্বল দিয়ে মুড়িয়ে দেয়া হলো ওকে। সব কিছুই জেনে গেছে ওরা, অর্থাৎ পুরোপুরিভাবে এখন ওদের হাতের মুঠোয় ও। একটা মাত্র ট্রাম্পকার্ড ছিল, সেটাও হাতছাড়া হয়ে গেল। এখন কি করবে ওরা? রানাকে সোজা লকআপে পাঠিয়ে দিয়ে হেন্ডারসনের খোঁজে বেরিয়ে যাবে নিশ্চয়ই? বেচারা সুফিয়া! বেচারা জামিল!

চুপচাপ বসে রইল রানা। কেমন একটা আলসেমীতে ছেয়ে যাচ্ছে শরীর, মন। অলস মস্তিষ্কেই হঠাৎ করে কোথা থেকে যেন একবিন্দু আলোর ছটা দেখতে পেল। মনে হলো, এখনও এমন কিছু আছে যা ওরা জানে না, একমাত্র ও-ই জানে। রিডের যুক্তিগুলো অকাট্য এবং স্পষ্ট হলেও, ওর মূল্য তাতে কমেনি বোধহয়। এখনও ওদের ওপর একহাত নিতে পারে ও।

তথ্যটা গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। অনেকের কাছেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকান সরকার তো বটেই, ব্রিটিশ সরকার ও অন্যান্য অনেক দেশের সরকারের কাছেই সেটা সমান গুরুত্ব বহন করে। সত্যি সত্যিই যদি রাশিয়ানরা অ্যাটাক-ক্যারিয়ার তৈরি করতে শুরু করে তো শুধু আমেরিকানদেরই নয়, ন্যাটো জোটের অন্যান্য দেশগুলোরও ঘুম ছুটে যাওয়ার কথা। রানার নিজের কাছেও হয়তো ওটার গুরুত্ব মোটেই কম নয়। কিন্তু সুফিয়া এবং জামিলের জীবনের বিনিময়ে তথ্যটা হস্তগত করতে বা অন্য কাউকে সহায়তা করতে রাজি নয় ও। রিড এবং উইলকিনসনের কাছে সুফিয়ার প্রাণের কোন মূল্যই নেই, রাশিয়ানদের কাছেও না।

ওদের সবারই মুখ্য উদ্দেশ্য ছলেবলে কৌশলে, যে-কোন উপায়ে ইনফর্মেশনটা হস্তগত করা। আর কিছু না হোক, জামিলের জন্যে হলেও বাঁচাতে হবে সুফিয়াকে। অন্তত চেষ্টা করে দেখবে রানা, শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে দেখবে।

রিড আর উইলকিনসন ওকে আটকে রেখে বেরিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, এমন সময় নীরবতা ভাঙল রানা।

'সন্ধের পর আজ একটা অগ্নিকাণ্ড হয়েছে জার্লশফে, তা জানো?'

'হ্যাঁ, তা আমি জানি, বাছা,' আদুরে গলায় বলল উইলকিনসন। 'তুমিই লাগিয়েছিলে নাকি আগুনটা?'

'সত্যি কথা বলতে কি, আমার কারণেই আগুন লেগেছিল হেন্ডারসনের কটেজে।'

'চমৎকার! অন্যের সম্পত্তিতে ইচ্ছে করে আগুন লাগানোর দায়েও সুন্দর আটকানো যাবে তোমাকে।'

'কেন আগুন লাগিয়েছিলে তুমি?' শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করল রিড।

'কারণ,' জবাব দিল রানা, 'বাড়িটায় আড্ডা গেড়েছিল রাশিয়ানরা।'

হাঁ হয়ে গেল দু'জনের মুখ। খবরটা হজম করার জন্য ওদেরকে কয়েক সেকেন্ড সময় দিল রানা। একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে দু'জনে। মৃদু হেসে উইলকিনসনের দিকে ফিরে বলল রানা, 'আজ সকালে একটা পোস্টভ্যান আক্রান্ত হয়েছিল, এ খবর কি পুলিস জানিয়েছে তোমাকে?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল উইলকিনসন। বুঝতে পারছে রানা, ভেতরে ভেতরে চুপসে গেছে লোকটা।

'কারা করেছে কাজটা? রাশিয়ানরা?' জিজ্ঞেস করল রিড।

'স্যান্ডনেস রোডে ঘটেছে ঘটনাটা। আমার কাছে এমন কোন তথ্য নেই যাতে প্রমাণ হয় রাশিয়ানরাই ঘটিয়েছে ঘটনাটা। কিন্তু আমি জানি, ওরাই। শেটল্যান্ডের ওয়েস্ট মেইন ল্যান্ডের বাসিন্দাদের বেশির ভাগই বুড়ো, চিঠিপত্র যা আসে তার প্রায় সবই ব্যক্তিগত। টাকা পয়সা আসে না, আসলেও এত কম যে তা লুট করার কথা কেউ ভাববে না।'

'ওরা তাহলে, ফেরত পেয়ে গেছে জিনিসটা?' উইলকিনসনের হতাশামিশ্রিত খসখসে গলা শোনা গেল।

জবাব দিল না রানা। ওদেরকেই উত্তরটা আন্দাজ করে নেয়ার সুযোগ দিল। কিন্তু, কোন রকম চিন্তা ভাবনার ধার ধারল না রিড। জিজ্ঞেস করল সরাসরি, 'কোন্ ঘটনাটা আগে ঘটেছে? পোস্টভ্যানের উপর আক্রমণ না হেন্ডারসনের বাড়িতে আগুন?'

'কেন? একটু আগেই তো বললাম, আগুনটা লেগেছে সন্ধ্যার পর, আর পোস্টভ্যান আক্রান্ত হয়েছে সকালে। পোস্টভ্যানে কিছু পায়নি ওরা। পেলে হেন্ডারসনের বাড়িতে হানা দেয়ার প্রয়োজন পড়ত না।'

রানার সামনে এসে দাঁড়াল রিড। ওর একেবারে সামনে প্রায় গায়ের ওপর এসে দাঁতে দাঁত চেপে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় হেন্ডারসন?'

'হেন্ডারসনের বাড়িতে রাশিয়ানরাও একই প্রশ্ন করেছিল আমাকে।'
'কোথায় হেন্ডারসন!' ভয়ানক হয়ে উঠল রিডের গলা।
'জানি না আমি।'
'গ্যালিশেড,' বলল উইলকিনসন, 'ওখানে কি করছিলে তুমি?'
'খুঁজছিলাম ওকে?'
'পেয়েছিলে?'
'না।'

রানার সামনে থেকে সরে গেল রিড। 'উইলকিনসন, এখন পুলিসের সাহায্য দরকার আমাদের। শেটল্যান্ডে ডাক আসে কিভাবে জানা দরকার। এখানকার পুলিস-চীফকে খবর দাও।'

ডিউটি সার্জেন্টই আপাতত পুলিস-চীফ। কারণ লোকাল পুলিস ইন্সপেক্টর লোকটা তিন দিনের কি এক কোর্স করতে এডিনবরায় গেছে। খবরটা শুনে স্পষ্টতই একটু আশাহত হলো রিড। সার্জেন্টের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'নাম কি তোমার?'

'ম্যাকেঞ্জি, স্যার।'

'ঠিক আছে, ম্যাকেঞ্জি, এক্ষুণি পোস্টাল অথোরিটিকে ধরার ব্যবস্থা করো। এখন থেকে জার্লশফ, স্যান্ডনেস ঠিকানায় হেন্ডারসন অথবা সুফিয়া আশরাফের নামে যে কোন চিঠিই আসুক না কেন চেক করতে হবে সেগুলো, আমাদের পারমিশন ছাড়া ডেলিভারি দেয়া যাবে না। আবার বলছি, যে-কোন চিঠি বা প্যাকেট! আগামীকালের ডাকে যেগুলো আসবে সেগুলোও চেক করতে হবে। বোঝা গেছে?'

চারকোনা ঢিলেঢালা ধরনের চেহারা সার্জেন্ট ম্যাকেঞ্জির। কিন্তু শরীরটা দারুণ শক্তসমর্থ। পোশাকের ওপর দিয়েই পেশীগুলোর অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। নির্বিকার একটা ভঙ্গি সবসময় লেগে আছে মুখে। জিজ্ঞেস করল সার্জেন্ট, 'কি ঘটতে পারে বলে ধারণা করছেন, স্যার?'

'কে জানে? আক্রমণ বা ওই ধরনের কিছু হতে পারে। যা-ই হোক এক্ষুণি জানাও পোস্টাল অথোরিটিকে।'

'যদি আক্রমণের আশঙ্কাই করেন, স্যার, তাহলে আমার মনে হয়, ব্রিটিশ এয়ারওয়েজকেও জানিয়ে রাখা দরকার। অ্যাবার্ডিন থেকে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজেই ডাক আসে এখানে।'

'ঠিক আছে,' সম্মতি দিল রিড। 'তাহলে অ্যাবার্ডিনের পোস্ট অফিসকেও জানিয়ে রাখো চেক করার কথাটা। তাড়াতাড়ি যাও।'

যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল ম্যাকেঞ্জি। বলল, 'শেটল্যান্ডের পোস্ট অফিসে চেক করার ব্যবস্থা হয়ে যাবে, স্যার। কিন্তু অ্যাবার্ডিনের পোস্ট অফিস বোধহয় শুনবে না আমার কথা। ওখানকার পুলিস অথোরিটির পারমিশন জোগাড় করতে হবে আপনাদের। যেমন ধরুন, অ্যাবার্ডিনের চীফ-কনস্টেবল: পারবেন, স্যার?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটা দেখব আমি, তুমি তাড়াতাড়ি যাও তো,' বলল উইলকিনসন।

তারপর দ্রুতপায়ে বাইরে বেরিয়ে গেল নিজেই। সিঁড়িতে ধুপধাপ শব্দ তুলে নেমে গেল নিচে।

'এখান থেকে যাবে যে-সব চিঠি সেগুলোর ব্যাপারে কি হবে, স্যার?' শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল সার্জেন্ট।

'তাই তো! ভাল কথা মনে করেছ তো!' প্রায় লাফিয়ে উঠল রিড। 'ওগুলোও চেক করতে হবে। একই নামের, হেন্ডারসন আর সুফিয়া। দু'জনের যে কারও কাছে যে-কোন চিঠি পার্সেল বা অন্য কিছু–আটক করতে হবে। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে, স্যার।' বেরিয়ে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল ম্যাকেঞ্জি।

'আরেকটা কথা, সার্জেন্ট, ক'টা ফোন তোমাদের?'

'তিনটে, স্যার।'

'আমাকে একটু লন্ডনে ফোন করতে হবে।' সার্জেন্টের পেছন পেছন দরজার দিকে এগোল সে-ও। রানার দিকে চোখ পড়তেই বলল, 'মিস্টার রানার সঙ্গে থাকার জন্যে কাউকে পাঠিয়ে দাও তো, সার্জেন্ট।' দরজার চাবিটা এগিয়ে দিল সার্জেন্টের দিকে।

'ঠিক আছে, স্যার, এক্ষুণি পাঠাচ্ছি।'

রিডের হাত থেকে চাবিটা নিয়ে বেরিয়ে গেল ম্যাকেঞ্জিও। তালা লাগিয়ে দিল বাইরে থেকে। অনেক রাত এখন, বাইরে নিস্তব্ধ লারউইক শহর। রুমের ভেতরেও পিন পতন নিস্তব্ধতা। ক্লিক করে তালা বন্ধ হওয়ার শব্দটাও অনেক জোর মনে হলো রানার কাছে।

রুমের ভেতরটা ভাল করে দেখবার সুযোগ পেল এতক্ষণে রানা। তাকাল রুমের চারপাশে। দুটো একশো পাওয়ারের বাতিতে আলোকিত হয়ে রয়েছে কামরাটা। দুটো জানালা ঘরের দুপাশে। একটা ও আগেই দেখেছে, লারউইক হারবার ওদিকটায়। অন্য জানালাটার কাছে উঠে গেল এবার। তাকাল বাইরে। আগের জানালাটার মত এদিকেও মাটি অনেক নিচে। পুরানো আমলের দালান, একেকটা তলাই দোতলার সমান। বিশ ফিটের কম হবে না, কোন কার্নিস-টার্নিস নেই, একেবারে খাড়া নেমে গেছে দেয়াল। লাফ দিলে নির্ঘাত ঘাড় মটকে যাবে। একটা রশিটশি পাওয়া গেলে হত। কিন্তু কাঠের কিছু চেয়ার টেবিল ছাড়া আর কিছু নেই কামরায়। বেরোনোর কোন উপায় নেই। একটু দূরে আধুনিক ডিজাইনের লাইব্রেরি বিল্ডিংটা দেখতে পেল ও। আলো ঝলমলে রাস্তা। পাশেই টাউন-হল।

তালা খোলার শব্দ হলো দরজায়। ঘুরে দাঁড়াল রানা, এসে পড়েছে পাহারাদার।

ম্যাকেঞ্জির মতই শক্তপোক্ত লোকটা। তিরিশের ওপরেই হবে বয়স। দেখলেই বোঝা যায়, প্রচণ্ড শক্তি রাখে গায়ে। মাছ ধরা ট্রলারের যে-সব নাবিক মাতাল হয়ে রাস্তায় ঝামেলার সৃষ্টি করে, এরই হাতে বোধহয় ছেড়ে দেয়া হয় তাদের। সন্দেহ নেই এক সঙ্গে ওরকম দু'তিনটে মাতালকে সামলানোর ক্ষমতা রাখে এই লোক, ভাবল রানা। ছোট্ট করে একটু মাথা ঝাঁকাল লোকটা। সম্মান দেখাল, না সতর্ক করল, ঠিক বোঝা গেল না।

'এক কাপ চা বা কফি জাতীয় কিছু পাওয়ার কোন আশা আছে?' জানতে চাইল

রানা।

'সুযোগ পেলে চেষ্টা করব। এখন না।'

'কখন সুযোগ পাবে কে জানে! আচ্ছা, ঠিক আছে, তখন হলেও চলবে।'

দাঁড়িয়ে রইল লোকটা টেবিলের পাশে। চেয়ারে এসে বসল রানা। সময় বয়ে যাচ্ছে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, বসে আছে রানা।

'অনেকদিন ধরে আছ লারউইকে?' নীরবতা ভাঙল রানা।

'বছর পাঁচেক।' ভুরু দুটো একটু কুঁচকে জবাব দিল লোকটা।

'ভাল লাগে এখানে থাকতে?'

'নিশ্চয়ই। চমৎকার জায়গা লারউইক।'

'ঠাণ্ডা একটু বেশি, তাই না?'

'কই, না! আমাদের কাছে তো সে রকম কিছু লাগে না। এখানে বাতাস আছে ঠিক, তবে স্কটল্যান্ডের মত বরফ বা তুষার নেই। চৌকিদারি করার জন্যে চমৎকার জায়গা এটা।'

'খুব ছোট্ট জায়গা, তাই বলছ একথা?'

'অনেকটা। তাছাড়া এখানকার মানুষগুলোও খুব ভাল। বড় শহরের মত নয় মোটেই।'

'জিম হেন্ডারসনকে চেনো তুমি? স্যান্ডনেসের,' জিজ্ঞেস করল রানা।

একটু সতর্ক হলো লোকটা, ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল আবার। 'হ্যাঁ, আমি চিনি ওকে। কেন?'

মৃদু একটু হাসল রানা। 'এমনিই। সবাই খুঁজছে তো ওকে, তাই জিজ্ঞেস করলাম। মিস্টার রিড, মিস্টার উইলকিনসন, আরও কে কে যেন। তুমি এমন কিছু হয়তো জানো যা কাজে আসবে ওদের।'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক। হতে পারে।'

'কে একজন বলছিল আমাকে, কোন্ এক পাহাড়ে নাকি চড়েছিল ও ক'দিন আগে?'

'হ্যাঁ, ভালই পাহাড় ঠ্যাঙাতে পারে লোকটা। গরমের সময় ফাউলার মত উঁচু চূড়ায় উঠেছিল ও। লোকে বলে, পাখি খুঁজতে গেছিল নাকি।' এমন একটা ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে যেন বোঝাতে চাইল, পাগল ছাড়া আর কেউ পাখি খোঁজার জন্যে এরকম ঝুঁকি নেয়!

'আমি চিনি না ওকে,' বলল রানা। 'আমার এক বন্ধুর বন্ধু হেন্ডারসন। কেমন লোক ও জানো নাকি?'

'হ্যাঁ। চমৎকার ছেলে জিম হেন্ডারসন। কেবল একটু খ্যাপাটে ধরনের, এই যা। পাহাড়ে চড়া আর পাখির নামে পাগল একেবারে। ভাল সেইলারও।' প্রশংসার হাসি ফুটে উঠল পুলিস লোকটার ঠোঁটে। 'আমি কয়েকবার বেরিয়েছি ওর সাথে। মাছ ধরতে, বুঝলেন? প্রচণ্ড ঝড় আর ঢেউয়ের ভেতরেও একটু ঘাবড়াতে দেখিনি ওকে।'

'বোট আছে নিশ্চয়ই হেন্ডারসনের?' জিজ্ঞেস করল রানা। আবার কেমন একটু

সতর্ক হয়ে উঠল লোকটা। 'মিস্টার রিডের জানা দরকার খবরটা।' যোগ করল ও।

'হ্যাঁ, ঠিকই ধারণা করেছেন।'

'কি ধরনের?'

'শেটল্যান্ড মডেল। এখানকার বেশিরভাগ বোটই ওই ধরনের।'

'কোথায় রাখে ওটা হেন্ডারসন?'

'লারউইকে যখন থাকে ও, তখন বেশির ভাগ সময় স্মল বোট হারবারেই রাখে ওটা।'

'এখন কি এদিকে আছে বোটটা? মিস্টার রিড বোধহয় জানতে চাইবে।'

'হ্যাঁ, আজ সকালেও দেখেছি হারবারে।'

'এখান থেকে দেখা যায় বোধহয়?' আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ল রানা।

'হ্যাঁ।'

'কোথায়?' হারবারের দিকের জানালাটার কাছে যেতে যেতে বলল রানা।

অমায়িকভাবে একটু সতর্ক করল লোকটা রানাকে। 'কোনরকম চালাকির চেষ্টা করবেন না নিশ্চয়ই, স্যার?'

'তোমার সঙ্গে!?' নিখাদ বিস্ময় ঝরে পড়ল রানার কণ্ঠ থেকে। 'পাগল নাকি তুমি!'

'ঠিক আছে, দেখাচ্ছি।' জানালার কাছে এগিয়ে গেল লোকটাও। হাত দিয়ে ইশারা করে দেখাতে দেখাতে বলল, 'ওই যে দেখা যাচ্ছে, স্যার। ওই ছাদটার কিনারে তাকান।'

'কই? হ্যাঁ, এবার দেখতে পেয়েছি। ওই হালকা রঙেরটা?'

চাঁদের আলোয় ঝকঝকে রূপালি চেহারা ধারণ করেছে হারবারটা। একপাশে স্মল বোট হারবার। অসংখ্য ছোট ছোট বোট নোঙর করা বা বাঁধা রয়েছে সেখানে। অন্য বোটগুলো থেকে একটু দূরে একটা ফাঁকা জায়গায় নোঙর করা বোটটা।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল লোকটা। 'ছাব্বিশ ফুট লম্বা। খুবই ভাল বোট। ইঞ্জিনটা নতুন একেবারে।'

'ভাগ্যবান লোক হেন্ডারসন,' বলল রানা।

'হ্যাঁ।'

'এত রাতেও হারবারটা বেশ ব্যস্ত মনে হচ্ছে, না?'

'এরকমই। দিনের বেলায় তো আরও ব্যস্ত থাকে।'

'আশ্চর্য! লারউইকের মত ছোট জায়গার হারবার এত ব্যস্ত থাকে!'

'লারউইক ছোট জায়গা হলেও তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি জাহাজ যাওয়া আসা করে এখানে। বেশির ভাগই ফিশিং বোট। অন্য ধরনের জাহাজের সংখ্যাও কম না। মাঝেমধ্যে দু'একটা ইয়টও আসে, এক কথায় সব ধরনের জাহাজ। ডাঙায়ও ঘোরাফেরা করে ওরা, জেলেদের কথা বলছি। পাবে বসে মদ খায়, মেয়েদের পেছনে লাগে। এখানকার এক পাবে আমি একসাথে ছয়টা দেশের লোক দেখেছি জানেন?'

'গণ্ডগোল পাকায় না মাঝেমধ্যে?'

'হ্যাঁ, প্রায়ই। একটাও ভাল দেখলাম না। আসলে ওদের পকেটের ওজনের ওপর নির্ভর করে কে কতটা খারাপ। সবশালা নাবিকই এক, একটু মদ পেটে পড়ল তো ব্যস, শুরু হয়ে গেল। ইংলিশ, নরওয়েজিয়ান, জার্মান, পোল, ফিন সব এক। কেবল রাশিয়ানরা একটু অন্যরকম।'

'রাশিয়ান!' আশ্চর্য হয়ে গেল রানা।

'হ্যাঁ। ওরাও আসে এখানে। এখনও বোধ হয় আছে কয়েকজন লারউইকে। সবার মধ্যে ওরাই সবচেয়ে ভাল, কক্ষনো কোন গণ্ডগোল নেই। গত পাঁচ বছরে একটা ঘটনাও নজরে আসেনি আমার।'

'খুব নিরামিষ মনে হয় লোকগুলো! কারণটা কি?'

'জানি না। তবে আমার ধারণা ওদের পকেটে তেমন পয়সা থাকে না বলেই কোনরকম গণ্ডগোল ঝামেলা পাকাতে পারে না ওরা। তবে সত্যি সত্যিই ওরা ভদ্রলোক, এমনও হতে পারে; আমি ঠিক জানি না।'

রাশিয়ান! চিন্তার পাখাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে শুরু করেছে ওর মাথার ভেতরে। লারউইকে রাশিয়ানরা! এবং সম্ভবত বৈধভাবেই। 'কোন্‌গুলো রাশিয়ান জাহাজ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

এক দঙ্গল মাছ ধরা ট্রলারের দিকে ইঙ্গিত করল লোকটা। অন্যান্য দেশের ট্রলারগুলো থেকে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেগুলো। 'পাঁচ ছ'টা হবে,' বলল লোকটা।

'যখন খুশি তখন ডাঙায় চলে আসে ওরা?'

'হ্যাঁ। লারউইকের রাস্তায় প্রায়ই দেখা যায় রাশিয়ানদের। দোকানের সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জিনিস দেখে। কেনে না। সেজন্যেই আমার ধারণা হয়েছে যে ওদের পকেটে পয়সা থাকে না। বুঝলেন, স্যার?'

চিন্তিত মুখে তাকিয়ে রইল রানা মাছ ধরা ট্রলারগুলোর দিকে। যখন খুশি আসে, যখন খুশি যায়! কোন বিধি-নিষেধ নেই! নকল ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিস এবং সার্জেন্ট টমাসকে কোন কষ্টই স্বীকার করতে হয়নি তাহলে!

'কেমন বিদঘুটে না, রাশিয়ান ট্রলারগুলো?' কিছু একটা বলবার জন্যেই বলল রানা।

'হ্যাঁ, স্যার। ওদের আচার-আচরণের কথাও বললাম তো, কেমন জানি বিদঘুটে। হাঁ করে তাকিয়ে তাকিয়ে দোকানের জিনিস দেখে, কেনে না কখনও। ওই যে দূরে, ছোট একটা বোট দেখছেন না, একটা মুরিংয়ের সঙ্গে বাঁধা...'

কনস্টেবলের হাতের ইশারা অনুসরণ করে তাকাল রানা।

'ওই ছোটটা?'

'হ্যাঁ। হেন্ডারসনের ছিল ওটা,' বলল লোকটা। 'লিটল শেটল্যান্ড মডেল। ওটা বিক্রি করে বড়টা কেনে ও।'

কনস্টেবলের চেহারা দেখলে ভুল করার কথা সবার। চমৎকার লোকটা। সহজ সরল আত্মবিশ্বাসী, তবে কোনরকম ভুল ধারণা নেই নিজের সম্পর্কে। সুখী লোকটা। একটু আত্মতৃপ্তও। পারমাণবিক যুদ্ধের আতঙ্ক, আমেরিকা-রাশিয়ার হুমকি, পাল্টা

হুমকি আচ্ছন্ন করে নেই এর মনটা। ভালই আছে নিজের ছোট্ট গণ্ডিতে। রিড ফেরার আগ পর্যন্ত ওর সঙ্গে কথা বলে কাটাল রানা।

রিড এসে ঢুকতেই আগে কথা বলল রানা, 'কনস্টেবল বলছিল, হারবারে নাকি রাশিয়ান বোট আছে।'

প্রথমে অবাক হলো রিড। পরমুহূর্তেই দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ল ওর মুখে। রাশিয়ান বোটের উপস্থিতি সম্পর্কে খুঁটিনাটি প্রশ্ন করে চলল। ধৈর্য ধরে উত্তর দিয়ে গেল কনস্টেবল। রাশিয়ানদের আসা যাওয়ার স্বাধীনতার কথা শুনে রানার মত সে-ও আশ্চর্য হয়ে গেল ভীষণভাবে। খানিকক্ষণ গুম হয়ে থেকে বলল, 'থ্যাঙ্কস, কনস্টেবল। এখন যেতে পারো তুমি। সার্জেন্টের বোধহয় দরকার পড়বে তোমাকে।'

'ঠিক আছে, স্যার,' বলে বেরিয়ে গেল কনস্টেবল রুম ছেড়ে।

এবার রানার দিকে ফিরল রিড। 'এই মুহূর্তে মাত্র আটজন লোক আছে পুলিসের হাতে। ওরা হেন্ডারসনকে খুঁজতে বেরোচ্ছে। কিন্তু...'

'কিন্তু, এখানে কোথাও খুঁজে পাবে না ওকে,' বলল রানা। 'যদি না সে নিজে দেখা দেয়, বুঝলে? খুবই ছোট জায়গা এটা। এখানকার সবাই সবার চেনা, আর পরস্পরের প্রতি ওদের সহানুভূতিও গভীর। বাইরের লোকদের ওরা একটু সন্দেহের চোখেই দেখে। ওপরে ওপরে ভাল ব্যবহার করবে ঠিকই, কিন্তু কখনোই কাছে ঘেঁষতে দেবে না।'

কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল রিড ওর দিকে। 'কেন? দেখা দিতে চাইবে না কেন ও?'

'ওই যে, বললাম, পরস্পরের জন্যে ওদের গভীর সহানুভূতি। আগুনের কথা জানবে ও–এতক্ষণ জেনে গেছে কিনা কে জানে–পোস্টভ্যানে হামলার খবরও জানবে। এছাড়া ইতিমধ্যেই হয়তো আরও কিছু জেনে গেছে ও যা জানতে পারিনি আমরা। নিজের স্বার্থে তো বটেই অন্যান্যদের নিরাপত্তার স্বার্থেও লুকিয়ে পড়বে ও। অন্য লোকেরাও যখন শুনবে আগুন দেয়া হয়েছে ওর বাড়িতে, তখন তারাই নিরাপদ আশ্রয়ে রাখবে ওকে। অনেক ছোট ছোট গ্রাম আছে এখানে, খেতের ভেতর আছে পাহারাদারের ঝুপড়ি, কোথায় তুমি খুঁজবে ওকে? এদিকে তোমার হাতে রয়েছে মোটে আটজন লোক।' মিস মার্থার আচরণের কথা মনে পড়ল রানার। বলল, 'আর ও চাইলে, ওরা ওর চারপাশে অদৃশ্য একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর তৈরি করে ফেলবে।'

একটু আগে উইলকিনসনও এসে ঢুকেছে কামরায়। রানার শেষ দিকের কথাগুলো শুনে আশ্বস্ত করতে চাইল রিডকে। 'আরে, চিন্তা কোরো না, আমরা ঠিক খুঁজে বের করে ফেলব ওকে।'

তাকাল না রানা উইলকিনসনের দিকে। রিডও তাকায়নি। অপমানে একটু জ্বলে উঠল যেন উইলকিনসনের চোখ দুটো। রানার ওপর রাগ আর ঘৃণার পরিমাণ আর একটু বেড়েছে বোধহয়। 'লন্ডনের সাথে কথা হয়েছে আমার, ওরা জানাবে অ্যাবার্ডিন পোস্ট অফিসকে,' বলল সে।

'ঠিক আছে,' বলল রিড। বলল বটে ঠিক আছে, তবে তাকাতে লাগল একবার

এর মুখে একবার ওর মুখে। চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে অসহায় একটা অনিশ্চিত ভাব।

'এবার?' রিডের চিন্তার গতি বুঝতে পেরেই জানতে চাইল রানা।

'অপেক্ষা করব আমরা। আর কি?'

উইলকিনসন বলল, 'আমি সার্চ-এ যোগ দিতে চললাম। যত বেশি লোক হবে সময়ও লাগবে তত কম।'

'হ্যাঁ, মুখের ওপর দরজা বন্ধ হওয়া দেখবে খালি,' টিপ্পনি কাটল রানা। 'পুলিস দেখলে তো আরও এঁটে যাবে ওদের ঠোঁট। কোন আশা নেই তোমাদের।'

'তোমার মাথায় নিশ্চয়ই আরও ভাল কোন বুদ্ধি আছে?' শ্লেষ মেশানো কণ্ঠস্বর উইলকিনসনের।

'একটা জায়গায় খুঁজে দেখা যেতে পারে।' একটু চিন্তিত হওয়ার ভান করল রানা।

'কোথায়?'

'হেন্ডারসনের বোট আছে একটা, সেখানে।'

'তুমি কি করে জানলে?' তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল রিড।

'সেই গানটা জানো না, আই আস্কড্ এ পুলিস ম্যান...,' হাসতে হাসতে বলল রানা।

'তাড়াতাড়ি ডাকো ওকে, উইল,' চিৎকার করে উঠল রিড।

হন্তদন্ত হয়ে ছুটল উইলকিনসন। একটু পরেই ফিরে এল বেচারা। 'সার্চপার্টির সঙ্গে বেরিয়ে গেছে কনস্টেবল,' জানাল সে।

সহযোগিতাপূর্ণ ভঙ্গিতে বলল রানা, 'কোন্ বোটটা এবং কোথায় বাঁধা আছে তা জানি আমি।'

'বলো কোন্টা।' হারবারের দিকের জানালার কাছে এগিয়ে গেল রিড।

'চলো দেখাচ্ছি।' দরজার দিকে এগোল রানা।

কিন্তু রিড বা উইলকিনসন দু'জনের কেউই চায় না সেটা। তবে এটাও বুঝল ওরা, যতটুকু বলেছে রানা তারচেয়ে বেশি আর কিছু বলবে না ও, দেখানোর তো প্রশ্নই আসে না।

আবার নিচে নেমে গেল উইলকিনসন। একজন মাত্র কনস্টেবল ছিল ডিউটিতে, তার কাছে জিজ্ঞেস করল, হেন্ডারসনের বোট কোথায় বাঁধা আছে তা সে জানে কিনা। কিন্তু ওদের দুর্ভাগ্য আর রানার সৌভাগ্য, জানে না লোকটা। বোট জিনিসটা লুকিয়ে থাকার জন্যে এত চমৎকার একটা জায়গা যে শেষ পর্যন্ত ওরা সেটা বাদ দিতে চাইল না।

'ঠিক আছে, রানা, চলো, দেখাও আমাদের।' পরাজিতের ভঙ্গিতে বলল রিড।

'অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে। চলো।'

বেরিয়ে এল ওরা রাস্তায়। মাঝরাত্রি পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে। ফাঁকা রাস্তা। বাতাস একটু কমেছে, তবে এখনও বেশ জোরেই বইছে। ঠাণ্ডাও বেশ। মাঝখানে রানা, সামনে রিড, পেছনে উইলকিনসন। হেঁটে চলছে ওরা। পকেটে হাত

ঢুকিয়ে রেখেছে উইলকিনসন। পিস্তলের বাঁট ধরে আছে বোধহয়।

ঢালু পথ বেয়ে ওরা এগোতে লাগল হারবারের দিকে। হারবার পর্যন্ত পৌঁছনোর আগেই ডানদিকে মোড় নিতে বলল রানা। একটু পরেই সাগরের তীরে পৌঁছে গেল ওরা।

সারি সারি মাছ ধরা ট্রলার নোঙর করে আছে কূলের খুব কাছে। কয়েকটার মাস্টহেডে কাস্তে আর হাতুড়ি আঁকা লাল রঙের ফ্ল্যাগ উড়তে দেখল রানা। এগিয়ে গেল ওরা ট্রলারগুলো ছাড়িয়ে। ট্রলারগুলো পার হয়ে বেশ কিছুটা আসার পর একটা বোট দেখিয়ে বলল রানা, 'ওইটা।'

কূল থেকে খানিকটা দূরে নোঙর করা রয়েছে শেটল্যান্ড মডেলের বোটটা। চওড়া পেট বোটটার। দু'দিকের বো-ই ভাইকিং গ্যালির ঢঙে তৈরি। ওটাতে কেউ আছে কিনা বোঝা গেল না তীর থেকে।

'দেখে তো মনে হচ্ছে কেউ নেই ওতে,' মন্তব্য করল উইলকিনসন।

'কেবিনের ভেতর যদি কেউ ঘুমিয়ে থাকে তো বাইরে থেকে কেমন দেখাবে বোটটা?' ঝাঁঝের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল রানা।

'একটা ডিঙি দরকার আমাদের,' বলল রিড। 'কাছে গিয়ে দেখতে হবে।' চারদিকে তাকিয়ে খুঁজছে ও, কোন-ডিঙি দেখা যায় যদি।

একটু দূরে, ঢালু সৈকতের ওপর ছোট্ট একটা ডিঙি নৌকা উল্টানো রয়েছে। তিনজনে ধরাধরি করে সোজা করল সেটা। ঠেলে ঠেলে নিয়ে গিয়ে ভাসাল পানিতে। প্রথমে উইলকিনসন উঠল নৌকায়।

'আমি এখানে অপেক্ষা করব?' জিজ্ঞেস করল রানা, বাঁদরামি হাসি মুখে।

'মাথা খারাপ! এক্ষুণি ওঠো নৌকায়। তোমাকে এখানে রেখে গেলে ফিরে এসে পাব? এক মুহূর্তের জন্যেও তোমাকে চোখের আড়াল করতে চাই না, বাছা।' শেষদিকে এসে রিডের গলায়ও একটু ফাজলেমি ঝিলিক দিয়ে উঠল।

'আমাকে আর কি দরকার? যা যা জানার সবই তো জেনে ফেলেছ। এখন হেন্ডারসনকে খুঁজে বের করতে পারলেই জিনিসটা পেয়ে যাবে তোমরা।' বলতে বলতে নৌকায় উঠল রানা।

'হ্যাঁ, হেন্ডারসনকে খুঁজে বের করার জন্যেই দরকার তোমাকে।' তীর থেকে বেশি দূরে নয় হেন্ডারসনের বোটটা। একশো গজও হবে না বোধহয়। বোটটার প্রায় পঞ্চাশ গজ মত এদিকে দুপাশে বেশ খানিকটা দূরে দূরে দুটো ট্রলার। ট্রলার দুটোর মাঝ দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। দূর থেকে ভেসে আসছে কর্মব্যস্ত হারবারের কোলাহল।

ট্রলার দুটোর কাছাকাছি আসতেই দূরে কোথায় যেন একটা এঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ হলো। বোটের এঞ্জিনই হবে, ভাবল রানা। স্টার্ট নিলেও এখনও চলতে শুরু করেনি বোধহয় বোটটা। অলস একটা ছন্দে গুমরে চলেছে এঞ্জিন। হারবারের দূরাগত কোলাহলের শব্দ আর এই এঞ্জিনটার মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি মিলে রাতের নিস্তব্ধতাকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে তুলল যেন।

বোটের মাঝখানে বসে বৈঠা বেয়ে চলেছে উইলকিনসন। সামনের গলুইয়ের

ওপর বসে আছে রিড, তাকিয়ে আছে হেন্ডারসনের বোটের দিকে। পেছনের গলুইয়ের কাছে রানা।

ট্রলার দুটো পার হয়েছে মাত্র ওরা, এমন সময় হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল দূরের সেই এঞ্জিনটার শব্দ। বোঝা গেল অনেক জোরে ঘুরতে শুরু করেছে এঞ্জিন, রওনা হচ্ছে বোধহয় বোট। এখন মনে হচ্ছে অনেক কাছে রয়েছে বোটটা। যেদিক থেকে শব্দ আসছে সেদিকে তাকিয়ে রইল রানা।

একটু পরেই দেখতে পেল রানা, ট্রলারের দঙ্গলটার পেছন থেকে প্রচণ্ড বেগে বেরিয়ে আসছে বড়সড় একটা স্পীড বোট। ফোয়ারার মত পানি ছিটকে পড়ছে সেটার দু'পাশে। পেছনটা অনেকখানি ঢুকে রয়েছে পানির ভেতর, সামনেটা খাড়া। ছুটে আসছে ওদের ডিঙিটার দিকে সোজাসুজি। লাফিয়ে উঠল ওর হৃৎপিণ্ডটা। ওটাকে এড়ানোর কোন সম্ভাবনা নেই। বৈঠা বাওয়া ছোট্ট ডিঙি নৌকা ওদের, কিছুই করতে পারবে না ওরা। সোজা এসে ডিঙিটার পেট বরাবর আঘাত করবে স্পীড বোটটার বো।

রিড আর উইলকিনসনের পুরোটা মনোযোগ রয়েছে হেন্ডারসনের বোটের দিকে। কিছুই খেয়াল করেনি ওরা। রানা যদি এখন টুপ করে নেমে পড়ে পানিতে তাও হয়তো টের পাবে না।

রাত্রির নিস্তব্ধতা চিরে এগিয়ে আসছে স্পীড বোট, প্রায় গায়ের ওপর এসে পড়েছে ডিঙির। রিডকে ডাকতে যাবে রানা, এমন সময় আতঙ্কিত চিৎকার শোনা গেল উইলকিনসনের। ঝট করে পেছন ফিরল রিড। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে। মুহূর্তের ভেতর মনে মনে একটা আন্দাজ করে নিল রানা: ডিঙির কোথায় এসে আঘাত করবে স্পীডবোট, ঠিক পেট বরাবর এগিয়ে আসছে সেটা। দ্রুত আরেকটু পেছনে সরে গলুইয়ের একেবারে প্রান্তে চলে এল ও।

ফুলস্পীডে এসে আঘাত করল স্পীডবোট ডিঙিটাকে। ভোঁতা একটা শব্দ উঠল শুধু। ডিঙিটাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে চলে গেল স্পীড বোট। প্রচণ্ড ধাক্কায় জ্যা-মুক্ত তীরের মত ছিটকে পড়ল রানা। এক সেকেন্ড পরেই বরফ শীতল পানিতে আবিষ্কার করল নিজেকে। পড়েই তলিয়ে গেল। হাত পা ছুঁড়ে তাড়াতাড়ি উঠে এল উপরে।

পানির ওপর মাথা জাগাতেই কাঁধের কাছে কিসের স্পর্শ পেল রানা। প্রথমে ভাবল ভেঙে যাওয়া ডিঙির কোন অংশ হবে হয়তো। পরমুহূর্তে বুঝতে পারল, শক্ত একটা হাত। ধরে ফেলেছে ওর কোটের কাঁধ। একটু পরেই বগলের তলা দিয়ে হাত চালিয়ে বাহুটা ধরে ফেলল। টানছে উপর দিকে।

মাথা ঘুরিয়ে উপর দিকে তাকানোর চেষ্টা করল ও। দ্বিতীয় আরেকটা হাত এসে ওর অন্য বাহুটাও আঁকড়ে ধরল। দেখতে পেল রানা, দু'জন লোক দু'দিক থেকে ধরে আছে ওকে, তৃতীয় আরেকজন হাঁটু গেড়ে বসে আছে দু'জনের মাঝখানে। একটা স্পীড বোটের উপর তিনজন লোক। সেই স্পীড বোটটাই বোধহয়, ভাবল রানা। কারণ পানিতে পড়ার আগে আশেপাশে আর কোন বোট দেখেনি ও।

মাঝের লোকটার চেহারা দেখে হাঁ হয়ে গেল রানার মুখ। গোদেনবার্গের স্ক্যান্ডা হোটেলে একে শেষবার দেখেছিল ও। এখন অবশ্য নাবিকের পোশাক পরে রয়েছে,

কিন্তু রিমলেস চশমার ও পাশের চাউনি বদলাতে পারেনি লোকটা। সুইডেনে সোভিয়েট এমব্যাসির প্রেস অ্যাটাশে ভ্লাদিমির রোসভের দিকে তাকিয়ে আছে ও।

পাঁচ

অনেকখানি ঝুঁকে এল ভ্লাদিমির রোসভ, এঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়েও যাতে শুনতে পায় রানা তার কথা।

'কোথায় জিনিসটা, রানা?' চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল সে।

মাথা নাড়ল রানা। জানে না ও। ঠক ঠক করে বাড়ি খাচ্ছে দু'পাটি দাঁত। চলছে বোট। বোটের সঙ্গে সঙ্গে দু'জন লোকের হাতে ঝুলন্ত অবস্থায় চলছে রানাও। দু'পাশ দিয়ে বেগে বয়ে যাচ্ছে সাগরের ঠাণ্ডা পানি। প্রতি মুহূর্তেই শুষে নিচ্ছে শরীরের মূল্যবান উষ্ণতা!

'কোথায়?' আবার জিজ্ঞেস করল ভ্লাদিমির।

'জানি না আমি,' অনেক কষ্টে উত্তর দিল রানা। বোটের বো থেকে ছিটকে আসা পানি ঝাপটা মারছে মুখে।

'তাহলে হেন্ডারসন কোথায়?'

'আমি জা...' ছলাৎ করে একগাদা পানি ঢুকে পড়ল ওর মুখে। খাবি খেলো রানা। কেশে উঠল খক্ খক্ করে। বেশ খানিকটা নোনা পানি চলে গেল পেটে। আরেকটু হলেই দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। লোক দু'জন আর একটু টেনে ধরল ওকে।

'বলো, রানা, কোথায় হেন্ডারসন?' জিজ্ঞেস করল ভ্লাদিমির।

'আমি জানি না, তবে...,' চিৎকার করে জবাব দিল রানা। আর কিছুক্ষণ এই ঠাণ্ডা পানিতে থাকতে হলে জ্ঞান হারাবে ও। হি হি করে কাঁপছে পুরো শরীর। তাকিয়ে আছে ভ্লাদিমির ওর দিকে। '...খুঁজছি আমরা।' অনেক কষ্টে শেষ করল রানা বাক্যটা।

অনেকক্ষণ ধরে একভাবে তাকিয়ে রইল ভ্লাদিমির ওর দিকে। রানাও তাকিয়ে থাকার চেষ্টা করছে। শরীর ছুঁয়ে এখনও বয়ে চলছে শীতল পানি, তার মানে বোটটা চলছে এখনও। গভীর সমুদ্রের দিকে নিয়ে যাচ্ছে নাকি?

'খুঁজে বের করো ওকে, রানা, খুঁজে বের করো,' আরও একটু ঝুঁকে এসে বলল ভ্লাদিমির। 'ট্র্যান্সপারেন্সিটাও খুঁজে বের করো, কেউ যেন না দেখে, বুঝেছ? একাই করবে কাজটা। ওই লোকগুলোর কাছ থেকে দূরে থাকবে। যা বললাম সেই মত কাজ না করলে আর কোনদিন দেখতে পাবে না মেয়েটাকে।'

'কেমন আছে সুফিয়া? আর জামিল? ঠিক আছে তো ওরা?'

'এখন পর্যন্ত,' বলল ভ্লাদিমির। 'যা বললাম, মনে রেখো। তা না হলে ঠিক না-ও থাকতে পারে।'

'চেষ্টা করব আমি,' একইরকম কষ্ট করে জবাব দিল রানা।

'চেষ্টা-ফেষ্টা বুঝি না। খুঁজে বের করবে ট্র্যান্সপারেন্সি, কেউ দেখার আগেই।'

হঠাৎ করেই থেমে গেল এঞ্জিনের শব্দ, কমতে শুরু করল বোটের গতি। আবার শোনা গেল ভ্লাদিমিরের গলা। এঞ্জিনের শব্দ না থাকায় অনেক জোরে শোনা গেল কথাগুলো। 'ওই আমেরিকানটার কাছ থেকে দূরে থাকবে। অন্য লোকটা, কি যেন নাম? উইলকিনসন, ওর কাছ থেকেও। দ্বিতীয়বার আর তোমাকে বাঁচাতে পারব না আমি। মনে রেখো।'

এখনও তাকিয়ে আছে রানা ভ্লাদিমিরের দিকে। কিছু বুঝতে পারার আগেই বগলের তলা থেকে হাত দুটো সরে গেল হঠাৎ। টুপ করে চলে গেল ও পানির নিচে। ঢক করে গিলে ফেলল রানা এক ঢোক নোনা পানি। কাশি এসে গেল। পানির নিচে কাশতে গিয়ে নাকে ঢুকে গেল পানি। এক্ষুণি পানির ওপরে মাথা না তুলতে পারলে শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা পড়বে ও। হাত-পা ছুঁড়ে উঠতে শুরু করল উপরে। নাকের ভেতর থেকে চোখ পর্যন্ত একটা সূঁচ ফোটানো যন্ত্রণার অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত।

পানির ওপরে মাথা তুলে লম্বা করে শ্বাস টানল রানা। খকর খকর করে কেশে সামলাল নিজেকে। গিলে ফেলা নোনা পানি গলা বেয়ে উঠে এল খানিকটা। একটু সুস্থ বোধ করছে এখন।

এবার ডাঙায় উঠতে হবে। ভাল করে তাকিয়ে দেখল, তীর থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে ওকে ছেড়ে দিয়ে গেছে ভ্লাদিমির। মাত্র আধ মিনিট সাঁতার কেটেই পায়ের তলায় পাথুরে মাটির স্পর্শ পেল রানা। ভয়ানক ঠাণ্ডা। দাঁতগুলো ঠক ঠক করে বাড়ি খেতে খেতে ব্যথা হয়ে গেছে। ঝটপট উঠে এল ও পানি থেকে। ফলে আরও বেশি শীত করতে লাগল।

চারদিকে তাকিয়ে নিজের অবস্থাটা ভাল করে দেখে নিল ও। লারউইক হারবারের দক্ষিণ প্রান্তে রয়েছে। যে জায়গা থেকে ডিঙিতে উঠেছিল ওরা সে জায়গাটা অনেক দূর এখান থেকে। মনে আছে, রিড এবং উইলকিনসনের সঙ্গে যখন রাস্তায় বেরিয়েছিল তখন বাতাস প্রায় ছিল না বললেই চলে। এখন খেয়াল করল আবার বাতাস বইতে শুরু করেছে, এবং বেশ জোরে।

এমনিতেই বরফের মত ঠাণ্ডা পানিতে চুব খেয়ে উঠেছে এইমাত্র, গায়ের কাপড় চুপচুপে ভেজা, তার ওপর আবার ঠাণ্ডা বাতাস। প্রায় জমে যাওয়ার অবস্থা হলো রানার। হাড় পর্যন্ত কাঁপুনি ধরে গেছে ঠাণ্ডায়। আপাতত শুকনো কাপড় পাওয়ার কোন আশা নেই। এই মুহূর্তে রাস্তায় ওঠাও নিরাপদ নয়, পুলিস থাকতে পারে। রিড আর উইলকিনসন নিশ্চয়ই এতক্ষণে সাঁতরে উঠে পড়েছে তীরে এবং ওর নিখোঁজ হওয়ার কথা জানিয়ে দিয়েছে পুলিসকে। সুতরাং এই মুহূর্তে কোন পুলিসের মুখোমুখি হওয়ার মানে আবার রিড মিঞার ফাঁদে পড়া।

একটা কথা ভেবে একটু স্বস্তি পেল রানা, লারউইক পুলিস স্টেশনের বেশির ভাগ পুলিসই হেন্ডারসনকে খুঁজতে বেরিয়ে গেছে। তবে প্রথমে ওরা নিশ্চয়ই লারউইকেই খুঁজবে হেন্ডারসনকে, আর ডিউটি কনস্টেবলও ওদেরকে রানার নিখোঁজ হওয়ার খবর দেয়ার কোন উপায় বের করে ফেলবে। সুতরাং ঝুঁকি নিয়ে দরকার

নেই।

ভ্লাদিমিরের কথা মনে পড়ল। পানির ভেতর হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে শোনা কথাগুলোর তাৎপর্য অনুধাবন করার চেষ্টা করল রানা। কিন্তু কিছুই ভাবতে পারল না। রিডের প্রায়োরিটির কথা মনে পড়ল। এই মুহূর্তে ওর জন্যে প্রায়োরিটি হচ্ছে কিছু শুকনো কাপড়। এই প্রায়োরিটি আবার গ্রেড-এ, ক্লাস ওয়ান ধরনের। এক্ষুণি দরকার শুকনো কাপড়ের। এই ভিজে কাপড়ে আর কিছুক্ষণ থাকলে নির্ঘাত নিউমোনিয়া। হাতের তালু দুটো গালে ঠেকাল, ঠাণ্ডা বরফ যেন। তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করল ও রাস্তার দিকে। শরীরটাকে গরম করার এটাই একমাত্র উপায় এখন। পুলিসের সামনে পড়লেও কিছু করার নেই, এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে ঠাণ্ডায় মারা যাবে।

একেবারে শান্ত চারদিক। হারবারের ওদিক থেকেও কোন শব্দ ভেসে আসছে না এখন। ডক শ্রমিকদের রাতের শিফটের ডিউটি শেষ হয়ে গেছে বোধহয়।

শহরের দিকে ফিরে আসতে লাগল রানা। একটা সাইডস্ট্রীটের মুখে এসে ভেতরে তাকাতেই একটা ফোন বুদের পরিচিত চেহারা দেখতে পেল। চারদিকে তাকিয়ে দেখল ও, কোন পুলিস বা স্থানীয় চৌকিদার আছে কিনা। নেই দেখে নিশ্চিত হয়ে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল বুদটার দিকে।

ওপাশ থেকে ঘুম জড়িত গলা শোনা গেল লারসনের।

'কে?' স্পষ্ট বিরক্তি ঝরে পড়ল ওর কণ্ঠ থেকে। সারাদিনের খাটা-খাটুনির পর একটু লেপের নিচে ঢুকেছে বেচারা, এমন সময় বিরক্ত করলে কেমন লাগে!

'মাসুদ রানা বলছি, চিনতে পারছেন?'

'এত রাত্রে? কোথায় ভেগেছিলেন আপনি?'

'পরে বলব। ভোর নাগাদ একটা বোট দরকার আমার। কোথায় পাব?'

'আমারই তো একটা বোট আছে। কোথায় যেতে চান?'

'এখনও জানি না। তবে ভোর বেলায়ই ওটা দরকার হবে আমার।'

'ভাড়া দিতে হবে কিন্তু।'

'কুছ পরোয়া নেই, ভাড়া পাবেন। আপনার বোটটা কি ধরনের?'

'কনভার্টেড লাইফবোট, এখন কেবিন ক্রুজার। খুব ভাল বোট। ক'টায় হলে চলবে?'

'এই ধরুন সাতটার দিকে।'

'অত ভোরে!' চিৎকার করে উঠল লারসন। পরমুহূর্তে সশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ঠিক আছে।'

'কোথায় আছে ওটা?'

'হে'স ডকে। হারবারের উত্তর প্রান্তে। সাতটার সময় দেখা হবে ওখানে।'

'কি নাম আপনার বোটের? চিনতে সুবিধা হবে তাহলে।'

'ব্লু-ঈগল।'

'থ্যাঙ্কস,' বলল রানা। 'এত রাত্রে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। চিন্তা করবেন না আপনি, প্রায়ই এরকম বিরক্ত হতে

হয় আমাকে। কিন্তু কি হয়েছিল আপনার? আধ ঘণ্টার বেশি অপেক্ষা করেছি আমি।'

'সেজন্যেও দুঃখিত। একটু জরুরী দরকারে যেতে হয়েছিল। বললাম তো পরে বলব।'

'ঠিক আছে, সকাল সাতটায়।' কেটে গেল লাইন।

হে'স ডক। হারবারের উত্তর প্রান্তে, অর্থাৎ টাউনেরও উত্তর প্রান্তে। অনেকটা দূর এখান থেকে, প্রায় আধমাইল। অতটা রাস্তা এই ভেজা কাপড়ে কারও চোখে না পড়ে হেঁটে যাওয়া কঠিন। জেটির পাশ দিয়ে রাস্তা, জেটিতে ভিড়ে আছে নানা ধরনের ট্রলার, বোট। কোথাও না কোথাও কেউ না কেউ জেগে আছে, এবং সবচেয়ে বেকায়দা মুহূর্তেই হয়তো দেখে ফেলবে। ঘুর পথে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রানা। শহরের পেছন দিক দিয়ে যেতে হবে। হারবারের জেটিগুলো এড়ানো যাবে তাহলে।

পা বাড়াল রানা। যথাসম্ভব দ্রুত হাঁটার চেষ্টা করছে ও, শরীরটা তাড়াতাড়ি গরম হবে তাতে। মাঝে মাঝেই এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছে কোন লোক দেখা যায় কিনা। এতরাতে কেউ দেখে চোর না মনে করে বসে!

পুলিস স্টেশনটা দেখা যাচ্ছে সামনে। মোটামুটি অর্ধেক পথ আসা গেছে তার মানে। পুলিস স্টেশনটা এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে একটা সরু গলিতে ঢুকে পড়ল রানা। দু'মিনিট পর গলির শেষ মাথায় পৌঁছল। গলি থেকে বেরিয়েই দেখল হারবারের সামনে পৌঁছে গেছে ও। কিন্তু সেদিকে নজর দেয়ার অবসর পেল না ও। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় অবশ হয়ে আসছে শরীর। এই মুহূর্তে ওর পক্ষে প্রচণ্ড শীত ছাড়া আর কোন বিষয়ে মন দেয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু এর ভেতরেও একটা ব্যাপার ওর নজর এড়াল না। একটা জিনিসের অনুপস্থিতি। কিছু একটা থাকার কথা ওখানে, কিন্তু নেই। হেন্ডারসনের বোটটা কোথায়? নতুন নোঙর করা আছে, দেখাই যাচ্ছে; কিন্তু অন্যটা?–যেটা বিক্রি করে দিয়েছে, সেই লিটল শেটল্যান্ড মডেলের বোটটা? অদৃশ্য হয়ে গেছে ওটা। রিড আর উইলকিনসনের সঙ্গে যখন হেন্ডারসনের বোট সার্চ করতে যাচ্ছিল তখনও খেয়াল করেছিল, ছিল বোটটা। কিন্তু এখন নেই।

আবার হাঁটতে শুরু করল রানা। একটু বাড়িয়েছে হাঁটার গতি। দ্রুত চলতে গিয়ে আরেকটু হলেই এক চৌকিদারের সামনে পড়ে যাচ্ছিল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বোধশক্তি একটু ভোঁতা হয়ে গেলেও সেই মুহূর্তে দ্রুত কাজ করল ওর মস্তিষ্ক। ঝট করে রাস্তার পাশের একটা ঝোপের আড়ালে বসে পড়ল ও, মিশে যেতে চেষ্টা করল ছায়ার সঙ্গে। চৌকিদারটা পার না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত চুপ করে বসে রইল। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হেঁটে গেল লোকটা, ধীরে ধীরে চলে গেল চোখের আড়ালে। ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আবার রওনা হলো রানা। একটু পর ছোট একটা ডকে এসে পৌঁছল। বেশ ছোট্ট একটা সাইনবোর্ড টাঙানো: 'হে'স ডক'। কারও চোখে না পড়েই তাহলে এসে পড়তে পেরেছে ও হে'স ডকে।

তীর থেকে প্রায় বিশ গজ দূরে নোঙর করা রয়েছে একটা বোট, ওটাই বোধহয় লারসনের "ব্লু-ঈগল"। কিন্তু উঠবে কি করে ওটায়? আশেপাশে তাকাল রানা, কোন

ডিঙি দেখতে পেল না। ভাসানো তো নয়ই, ডাঙার উপর উল্টো করেও রাখা নেই একটাও। আবার ঠাণ্ডা পানিতে নামতে হবে ভাবতেই শিউরে উঠল ও। কিন্তু উপায় নেই। বোটে উঠতে হলে নামতেই হবে পানিতে। লারসনের বোটে দু'একটা শুকনো কাপড় থাকতে পারে।

চোখ বুজে নেমে পড়ল ও পানিতে। ধীরে ধীরে সাঁতার কেটে এগোতে লাগল বোটের দিকে। ভেজা কাপড়গুলোর ওজন ভারী সীসার মত টানছে নিচের দিকে। তার ওপর ঠাণ্ডা। বিশ গজ সাঁতরাতেই অবস্থা খারাপ হয়ে গেল।

অবশেষে পৌঁছল ও বোটটার কাছে। প্রচণ্ড ভারী মনে হচ্ছে শরীরটাকে। আড়ষ্ট হয়ে গেছে হাত পা। বোটের গা ধরে ধরে আস্তে আস্তে বো-এর কাছে পৌঁছল ও। মাথা উঁচু করে দেখল নামটা। হ্যাঁ, ব্লু-ঈগলই। আবার ফিরে এল স্টার্নের দিকে। হাচড়েপাছড়ে উঠে পড়ল পানি পর্যন্ত ঝুলিয়ে দেয়া লোহার মইয়ের ধাপ তিনটে বেয়ে। কেবিনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তালা মারা দরজায়। কি আর করা যাবে, 'দুঃখিত, লারসন,' মনে মনে বলল রানা। বলেই দড়াম করে লাথি মারল দরজায়। হালকা দরজা, মড়াৎ করে খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে পড়ল ও।

পোর্টহোলগুলোয় পর্দা লাগানো। কিন্তু এত পাতলা যে বাতি জ্বালতে সাহস হলো না। পাতলা পর্দা ভেদ করে সামান্য চাঁদের আলো ঢুকছে কেবিনে। সেই আলোয় ঝাপসা ভাবে দেখা যাচ্ছে ভেতরটা।

খুঁজতে শুরু করল রানা। একটা লকারের ভেতর পাওয়া গেল একটা সোয়েটার। একটু স্যাঁতসেঁতে ভাব সেটায় তবু ওর ভেজা কাপড়ের চেয়ে অনেক শুকনো, অনেক গরম আর অনেক ভাল। একটা স্পেয়ার ট্রাউজারও পাওয়া গেল। আরেকটু খুঁজতেই একজোড়া সেইলিং বুট, অয়েলস্কিন আর একটা ডাফেল কোটও পাওয়া গেল। আর কি চাই? ঝটপট ভেজা কাপড়গুলো খুলে ডাফেল কোটটা দিয়ে গা-মাথা মুছে ট্রাউজার আর সোয়েটার পরে নিল ও। একটু ভাল বোধ করছে এখন, তবে ভীষণ দুর্বল।

কন্ট্রোলটা দেখতে লাগল রানা। চমৎকারভাবে কনভার্ট করা হয়েছে ব্লু-ঈগলকে। একটা পুশ-পুল ফুয়েল সুইচ দেখল ও। সেল্‌ফ স্টার্টার, একটা সিম্পল থ্রটল, ফরওয়ার্ড-অ্যাস্টার্ন লিভার, মোটামুটি সহজই মনে হচ্ছে এটা চালানো।

স্টার্টার সুইচটায় টিপ দিতেই প্রচণ্ড শব্দ উঠল একটা। কিন্তু স্টার্ট নিল না এঞ্জিন। পোর্টহোল দিয়ে মাথা বের করে চারপাশটা দেখল ভাল করে। কেউ খেয়াল করছে? কিছু বোঝা গেল না। আগের মতই নিস্তব্ধ, নিস্তরঙ্গ চারদিক। আবার চেষ্টা করতেই স্টার্ট নিল ইঞ্জিন। পায়ের নিচে মসৃণ একটা কম্পন।

ডেকে বেরিয়ে এল রানা। নোঙর তুলে শিকলটা গুছিয়ে রেখে আবার এসে ঢুকল কেবিনে। হুইলের সামনে বসে সামান্য একটু ঠেলে দিল থ্রটল। ধীরে ধীরে সামনের দিকে চলতে শুরু করল বোট।

প্রবণতা বলছে ফুল স্পীডে চালাতে, আর যুক্তি বলছে—স্লো। যুক্তির কথা শুনবে বলে ঠিক করল রানা। জোরে চালালে কেউ কোনখান থেকে খেয়াল করবে। হারবারের ভেতর রাতের এই সময়ে অতজোরে বোট চালাতে দেখলে নির্ঘাত

রিপোর্ট করবে হারবার কন্ট্রোলে। কথায় বলে, সি-পোর্টের প্রতিটা কোণে একটা করে চোখ বসানো থাকে। ধীরে ধীরে ডকের মুখটা পেরিয়ে এল ও।

হঠাৎ আলোর কথা মনে পড়ল রানার। রাত দুপুরে জোরে বোট চালানো যেমন সন্দেহজনক বাতি নিভিয়ে চালানোটাও তেমনি সন্দেহজনক। তাড়াতাড়ি সুইচ খুঁজে মাস্টহেডের বাতিটা জ্বালল। একটা বাতি জ্বালা যা দুটো বাতি জ্বালাও তা–ভেবে কেবিনের বাতিটাও জ্বেলে দিল।

এখনও নিশ্চুপ হারবারটা। বোধহয় আরও কয়েক ঘণ্টা থাকবে এরকম। একটাও জাহাজ চলাচল করছে না, কোন বোটও না। এমন কি হারবার প্যাট্রলের কোন বোটও চোখে পড়ল না। জেটিগুলোও জনশূন্য, একটা ক্রেনও চলছে না। থ্রটলটা আর একটু ছাড়ল রানা। আলোকিত কেবিনের ভেতরটায় দৃষ্টি বুলাল একবার। একদিকে কয়েকটা লকার, একটা সিঙ্ক, একটা কেরোসিন স্টোভ। খাবারও আছে নাকি? হ্যাঁ, তাই তো মনে হয়, কয়েকটা টিন দেখা যাচ্ছে। একটু খুঁজতেই প্রচুর খাবার বেরুল। শুকনো মাংস, বিন সুপ, কয়েকটা চকোলেট বার, চা, কফি, চিনি আর প্রায় আধবোতল "দি গ্রাউজ বিউটিফুল এন্ডারলি স্কচ হুইস্কি।"

বোতলটা তুলে নিল রানা। ঢক ঢক করে খানিকটা নির্জলা হুইস্কি ঢেলে দিল গলায়, তারপর এক কামড় দিল চকোলেটে। চমৎকার হুইস্কি, চকোলেটটাও। আরেক চুমুক হুইস্কি খেলো। হুইস্কিটুকু পেটে পড়তেই আবার জ্যান্ত হয়ে উঠল যেন ও।

হুইলটা অটোতে সেট করে উঠে স্টোভটা জ্বালল রানা। একটা কেটলিতে খানিকটা পানি নিয়ে চাপিয়ে দিল, তারপর হুইলের কাছে ফিরে এসে বিনের ক্যানটা খুলে খেতে শুরু করল গোগ্রাসে, চোখ রয়েছে সামনের দিকে। হারবারে কোন জাহাজ বা বোট চলাচল করছে না ঠিকই, তবে বাইরে থেকে কোন জাহাজ যে আসবে না নিশ্চিত করে বলা যায় কি?

কিছুক্ষণ পরেই কেটলিতে পানি ফোটার সোঁ সোঁ শব্দ শোনা গেল। আবার স্টোভের কাছে ফিরে এল রানা। দ্রুতহাতে প্রায় একমগ কফি বানিয়ে নিয়ে ফিরে এল হুইলের কাছে। এক হাতে হুইল ধরে চুমুক দিতে লাগল ধীরে ধীরে। বেশ সময় নিয়ে গরম কফিটুকু শেষ করল ও। কফিটুকু খেয়ে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠল। আবার গরম হয়ে উঠেছে শরীরটা। খুশি খুশি লাগছে।

ইতোমধ্যে কয়েকটা চার্ট খুঁজে পেয়েছে ও। কোন্ রুটটা ধরবে ভাবছে। লারউইক থেকে আড়াআড়িভাবে চ্যানেলটা ক্রস করলেই ব্রিসে আইল্যান্ড। ব্রিসের শেষ প্রান্ত ঘেঁষে নস এবং নস-এর শেষ প্রান্তে হোম অভ নস। নস ও ব্রিসের মাঝখানে চার বা পাঁচশো গজের একটা সরু চ্যানেল। হেন্ডারসন যদি সবার দৃষ্টির আড়ালেই চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে তো তার হোম অভ নস এ-ই যাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। অন্য কোথাও যে যেতে পারে না তা অবশ্য নয়, তবে লিট্‌ল শেটল্যান্ড মডেলের বোটটা মাঝরাত্রে অদৃশ্য হওয়ায় মোটামুটি ধরে নিয়েছে রানা, ওখানেই গেছে সে।

কিন্তু একটু পর ওর নিজের কাছেই কেমন উদ্ভট লাগতে লাগল যুক্তিটা।

শেটল্যান্ডেই হাজার খানেক লুকোনোর জায়গা আছে, ও নিজেই বলেছিল রিড আর উইলকিনসনকে–মিথ্যে নয় কথাটা। তা ছাড়া অদৃশ্য হয়ে যাওয়া বোটটা এখন আর হেন্ডারসনের সম্পত্তি নয়। এককালে ছিল হয়তো, কিন্তু তাতে কি এসে গেল? এরকম একটা ট্রিপে নিজের বোট ব্যবহার করাই সুবিধাজনক। কাউকে কিছু না জানিয়েই রওনা হওয়া সম্ভব তাহলে। অবশ্য উল্টো যুক্তিও দেখানো যায়, ও এখনও লারউইকে আছে এটা প্রমাণ করার জন্যেই নিজের বোট না নিয়ে অন্যের বোটে করে রওনা দিতে পারে।

যা হোক, দেখা যাক কি হয়। এ পর্যন্ত হেন্ডারসন সম্পর্কে যতটুকু জানতে বা বুঝতে পেরেছে তাতে মনে হয় উঁচু নির্জন জায়গার প্রতি শুধু আকর্ষণ নয়, ওপরে ওঠার একটা মানসিক প্রবণতাও রয়েছে লোকটার। তাছাড়া একটু স্বাধীনচেতা ধরনের লোক সে, নিজের পথ নিজেই বেছে নিতে চাইবে, এবং অবশ্যই নিজের পদ্ধতিতে। আর সেক্ষেত্রে হোম অভ নস-এ আসাটাই ওর চরিত্রের সঙ্গে মেলে সবচেয়ে বেশি। তাছাড়া, অল্প কয়েকজনই জানে যে সে উঠতে পারে ওখানে। শ্বেত প্যাঁচার কারণেই ব্যাপারটা গোপন রাখতে হয়েছে ওকে। ওখানে পৌঁছেও ও না চাইলে ওকে খুঁজে বের করা যাবে বলে মনে হয় না।

দক্ষিণে ব্রিসের দিকে কোর্স সেট করল রানা। খুব একটা দূরে নয় দ্বীপটা। এখান থেকেই অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে দ্বীপের অন্ধকার অবয়ব। পুরো দ্বীপজুড়ে পাহাড়ের চূড়াগুলো উঠে গেছে উপরে। বেশ উঁচু হবে পাহাড়গুলো, মনে হলো ওর।

হঠাৎ করে ফুয়েলের কথা মনে পড়ল রানার। কতটুকু তেল আছে ব্লু-ঈগল-এর ট্যাঙ্কে আল্লা মালুম! এখন আর চেক করার কোন উপায় নেই, লাভও নেই। জাহান্নামে যাক্, আগে মনে পড়ল না কেন, দাঁত কড়মড়িয়ে ভাবল রানা। মাথাটা যাচ্ছে। এত অসতর্ক হলো কবে থেকে ও? না হবেই বা কেন? আর কিছুদিন রিপোর্টারগিরি করলে যে অবস্থা হবে তাতে ঢাকায় গেলে নির্ঘাত ডেস্কে বসিয়ে দেবে বুড়ো মিঞা।

যা হয় হবে, তেলের অভাবে এঞ্জিন একেবারে বন্ধ না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রানা। হুইস্কির বোতলটা তুলে নিয়ে আরও খানিকটা ঢালল গলায়। ভ্লাদিমির রোসভের কথা ভাবতে লাগল, গোদেনবার্গ থেকে খুবই তাড়াতাড়ি এখানে এসেছে সে। কিভাবে? প্লেনে? উঁহুঁ, ইংল্যান্ডের মেইনল্যান্ড না হয়ে গোদেনবার্গ থেকে এখানে আসার কোন উপায় নেই। সেক্ষেত্রে সোভিয়েট এমব্যাসির প্রেস অ্যাটাশের পরিচয়দানকারী একজন লোকের পক্ষে এত তাড়াতাড়ি এখানে এসে পৌঁছুতে পারার কথা নয়। অফিশিয়াল ফর্মালিটি সারতেই অনেক সময় লেগে যাওয়ার কথা।

চার্টার্ড প্লেন? বোধহয় না। সেটাও খুব একটা যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে না। সোভিয়েট কূটনীতিককে নিয়ে চার্টার্ড প্লেন লন্ডনের অনুমতি ছাড়া নামতেই পারবে না সামবার্গে। আর পারলেও এত অবাধে ঘোরাফেরা করার সুযোগ পেত না ভ্লাদিমির।

যদি ছদ্ম পরিচয়ে এসে থাকে? হ্যাঁ, তা সম্ভব। তাছাড়া, শেটল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ

অ্যাবার্ডিনের চেয়ে স্ক্যান্ডিনেভিয়ারই বেশি কাছাকাছি, বিশেষ করে নরওয়ের। আর সে কারণেই বোধহয় শেটল্যান্ডাররা যতখানি না ব্রিটিশ তার চেয়ে বেশি নরওয়েজিয়ান। বড়সড় একটা ফিশিং ট্রলারে করে এলেও পনেরো-ষোলো ঘণ্টার বেশি লাগার কথা নয়। ভ্লাদিমিরের পক্ষে আরও দ্রুতগামী জাহাজ জোগাড় করাও খুবই সম্ভব।

যা হোক, যেভাবেই এসে থাকুক, ভ্লাদিমির এসেছে এখানে এটাই বড় কথা। কিন্তু যে কথাগুলো সে বলল খানিক আগে, তার অর্থ কি? ওয়ে শেটল্যান্ডে এসেছে তা জানা কঠিন কিছু নয় ভ্লাদিমিরের পক্ষে। স্যান্ডনেসে হেন্ডারসনের কটেজে থাকতেই নকল ফ্রান্সিস নকল সার্জেন্ট টমাসকে পাঠিয়েছিল ওর উপস্থিতির খবর জানাতে। মনে হচ্ছে ভ্লাদিমিরই কে.জি.বি-র এই অপারেশনের লীডার, সুতরাং ধরে নেয়া যায় নকল টমাস তার সঙ্গেই রেডিও কন্ট্যাক্ট করেছিল। ভাল কথা, তারপর? তারপর ওর লোকেরা খুঁজেছে রানাকে এবং ঠিক ঠিক বের করে ফেলেছে কোথায় আছে ও এবং ওরা যখন হেন্ডারসনের বোট চেক করতে যাচ্ছে তখন সুযোগ বুঝে ডিঙি উল্টে দিয়ে রিড আর উইলকিনসনের কাছ থেকে আলাদা করে ফেলেছে ওকে। কিন্তু ওকে হাতে পেয়েও না আটকে ছেড়ে দিল কেন ভ্লাদিমির, ভেবে পেল না রানা।

প্রশ্নগুলো নিয়ে যতই ভাবছে ও, ততই পরিষ্কার হয়ে আসছে উত্তরটা। একটাই উত্তর, ভ্লাদিমির ধরে নিয়েছে—অন্তত আন্দাজ করেছে যে ট্র্যান্সপারেন্সিটা যদি কেউ উদ্ধার করতে পারে তো রানাই পারবে। হয়তো সুফিয়াই ওকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছে কথাটা। ওয়ার্নিংটার কথা মনে পড়ল, 'আর কেউ দেখার আগেই ট্র্যান্সপারেন্সিটা ফেরত দিতে হবে, নইলে সুফিয়া...'

কিসের ছবি আছে ট্র্যান্সপারেন্সিটায়? প্রশ্নটা আবার জাগল ওর মনে। একটু টেকনোলজির ছোঁয়া লাগা ফিফটিজের মেলোড্রামা? প্ল্যানের ফটোগ্রাফ? নাকি নির্মাণাধীন জাহাজের ছবি? একটা মাত্র ছবি দেখে কি বলে দেয়া যায় কি ধরনের জাহাজ তৈরি হচ্ছে? মনের পর্দায় ভেসে উঠল একটা এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ারের ছবি, নির্মাণ কাজ অনেকদূর এগিয়ে গেলে সম্ভব হয়তো, ভাবল রানা।

রানা যদি দেখে ট্র্যান্সপারেন্সিটা? তাহলে ও-ও শেষ। কারণ তাহলেও রাশিয়ানদের গোপনীয় ব্যাপারটা আর গোপন থাকল না। যা দেখেছে তা অন্য কারও কাছে প্রকাশ করার আগেই সরিয়ে দিতে হবে ওকে দুনিয়া থেকে। হেন্ডারসন যদি দেখে থাকে লেন্সকেসের ভেতরে লুকোনো জিনিসটা তাহলে তাকেও। অর্থাৎ যারা দেখবে ওটা তাদের সবাইকেই বিদায় নিতে হবে পৃথিবী থেকে। 'ট্র্যান্সপারেন্সিটা উদ্ধার করে দিয়েছ বলে অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে, এবার নিয়ে যাও তোমার বান্ধবীকে,' ওটা উদ্ধার করে হাতে দেয়ার পর ভ্লাদিমির নিশ্চয়ই একথা বলবে না। বরং সবাইকে সাফ করে দেয়াই ওদের জন্যে নিরাপদ।

রানা, সুফিয়া, হেন্ডারসন তিনজনকেই শেষ করে দিতে হবে ওদের। জামিলকে? জিনিসটা ও না দেখলেও, রাশিয়ানদের কুকীর্তির কথা ফাঁস করে দিতে পারে ছেড়ে দিলে, সুতরাং ওকেও মরতে হবে। ট্র্যান্সপারেন্সিটা দেখা তো দূরের

কথা, যারা ওটা স্পর্শ করবে তাদের জীবনও নিরাপদ নয়। তবে ভ্লাদিমির এটাও জানে, যতক্ষণ রানা বিশ্বাস করবে ভাল আছে সুফিয়া আর জামিল ততক্ষণ জিনিসটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে ও। সুতরাং ট্র্যান্সপারেন্সিটা ফেরত পাওয়ার আগ পর্যন্ত সুফিয়া নিরাপদ।

সামনে বেশ খানিকটা দূরে একটা লাল বাতি দেখে সতর্ক হলো রানা। তাড়াতাড়ি চার্টের দিকে তাকাল।

লাল কালি দিয়ে ক্রস-মার্ক দেয়া একটা জায়গা দেখতে পেল চার্টে। নিচে মোটা আন্ডারলাইন করে লেখা, 'অয়েল রিগ রেক' অর্থাৎ অয়েল রিগের ধ্বংসাবশেষ। বহুদিন আগে ওখানে বোধহয় তেল অনুসন্ধানের জন্যে রিগ বসানো হয়েছিল। তেল পাওয়া যায়নি অথবা অন্য কোন কারণে পরিত্যক্ত হয় রিগটা। খুলে-টুলে জিনিসটা নিয়ে যাওয়া খরচে পোষায়নি বোধহয়, তাই ফেলে রেখে গেছে অনুসন্ধানকারী কোম্পানি।

মিনিটখানেক পর অয়েল রিগের ধ্বংসাবশেষটার পাশ কাটিয়ে ব্লু-ঈগলকে চালিয়ে নিয়ে গেল রানা। পানির ওপর মাথা জাগিয়ে বেঁকে চুরে রয়েছে কয়েকটা স্টিল গার্ডার। ছোট ছোট ঢেউ বারবার ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে ওগুলোর মাথা।

অয়েল রিগ রেকটা পার হয়ে আসার পর ঢেউগুলোর আকৃতি বড় হলো একটু। প্রশস্ত খোলা সাগরে এসে পড়েছে বোট। এতক্ষণ স্থিরভাবে পানি কেটে এগোচ্ছিল ব্লু-ঈগল, এখন ঢেউয়ের দোলায় নাচতে নাচতে চলেছে। হুইলটাকে শক্ত করে ধরল রানা, বাতাস বেড়ে গেছে অনেক। বাড়তে বাড়তে পুরোপুরি ঝড়ের রূপ নিলেও কিছু করার নেই। উত্তর সাগরের এই এলাকায় যখন তখন জানান না দিয়ে ঝড় আসাটা বিচিত্র কিছু নয়। এইটুকু বোট নিয়ে এতদূর আসা বোধহয় ঠিক হয়নি।

দক্ষিণ-পশ্চিম দিক লক্ষ্য করে চলছে বোট। ব্রিসে দ্বীপটা দেখা যাচ্ছে সামনে। অনেক স্পষ্ট। চার্টে আশেপাশের অন্যান্য দ্বীপগুলোর অবস্থান দেখল রানা। পেছনে জিও অভ দি ভেং; সামনে বার্ড হেড; তারও পরে হ্যামার এবং মাকল হেল। ব্রিসে দ্বীপের উত্তর প্রান্তের একটা পাহাড়ী অন্তরীপ ঘুরে নস-এর দিকে কোর্স সেট করল ও। ঝড় যদি ওঠেই, যখন উঠবে তখন দেখা যাবে।

একহাতে হুইল, অন্য হাতে চার্টটা ধরে আছে ও। কিভাবে গেলে সুবিধা হবে দেখছে। জীবনে কখনও আসেনি এদিকে, সুতরাং এই চার্টই একমাত্র ভরসা।

নস আইল্যান্ডটা একটু অদ্ভুত আকৃতির। মূল দ্বীপটার একেবারে পশ্চিম প্রান্তের মাঝামাঝি জায়গা থেকে বেরিয়েছে সরু লম্বা এক চিলতে স্থলভাগ। এই স্থলভাগটুকুর দু'দিকে রয়েছে আরও সরু সরু দুটো বেলাভূমি। মূল দ্বীপটা মোটামুটিভাবে পুব-পশ্চিমে সরু ভূখণ্ডটাসহ দেড় মাইল এবং উত্তর-দক্ষিণে এক মাইল। চার্ট অনুযায়ী, পশ্চিম প্রান্তের সরু ভূ-খণ্ডটুকুর প্রান্তভাগ খুবই নিচু—সি-লেভেল থেকে তিনচার ফুটও হবে না বোধহয়, আর দু'শো ফুটের মত চওড়া, প্রায় সিকি মাইল মত লম্বা।

সামনে তাকিয়ে ঝাপসাভাবে একটা দ্বীপ দেখতে পেল রানা। সম্ভবত নস আইল্যান্ড। আর একটু এগিয়ে যেতেই পশ্চিম দিকের সরু স্থলভাগটুকু নজরে

পড়ল। এটাই তাহলে নস। সরু স্থলভাগটুকুর পশ্চিম প্রান্ত থেকে ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে এসেছে একটা ঢাল, মিশেছে মূলদ্বীপের দক্ষিণ-পুব কোণের একটা চূড়ার সঙ্গে। চূড়াটার নাম চার্টে উল্লেখ করা হয়েছে, দি ন্যুপ। এই দি ন্যুপ-এর দক্ষিণ পুব পাশে হোম অভ নস। ন্যুপ আর হোম অভ নস-এর মাঝখানে খুব সরু একটা চ্যানেল, চওড়ায় গজ ত্রিশেকের বেশি হবে না।

দ্বিধায় পড়ে গেছে রানা। যাবে হোম অভ নস পর্যন্ত? গিয়ে লাভ হবে কিছু? লারসন যা বলেছে সে অনুযায়ী কমপক্ষে দু'শো ফুট উঁচু চূড়াটা। ওটার গোড়ায় পৌঁছে কি করবে ও? হেন্ডারসনের নাম ধরে চিৎকার? সাগরের গর্জনেই চাপা পড়ে যাবে ওর গলার স্বর, উপর পর্যন্ত পৌঁছবে না। আর ক্র্যাডল হোমের চূড়ায় ওঠার চেষ্টা করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। খাড়া উঠে গেছে পাহাড়ের গা। এ পর্যন্ত দু'জন মাত্র লোক উঠতে পেরেছে ওখানে, প্রাচীনকালের কিংবদন্তীর সেই লোকটা আর হেন্ডারসন। কি করবে? দু'চোখ মেলে প্রাণ ভরে একবার দ্বীপটা দেখেই ফিরে যাবে?

বোটে ওঠার পরপরই শুকনো পোশাক, খাবার আর গরম কফি পেয়ে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল ও, এখন আবার দুর্বল বোধ করতে শুরু করেছে। নির্ঘুম চৌত্রিশ ঘণ্টা পার করে দিয়েছে ও। সারাদিনের ধকল, তারপর ডিঙি উল্টে ঠাণ্ডা পানিতে চুব খাওয়া, সব মিলিয়ে ভয়ানক ক্লান্তি লাগছে। হুইল ধরে বসে থাকতেই কষ্ট হচ্ছে। ঘুমে ভেঙে আসছে চোখ। হাই উঠছে বার বার। বাঙ্কে উঠে শুয়ে পড়তে পারলে হত। কিন্তু এখন ঘুমোনোর প্রশ্নই ওঠে না। হেন্ডারসনকে খুঁজে বের করতে হবে, সুতরাং হোম অভ নসটা না দেখে যেতে পারে না ও।

কিন্তু সবচেয়ে আগে দরকার শক্তি। কোথায় যেন পড়েছিল রানা চিনিতে দ্রুত শক্তি পাওয়া যায়। তাই তো। খাবারের লকারটায় টিন ভর্তি চিনি রয়েছে। তাড়াতাড়ি প্রায় আধ কাপ চিনি গ্লাসে নিয়ে পানি দিয়ে গুলে খেয়ে নিল ও। সব চিনি গলেনি পানিতে। কচমচ করে চিবিয়ে খেয়ে নিল বাকিটুকু। কাঁচা চিনি খেতে গিয়ে আরেকটু হলেই বমি এসে যাচ্ছিল। সামলাল অনেক কষ্টে। ছেলেবেলায় মায়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে টিন খুলে মুঠ মুঠ চিনি খাওয়ার কথা মনে পড়ে গেল। কি মজাই না পেত তখন কাঁচা চিনি খেয়ে। আর এখন বমি এসে যাচ্ছে, আশ্চর্য!

একটু পরেই অবশ্য এইসব বমি-টমির কথা ভুলে যেতে হলো ওকে। আধখানা চাঁদের ঝাপসা আলোয় সামনে দেখা যাচ্ছে ছোট্ট একটা বেলাভূমি। চার্টে নেসটি ভো হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে জায়গাটাকে। নেসটি ভো পেরিয়ে আর একটু যাওয়ার পরই দেখতে পেল ক্র্যাডেল হোম বা হোম অভ নস পাহাড়টা। সমুদ্রের ভেতর থেকেই একেবারে খাড়া একটা পিলারের মত উঠে গেছে কমপক্ষে দুশো ফুট উঁচুতে। একটুও হেলানো নয় পাহাড়টার গা, আয়তন গোড়ায় যতখানি চূড়ায়ও ততখানিই। মূল নস দ্বীপ এবং হোম অভ নসের মাঝখানের সরু চ্যানেলটা দেখল ও। শিউরে ওঠার মত দৃশ্য। অত্যন্ত দক্ষ নাবিক না হলে ওই চ্যানেলের ভেতর বোট ঢোকাতে সাহস পাবে না কেউ। চওড়ায় খুব বেশি হলে নব্বই কি একশো ফিট। কিন্তু ওই একশো ফিট জায়গার ভেতরেই অসংখ্য ছোট ছোট ডুবো পাহাড়। মাথা জাগিয়ে আছে কিছু, পানির লেভেলের নিচেও রয়েছে অনেকগুলোর মাথা। ওই

সব ছোট ছোট ডুবো পাহাড়ে সমুদ্রের স্রোত বাধা পাওয়ায় ভয়ঙ্কর চেহারা ধারণ করেছে চ্যানেলটা। বাধা পেয়ে ওই জায়গাটুকুতে স্রোতের বেগ বেড়ে গেছে বহুগুণ। ঢেউগুলোর চেহারাও হয়েছে মারাত্মক। পাহাড়ের গায়ে শতটুকরো হয়ে আছড়ে পড়ছে ঢেউগুলো। ফোয়ারার মত হয়ে ছিটকে উঠছে পানি। সাদা ফেনা জমে গেছে মনে হয়। ওপাশে দেখা যাচ্ছে দি ন্যুপ পাহাড়টা। ওটারও এদ্দিকের গা-টা উঠে গেছে হোম অভ নস-এর মাথা ছাড়িয়ে একেবারে খাড়াভাবে।

হোম অভ নস-এ ওঠার কোন প্রশ্নই আসে না এদিক দিয়ে, এমন কি নস আইল্যান্ডে নামার মত কোন জায়গাও নেই এদিক দিয়ে। হোম অভ নস-এর সামনে এসে বোটের স্পীডটা একটু কমিয়েছিল রানা, আবার বাড়িয়ে দিল। দক্ষিণ দিক দিয়ে ঘুরে নস-এর পশ্চিম উপকূলে চলে গেল বোট নিয়ে। এপাশেও নামার মত জায়গার খুব অভাব মনে হলো। বেশির ভাগ জায়গাই সমুদ্রের ভেতর থেকে উঠে গেছে খাড়া। প্রায় মাইল খানেক যাওয়ার পর একটা বেলাভূমি মত দেখতে পেল রানা। নস ভো নাম জায়গাটার, চার্ট দেখে জানতে পারল ও। আর একটু গেলেই সরু ভূখণ্ডটা।

নস ভোর সৈকতটা এমন যে এখান দিয়ে সহজেই নামা যাবে। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল রানা। এমনিতেই খুব জোরে চলছিল না বোট, এখন ইঞ্জিন বন্ধ করে দিতেই দ্রুত কমে আসতে লাগল গতি। কূল থেকে প্রায় পনেরো গজ দূরে থাকতেই বোটের তলা ঠেকে গেল মাটিতে। মৃদু একটা ঝাঁকুনি খেয়ে থেমে গেল।

এখন ? শুকনো পায়ে কিভাবে তীরে ওঠা যায় ভাবতে লাগল রানা। অন্য জায়গায় বোট ভেড়ানো যায় কিনা দেখবার আশায় আবার এঞ্জিনে স্টার্ট দিল। ফরোয়ার্ড-অ্যাস্টার্ন লিভারটা অ্যাস্টার্নের দিকে টেনে দিতেই পেছন চলতে লাগল ব্লু-ঈগল। প্রায় একশো গজ দূরে আরেকটা জায়গায় নিয়ে বোট ভেড়ানোর চেষ্টা করল ও। কিন্তু এবার কূল থেকে কমপক্ষে চল্লিশ গজ দূরে মাটিতে ঠেকে গেল বোটের তলা। আবার স্টার্ট দেয়া, আবার পেছনে চলা, আবার অন্য জায়গায় নিয়ে বোট ভেড়ানোর চেষ্টা করা। তৃতীয়বার ব্যর্থ হয়ে শুকনো পায়ে তীরে ওঠার আশা ত্যাগ করল রানা। প্রথম যে জায়গায় থেমেছিল সেখানেই গিয়ে থামল আবার।

ট্রাউজারটা হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে নোঙরটা হাতে করে নেমে এল ও পানিতে। ঠিক হাঁটু পর্যন্তই ডুবল পানির নিচে। যাক বাবা, ছপাৎ ছপাৎ করে হেঁটে সৈকতের উপর গিয়ে উঠল রানা। পানির একটু উপরেই বড় একটা পাথরের সঙ্গে আটকে দিল নোঙর। নোঙরের সরু শিকলটা দু'হাতে ধরে টেনে দেখল, ভাল ভাবেই আটকেছে, ছুটে যাওয়ার ভয় নেই।

পাথরটার উপরেই বসল রানা। লারসনের রাবারের সেইলিং বুটজোড়া খুলল পা থেকে। ঝেড়ে ঝেড়ে বুটের ভেতর থেকে পানি বের করে আবার পরল সেগুলো। হাঁটতে শুরু করল সৈকতের ওপর দিয়ে। দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে যেখান থেকে সরু ভূখণ্ডটা বেরিয়েছে সেখানে ছোট্ট একটা ঘর আছে। চার্টে 'শেফার্ডস হাউস' অর্থাৎ রাখালদের ঘর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে জায়গাটাকে। সেদিকেই হাঁটতে লাগল ও।

পাঁচ মিনিটও লাগল না কুঁড়ে ঘরটার কাছে পৌঁছতে। বাইরে থেকে ফাঁকা আর পরিত্যক্ত মনে হলো ঘরটাকে। কতদিন আগে ব্যবহার হত ঘরটা কে জানে। খুব একটা মনোযোগ দিল না ও ঘরটার দিকে। ফাঁকা ঘরটার ভেতরে একবার উঁকি দিয়েই চলতে শুরু করল পুব-দক্ষিণ কোণ বরাবর। ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে উপর দিকে উঠে গেছে পথটা। কিছু দূর যাওয়ার পর শুরু হলো উৎরাই। শ'খানেক গজ ঢালু হয়ে নেমে যাওয়ার পর আবার চড়াই। এবার অনেক খাড়াভাবে উঠে গেছে প্রায় চূড়া পর্যন্ত। চড়াই বেয়ে উঠতে শুরু করল রানা। বহুদিন ধরে ভেড়া চলাচলের ফলেই বোধহয় সৃষ্টি হয়েছিল একটা পায়ে চলা পথ। পথটার কোন অস্তিত্ব নেই এখন আর, সরু লম্বা একটা গর্ত টের পাওয়া যায় কেবল।

পথটার দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে হেঁটে চলেছে রানা। উল্টোদিকে কয়েক গজ দূরেই খাদ, খাড়া নেমে গেছে নিচে। এই মুহূর্তে খুব একটা বিপদের সম্ভাবনা দেখছে না ও, তবু একটু ভয় ভয় লাগছে যেন। পুরো দ্বীপটাতে এখন সম্ভবত ও-ই একমাত্র জীবিত মানুষ, কথাটা ভাবতেই কেমন একটু ছম ছম করে উঠল গা।

প্রতি মুহূর্তেই উপরে, আরও উপরে উঠে যাচ্ছে পথ। ইতোমধ্যেই সি-লেভেল থেকে প্রায় দেড়শো ফিট উপরে উঠে এসেছে ও। পা পিছলে বা হোঁচট খেয়েও যদি একবার পড়ে তো সোজা পড়তে হবে খাদের নিচে, হাড়গোড় একটাও থাকবে না তাহলে। পথটার এখানে ওখানে অসংখ্য খরগোশের গর্ত। ওগুলোকেই আরও বেশি ভয়। বেখেয়ালে যদি কোন একটার ভেতরে পা পড়ে যায় তো তাল সামলানো শক্ত হবে। পাশের খাদে না পড়লেও ঢালু পথে গড়িয়ে একেবারে নিচ পর্যন্ত চলে যাবে নির্ঘাত।

প্রচণ্ড ক্লান্তি আবার এসে ভর করছে শরীরে। ব্যথা করছে পা দুটো। বসে পড়ার ইচ্ছেটা দমন করল বহুকষ্টে। পাহাড়ী পথে হাঁটার অভ্যেস যাদের নেই তারা হঠাৎ করে পাহাড় টপকাতে শুরু করলে যে অবস্থা হয় ওরও সেই দশা। একটু দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে তাকাল। অনেকখানি উঠে এসেছে। প্রায় অর্ধেক। অনেকদূরে দেখা যাচ্ছে রাখালদের কুটিরটা। আবার তাকাল চূড়ার দিকে, উপরের ঢালুটা আরেকটু খাড়াভাবে উঠে গেছে বোধহয়।

পায়ের পেশীগুলোর জড়তা ছাড়িয়ে নিয়ে আবার উঠতে শুরু করল রানা। এখানে ঢালটা এমন যে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্যে হাঁটুতে হাত রেখে সামনে ঝুঁকে হাঁটতে হচ্ছে। কয়েক মিনিট পরেই আবার থামতে হলো। রীতিমত হাঁপাচ্ছে এখন ও। আবার পেছন ফিরে তাকাল, প্রায় মাইলখানেক এসেছে বলে মনে হলো। আর বেশি পথ নেই। মিনিট দশেকের ভেতরেই বোধহয় দেখা যাবে হোম অভ নস-এর চূড়াটা।

এদিকে আরেক উপদ্রব হয়ে দেখা দিল ঠাণ্ডা। যত উপরে উঠছে ঠাণ্ডাও ততই বাড়ছে, সেই সাথে বাতাসও। ক্লান্তির কারণে উঁচু পথে উঠতে কষ্ট হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু পরিশ্রম হচ্ছে না বিশেষ। ফলে ঠাণ্ডাটা বেশ জেঁকে ধরেছে।

হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেল চড়াই। ছোট্ট একটুখানি উৎরাই, পাথরের ভাঙাচোরা একটা দেয়াল মত জায়গায় গিয়ে শেষ হয়েছে ঢালটা। বাঁ দিকে আরেকটা

পাহাড়, নস ক্লিফ। নস আইল্যান্ডের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় বোধহয় এটাই। ডান দিকে প্রায় শ'খানেক গজ নিচে অন্ধকার একটা গিরি গহ্বর। গিরি গহ্বরটার ওপাশে ঘাস দেখতে পাচ্ছে রানা।

দক্ষিণ-পুব কোণটা মনে মনে বুঝে নিয়ে তাকাল রানা সেদিকে। বিশাল পাথরের স্তূপের ওপর এক একর আয়তনের সমতল ক্ষেত্রটা দেখল। কিছু নেই ওটার ওপর। থাকলেও দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে। বেশ অন্ধকার ক্র্যাড্‌ল হোম-এর ওপরটা। ডানদিকের ঢালটা বেয়ে সাবধানে নামতে শুরু করল ও। খাটো ঢালটা, তবে অনেক বেশি খাড়া। ভেড়ার পায়ে-চলা পথের চেয়ে সত্যি সত্যিই অনেক বেশি বিপজ্জনক। একটু যদি তাল হারায় তো সোজা গিয়ে পড়বে পাশের গিরি গহ্বরটায়। এবং স্রেফ এক দলা মাংসপিণ্ডে পরিণত হবে শরীরটা।

শেষ পর্যন্ত দি ন্যুপ ও হোম অভ নস-এর মাঝখানের ফাঁকটার কাছে এসে পৌঁছুল রানা। লারসন বলেছিল হেন্ডারসন নাকি টাইলোরিন ট্র্যাভার্স বেঁধেছিল ওখানে। জিনিসটা যে কি তা জানে না রানা, তবে ধারণা করল, ফাঁকটার এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত দড়ি দড়ার কিছু ব্যাপার হবে। বেশি খুঁজতে হলো না, সামনেই দেখতে পেল ও জিনিসটা। দড়ি দড়ার কারবার আছে বটে, তবে টাইলোরিন ট্র্যাভার্স নামটার সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্য পাওয়া গেল না জিনিসটার। বরং আগে সেই রাখালরা ভেড়াকে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে যেত যে ধরনের জিনিসে করে সেই ধরনের কিছু একটা নজরে পড়ল। মোটা একটা খুঁটি বেশ দৃঢ়ভাবে পোঁতা মাটিতে। তিন চারটে তারের টানা দিয়ে আরও মজবুত করা হয়েছে সেটাকে। খুঁটির সঙ্গে বাঁধা মোটা একটা নাইলনের রশি, হোমের দিকে চলে গেছে। কে জানে এটাকেই টাইলোরিন ট্র্যাভার্স বলে উল্লেখ করেছিল কিনা লারসন? কিন্তু দোলনাটা কোথায়?

চিৎকার করে ডাকল রানা হেন্ডারসনের নাম ধরে। কিন্তু বাতাসের ধাক্কায় চিৎকারটা ওর মুখেই ফিরে এসে বাড়ি খেলো, হোমের দিকে গেল বলে মনে হলো না। পর পর কয়েকবার চিৎকার করল ও। কিন্তু লাভ হলো না কিছু, পাশ থেকে কোন উত্তর এল না। এখন এই দড়ি টেনে ওপাশে যেতে হবে ভাবতেই বিতৃষ্ণায় ছেয়ে গেল ওর মন! হতে পারে হেন্ডারসন ওখানে নেই, কিন্তু নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় কি? পাখিদের ওপর নজর রাখার জন্যে হেন্ডারসন ছোটখাট একটা আস্তানা বানিয়ে থাকতে পারে ওখানে, নিদেন পক্ষে তাঁবু। এমনও হতে পারে তাঁবুর ভেতর কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে সে, আর সেই ঘুম ভাঙতে যতটা দরকার ততটা শব্দ সৃষ্টি করতে পারেনি রানা।

কিন্তু কিভাবে যাবে রানা ওপাশে? এখানে তো একটা দোলনা থাকার কথা। কিন্তু পাত্তা নেই সেটার, দড়িটা শুধু নেমে গেছে হোম অভ নস পর্যন্ত। আর একটু কাছে গিয়ে ভাল করে তাকাল ও। এতক্ষণে বুঝতে পারল, একটা নয় দুটো দড়ি আছে ওখানে। দ্বিতীয়টাও নাইলনের, তবে অনেক সরু। প্রথমটা প্রায় দেড় ইঞ্চি মোটা আর দ্বিতীয়টা সিকি ইঞ্চির বেশি হবে না। খুঁটির সঙ্গে লাগানো একটা পুলির ওপর দিয়ে চলে গেছে সরু দড়িটা। দড়িদুটোর ওপ্রান্ত বিলীন হয়ে গেছে অন্ধকারে, দেখতে পেল না রানা। ওপাশে নিশ্চয়ই এরকম আর একটা খুঁটি এবং পুলি আছে,

ভাবল ও।

হঠাৎ করেই মনে পড়ল ওর কথাটা, যদি এই দড়ির সঙ্গে কোন দোলনা থেকে থাকে তাহলে ওপাশে আছে সেটা। একটাই অর্থ হতে পারে তার, হেন্ডারসন সেটা ব্যবহার করেছে ওপাশে যাওয়ার কাজে।

তাড়াতাড়ি সরু দড়িটার বাঁধন খুলে টানতে শুরু করল রানা। প্রায় এক গজ টেনে ফেলার পরও দড়িতে কোন ভার অনুভব করল না ও। দুই গজ···, তিন গজ···। প্রায় পাঁচ গজ টানার পর ওমাথায় ভারী কিছুতে টান পড়ল বলে মনে হলো। হ্যাঁ, দোলনাটা তাহলে বাঁধা আছে। ধীরে ধীরে টেনে চলল ও।

মিনিট দুয়েক লাগল দোলনাটাকে টেনে এপাশ পর্যন্ত আনতে। দোলনার চেহারা দেখে একটু অবাক না হয়ে পারল না রানা। বড়সড় একটা বাক্স ছাড়া আর কিছু না সেটা। সামনে পেছনে কাঠের ধারগুলো পাশগুলোর চেয়ে একটু বেশি উঁচু, সাধারণ বাক্সের সঙ্গে এই যা পার্থক্য। সামনের এবং পেছনের উঁচু কাঠদুটোয় ছিদ্র করা, সেগুলোর ভেতর দিয়ে চলে গেছে মোটা দড়িটা। সরল প্রযুক্তি। দড়ি ছিঁড়ে না গেলে, বা খুঁটি উপড়ে না পড়লে বিপদের সম্ভাবনাও নেই প্রায়। সরু দড়িটার অন্য প্রান্ত বাঁধা বাক্সের সঙ্গে।

দোলনা অর্থাৎ বাক্সটাকে টেনে এনে একেবারে খুঁটির গায়ের সঙ্গে লাগাল ও। চড়ে বসবার আগে আবার ভেবে দেখল ভাল করে, উচিত হচ্ছে তো কাজটা? আসলে আর কোন উপায় নেই। হেন্ডারসনকে খুঁজে বের করতেই হবে, আর এখানেই ওর থাকার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

যা হয় হবে, ভেবে উঠে পড়ল ও বাক্সের ভেতর। সঙ্গে সঙ্গেই ওর শরীরের ওজনে রশিটা ঝুলে পড়ল অনেকখানি এবং বাক্সটাও দুলতে লাগল এদিক ওদিক। একটু ঘাবড়ে গেল রানা, ছিঁড়ে-টিড়ে পড়বে না তো? বাক্সের ঠিক মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে ওটার ভারকেন্দ্র ঠিক রাখার চেষ্টা করল ও। দুলুনিটা একটু কমলে মোটা দড়িটা ভাল করে ধরল দু'হাতে। তার পরে লম্বা একটা দম নিয়ে টানতে শুরু করল। হোম অভ নস-এর চূড়ার চেয়ে দি ন্যুপ-এর চূড়া উঁচু। সুতরাং দড়িটারও ওমাথার চেয়ে এমাথা উঁচু। দড়ি টানার জন্যে খুব একটা পরিশ্রম করতে হচ্ছে না ওকে, প্রায় আপনা থেকেই নেমে যেতে লাগল বাক্সটা।

নিচে কি আছে জানে না ও। জানলেও দেখতে পেত না কিছু। চাঁদ ডুবে গেছে কিছুক্ষণ আগে। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার এখন চারদিক। একটু পর থেকেই নিচে কি আছে না আছে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর খুব একটা অবসর পেল না ও। রশিটা হোম অভ নস-এর দিকে ঢালু হওয়ায় যত সহজে যাওয়া যাবে ভেবেছিল কাজটা তত সহজ হলো না। হাত দিয়ে ধরে ধরে গতি শ্লথ করতে হচ্ছে ওকে। দড়ি টেনে টেনে ওপর দিকে ওঠার চেয়ে মোটেই কম কষ্টকর নয় কাজটা। বেশ পরিশ্রম হচ্ছে বাক্সের দ্রুত গড়িয়ে যাওয়া ঠেকাতে। একই সঙ্গে আবার ভারসাম্যের ব্যাপারটাও খেয়াল রাখতে হচ্ছে। একটু নড়াচড়া করলেই বিপজ্জনক ভঙ্গিতে দুলে উঠছে বাক্স।

শ'খানেক ফুটের বেশি হবে না দূরত্ব। কিন্তু এটুকুই মনে হচ্ছে অসীম। এক ফুট এক ফুট করে এগিয়ে যাচ্ছে রানা ক্র্যাড্‌ল হোমের দিকে। ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে

উঠছে হোমের প্রান্ত। পেছন ফিরে তাকাল একবার, ঝাপসা হয়ে এসেছে দি ন্যু-এর প্রান্তটা। ফেরার সময় ঠিক কি হতে পারে ভাবতেই একটু দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল ও। ঢালুর দিকে যেতেই যে কষ্ট, উপর দিকে উঠতে কি অবস্থা হবে কে জানে! যাই হোক, এখন সবচেয়ে বড় কথা, ওপাশে পৌঁছে পাওয়া যাবে তো হেন্ডারসনকে?

এমন সময় নতুন একটা প্রশ্ন জাগল রানার মনে। ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে গেল ও। দোলনাটা হোমের প্রান্তে ছিল এবং হালকা রশিটা বাঁধা ছিল ন্যুপ-এর প্রান্তের খুঁটির সঙ্গে। যদি হেন্ডারসন দোলনায় চড়ে ওপাশে গিয়ে থাকে তো রশিটা বাঁধল কে?

ছয়

উত্তর পেয়ে গেল রানা একটু পরেই। কিন্তু পরিস্থিতি তখন ওর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।

আকস্মিক একটা ধাক্কা অনুভব করল সামনে, দুলে উঠল দোলনা। হঠাৎ করে লাগাতে বেশ জোরে মনে হলো ধাক্কাটা, সোজা হয়ে দাঁড়াল ও, আরেকটু দুলুনি লাগল বাক্সে। সামনে তাকিয়ে দেখল একটা খুঁটির সঙ্গে ঠেকে আছে বাক্স।

হোমের কিনার থেকে প্রায় সাত-আট ফুট ভেতরে গিয়ে থেমেছে দোলনা। নেমে আসবার আগে চারপাশটা ভাল করে দেখে নিতে চায় ও। খুঁটি ছাড়িয়ে আরও সামনে দৃষ্টি প্রসারিত করল। প্রথমেই দৃষ্টি পড়ল একটা ছায়ামূর্তির ওপর। খুঁটিটা থেকে পাঁচ-সাত ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে। বুট পরা পা দুটো একটু ফাঁক করে আছে বিজয়ীর ভঙ্গিতে। ছায়ামূর্তিটার মুখ দেখা যাচ্ছে না অন্ধকারে, কালো একটা অস্পষ্ট অবয়ব শুধু টের পাওয়া যাচ্ছে। লোকটার হাতে ধরা জিনিসটা চিনতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হলো না। রাইফেল। পাখি পর্যবেক্ষণের কাজে এ ধরনের জিনিস লাগে বলে কখনও শোনেনি রানা। মুহূর্তেই বুঝে ফেলল, হেন্ডারসন নয় লোকটা। তবু একবার ডাকল ও, 'হেন্ডারসন!'

জবাবে রাইফেলটা দ্রুত একবার ঝাঁকুনি দিয়ে বাক্স থেকে নেমে আসার জন্যে ইশারায় নির্দেশ দিল লোকটা। তারপর আরও দু'পা সরে গেল পেছনে।

সাবধানে নেমে এল রানা বাক্স আকৃতির দোলনা থেকে। ক্র্যাড্‌ল হোমের ঘন সবুজ ঘাসে পা রাখল। রাইফেলে আরেকটা ঝাঁকুনি দিয়ে ওকে কিনার থেকে সরে আসার নির্দেশ দিল লোকটা। নিজে আরও কয়েক পা পেছনে সরে গেল। দু'হাত মাথার ওপর তুলে একটু সামনে এগোল রানা।

এ পর্যন্ত একটাও কথা বলেনি লোকটা। এখনও বলল না। আবার রাইফেল নেড়ে ইশারা করল সে। বসে পড়ল রানা পুরু ঘাসের ওপর। মনে মনে ভাবল, বোবা নাকি ব্যাটা?

সামনে ঝুঁকে মাটি থেকে বাক্সমত কিছু একটা তুলে নিয়ে আরও দু'তিন পা

পেছনে সরে গেল লোকটা। ভাব ভঙ্গিতে মনে হলো শুধু সতর্কই নয়, একটু সন্ত্রস্তও যেন সে। রাইফেলটা একহাতে ধরে অন্য হাতে বাক্সটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে লোকটা। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই লম্বা ঝকঝকে একটা ধাতব জিনিস দেখা দিল বাক্সটার উপরে। ট্রান্সমিটার তাহলে! ঝকঝকে এরিয়ালটা অন্ধকারেও একটু চকচক করছে যেন। নিঃসন্দেহে ভ্লাদিমিরের লোক, ভাবল রানা। কিন্তু এই জায়গার কথা জানল কি করে ভ্লাদিমির? সুফিয়ার কাছ থেকে। হোম অভ নস-এ যে পাওয়া যেতে পারে হেন্ডারসনকে তা তো জানার কথা নয় সুফিয়ার!

সতর্ক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে রাশিয়ান আঞ্চলিক ভাষায় দ্রুত একগাদা কথা বলে গেল লোকটা। কথাগুলোর এক বর্ণও বুঝল না রানা। তবে লোকটার কথা বলার ঢং দেখে মনে হচ্ছে চেহারার বর্ণনা দিচ্ছে। বেশিক্ষণ লাগল না লোকটার বক্তব্য শেষ হতে। এরিয়ালটা গুটিয়ে ফেলে রেডিওটা আবার নামিয়ে রাখল মাটিতে। রাইফেলটা শক্ত করে দু'হাতে ধরল আবার। এগিয়ে এল কয়েক পা।

'এই জায়গার কথা জানলে কি করে তোমরা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কোন জবাব দিল না লোকটা। বোঝা গেল কথা বলবে না সে। শক্ত করে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রয়েছে এবং সহজে খুলতে রাজি নয় সেগুলো। হয়তো রুশ ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানেই না সে। ভ্লাদিমির বা তার দলবলই যা এই হোমের কথা জানল কি করে তা ভেবে বের করার চেষ্টা করতে লাগল রানা। সুফিয়া না জানালে আর কোত্থেকে জানবে ওরা? কিন্তু সুফিয়াই কি জানত এ জায়গার কথা? অসম্ভব কিছু নয়, হেন্ডারসন ওকে জানিয়ে থাকতে পারে। কে জানে, শ্বেত প্যাঁচার কথাও জানিয়েছে কিনা। খালাতো ভাইয়ের সঙ্গে ভালই যোগাযোগ ছিল সুফিয়ার। নিয়মিত চিঠিপত্র আদান-প্রদান হত নিশ্চয়ই। নকল ফ্রান্সিসের বলা কথাগুলো মনে পড়ল, 'খুব শিগগিরই মিসেস হেন্ডারসন হওয়ার কথা সুফিয়ার।'

হঠাৎ একটা কথা মনে হলো রানার, ভ্লাদিমির নিশ্চয়ই আগে থেকে জানত না এই জায়গার কথা। কিছুক্ষণ, অর্থাৎ এক বা দু'ঘণ্টা আগে সুফিয়াকে আবার জিজ্ঞাসাবাদ করেই হয়তো জানতে পেরেছে হোম অভ নস-এর কথা, এবং একজন লোককে পাঠিয়ে দিয়েছে রাইফেল আর রেডিও দিয়ে, হেন্ডারসন এল তো ভাল, সঙ্গে সঙ্গে যেন খবর দেয়া হয় তাকে, না এল তো। সকাল নাগাদ বিদায় নেবে সেন্ট্রি। তার মানে এখনও সম্পূর্ণ অক্ষত না হোক বেঁচে আছে সুফিয়া। বেশ অর্গ্যানাইজড মনে হচ্ছে ভ্লাদিমিরকে। প্রচুর লোক, প্রচুর অস্ত্র এবং প্রচুর ইকুইপমেন্ট নিয়ে কাজে নেমেছে সে। কিন্তু সত্যিই কি প্রচুর লোক আছে ভ্লাদিমিরের? এরকম নির্জন এবং দুর্গম একটা জায়গায় তাহলে মাত্র একজন লোক পাঠাল কেন? অন্তত দু'জন পাঠানো উচিত ছিল না?

আরেকটা প্রশ্ন উঁকি দিতে লাগল রানার মনে; এখন ও একটা নেভি ব্লু রঙের গোল গলা সোয়েটার পরে আছে। পরনে ডার্ক ট্রাউজার আর পায়ে সেইলিং বুট। লারউইক হারবারের পানিতে ভ্লাদিমির যে পোশাকে দেখেছিল তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ওর এখনকার পোশাক। এই লোকটা কিভাবে ওর চেহারার বর্ণনা দেবে? নিঃসন্দেহে পোশাক-আশাকের বর্ণনাই প্রাধান্য পাবে। তাছাড়া চেহারার অস্পষ্ট

একটা বর্ণনা হয়তো দিতে পারবে। বয়সের কথা বলবে, ত্রিশের কাছাকাছি। হেন্ডারসনের বয়স প্রায় একই, ছবি দেখেছে রানা ওর। কিন্তু এই বর্ণনা শুনে কারও বুঝতে পারার কথা নয় লোকটা হেন্ডারসন না রানা। হেন্ডারসনকে আটকেছে সেন্ট্রি, তাই মনে করেই ছুটে আসবে ভ্লাদিমির। উত্তাল সমুদ্র পাড়ি দিতে হলেও আসবে। ইতোমধ্যেই হয়তো রওনা হয়ে গেছে সে। কিন্তু তারপর? এখানে এসে হেন্ডারসনের জায়গায় ওকে দেখে কি করবে সে? দেখবে সে যতটুকু এগিয়েছে রানা তার চেয়ে এক বিন্দু বেশি এগোতে পারেনি। সুতরাং ওকে তার আর প্রয়োজনীয় না-ও মনে হতে পারে এবং তখনই যদি ভ্লাদিমির ওর পাওনা চুকিয়ে দিতে চায় তো অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

সুতরাং কিছু একটা করতে হবে। ভ্লাদিমির এসে পৌঁছানোর আগেই। কিন্তু কি?

জেলির বোয়েমের ওপর দুটো মাছির মত মনে হচ্ছে দু'জনকে, রানা আর রাশিয়ান লোকটা। কেবল পার্থক্য হচ্ছে, একটার হুল আছে অন্যটার নেই, আর দুটোর একটাও উড়তে পারে না। দড়িতে ঝুলানো দোলনাটা ছাড়া এই পিলার আকৃতির পাহাড় থেকে যাওয়ার বা আসার আর কোন পথ নেই। এবং এই রাইফেলধারী বোধহয় দড়ির ওপ্রান্তে আর কেউ এসে না পৌঁছানো পর্যন্ত চুপচাপ অপেক্ষা করবে। কিন্তু অতক্ষণ অপেক্ষা করা সম্ভব নয় রানার পক্ষে।

কিন্তু অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার আছে বলেও তো মনে হচ্ছে না। রাশানটা সশস্ত্র এবং দাঁড়ানো, রানা নিরস্ত্র এবং বসা। সবদিক থেকে সুবিধাজনক অবস্থায় আছে লোকটা। একটু নড়লেই বোধহয় গুলি করবে। আবার একটু ভাবল রানা কথাটা। হুঁ! তাই তো···! সত্যিই কি গুলি করবে লোকটা? যদি ওকে হেন্ডারসন মনে করে থাকে তো গুলি করবে বলে মনে হয় না। কারণ হেন্ডারসনই এখন মূল ব্যক্তি—অন্তত রাশিয়ানদের কাছে। যে-কোন উপায়েই হোক হেন্ডারসনকে দরকার ওদের, এবং এমন অবস্থায়, যে অবস্থায় ওর পক্ষে ট্র্যান্সপারেন্সিটা এনে দেয়া অথবা কোথায় আছে তা জানানো সম্ভব। ভ্যালি অভ ফায়ারে রিডের লেলিয়ে দেয়া রাইফেলধারীদের কথা মনে পড়ল রানার, এক ধারসে গুলি করে চলেছে, কিন্তু একটাও লাগছে না গায়ে। এই লোকটার উপরেও কি সেরকম মিস করার অর্ডার রয়েছে?

সম্ভবত। সেরকম সম্ভাবনা খুবই বেশি?

ভ্যালি অভ ফায়ারে ভুল করেনি ও। এখানেও নিতে হবে ঝুঁকিটা। কিন্তু রাশিয়ানদের প্রয়োজন আর কাজের ধারা এবং আমেরিকানদের প্রয়োজন আর কাজের ধারা কি এক? এই লোকটার ওপর যদি সেরকম ক্ষেত্রে আহত করার নির্দেশ থেকে থাকে?

যদি কিছু না করে চুপচাপ বসে থাকি, ভাবল রানা, ভ্লাদিমির আসবে। হেন্ডারসন নয়, ওকে দেখবে এসে। তারপর ভাববে, ও, রানা! ওকে তো আর দরকার নেই, দাও শেষ করে। একটা গুলিও খরচ করতে হবে না, কিনার থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেই হবে। বিদায় রানা! হেন্ডারসন ছাড়া সুফিয়া এবং জামিল সম্পর্কে ভাববার আর

কেউ থাকবে না তখন। কিন্তু হেন্ডারসনের একার পক্ষে ভ্লাদিমির আর তার দলের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। ওদের কাছে হেন্ডারসন তো দুগ্ধপোষ্য শিশু। ট্র্যান্সপারেন্সির বিনিময়ে সুফিয়া এবং জামিলকে ফেরত দেয়ার প্রস্তাব দিলেই লাফিয়ে এগিয়ে যাবে সে। তখন ওকেও হাতে পাবে ভ্লাদিমির। সুতরাং বিদায় সুফিয়া! বিদায় জামিল! বিদায় হেন্ডারসন!

না, কিছু একটা করতে হবে। ভ্লাদিমির এসে পৌঁছনো পর্যন্ত অপেক্ষা করলেও মরার সম্ভাবনা, আর এখন পালানোর চেষ্টা করতে গিয়ে গুলি খেলেও মরার সম্ভাবনা। মরলে বাঁচার চেষ্টা করেই মরবে। তাছাড়া এই মাথা-মোটা ওর গায়ে যে গুলি লাগাতেই পারবে তেমন কোন নিশ্চয়তা আছে কি? ফিফটি ফিফটি চান্স।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল রানা। সোজা হলো। ঝট করে ওর মুখের দিকে তাকাল রাশিয়ানটা। মাটিতে ঠেকানো ছিল রাইফেলটা, তুলে নিয়েছে হাতে। একবার ভ্রূকুটি করে ব্যারেলটা নেড়ে আবার বসে পড়তে ইশারা করল।

বুঝতে পারেনি এমন একটা ভঙ্গি করল রানা। অবাক চোখে বোকার মত তাকিয়ে রইল লোকটার দিকে। ভেতরে ভেতরে লোকটার চিন্তার সূত্র অনুসরণের চেষ্টা করছে ও। একটু পরেই বুঝতে পারল, ভ্রূকুটিটা বসবার ইঙ্গিতই, গুলি করার ভীতি প্রদর্শন নয়। তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হলো ব্যাপারটা ওর কাছে। তারমানে আশা আছে। গুলি না করারই নির্দেশ দেয়া হয়েছে বোধহয় একে। আরেকটু সোজা হয়ে হাতদুটো মাথার উপর তুলে আড়মোড়া ভাঙল রানা। ভাবখানা যেন হাত পায়ের খিল ছাড়াচ্ছে। তারপর ঝুঁকে হাঁটু দুটো একটু ডলল হাত দিয়ে। লোকটার দিকে তাকিয়ে বোকার মত হাসল একটু। যেন বোঝাতে চাইছে, এতদূর পাহাড় বেয়ে তারপর ওই দোলনায় করে এপাশ পর্যন্ত এসে খুবই কাহিল হয়ে পড়েছি। এদিকে লোকটা এখনও রাইফেল নেড়ে বসে পড়তে ইশারা করেই চলেছে।

কিন্তু বসল না রানা। সোজা হয়ে দাঁড়াল আবার। কাঁধটা একটু ঝাঁকিয়ে, হাতের তালু দুটো ঘষে খুব ঠাণ্ডা লাগছে, এমন একটা ভঙ্গি করল। কিন্তু পাত্তা দিল না লোকটা ওর ভঙ্গিকে। এতক্ষণ রাইফেল নেড়ে বসতে ইশারা করছিল এখন বাগিয়ে ধরল সেটা। কিন্তু, আশ্চর্য, একটা শব্দও করল না মুখ দিয়ে। এতক্ষণ পর লোকটার ইশারার তাৎপর্য বুঝতে পেরেছে এমন একটা ভঙ্গি করে উল্টো ইশারা করল রানা, যার অর্থ, 'মাটিতে বসতে হবে?' প্রচণ্ডভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল লোকটা।

রাইফেলধারীর চোখে চোখ রেখে বসতে শুরু করল রানা। ধীরে ধীরে হাঁটু দুটো ভাঁজ করে শরীরটাও ভাজ করতে শুরু করল ও। ইতোমধ্যে রাইফেলটা নামিয়ে নিতে শুরু করেছে লোকটা। হাতের তালু দুটো দু'হাঁটুর ওপর রাখল রানা, নিতম্বটা নেমে এল নিচে। বসবার আগ মুহূর্ত–অনেকটা অন-ইওর-মার্কস পজিশনে এখন ও। পায়ে ধাক্কা দিতে হবে লোকটার। পাঁচ ফুট মত দূরে সে, ছয়ও হতে পারে। দুই পা যেতে হবে রানাকে, এর মধ্যেই লোকটাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে গুলি করবে কি করবে না। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে ও রাশিয়ানটার চোখের দিকে। আর দেরি করা যায় না।

লোকটার চোখে চোখ রেখেই আচমকা লাফ দিল রানা। এক লাফেই প্রায় চার

ফুট দূরত্ব অতিক্রম করে সোজা হয়ে দাঁড়াল ও। দাঁড়াতে দাঁড়াতেই কুংফুর ভঙ্গিতে এক সঙ্গে দুটো লাথি চালাল। বাম পায়ে লোকটার ডান হাঁটুতে এবং ডান পায়ে কোমরের কাছে কিডনির সোজাসুজি। গুলি করার সুযোগই পেল না লোকটা, চিৎ হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। পর মুহূর্তেই দুই হাঁটু এক সঙ্গে জোড়া করে ডাইভ দিয়ে পড়ল রানা লোকটার পেটের ওপর। ঘোঁৎ করে একটা শব্দ বেরোল ওর গলা দিয়ে। এক সেকেন্ডও সময় নষ্ট না করে এলোপাতাড়ি কয়েকটা ঘুসি চালাল ওর নাক-মুখ বরাবর। কোথায় কোথায় লাগল খেয়াল করার প্রয়োজন বোধ করল না রানা। ব্যথায় গোঙানির মত একটা শব্দ বেরোল লোকটার গলা দিয়ে।

ইতোমধ্যে একটু সামলে নিয়ে যুঝতে চেষ্টা করল লোকটা। সোজা হয়ে ঠেলে ফেলে দিতে চাইল রানাকে পেটের ওপর থেকে। না পেরে হাত চালাল ওর চোখ লক্ষ্য করে। উঠে বসেছে। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে। আরেকটা ঘুসি চালিয়েছে রানা লোকটার কানের ঠিক নিচে নার্ভ সেন্টারে, পর মুহূর্তে ঘাড়ের পিছনে আরেকটা। নিঃশব্দে ঢলে পড়ল লোকটা।

উঠে দাঁড়াল রানা। হাঁপাতে হাঁপাতে তাকাল মাটিতে পড়ে থাকা নিঃসাড় দেহটার দিকে। একটুও নড়ছে না। বুকটা ওঠানামা করছে কিনা বোঝা গেল না অন্ধকারে। মরে গেল নাকি? যা-ই হোক, দেখার সময় নেই এখন। আর এক মুহূর্তও দেরি করা যাবে না এখানে।

হেন্ডারসনের বার্ড ওয়াচিং হাইডটা কোথায়? ও যদি হোম অভ নস-এ থেকে থাকে তো ওখানেই থাকবে। কিন্তু এখানে আছে কি সে? বোধহয় না। থাকলে এখানে পাহারাদার বসানোর প্রয়োজন পড়ত না ভ্লাদিমিরের। যাহোক হেন্ডারসন থাক বা না থাক, হাইড আউটটা দেখতে হবে।

বেশিক্ষণ লাগল না জিনিসটা খুঁজে পেতে। তাঁবু নয়, ছোট্ট একটা কুঁড়েঘরমত। তাঁবুর মতই চেহারা, তবে কাঠের তৈরি। ভেতরে ঢুকে দেখল রানা। নেই কেউ। কয়েকটা নোটবুক, বেশ খানিকটা দড়ি, ক্যামেরা, একটা টেলিফটো, জুম, বিনকিউলার, দুটো স্লিপিং ব্যাগ, একটা স্পিরিট স্টোভ, একটা থার্মোস, একাধিক টর্চ এবং কিছু খাবার। একটা টর্চ নিয়ে বেরিয়ে এল রানা। ওজন দেখে মনে হচ্ছে ব্যাটারি ভরাই আছে। সুইচ টিপে দেখল জ্বলে কিনা। আলোর উজ্জ্বলতা দেখে বুঝতে পারল ব্যাটারি একেবারে নতুন। রোপ ওয়েটার কাছে ফিরে আসতে লাগল ও।

ভালই আলো দেয় টর্চটা। কিন্তু একটা অসুবিধা হচ্ছে, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আলো। যেখানটায় লক্ষ্য করে জ্বালানো হয় সেখানকার চেয়ে অন্য জায়গায়ই আলোকিত হয় বেশি। হেন্ডারসনের হয়তো এই টর্চেই সুবিধা হয় পাখি দেখতে।

হঠাৎ একটা জিনিস দেখে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করল রানা। হোমের সমুদ্রের দিকের প্রান্তটায় আলোর আভা দেখা যাচ্ছে। নিচ থেকে আসা উজ্জ্বল আলোয় কিনারের ঘাস এবং ঝোপগুলো উজ্জ্বল ভাবে আলোকিত হয়ে উঠেছে। ব্যাপার কি দেখার জন্যে কিনারার দিকে এগিয়ে গেল ও। কিনারের পাঁচ-সাত ফুট এপাশে থাকতে শুয়ে পড়ে হামাগুড়ি দিয়ে একটু একটু করে এগোল কিনারের

দিকে। সাবধানে কিনার থেকে মাথাটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে তাকাল নিচের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি মাথাটা সরিয়ে নিয়ে এল এপাশে। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না চোখে। রেটিনাগুলোকে বিশ্রাম দেয়ার জন্যে চোখ বুজে শুয়ে রইল কিছুক্ষণ।

বেশ কিছুক্ষণ পর চোখ খুলল ও। এখনও কিছু দেখতে পাচ্ছে না চোখে। অনেকক্ষণ ধরে চোখ পিট পিট করার পর আবার তাকাল। কিন্তু এবারও লাভ হলো না কোন। প্রায় একযুগ পর যেন স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ফিরে এল চোখে।

আবার দেখার চেষ্টা করল ও আলোর উৎসটা। এবার আরও সতর্কভাবে তাকাল। বোকার মত বাড়িয়ে দিল না মাথাটা। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ কিনারার আলোর আভার দিকে। আলোটা সরে গেল এক দিকে; কয়েক সেকেন্ড পর আবার এসে স্থির হলো আগের জায়গায়। উজ্জ্বল আলো জ্বেলে কেউ কিছু খুঁজছে বোধহয় হোম অভ নস-এর চূড়ায়। পরেরবার আলোটা একটু সরতেই আবার মুখ বাড়িয়ে দিল ও।

যা দেখল তাতে আতঙ্কিত না হলেও ভয় না পেয়ে পারল না ও। ঘটনাটা যে খুব একটা অপ্রত্যাশিত তাও নয় অবশ্য। অনেক নিচে সমুদ্রের ওপর ভাসছে একটা ফিশিং ট্রলার। এক সেকেন্ডের জন্যে দেখলেও রাশিয়ান আইডেন্টিফিকেশন মার্কটা চিনতে ভুল হয়নি রানার। ওটা থেকেই সার্চ লাইট মারা হয়েছে ওপর দিকে। সাগরের ঢেউয়ের দোলায় ট্রলারটা দুলছে বলেই আলো একবার এদিক একবার ওদিক যাচ্ছে। ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন লোক। অস্পষ্টভাবে হলেও বুঝতে পারল রানা, সব ক'জনেরই চোখ এদিকে। একজনকে মনে হলো চিৎকার করে ডাকছে কাউকে। নিঃসন্দেহে রাশিয়ানটাকেই ডাকছে ওরা। রেডিওতে কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে চিৎকার করে ডেকে বেচারার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে বোধহয়।

এক সেকেন্ডের ভেতরেই পুরো জিনিসটা দেখে নিল ও। আলোটা আবার এসে চোখে লাগার আগেই পেছনে সরে এল। ঝটপট উঠে দাঁড়িয়েই রোপওয়ের দিকে ছুটতে শুরু করল। ওরা এসে পড়ার আগেই যদি ও প্রান্তে পৌঁছতে না পারে তো বাঁচার কোন আশা নেই।

রোপওয়ের খুঁটিটার কাছে পৌঁছে এক সেকেন্ড দাঁড়াল ও। বারবার সেই পুরানো প্রশ্নটা উদয় হচ্ছে মনে: রশি টেনে টেনে দোলনাটাকে অত ওপরে ওঠাতে পারবে তো? দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগে নষ্ট করার মত সময় নেই হাতে। ঝটপট উঠে পড়ল বাক্সের ভেতর। একটা পা বাক্সের মাঝ বরাবর রেখে অন্য পা-টা রাখল পেছনের প্রান্তে। এইভাবে দাঁড়ানোতে এবার অনেক কম হলো দুলুনি। আসবার সময় এই বুদ্ধিটা মাথায় এলে কষ্ট অনেক কম হত।

নাইলনের রশিটার দিকে তাকাল ও। হোম অভ নস থেকে উঠে গেছে ক্লিফ অভ দি ন্যুপ পর্যন্ত। কমপক্ষে পঁচিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে উঠে গেছে রশিটা, ত্রিশ ডিগ্রিও হতে পারে। এক পা পেছন দিকে স্থাপন করার ফলে বাক্সটা একটু কাত হয়ে রয়েছে। তা থাকুক, বিপজ্জনকভাবে দুলছে না তো। হাত বাড়িয়ে ধরল রানা মোটা

রশিটা। গায়ের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে টানতে শুরু করল।

একবিন্দু নড়ল না দোলনা। কি ব্যাপার? আটকে গেল নাকি কিছুতে? অসহায়ভাবে একবার চারদিকে তাকিয়ে এক পা সামনে বাড়াল ও। এখন ওর একটা পা সামনে আর অন্য পা-টা বাক্সের মাঝামাঝি জায়গায়। সোজা হলো বাক্সটা, একটু একটু দুলতেও শুরু করল। আবার টানল ও রশিটা ধরে। হ্যাঁ, চলতে শুরু করেছে এবার। বুঝতে পারল রানা, বাক্সটা বেকায়দায় কাত হয়ে ছিল বলেই নড়ছিল না এতক্ষণ।

প্রচণ্ড শক্তি দরকার বাক্সটাকে টেনে নিয়ে ওপাশ পর্যন্ত পৌঁছতে। দশ বারো গজ মত এসেছে, কিন্তু এখনই মনে হচ্ছে নিঃশেষ হয়ে গেছে শরীরের সব শক্তি। প্রাণপণে রশি টেনে চলেছে রানা আর ভাবছে, বাকিটুকু যেতে পারবে তো? গজ বিশেক যাওয়ার পর আর পারল না ও। রশি টানা থামিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। একটু বিশ্রাম না নিয়ে নিলে আর এক ইঞ্চিও এগিয়ে নিতে পারবে না দোলনাটাকে।

কি মনে করে একবার নিচে তাকাল রানা। সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার দশা হলো। কমপক্ষে আড়াইশো ফুট নিচে হোম অভ নস আর দি ন্যুপ-এর মাঝখানের সরু চ্যানেলটা। একশো ফুটের বেশি হবে না, কিন্তু এটুকু জায়গাতে ঢেউয়ের তাণ্ডব নাচ দেখে শিউরে উঠল ও। প্রচণ্ড গর্জন তুলে স্প্রের মত করে চারদিকে ছিটকে ছড়িয়ে পড়ছে পানি। ঘন সাদা ফেনায় ভরে রয়েছে জায়গাটা।

এখন যদি ছিঁড়ে যায় রশিটা, বা ভেঙে পড়ে দোলনা? কথাটা মনে হতেই আপনা থেকে ওর হাত চলে গেল রশির ওপর। টানতে লাগল নতুন উদ্যমে। কিন্তু এক ফুটের বেশি এগোল না বাক্স। পাকানো, শক্ত দড়ি। হাত লাল হয়ে গেছে ঘষায় ঘষায়। জ্বালা করছে। ছড়ে গিয়ে রক্ত বেরোতে শুরু করবে কি না বুঝতে পারল না রানা। জাহান্নামে যাক্ হাত, আবার আঁকড়ে ধরল ও রশিটা। টানল সর্বশক্তি দিয়ে। হ্যাঁ, এবার অনেকটা এগিয়েছে। এক ফুটের অনেক বেশি, কমপক্ষে আড়াই ফুট। খুশি হয়ে উঠল ও। এভাবে আর বার দশেক টানতে পারলেই তো পৌঁছে যাবে। আবার টানল, এবার আড়াই ফুট না হলেও দু'ফুট মত এগোল।

এখন নতুন কৌশলে রশি টানছে ও। একবার টেনে দেড়, দুই, বা আড়াই ফুট এগোনোর পর দু'তিন সেকেন্ড বিশ্রাম নিয়ে আবার টানছে। আবার একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার একটু টানছে। সাত আট ফুট মত এগোল এই নিয়মে টেনে কিন্তু তারপরেই আবার অসহ্য হয়ে উঠল হাতের জ্বলুনি।

আর বেশি নেই, সাত-আট গজও হবে না বোধহয়। কিন্তু আর পারছে না ও। হাতে কোন অনুভূতি নেই মনে হচ্ছে। রশিটা বুকের একপাশ আর বগলের তলা দিয়ে চলে গেছে। রশির ঘষায় ঘষায় ওই জায়গাগুলোও জ্বলতে শুরু করেছে। এই ঠাণ্ডা আর বাতাসের ভেতরেও ঘেমে নেয়ে উঠেছে ও। ঘামের কারণেই রশি টানতে অসুবিধা হচ্ছে আরও বেশি। হাতের তালু ভিজে উঠেছে ঘামে, নাইলনের রশির ওপর দিয়ে পিছলে আসতে চাইছে বারবার। ফলে অনেক বেশি শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে হচ্ছে রশি। সে কারণে শক্তিও ক্ষয় হচ্ছে বেশি, হাতে ব্যথাও লাগছে বেশি।

একটু একটু করে এগোচ্ছে বাক্স। একভাবে দাঁড়িয়ে রশি টানার ফলে পিঠও

ব্যথা করতে শুরু করেছে। বাহুর মাংসপেশীতেও খিল ধরার অবস্থা। পুরোপুরি সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলেও ওর পক্ষে দুঃসাধ্য হত কাজটা, আর এখন ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে ওকে করতে হচ্ছে কাজটা। পুরো দু'দিন ঠিকমত খাওয়া হয়নি, এক বিন্দু ঘুমোনো হয়নি, হাজার মাইলের ওপর পথ পাড়ি দিতে হয়েছে প্লেনে, তারপর এই অমানুষিক পরিশ্রম! মাথার ভেতর অনবরত হাতুড়ি পিটছে চিন্তাটা: পার না হতে পারা মানে মৃত্যু, কেউ ঠেকাতে পারবে না। বোধহয় বেঁচে থাকার সহজাত প্রবৃত্তির বশেই শরীরের এই হাল নিয়েও এতদূর আসতে পেরেছে ও, আর এতদূর পেরেছে যখন পারবে বাকিটুকুও।

আর কতটা? এই তো এসে গেছে, মনে মনে সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করল রানা। আর গজ পাঁচ-ছয়েকও হবে না বোধহয়। টানো, রানা, টানো। আর পাঁচ ছ'বার ঠিক মত টানতে পারলেই পৌঁছে যাবে প্রান্তে। তারপরেই সব কষ্টের অবসান।

এখন একেবারে দু'ফুটও এগোচ্ছে না দোলনা, এবং প্রতিবারই ক্রমশ কমে আসছে এগোনোর পরিমাণ। দড়ি টেনে টেনে যত এগোচ্ছে ও সি-লেভেল থেকে উচ্চতাও ততই বাড়ছে, মাধ্যাকর্ষণের ফলে নিচদিকের টানও বাড়ছে সেই সঙ্গে। অর্থাৎ কষ্টের পরিমাণও বাড়ছে। যাই হোক দূরত্ব তো কমছে প্রতিবারেই, সেটাই একমাত্র আশার কথা আর একটু–আর একটু–।

হঠাৎ তাল হারাল রানা। হড়কে গেল একটা পা। সড়সড় করে ফুট তিনেক নেমে এল দোলনাটা। দুলছে ভীষণভাবে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠল ওর হৃৎপিণ্ড। আকস্মিক পতনের আশঙ্কায় চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল, পরমুহূর্তে চোখ খুলেই দেখতে পেল দোলনার পাশটা সমান্তরাল হয়ে আছে মাটির সঙ্গে। আঁতকে উঠল রানা। আতঙ্কে কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ দুটো। এক সেকেন্ডের জন্যে ও-ও ঝুলে রইল মাটির সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে। আবার চোখ বন্ধ করে ফেলল রানা। এক সেকেন্ড পরেই নেমে এল দোলনাটা, এপাশ ওপাশ দুলতে লাগল। আর একটু হলেই গেছিল, শিউরে উঠে ভাবল ও। বাক্সটা যদি আর একটু উঠত সোজা আড়াইশো ফুট নিচে পাথরের ওপর পড়ত গিয়ে শরীরটা। শক্ত হাতে রশিটা ধরা ছিল বলে বেঁচে গেছে এ যাত্রা।

মিনিটখানেকের বেশি লাগল দুলুনি কমতে। এখনও ভয়ানক ভাবে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা। দুলুনি কমার পরেও আরও মিনিটখানেক লাগল ওর সুস্থ হতে। আবার টানতে শুরু করল রশি। প্রায় তিন ফুট পিছিয়ে এসেছে ও। যে মুহূর্তে শরীরে এক বিন্দু শক্তি অবশিষ্ট নেই এবং প্রতিটি সেকেন্ডই মহামূল্যবান, সেই মুহূর্তে তিন ফুট পিছিয়ে আসা মানে অনেকখানি পিছিয়ে আসা। প্রথম প্রচেষ্টায় এক ইঞ্চিও এগোল না এবার দোলনাটা। হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠতে চাইছে মনটা। আর বোধহয় তিন-চার গজ মাত্র আছে। এইটুকু গেলেই মুক্তি। কিন্তু ওর শক্তিতে আর কুলাচ্ছে না। আবার চেষ্টা করল ও। হ্যাঁ, এগিয়েছে একটু, তবে এত কম যে মোটেই খুশি হতে পারল না ও। মোটে ছ'সাত ইঞ্চি।

কয়েক সেকেন্ড বিশ্রাম নিয়ে আবার চেষ্টা করল রানা। একই অবস্থা,

ফুটখানেকের বেশি এগোল না বাক্স। আবার কয়েক সেকেন্ড বিশ্রাম নিয়ে আবার টানল। ফুলে ফুলে উঠছে হাতের পেশীগুলো। আরও ফুটখানেক এগিয়েছে।

এমন সময় বাঁ দিকে কিছু একটা চোখে পড়ল ওর। সার্চলাইটের বিমটা সরছে! ফিশিংট্রলারটা বোধহয় হোম অভ নর্স-এর উত্তর প্রান্তের দিকে এগিয়ে আসছে! একবার যদি এদিক পর্যন্ত আসতে পারে ওরা তো আর রক্ষা নেই। আলোর সামনে পড়ে যাবে ও, তারমানে গুলির সামনেও। আবার টানতে শুরু করল রানা। দাঁতে দাঁত চেপে আঁকড়ে ধরে আছে ও রশিটা। এখন আরেক ভয় এসে বাসা বেঁধেছে মনে: রশিটা ঢিল করে ধরার ফলে যদি পিছলে নেমে যায় বাক্স তো কিছু করার থাকবে না। যা অবস্থা, নেমে যাওয়ায় বাধা দিতে পারবে না ও। আর, একবার নেমে গেলে আবার উঠে আসা অসম্ভব। এই কারণে বিশ্রামের সময়ও সর্বশক্তিতে আঁকড়ে ধরে থাকছে ও রশিটা। সুতরাং শক্তিক্ষয়টা এখন একটা সার্বক্ষণিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে; বিশ্রামের সময় একটু কম, টানার সময় বেশি।

আর তিন গজ অর্থাৎ প্রায় দশ ফুট মত বাকি। আর একটা টান দিল রানা, দূরত্ব কমে এল আট ফুটে, এসে গেছে ট্রলারটা হোমের উত্তর প্রান্তে। সার্চলাইটের আলো খেলা করে বেড়াচ্ছে ওর চারপাশ দিয়ে। ঢেউয়ের দোলায় দুলছে ট্রলারটা ফলে ঠিক বাক্সের ওপর ফেলতে পারছে না ওরা সার্চলাইটের আলো। আর ছ'ফুট···আলো এসে পড়েছে দোলনার ওপর, ওর গায়েও খানিকটা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা বোটটার দিকে। এবার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। দোলনার উপর স্থির হয়ে আছে আলোর বিমটা।

চোখ বন্ধ করেই আরেকটা টান দিল রানা। আর চার ফুট···। এমন সময় কিছু একটা এসে লাগল দোলনার গায়ে। ঠক্-খড়াস করে শব্দ উঠল একটা। কেঁপে উঠল দোলনাটা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বুলেটটা এসে লাগল বাক্সে। মন দিল না ও বুলেটের দিকে, মনপ্রাণ দিয়ে টেনে চলল রশি। আর দুই ফুট···। তৃতীয় বুলেটটা এসে লাগল বাক্সে। কাঠের চলটা ছিটকে এসে লাগল ওর গায়ে। আরেকটা। কানের পাশ দিয়ে বাতাসে শিস কেটে চলে গেল একটা।

চোখ বন্ধ করে প্রাণপণে টেনে চলেছে রানা। হঠাৎ হাতে কি যেন একটা অন্যরকম স্পর্শ পেল। চমকে উঠল একটু। পরমুহূর্তে বুঝতে পারল তারের টানা দেয়া খুঁটিতে হাত পড়েছে। আনন্দে লাফিয়ে উঠল ওর হৃদয়টা। তাহলে এসে গেছে! উহ! অবশেষে চলে আসতে পেরেছে এ প্রান্তে।

এক হাতে শক্ত করে খুঁটিটা ধরে থেকে হাচড়ে-পাচড়ে নেমে এল সে বাক্স থেকে। আরও কয়েকটা গুলি এসে লাগল বাক্সের গায়ে। মাটিতে পা রেখে আগে বাক্সটা তারপরে খুঁটিটা ছাড়ল ও। নিজের ওজনে সড়সড় করে নেমে যেতে লাগল বাক্সটা। ছুটতে শুরু করল রানাও। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই পৌঁছে গেল বাক্সটা হোমের প্রান্তে। ওপ্রান্তে খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ার ভোঁতা একটা শব্দ উঠল। পরমুহূর্তে আরও কয়েকটা গুলির শব্দ ভেসে এল কানে। দাঁড়াল না রানা, প্রায় দৌড়ে নামতে শুরু করল খাড়া ঢাল বেয়ে। যে-কোন উপায়েই হোক ব্লু-ঈগল-এ গিয়ে চড়তে হবে এখন।

ব্লু-ঈগলকে যেখানে নোঙর করে রেখে এসেছে, জায়গাটা এখান থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে। ওই পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই ধরা পড়ে যাবে না তো? কথাটা মনে হতেই ছোটার গতি বেড়ে গেল ওর। ভাগ্য ভাল, এখন আবার চড়াই পথে উঠতে হচ্ছে না। চড়াই বেয়ে উঠতে হলে সম্ভবত কোনদিনই ব্লু-ঈগল-এ পৌঁছতে পারত না ও। ঢালু পথ বেয়ে অনেকটা নিজের ওজনেই এগিয়ে যাচ্ছে রানা মাতালের মত এলোপাতাড়ি পা ফেলে।

আরেকটু বাড়ানোর চেষ্টা করল ও চলার গতি। কিন্তু তাল সামলাতে পারল না, পড়ে গেল হোঁচট খেয়ে। পতন ঠেকাতে গিয়ে আরও ব্যথা পেল হাতে। বড় দুরবস্থায় পড়েছে এবার রানা। হাতের ব্যথার দিকে মনোযোগ না দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে উঠে দাঁড়াল ও। আবার ছুটতে শুরু করল। আবার হোঁচট খেলো। খরগোশের গর্তে পা ঢুকে গিয়েছিল। হাঁচড়ে-পাছড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটতে শুরু করল আবার।

ওই ভয়ানক রোপওয়ে বেয়ে আসার পর এখনকার ছোটা আর হোঁচট খাওয়ার কষ্টকে কোন কষ্টই মনে হচ্ছে না। সত্যি কথা বলতে কি ছুটতে ওর কোন কষ্টই হচ্ছে না। ঢালু পথের কারণে তাল রাখার জন্যে একটু কষ্ট করতে হচ্ছে বটে তবে তা মারাত্মক কিছু না। ওই দড়ি টানার কষ্টের পর এসব তো নস্যি। শেষবার হোঁচট খেয়ে পড়ার পর উঠে দাঁড়ানোর আগে দৃষ্টি মেলে সামনেটা একটু পর্যবেক্ষণ করে নিল রানা। এখনও ফাঁকাই দেখা যাচ্ছে সামনেটা। দু'হাতের ওপর ভর দিয়ে উঠল ও। আবার নামতে শুরু করল ঢাল বেয়ে। ইতোমধ্যেই প্রায় অর্ধেক এসে পড়তে পেরেছে ভেবে স্বস্তি পেল মনে।

একবার এদিকে একবার ওদিকে কাত হয়ে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করতে করতে নেমে যাচ্ছে রানা। ওই ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টাটুকু ছাড়া আর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই শরীরের ওপর। ভয়ানক গতিতে নেমে আসছে ও খাড়া ঢাল বেয়ে। এই গতিতে নামতে পারলে আর পাঁচ-সাত মিনিটও লাগবে না ব্লু-ঈগলের কাছে পৌঁছতে।

অনেকটা পথ একই গতিতে আসার পর মারাত্মক একটা হোঁচট খেলো ও। এটাও ওই খরগোসের গর্তের কারণেই। গোড়ালিটা পড়েছিল গর্তের ভেতর। প্রচণ্ড ব্যথায় কুঁকড়ে গেল রানা। গোড়ালিটা মচকে গেল কিনা বুঝতে পারল না। বাচ্চারা হাঁটতে শেখার সময় যেভাবে পড়ে ঠিক সেভাবে পড়ল ও উপুড় হয়ে। বুকেও ব্যথা লাগল বেশ। কয়েক সেকেন্ড দম নিতে পারল না। শ্বাস টানতে চেষ্টা করছে কিন্তু বাতাস ঢুকছে না ফুসফুসে। হিক্কা তুলতে তুলতে উঠে বসল রানা। লাল হয়ে উঠেছে মুখ। চোখ দুটো গোল হয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর ছেড়ে। স্থান কাল পাত্র জ্ঞান লোপ পেল। আর কিছু চাই না, শুধু বাতাস, একটু বাতাস চাই।

হঠাৎ সুঁইয়ের মত কি যেন বিঁধল বুকে, সঙ্গে সঙ্গে একটুখানি বাতাস ঢুকল ফুসফুসে। সোজা হয়ে বসে লম্বা করে শ্বাস টানল এবার। হ্যাঁ, পুরোপুরিই ঢুকেছে বাতাস। কিছুক্ষণের ভেতর আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে এল শ্বাস-প্রশ্বাস। পুরোপুরি সচেতন হয়ে উঠল ধীর ধীরে। কি ব্যাপার, এরকম একটা উদ্ভট জায়গায় পড়ে আছি

কেন? এক এক করে মনে পড়ল সব কথা: হেন্ডারসনকে খুঁজতে হোম অভ নস-এ গিয়েছিল ও। সেখানে রাশিয়ান রাইফেলধারীকে মেরে-ধরে মরণ দোলনায় চড়ে রশি টেনে টেনে দি ন্যুপ-এর চূড়ায় উঠে দৌড়ে নামতে শুরু করে ও। ভ্লাদিমির এবং তার দলবল ফিশিং বোট নিয়ে আছে কূলের কাছাকাছি কোথাও। ওরা গুলি করছিল দোলনা লক্ষ্য করে। তাই তো, ওরা যদি কূলে নেমে খুঁজতে শুরু করে, তাহলে? ঝট করে উঠে দাঁড়াল রানা. যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নস আইল্যান্ড ছেড়ে ভাগতে হবে, আর সেই কারণেই ব্লু-ঈগল-এ পৌছানো দরকার সবার আগে।

এবার আর অত দ্রুত ছুটল না রানা। দ্রুত ছুটতে গিয়ে একেকবার হোঁচট খেয়ে যা সময় নষ্ট হচ্ছে তার চেয়ে আস্তে আস্তে চলা ভাল। ভ্লাদিমির কি করবে? হাঁটতে হাঁটতে ভাবছে ও: হোম অভ নসের উপর কি ঘটেছে নিশ্চয়ই জানতে চাইবে সে। ওখানে কি ঘটেছে না ঘটেছে সে সম্পর্কে যদি কিছু একটা ধারণাও করে থাকে সে, তবু রাইফেলধারীর অজ্ঞান দেহটা উদ্ধার করার জন্যে হলেও নস আইল্যান্ডে লোক নামাবে সে। ল্যান্ডিঙের উপযোগী দুটোই মাত্র জায়গা আছে এ দ্বীপে: নস-ভো–যেখানে ব্লু-ঈগলকে নোঙর করে এসেছে রানা, আর নেসটি-ভো'র সৈকতটা। হোম অভ নস-এ যেতে হলে নস-ভো'র সৈকতেই লোক নামাতে হবে ওদের, আর সেক্ষেত্রে ব্লু-ঈগলকে দেখতে পাবে ওরা এবং অত্যন্ত সহজেই অকেজো করে দিতে পারবে। নেসটি ভো দিয়ে যদি নামে তাহলে অবশ্য চান্স আছে নস ছেড়ে নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়ার। কিন্তু আসলে ওখানে ল্যান্ড করার সম্ভাবনা শতকরা এক ভাগও নেই। কারণ ভ্লাদিমির নস-এ লোক নামাবে হোম অভ-নস এ যাওয়ার জন্যেই এবং সে কারণে ওকে নস-ভো দিয়েই নামতে হবে।

নিজের অজান্তেই আবার ছুটতে শুরু করল রানা। ব্লু-ঈগলকে অকেজো করে দিলে আর কোনদিনই ও ফিরতে পারবে না লারউইকে। আর নস দ্বীপটাও এত ছোট যে ওকে খুঁজে বের করার জন্যে খুব বেশি হলে ঘণ্টাখানেক সময় ব্যয় করতে হবে ভ্লাদিমিরকে।

হোঁচট খাওয়ার ভয় অনেক কমে গেছে। খাড়া ঢালটা পেরিয়ে এসেছে ও। সামনেও পথটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে, তবে অতটা তির্যক ভাবে নয়। শরীরের ওপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ ফিরে এসেছে রানার। সবচেয়ে বড় কথা হাত দুটোকে আর ব্যবহার করতে হচ্ছে না এখন।

পেছন ফিরে তাকাল না রানা। ভ্লাদিমিরের ট্রলারটা কোথায় আছে তা দেখার কোন উপায় নেই এখান থেকে, উঁচু পাহাড়ের আড়ালে পড়ে গেছে সমুদ্র। আর একবারও হোঁচট না খেয়ে সমান জায়গায় এসে পড়ল ও।

কিছুদূর হাঁটার পরই শুরু হলো চড়াই। প্রমাদ গুণল রানা। এতক্ষণ বেশ আরামেই আসা গেছে, এখন আবার চড়াই পথে উঠতে শুরু করলেই শক্তি ক্ষয় হতে শুরু করবে। প্রায় একশো গজ হবে চড়াই পথটা, কিন্তু মাত্র বিশ গজ মত যাওয়ার পরই ঝামেলা শুরু হলো। রশির ঘষায় ছড়ে যাওয়া বুকের ধারটা এতক্ষণ জ্বলছিল একটু একটু। সামনে ঝুঁকে হাঁটতে হচ্ছে বলে এখন আবার পিঠের পেশীতে ব্যথা শুরু হলো। এদিকে লারসনের সেইলিংবুট জোড়াও গোলমাল শুরু

করে দিয়েছে, পা পিছলে যেতে চাইছে বারবার। সাবধানে একটু একটু করে উঠতে লাগল রানা।

সময়মত পৌঁছতে পারবে তো? ও পৌঁছনোর আগেই যদি ভ্লাদিমির তার দলবল নিয়ে এসে যায় নস-ভো-র সৈকতে, তাহলে? একটু দ্রুত করার চেষ্টা করল ও হাঁটার গতি। চড়াই বেয়ে উঠতে হচ্ছে বলে শরীরের ওজন অনেক বেড়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। প্রায় এসে গেছে ও ঢালটার চূড়ায়। তারপরেই শুরু হবে উৎরাই। এই তো এসে গেছে, আর একটু...আর একটু...।

চড়াইটা পেরিয়ে সামনে তাকাল রানা। হাঁপাচ্ছে ও। নির্জন নিস্তব্ধ সৈকতটা দেখতে পেল। হ্যাঁ, এখনও আছে ব্লু-ঈগল। ভাসছে। অন্ধকারে ভাল বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু চেনা যাচ্ছে অবয়বটা। ভ্লাদিমিরের ট্রলারটা দেখা যায় কিনা...সৈকত ছাড়িয়ে আরও দূরে দৃষ্টি মেলে দিল ও। না, দ্বিতীয় কোন বোট বা কিছু চোখে পড়ল না।

খুশি মনে নামতে শুরু করবে রানা, এমন সময় চোখ গেল সরু ভূ-খণ্ডটার কাছে। হ্যাঁ, আরেকটা বোট নোঙর করা রয়েছে সেখানে। লিটল শেটল্যান্ড মডেলের বোট একটা। লারউইক হারবার থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল যেটা, সেটার মত।

সাত

হেন্ডারসন তাহলে এসেছে নস-এ!

কোথায় সে? ঢাল বেয়ে নেমে আসার সময় ওকে দেখেনি রানা। অবশ্য দেখার কথাও নয়। ওর পুরো মনোযোগ ছিল পথের দিকে। পথ ছাড়া অন্য কিছুর দিকে মন দেয়ার প্রয়োজনই বোধ করেনি ও। প্রয়োজন সম্ভবত ছিলও না। হেন্ডারসন হয়তো দেখেছে ওকে। হয়তো নিচের দিকে ছিল সে। রানা যখন বড় ঢালটা পার হচ্ছিল হেন্ডারসন হয়তো তখন দক্ষিণের চূড়াগুলোর দিকে যাচ্ছিল।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও আবার চলতে শুরু করল রানা। দুটো কারণে হেন্ডারসনকে নস-এ ফেলে যেতে দ্বিধা করছে সে। প্রথমত, হেন্ডারসনকে না পেলে ট্র্যান্সপারেন্সিটা পাওয়া যাবে না। দ্বিতীয়ত, ভ্লাদিমির যদি দেখে হেন্ডারসনকে তো সব পণ্ড। সুফিয়া এবং জামিলকে আর উদ্ধার করা যাবে না তখন। ভ্লাদিমির নামবেই নস-এ। অন্ততপক্ষে তার লোকদের নামাবে। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভাগতে হবে এখান থেকে। হেন্ডারসন দ্বীপের অন্ধিসন্ধি চেনে ভাল, ও হয়তো লুকিয়ে পড়তে পারবে কোন ফাঁক-ফোকরে। কিন্তু ওর বোটটা যদি দেখে ফেলে ওরা তাহলে বাঁচার কোন পথ থাকবে না হেন্ডারসনের। বোট নিয়ে দ্বীপটা চক্কর দিতে থাকবে ভ্লাদিমির আর তার লোকেরা গরু খোঁজা করবে বেচারাকে। তারপরও যদি না পায় তো লিটল শেটল্যান্ড মডেলটায় দু'জন লোক রেখে গেলেই হবে। আজ হোক কাল হোক হেন্ডারসনকে ফিরতেই হবে লারউইকে এবং তখন বোটের কাছে আসতেই হবে

ওকে। আর বোটে উঠলেই ধরা পড়ে যাবে ও। একটু আশ্চর্য না হয়ে পারল না রানা, এতক্ষণ লাগল কেন হেন্ডারসনের নস পর্যন্ত এসে পৌঁছুতে?

ব্লু-ঈগলকে নোঙর করে রাখা সৈকতে পৌঁছে গেছে রানা। পাথরের গা থেকে নোঙরটা খুলে নিয়ে নেমে পড়ল ও পানিতে। হাঁটু পানি ভেঙে বোটের স্টার্নের কাছে পৌঁছল। স্টার্নের দিকটাই নিচু। পাঁচিলে ওঠার ভঙ্গিতে উঠে পড়ল ও বোটে। একমুহূর্তও দেরি করল না ডেকে। কেবিনের ভেতর ঢুকেই স্টার্টার সুইচটা টিপে দিল। মুখ দিয়ে একটা খিস্তি বেরিয়ে এল ওর, স্টার্ট নিচ্ছে না এঞ্জিন। দাঁতে দাঁত চেপে আবার টিপল ও সুইচটা। এবার কাজ হলো। হারামীটা সবসময়ই প্রথমবারে ফাজলেমি করে দ্বিতীয়বারে স্টার্ট নেয় নাকি?

এবার পেছনে! অ্যাস্টার্নের দিকে টেনে দিল ও লিভারটা। প্রপেলারের পানি কাটার শব্দ শুনতে পেল। ধীরে ধীরে পেছনে চলেছে বোট, সামনের সৈকতটা দূরে সরে যাচ্ছে ক্রমশ। বেশ খানিকটা পিছিয়ে এসেছে বোট। লিভারটা নর্মাল পজিশনে নিয়ে এল রানা। নিজের গতিতে এখনও পেছনে চলছে ব্লু-ঈগল। এক সেকেন্ড পর সামনে ঠেলে দিল ও লিভারটা। হুইল ঘুরিয়ে রওনা হলো সামনের দিকে।

রাশিয়ান ট্রলারটা কোথায়? সামনে দেখা যাচ্ছে না। ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল রানা। কেবিনের খোলা দরজা দিয়ে দেখতে পেল ট্রলারটাকে। বেশ কাছে এসে গেছে ওটা, কয়েকশো গজও হবে না বোধহয়। ফুলস্পীডে ধেয়ে আসছে। সার্চলাইটটা জ্বলছে, স্থির হয়ে আছে ব্লু-ঈগল-এর ওপর। বো-এর ধাক্কায় দুপাশে ফোয়ারা হয়ে ছিটকে পড়ছে পানি। নস-এর-পুব-প্রান্ত ঘেঁষে উত্তর দিকে গিয়ে পুরো দ্বীপটা ঘুরে এসেছে বলেই বোধহয় এতটা সময় লেগেছে ওটার এপর্যন্ত আসতে, ভাবল রানা।

এতক্ষণ অনেকটা মহৎ-উদার ভঙ্গিতে ভাবছিল রানা। যদি ট্রলারটাকে বাধ্য করতে পারে ও ব্লু-ঈগলকে অনুসরণ করতে তাহলে হেন্ডারসনের বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে কয়েকগুণ। কিন্তু এখন আর ভাবাভাবির কোন অবকাশ নেই, ব্লু-ঈগলের দিকেই ধেয়ে আসছে ভ্লাদিমিরের ট্রলার। লারসনের বোটের চেয়ে অনেক বড়, অনেক শক্তিশালী এবং সম্ভবত অনেক গতিশীলও।

থ্রটলটা পুরো ছেড়ে দিল রানা। ধীরে ধীরে স্পীড বাড়ছে ব্লু-ঈগল-এর। আবার পেছনে তাকাল ও। রীতিমত আঁতকে উঠবার মত অবস্থা, আগেরবার যতটা দূরে দেখেছিল ট্রলারটাকে এখন তার অর্ধেক দূরত্বে রয়েছে সেটা। এত আস্তে স্পীড উঠছে কেন ব্লু-ঈগল-এর! সোনা, মাণিক, একটু তাড়াতাড়ি স্পীড নাও!

উঠে গেছে স্পীড। ফুল স্পীডে এগোচ্ছে এখন ব্লু-ঈগল। আবার পেছনে তাকাল রানা। যাক বাবা, বাঁচা গেছে, আর কাছে আসতে পারেনি ট্রলারটা। সমান দূরত্ব অক্ষুণ্ন রয়েছে দুটো বোটের মধ্যে। এটাই যদি ট্রলারের হাইয়েস্ট স্পীড হয় তো এইভাবে সোজা লারউইক হারবার পর্যন্ত বোট চালিয়ে চলে যাওয়া যাবে, খুশিমনে ভাবল।

কিছুক্ষণের মধ্যে নস-এর দক্ষিণ প্রান্তে চলে এল ব্লু-ঈগল। পুব-দিকে হুইল ঘোরাল রানা। সামনে ভেসে উঠল ভয়ঙ্কর পাহাড়টার চেহারা–হোম অভ নস!

খানিকক্ষণ আগের স্মৃতিগুলো মনে পড়তেই শিউরে উঠল ও। হোম অভ নস পেরিয়ে ডাইনে তাকাল ও। সামান্য দূরেই দেখা যাচ্ছে ব্রিসে আইল্যান্ড। চার-পাঁচশো গজের বেশি হবে না। পুরোপুরি পাহাড়-দ্বীপ ব্রিসেও। অনেকগুলো ধূসর রঙের পাহাড়ের চূড়া ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না ও। খুব উঁচু নয় অবশ্য চূড়াগুলো। দ্বীপ না বলে সমুদ্র থেকে সরাসরি উঠে যাওয়া কয়েকটা পাহাড়ের সমষ্টিও বলা যেতে পারে ব্রিসেকে।

আবার পেছনে তাকিয়েই বিষম খেলো রানা। একটু আগের আনন্দটুকু উবে গেল নিমেষে। বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেছে ট্রলার। খুব সামান্য হলেও ব্লু-ঈগলের চেয়ে দ্রুতগতিতে আসছে ওটা। ফলে এই মাইল দুয়েক আসতেই বেশ খানিকটা কাছে চলে এসেছে। তারমানে ব্লু-ঈগলে করে লারউইক পর্যন্ত চলে যাওয়ার বুদ্ধিটা বাদ দিতে হচ্ছে। আবার তাকাল ও ব্রিসের দিকে। সমুদ্রের ভেতর থেকে উঠে আসা পাহাড়গুলো দেখল, খুব উঁচু নয় বটে চূড়াগুলো, কিন্তু তাতে এমন কিছু সুবিধে হচ্ছে না ওর।

তাড়াতাড়ি চার্ট খুলল রানা। ব্রিসের কোস্ট লাইন দেখানো জায়গাটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল ওর দৃষ্টি। হ্যাঁ, ওই চূড়াগুলোর মাঝখানে একটা ফাঁকা জায়গার নির্দেশ দেয়া আছে চার্টে। 'গ্রাট উইক' নাম জায়গাটার। ওখানে পৌঁছতে হবে, ভাবল রানা। কতদূর হবে? এক মাইল? আবার চার্টের দিকে তাকাল, মনে মনে হিসেব করল একটু, দেড় মাইলের কম না। কিন্তু অতদূর কি যাওয়া যাবে ভ্লাদিমিরের ট্রলারকে ফাঁকি দিয়ে? অসম্ভব! আর এক মাইল যাওয়ার আগেই ধরে ফেলবে ওরা ব্লু-ঈগলকে। একটাই উপায় আছে, সরাসরি চ্যানেল ক্রস করে ব্রিসের উপকূলে উঠে পড়া। দরকার ঢলে ইকো বে-তে যেমন বোট নিয়েই উঠে পড়েছিল সৈকতের উপর, তেমনি করতে হবে।

সরাসরি ব্রিসের দিকে কোর্স ঠিক করে পেছন ফিরে তাকাল রানা। আরেকটু এগিয়ে এসেছে কি ট্রলারটা? বুঝতে পারল না ঠিকমত। ফুলস্পীডে এগোচ্ছে ব্লু-ঈগল। ভাগ্যকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারল না ও, ট্রলারের চেয়ে খুব বেশি কম না ব্লু-ঈগলের স্পীড। আবার পেছনে তাকাল ও, পানি ফেড়ে এগিয়ে আসছে যেন ট্রলারটা। ডেকের ওপর লোকজন দেখা যাচ্ছে, রাইফেলও আছে বোধহয় দু'একজনের হাতে। কিন্তু গুলি করছে না কেন ওরা? একটাই কারণ হতে পারে, ও হেন্ডারসন কিনা নিশ্চিত হতে পারেনি ভ্লাদিমির, সুতরাং জীবিত অবস্থায়ই ধরতে চায় ওকে।

নেসটি-ভো সৈকতটা পেরিয়ে এসেছে ওরা। আপাতত নসের দিকে কোন খেয়ালই নেই ভ্লাদিমির বা তার সাঙাৎদের। দেখো হেন্ডারসন, ভাগতে পারো নাকি এই সুযোগে!

আর সামান্য একটু গেলেই ব্রিসে। পঞ্চাশ গজও হবে না বোধহয়। স্পীড একটুও কমাল না রানা। বেচারা ব্লু-ঈগল, বেচারা লারসন। সন্দেহ নেই পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে চুরমার হয়ে যাবে বোটটা। কোনদিন যদি ফিরতে পারে লারউইকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে লারসনকে।

আর গজ ত্রিশেক মাত্র। ছোট ছোট ডুবো পাহাড়ের চূড়াগুলো দেখতে পাচ্ছে ও। সাগরের ঢেউ এসে বারবার ধুয়ে দিচ্ছে চূড়াগুলোকে। হুইল ছেড়ে দিয়ে সামনের ডেকে গিয়ে দাঁড়াল রানা, ধাক্কা খাওয়ার আগ মুহূর্তে লাফ দেবে। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে ও সামনের পাহাড়টার দিকে। দ্রুত ছোট হয়ে আসছে বোট আর পাহাড়ের মাঝখানের জায়গাটুকু। আর দশ গজও নেই! লাফ দিল রানা। দ্রুতগামী বোটের ওপর থেকে লাফ দেয়ায় জ্যামুক্ত তীরের মতই ছিটকে শূন্যে উঠে গেল ও। শূন্যে থাকতে থাকতেই শুনতে পেল সংঘর্ষের শব্দটা। কিছু দেখতে না পেলেও বুঝতে পারল, দুমড়ে মুচড়ে গেল ব্লু-ঈগলের সামনেটা। অ্যালুমিনিয়াম ছেঁড়ার শব্দ উঠল খ-র-র-র-র। পরমুহূর্তে পড়ল ও পানিতে ডোবা শক্ত পাথরটার ওপর। বরফের মত ঠাণ্ডা পানি। নতুন করে আর ভিজতে হলো না অবশ্য, নস-ভো থেকে বোটে ওঠার সময়ই ট্রাউজারের হাঁটু পর্যন্ত ভিজে গিয়েছিল। এখন কোমর পর্যন্ত ভিজল। সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়াল রানা। পাথরের ওপর দিয়ে ছুটল পাহাড়ের দিকে। পনেরো-বিশ ফুট জায়গা ছপ ছপ করে পানির উপর দিয়ে হেঁটে পৌঁছে গেল পাহাড়টার গোড়ায়। এক সেকেন্ডও সময় নষ্ট না করে উঠতে শুরু করল পাহাড়ের গা বেয়ে। পেছনে ফিরে তাকাল রানা, এসে পড়েছে ট্রলারটাও। একশো গজের মত দূরে রয়েছে ওটা তীর থেকে। এখনও কোন গুলি হলো না ওটা থেকে। সোজা এগিয়ে আসছে, তবে স্পীড বোধহয় কমাতে হয়েছে একটু।

এখানেও ভাগ্যের সহায়তা পেল রানা। একেবারে খাড়া অথবা মসৃণ নয় পাহাড়ের গা-টা। বেশ হেলানোই। বড় বড় পাথরের ওপর পা রেখে সহজেই উঠে যেতে পারছে ও। স্বাভাবিক অবস্থায় খুব একটা পরিশ্রম হওয়ার কথা নয় ওভাবে উঠতে, কিন্তু ওর যা অবস্থা এখন, তাতে এটুকু পরিশ্রমও দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। হৃৎপিণ্ডটা লাফাচ্ছে প্রচণ্ড ভাবে। কপালের দু'পাশের শিরা দুটো টনটন করছে। চূড়াটার দিকে অর্ধেক উঠেছে ও এমন সময় সার্চলাইটের আলো এসে পড়ল ওর ওপর।

চমকে পেছন ফিরে দেখল রানা, ভ্লাদিমিরের ট্রলারটা থেমেছে কূল থেকে পঁচিশ ত্রিশগজ দূরে। এঞ্জিনের শব্দ শোনা যাচ্ছে না আর, বন্ধ করে দিয়েছে বোধহয়। এবার নির্ঘাত ছুটে আসবে বুলেট। কারণ এতক্ষণে ওদের বুঝে ফেলার কথা হেন্ডারসন নয়, রানাকেই তাড়া করে আসছিল।

কিন্তু, না, গুলি করল না ভ্লাদিমির। জীবিত ধরতে চায় বোধহয় রানাকে ও। খুব একটা সমস্যায় পড়তে হবে বলে মনে হয় না ভ্লাদিমিরকে, ভাবল রানা। যে গতিতে উঠছে ও তাতে চূড়া পর্যন্ত উঠতে উঠতেই এসে পড়বে ওরা। কূলে ওঠার জন্যে ছোট একটা বোট নামাচ্ছে ভ্লাদিমিরের লোকেরা। আর কতক্ষণ? দু'মিনিট? তিন মিনিট? খুব বেশি হলে পাঁচ মিনিট, তারপরই ধরা পড়তে হবে ওকে।

অত সহজে না। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করবে রানা। চূড়ার দিকে তাকাল ও। ওই তো দেখা যাচ্ছে, আর বেশি উপরে না। তার পরেই তো নিচে নামতে হবে. সহজেই নামা যাবে তখন। শরীরের অবশিষ্ট শক্তিটুকু একত্র করে আবার উঠতে শুরু করল ও। সার্চলাইটের আলোয় তৈরি হওয়া নিজের ছায়াটা দেখল ও। লম্বা হয়ে

একেবারে চূড়া পর্যন্ত চলে গেছে ছায়াটা।

একটু একটু করে শরীর টেনে টেনে উপরে উঠছে রানা। কয়েক ধাপ ওঠার পরেই আবার থামতে হলো ওকে। আর পারছে না। আর দশ বারো ফুট উঠতে পারলে পৌঁছে যাবে চূড়ায়। কিন্তু এই দশ বারো ফুট কি উঠতে পারবে কোনদিন?

দশ পনেরো সেকেন্ড বিশ্রাম নিয়ে পেছনে তাকাল ও। কূলের দিকে অর্ধেক পথ এসে গেছে ছোট নৌকাটা। ছ'জন লোক রয়েছে সেটায়। না, আর দেরি করা যায় না, এক্ষুণি উঠে পড়তে হবে চূড়ায়। উঠতে শুরু করল আবার। কিন্তু অনেক চেষ্টায় মাত্র তিনফুট উঠতে পারল, তারপর থেমে পড়তে হলো। ইস, আর মাত্র সাতফুট। কয়েক সেকেন্ড পর আবার চেষ্টা করল। উঠল বটে, তবে এক ধাপের বেশি না। শরীরে আর এক বিন্দু শক্তিও অবশিষ্ট নেই। কেবলমাত্র ইচ্ছাশক্তির জোরেই চলছে এখন ও। আর দু'বারের চেষ্টায় ছোট্ট একটা মালভূমি মত জায়গায় এসে পড়ল ও। এটাই চূড়া। নামতে হবে এখন···।

জাহান্নামে যাক সব! কতদূর এসেছে ভ্লাদিমিরের দলবল তা দেখার ইচ্ছেও লুপ্ত হয়ে গেছে। শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। আধো ঘুম আধো জাগরণ একটা অবস্থা রানার। এক্ষুণি পায়ের শব্দ পাওয়া যাবে রাশিয়ানদের···।

কিসের শব্দ–? পায়ের শব্দ না তো! এঞ্জিন? হ্যাঁ, এঞ্জিনেরই শব্দ। ট্রলারটা আবার স্টার্ট নিচ্ছে? তাই হবে। চলে যাচ্ছে ওরা! কিন্তু, না, বোটের এঞ্জিনের শব্দ না তো। কেমন একটা ঠকঠকে ভাব আছে শব্দটায়, আর আসছেও ওপর থেকে।

হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। নিভে গেছে সার্চলাইট। উজ্জ্বল আলোর পর আকস্মিক অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছে না ও, মাথার ওপরের শব্দটা শুনতে পাচ্ছে শুধু। কিসের শব্দ ওটা? দেখবার জন্যে যে মাথাটা উঁচু করবে একটু সে-শক্তিটুকুও অবশিষ্ট নেই শরীরে।

ধীরে ধীরে বাড়ছে শব্দটা। কানের পর্দা ফেটে যাবে নাকি? দু'হাতে কান চেপে ধরে বেকায়দা ভঙ্গিতে উঠে বসল ও। আবার আলোর বন্যায় হেসে উঠল ওর চারপাশটা। এক সেকেন্ড পরেই বুঝতে পারল, এবার আর নিচ থেকে আসছে না, উপর থেকে আসছে আলো। উপর দিকে চোখ তুলেই আশ্চর্য হয়ে গেল রানা। ঠিক ওর মাথার ওপরে হেলিকপ্টার একটা। নেমে আসছে ধীরে ধীরে। রোটরের ঠেলে দেয়া বাতাসের প্রচণ্ড ঝাপটা এসে লাগছে গায়ে। হেলিকপ্টারের দরজাটা খোলা, সেখানে দাঁড়িয়ে এক লোক, হাত নাড়ছে ওর দিকে তাকিয়ে।

কে লোকটা? কি চায় ওর কাছে? একটু পরেই বুঝতে পারল রানা, হাত নাড়ছে না লোকটা, কিছু একটা ইশারা করছে। আস্তে আস্তে, কপ্টারটা মাটি স্পর্শ করল। সাসপেনশনের ওপর একবার উপরে একবার নিচে দুলে উঠল সেটা। রোটরগুলো ঘুরে চলেছে এখনও।

কেমন একটা ভারহীন অনুভূতি ওর শরীরে। ঘটনাগুলো ঘটছে, ও দেখছে, কিন্তু কিছু বুঝতে পারছে বলে মনে হচ্ছে না। দরজায় দাঁড়ানো লোকটাকে মাটিতে নেমে আসতে দেখল ও। এগিয়ে আসছে ওর দিকে। শত্রু না মিত্র বুঝতে পারছে না, চিনতে পারছে লোকটাকে। আত্মরক্ষার সহজাত তাগিদে পেছন দিকে সরতে

চেষ্টা করল রানা, কিন্তু নাড়াতে পারল না শরীরটাকে। পাশে এসে দাঁড়াল লোকটা। একটু ঝুঁকে শক্ত করে ধরল ওর বাহু। দু'হাতে ধরে টেনে নিয়ে তুলল হেলিকপ্টারে। হেলিকপ্টারের শব্দ হঠাৎ করে দ্বিগুণ হয়ে গেল যেন। শরীরের নিচে মেঝেটা কাঁপতে শুরু করেছে। আতঙ্কিত হয়ে উঠল রানা, পড়ে যাবে নাকি মাটিতে? পরমুহূর্তে অনুভব করল ধীরে ধীরে উপরে উঠতে শুরু করল মেঝেটা।

'বহুত ঘোড়েল লোক তুমি, রানা...,' বহুদূর থেকে ভেসে এল যেন শব্দটা। চিনতে পারল রানা গলাটা। দেখতে চেষ্টা করল লোকটাকে। কিন্তু তাকাতে পারল না, চোখের পাতা দুটো আপনা-আপনিই বন্ধ হয়ে আসছে কেন? হেলিকপ্টারের এঞ্জিনের শব্দটাও ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে। ওকে আবার ব্রিসে আইল্যান্ডের পাহাড় চূড়ায় নামিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে নাকি ওরা? কিন্তু ভ্লাদিমিরের লোকেরা তো আসছে ধরার জন্যে! তাহলে তো ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করতে হয় এক্ষুণি। কিন্তু চোখ দুটো এত ভার কেন, তাকাতে না পারলে নামবে কি করে...। ভাবতে গিয়েই সবকিছু অন্ধকার!

প্রচণ্ড ব্যথার একটা অনুভূতি নিয়ে জেগে উঠল রানা। সারা শরীর জুড়ে অবশ একটা ভাব। মাথায় যন্ত্রণা না থাকলেও ভার ভার লাগছে। পা দুটো আর হাতের তালুর অবস্থাই সবচেয়ে খারাপ। এই দুটোর যন্ত্রণাই সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিচ্ছে ওকে। আড়মোড়া ভেঙে শরীরের অবশ ভাবটা দূর করতে চাইল, কিন্তু লাভ হলো না বিশেষ। পিটপিট করে কয়েকবার চোখ খুলল, বন্ধ করল। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না, ঝাপসা সব। বেশ কিছুক্ষণ পিট পিট করার পর একটু স্বচ্ছ হলো দৃষ্টি। সাদা ছাদের সঙ্গে ঝুলানো একটা বাল্‌ব্ দেখতে পেল। মাথাটা একটু কাত করে পাশে তাকাল। সাদা দেয়াল! অ্যাঁ, তাই তো! বিছানায় শুয়ে আছে ও! বিছানা এল কোত্থেকে? কার বিছানা? কোথায়? ব্রিসে আইল্যান্ডে তো কোন বিছানা থাকার কথা নয়! আর একটু ঘাড় কাত করতেই দরজা দেখতে পেল একটা। স্টীলের। ঘষা ঘষা ধরনের গাঢ় সবুজ রং করা। দরজাটার মাঝামাঝি জায়গায় একটা চারকোনা ফোকর মত। তাই তো, কোথায় ও!

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল রানা। সঙ্গে সঙ্গে শত কণ্ঠে প্রতিবাদ করে উঠল পেশীগুলো। ঘুরে উঠল মাথাটা। আবার ধপাস করে শুয়ে পড়ল। এটা তো একটা জেলখানার সেল মনে হচ্ছে। এখানে এল কি করে ও?

এবার মনে পড়ল কথাগুলো। ভ্লাদিমিরের হাত থেকে বাঁচার জন্যে ব্রিসে আইল্যান্ডে গিয়ে উঠেছিল ও। একটা হেলিকপ্টার এসে নেমেছিল ওর পাশে। কিন্তু তারপর...? হ্যাঁ, মনে পড়েছে, কপ্টারের দরজায় একজন লোক দাঁড়ানো ছিল। সে এসে টেনে হিঁচড়ে হেলিকপ্টারে তুলেছিল ওকে। তারপর পরিচিত একটা গলার স্বর শুনতে পেয়েছিল, উইলকিনসনের গলা!

এবার আর আচমকা নয়, আস্তে আস্তে উঠে বসল ও বিছানায়।

'কে আছ?' খাস বাংলায় চিৎকার করে উঠল রানা।

কোন সাড়াশব্দ নেই। কয়েক সেকেন্ড পর আবার চিৎকার করল ও, 'কে

আসছে…?'

দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেল এক সেকেন্ড পর, ইউনিফর্ম পরা এক লোক ঢুকল ঘরে।

'কোথায় আমি?' গলার স্বর একটুও না নামিয়ে জানতে চাইল রানা।

'সেল-এ আছেন আপনি,' অবলীলায় উত্তর দিল লোকটা।

'কোথাকার সেল?'

'লারউইক পুলিস স্টেশনের।' বলেই আর দাঁড়াল না লোকটা, বেরিয়ে গেল বাইরে। তালা লাগানোর শব্দ হলো দরজায়। এক মিনিটও বোধহয় পার হয়নি, আবার তালা খোলার শব্দ হলো। চিরতার মত বিশ্রী তেতো লোক দুটো ঢুকল ভেতরে: রিড আর উইলকিনসন।

'ব্যাখ্যা করো!' ঘরে ঢুকে এক সেকেন্ডও দেরি করল না রিড। কোনরকম কুশল বিনিময়ের ধার ধারল না, ছুঁড়ে মারল প্রশ্নটা।

'আরে দাঁড়াও দাঁড়াও,' বলল রানা, 'আমাকে একটু জেগে উঠতে দাও আগে। এক কাপ চা অথবা কফি পাওয়া যাবে না? একেবারে মরণ-দশা হয়েছে!'

'তোমার ভাগ্য ভাল, নয়তো সত্যিই মরতে তুমি এখন বলো কি হয়েছিল? ওই পাহাড়ের ওপর উঠেছিলে কেন তুমি?'

'ঈশ্বরে বিশ্বাস করো তো? সেই ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে বলছি, আমাকে কিছু খেতে দাও আগে।' যেরকম ভাব দেখাচ্ছে আসলে তত খিদে পায়নি ওর। কিন্তু রিডের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে আসলে চিন্তাগুলোকে একটু গুছিয়ে নিতে চায় ও।

'কেউ এককাপ চা নিয়ে এসো তো,' চিৎকার করে বলল রিড। দরজার কাছে গিয়ে আরেকবার বলল সে কথাটা।

'ওকে…'

কি যেন বলতে গেল উইলকিনসন। কিন্তু বাধা দিল রিড। বলল, 'চা খেয়ে যদি একটু সাহস পায় বেচারা! পাহাড়ের ওপর যা অবস্থা হয়েছিল ওর!'

একজন কনস্টেবল এসে দাঁড়াল দরজার কাছে। জানতে চাইল, কি দরকার।

'চা-চা, চা আনো তাড়াতাড়ি,' আবার হেঁকে উঠল রিড। চিৎকারের ঠেলায় চোখ বন্ধ করে ফেলল রানা। এখনও ভাল করে গুছিয়ে কিছু ভাবতে পারছে না ও। তবে ঘুম ভাঙার পর যে অবস্থা ছিল মাথার, তারচেয়ে অনেক ভাল এখন। চা আসার আগে পূর্বাপর পরিস্থিতিটা আরেকবার ভেবে নিতে চাইল ও। কিন্তু সে সুযোগ পেল না। অসম্ভব রকম কম সময়ের ভেতর এসে গেল চা। সাদা একটা এনামেলের মগ ভর্তি।

ঠিক দু'চুমুক খাওয়ার সুযোগ দিল ওকে রিড। 'চা পেয়েছ তুমি, এবার তাড়াতাড়ি বলে ফেলো।'

'হেন্ডারসনকে খুঁজে পেয়েছ তোমরা?' উল্টো জিজ্ঞেস করল রানা।

'না।'

'দুর্ভাগ্য বলতে হবে!' আরেকটা চুমুক দিল ও মগে।

রাগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল উইলকিনসন। পারলে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে

রানাকে তেল-মসলা ছাড়াই। উইলকিনসনের রাগ রিডের ভেতরেও সংক্রামিত হয়েছে কিনা বুঝতে পারল না রানা।

'আমাদের চেয়ে এগিয়ে আছ তুমি,' প্রশ্ন নয়, বিবৃতি দেয়ার ভঙ্গিতে বলল রিড।

'আল্লা জানে কি ঘটেছিল,' নিষ্পাপ কণ্ঠে বলল রানা। 'কিসের সঙ্গে যেন বাড়ি খেয়েছিল ডিঙিটা। পানিতে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম আমি। তোমাদের কি হয়েছিল? কেমন করে তীরে উঠলে তোমরা?'

'সেটা পরে শুনলেও চলবে তোমার। বলে যাও।'

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম, পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম আমি, এমন সময় কোত্থেকে একটা বোট এসে থামল আমার পাশে। ডুব দিয়ে পালানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। বোটের উপর থেকে দু'জন লোক হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল আমাকে। ওদের হাতে ঝুলন্ত অবস্থায় খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর ছুটে যাই আমি। ওরা বোট স্টার্ট দিয়ে আবার আমাকে ধরার আগেই তীরে উঠে পড়ি। ওরাও বোট কূলে ভিড়িয়ে তাড়া করতে থাকে। দৌড়ে একটা বোটে উঠে স্টার্ট দিয়ে চালাতে শুরু করি আমি। যেখানেই হোক পালাতে হবে, এরকম ছিল আমার মনের অবস্থা। কিন্তু ওরাও ফলো করে আসছিল, ওদের বোটটা বেশি শক্তিশালী ছিল। বুঝতেই পারছ।'

'হুঁ, বুঝলাম,' বলল রিড। 'সকাল বেলায় হেস, ডক-এ একটা লোক দাঁড়িয়েছিল, নাম লারসন। মোটেই উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল না তাকে। আরেকটা লোকের সাথে দেখা করতে এসেছিল। সকাল সাতটায় মাসুদ রানা নামের এক লোকের সাথে নিজের বোটে করে কোথায় যেন যাওয়ার কথা ছিল তার। সাতটার সময় বেচারা এসে দেখে বোটও নেই রানাও নেই।'

'হ্যাঁ, আমি যে বোটটায় উঠেছিলাম সেটা ওরই। আমি আগেই জানতাম কোথায় আছে ওটা, বুঝেছ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, পরিষ্কার বুঝেছি।' এবার বোধহয় রিডও রেগে উঠছে। নাকের বাঁশিদুটো কাঁপছে একটু একটু। উত্তেজিতভাবে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আরও অনেক কথাই বলেছে লারসন। হেন্ডারসন সম্পর্কে, মিস মার্থা নামের এক মহিলা সম্পর্কে...'

ভেতরে ভেতরে একটু চমকে উঠল রানা। ব্যাটা কি হোম অভ নস-এর কথাও ফাঁস করে দিয়েছে? পয়সার জিনিস ওর রঙিন পিকচার স্টোরি। না বোধহয়। পুরো ব্যাপারটা যদি খুলে না বলে থাকে রিড এবং উইলকিনসন, তাহলে বোধহয় ফাঁস করেনি লারসন। এবং সম্ভবত এই টপ সিক্রেট ব্যাপারটার খুঁটিনাটি বিষয় ওর কাছে খুলে বলেনি রিড।

'আচ্ছা, এসব কথাও বলেছে নাকি লারসন!' অবাক হওয়ার ভান করল রানা।

'হ্যাঁ, এসব কথাও বলেছে।'

'কিন্তু, মিস মার্থা তো কোন সাহায্যই করেনি আমাকে।'

'আমাকেও অবশ্য কোন সাহায্য করেনি মহিলা,' দুঃখিত স্বরে বলল রিড। 'সবরকম ভাবেই চেষ্টা করেছি আমরা। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তামূলক জরুরী তথ্য গোপন

করার অভিযোগে অভিযুক্ত করার ভয় দেখিয়েও লাভ হয়নি। আধঘণ্টা ধরে আলাপ করে একটাই কথা বের করা গেছে চিমসে বুড়ির পেট থেকে যে, হেন্ডারসন কোথায় আছে সে সম্পর্কে কোন ধারণা নেই তার।'

ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে চা, চুমুকের বদলে ঢক ঢক করে গিলে ফেলল রানা সবটুকু। গরম চা যে অবসন্ন শরীরকে কত তাড়াতাড়ি চাঙ্গা করতে পারে তা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল ও। মাথার ভার ভার ভাবটা দূর হয়ে গেছে, শরীরও অনেক ফ্রেশ লাগছে।

'হেন্ডারসন কোথায় আছে তা আমিও জানি না,' বলল রানা।

'অন্তত কোথা থেকে খোঁজা শুরু করা যায় তা তো জানো?'

'না, তাও জানি না।'

কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল রিড ওর দিকে। 'বিশ্বাস করো, এক্ষুণি তুমি জানতে শুরু করবে এবং আমাকে বলতেও শুরু করবে।'

'কেন পিঁড়ি লাগাবে নাকি?'

লুফে নিল কথাটা উইলকিনসন। 'দরকার হলে...'

সঙ্গে সঙ্গে বিরক্তির স্বরে বলে উঠল রানা, 'এই গর্দভটাকে থামাও তো। পেটে যদি এক ছটাক বুদ্ধি থাকত! খালি ব্যা-ব্যা!'

আবার ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল উইলকিনসনের চেহারা। কিন্তু তাকে পাত্তা না দিয়েই বলতে লাগল রানা, 'আমার জানামতে, একমাত্র মিস মার্থাকে দিয়েই শুরু করা যেতে পারে। আর কোন উপায় আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

'শোনো, রানা, অনেক আগেই যে কাজটা করা দরকার ছিল আমাদের সে কাজটা করেছি আমরা আজ সকালে। আমরা সেই পোস্টম্যানের সঙ্গে কথা বলেছি, যাকে আটক করেছিল–তোমার ভাষায় রাশিয়ানরা। কি ঘটেছিল, জানো?'

'না, বলো শুনি।'

'হেন্ডারসনের সঙ্গে পথে দেখা হয়েছিল তার। হেন্ডারসন লারউইকে আসছিল, পোস্টম্যান যাচ্ছিল। পোস্টম্যান ওকে থামিয়ে চিঠিপত্রগুলো দিয়ে দেয় ওকে। নিয়মের বাইরে হলেও করেছে সে কাজটা। আরও মাইল দশেক যাওয়ার পর আক্রান্ত হয় বেচারা।' থেমে রানার মুখের দিকে চাইল রিড। ওকে প্রশ্ন করার সুযোগ দেয়ার জন্যেই যেন থামল সে।

'কি ধরনের চিঠিপত্র ছিল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ছোট একটা প্যাকেট ছিল,' বলে থামল একটু রিড। রানার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছে, 'তিন ইঞ্চি বাই এক ইঞ্চি মাপের সিলিন্ডার জাতীয় কিছু একটা হবে, নরওয়ের স্যান্ডনেস থেকে রিডাইরেক্ট করে পাঠানো।'

'তাই নাকি?' খুব একটা আগ্রহ দেখাল না রানা।

'জ্বী-হ্যাঁ।' ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল রিডের কণ্ঠ থেকে। পরমুহূর্তে কঠোর হয়ে উঠল তার মুখ। 'তুমি জানো প্যাকেটটা সম্পর্কে, তাই না, রানা? এখন আমার প্রশ্ন, কিভাবে তুমি জানলে ব্যাপারটা? জিনিসটা হাতে পেল এবং বাতাসে মিলিয়ে গেল হেন্ডারসন এটা তো হতে পারে না। খুঁজে পাওয়া দরকার ওকে।'

'ঠিক আছে বলব আমি। কিন্তু আমার কথা কি বিশ্বাস হবে তোমাদের?'

'বিশ্বাস হোক বা না হোক, বলো তুমি।'

গড়গড় করে বলে গেল রানা। সুফিয়ার কন্ট্যাক্ট লেন্সের কথা, চশমার দোকানের কথা, সুফিয়া আর হেডারসন বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সব। এই ইনফরমেশনগুলো এখন আর কোন কাজে লাগবে না রিডের তা জানে রানা এবং সেই কারণে বেশ বিস্তৃত ভাবেই বর্ণনা করল ব্যাপারগুলো। শেষে যোগ করল, 'বিশ্বাস হলো কথাগুলো?'

জবাব দিল না রিড, মুখ দেখেই বোঝা গেল বিশ্বাস করেছে সে। তারপর একটু হতাশ ভঙ্গিতে আস্তে আস্তে বসে পড়ল খাটের ওপর। এমন দৃষ্টিতে তাকাল রানার দিকে যেন এক্ষুণি গলা টিপে ধরবে ওর।

'উহ! কথাটা যদি তুমি গোদেনবার্গেই বলতে আমাকে...'

'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের একজন রিপোর্টারকে?'

'পরেও বলতে পারতে। ফ্রান্সিস যখন ধরে প্লেনে তুলে দেয় তোমাকে, তখন বললেও ঠেকানো যেত ব্যাপারটা।'

উইলকিনসন তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পদ্ধতিতে আবার ঢুকে পড়ল ওদের আলোচনায়। 'এই আমি প্রতিজ্ঞা করছি, রানা,' বলল সে, 'এই সেলটার দিকে তাকিয়ে দেখো ভাল করে। অভ্যস্ত হয়ে যাও এটার সঙ্গে। কারণ, তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের অনেকখানি সময় এরকম একটা সেলেই কাটাতে হবে। কথা দিচ্ছি আমি।'

'অত সস্তা নয়, মাথামোটা, অত সস্তা নয়। কি অপরাধে শুনি? তোমাদের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তামূলক জরুরী তথ্য গোপন করেছি? তোমার রাষ্ট্রের নিরাপত্তার চিন্তা তোমার, আমার কি? যাকগে, আমি কি একটু গোসল করতে পারব? কয়েদীদেরও কিন্তু নিয়মিত গোসলের অধিকার আছে।'

একটু ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল রিড, কিছু বলল না।

'আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে,' বলল রানা। 'কিন্তু তার আগে ঠাণ্ডামাথায় একটু চিন্তা করতে হবে আমাকে।'

'বলো।'

'এখন না। আগে গোসল করে নিই।'

বেশ সময় নিয়ে ধীরে ধীরে স্নান শেষ করল রানা। বাথরুমের জানালায়ও মোটা গরাদ, সুতরাং নিশ্চিন্ত মনেই ওকে গোসল শেষ করার সুযোগ দিল রিড। বাথরুমের দরজা বন্ধ করতেই একা হয়ে গেল রানা। বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলোকে একসূত্রে গাঁথার চেষ্টা করল। শরীরে গরম পানি ঢালতেই পেশীর ব্যথা কমে গেল অনেক। পুলিসের সরবরাহ করা চমৎকার একটা তোয়ালে দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ দলাই মলাই করার পর আরও স্বাভাবিক হয়ে এল শরীরটা। মাথাও পরিষ্কার হয়ে এল। সেলে ফিরে লারসনের কাপড়গুলো পরে নিল আবার। ট্রাউজারের পকেটে হাত দিয়ে দেখল খালি।

'আমার জিনিসপত্র কোথায়?' কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল রানা।

'সরিয়ে ফেলা হয়েছে ওগুলো,' পাশবিক একটা আনন্দের ভঙ্গিতে জবাব দিল

উইলকিনসন। 'কয়েদীদের সঙ্গে কিছু রাখতে দেয়া হয় না, জানো তো, এটাই নিয়ম। তোমাকে, রশিদ দেয়া হবে অবশ্য।'

রিডের দিকে তাকাল রানা। বলল, 'আমার ওয়ালেটে একটা ছবি আছে, ভিজে গেছে বোধহয় ছবিটা। অফিসের এক পার্টিতে তোলা, আমি আর সুফিয়া পাশাপাশি বসা...'

'তাতে কি হলো?' বলল রিড।

'তাতে হলো গিয়ে, মিস মার্থা হেন্ডারসনকে আগলে রেখেছে, মা যেমন শিশুকে আগলে রাখে সেরকম। অনেকদিন থেকে পরিচিত ওরা। লারউইকে এলে মহিলার কটেজেই থাকে সে। যে মেয়েকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে তাকে একবার না একবার মিস মার্থার কাছে নিয়ে যাবেই হেন্ডারসন, বুঝতে পারছ? অন্ততপক্ষে ওর ছবি দেখিয়েছে বুড়িকে।'

'এখনও কিছুই বুঝতে পারলাম না আমি।'

'কি আশ্চর্য, এত সহজ ব্যাপারটা বুঝতে পারলে না? এজন্যেই তো আমার আগে যেতে পারছ না কখনও, পেছনে পেছনেই থাকতে হচ্ছে।' খোঁচা মারার সুযোগটা ছাড়ল না রানা। 'হেন্ডারসন লুকিয়ে আছে, ঠিক?' বলতে লাগল ও, 'এবং বুড়ি ওকে আগলে আছে। হয়তো ওর সাথে যোগাযোগও আছে, খাওয়া ঘুমোনোর দরকার আছে না ওর? ওর বাগদত্তা মেয়েটা ওর কাছে একটা পার্সেল আর কিছু একটা সতর্কবাণী পাঠিয়েছে। ওর কটেজে আগুন লেগেছে এবং যে পোস্টম্যান ওকে প্যাকেটটা দিয়েছে সে একটু পরেই আক্রান্ত হয়েছে। ঠিক? কি ঘটে দেখার জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া এই পরিস্থিতিতে আর কি করতে পারে হেন্ডারসন? অপেক্ষা করা আর ভাবা, কোন প্রস্তাব আসবে নিশ্চয়ই। আর প্রস্তাবটা যদি বিশ্বাস করা যায় এমন কারও কাছ থেকে আসে তাহলেই সে গর্তের বাইরে মাথা বের করবে। বোঝা গেছে?'

লুফে নিল কথাটা উইলকিনসন, 'চমৎকার! আমরা নিয়ে যাব ফটোগ্রাফটা।'

'অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি,' বলল রানা, 'আমার চেহারা তোমার মত হোঁৎকা নয়, উইলকিনসন। রিডের মতও নয়। এখানে একজনই আছেন যাঁর চেহারা আমার মত, তিনি হচ্ছেন এই আমি। ছবিটা দেখালে আমাকে বিশ্বাস করলেও করতে পারে মিস মার্থা। অবশ্য যদি সুফিয়ার সঙ্গে আগে পরিচিত হয়ে থাকে মহিলা তবেই। কিন্তু তোমাদের কোন আশা নেই। আমি উপস্থিত না থাকলে ছবিটার কোন অর্থই থাকবে না বুড়ির কাছে। পরিষ্কার?'

একটু সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল রিড ওর দিকে। তারপর বলল, 'আরেকটা ব্যাপার আছে, যেটা জানো না তুমি। পাখি পর্যবেক্ষণে সহায়তা করার জন্যে হেন্ডারসনের এক সহকারী আছে। নিউটন লোকটার নাম। এই লোকটাও নিখোঁজ হয়ে গেছে।'

একটু ভাবতেই বুঝতে পারল রানা, এই নিউটন লোকটাই তাহলে হোম অভ নস-এর কথা জানিয়েছে ভ্লাদিমিরকে! অর্থাৎ সুফিয়ার এখনও বেঁচে থাকার সম্ভাবনা অনেকখানি কমে গেল। সুফিয়া আর জামিল যদি বেঁচে থাকে তো তিনজন জিম্মি

এখন রাশিয়ানদের হাতে!

'আমার মনে হয় না পরিস্থিতির খুব একটা পরিবর্তন হচ্ছে তাতে,' বলল রানা। 'এখন বলো, আমরা ছবিটা দেখাব মিস মার্থাকে, না, দেখাব না?'

আস্তে মাথাটা একটু ঝাঁকিয়ে বলল রিড, 'হ্যাঁ, মহিলার সঙ্গে দেখা করব আমরা। তোমার জিনিসপত্র আনার ব্যবস্থা করছি আমি, এক মিনিট দাঁড়াও।'

জিনিসপত্র আসার সময়টুকু ভীষণ দুশ্চিন্তায় কাটাল রানা। নিজের ভেজা কাপড় বদলে লারসনেরগুলো পরার সময় পকেটের জিনিসপত্র সব বের করেছিল, না ভেজা কাপড়ের পকেটেই রয়ে গিয়েছিল কিছু, মনে করতে পারছে না ও। ঢিপ ঢিপ করছে বুকের ভেতর। ওয়ালেটটা যদি না থেকে থাকে তো সব পণ্ড। হঠাৎ মনে হলো, আছে ওয়ালেটটা। তা না হলে ছবির প্রসঙ্গ তোলার পরপরই রিড জানাত যে ওর পকেটে কোন ওয়ালেট ছিল না।

যা হোক, একটু পরেই দুশ্চিন্তার অবসান হলো। একজন কনস্টেবল নিয়ে এল জিনিসগুলো। কিছু খুচরো পয়সা, চাবি, সিগারেট লাইটার, ভেজা একটা পাসপোর্ট, আরও ভেজা রুমাল আর ওয়ালেট। ওয়ালেটটা খুলল রানা। ভিজে যাওয়া টাকা আর ক্রেডিট কার্ডগুলোর নিচ থেকে বের করল ছবিটা। ভিজেছে, তবে কোন ক্ষতি হয়নি সেটার। পানিতে ক্ষতি হয় না ফটোগ্রাফিক প্রিন্টের, যদি না শুকানোর সময় কোন কিছুর সঙ্গে সেঁটে দেয়া হয়।

'পেয়েছ?' জিজ্ঞেস করল রিড।

'হ্যাঁ।'

'চলো তাহলে।'

ওয়ালেটটা ট্রাউজারের ব্যাক পকেটে ঢুকিয়ে বলল রানা, 'আরেকটা জিনিস।'

'আবার কি?'

'প্রকৃতির ডাক।'

'হায়, জিযাস!'

'খুবই জরুরী,' চোখ মুখ কুঁচকে বলল রানা।

ল্যাভেটরিতে ঢুকল ও। শক্ত টিস্যু পেপারের রোল দেখতে পেল কমোডের পাশে। ভাগ্য ভাল সফট্ নয় এগুলো। ব্রিটেনের অনেক পুলিস স্টেশনেই এখনও সফট্ টিস্যু পেপারের প্রচলন হয়নি। অন্ততপক্ষে কয়েদীদের জন্যে তো নয়ই।

রোল থেকে খানিকটা কাগজ ছিঁড়ে নিল রানা। টেনে দেখল, লেখার পক্ষে যথেষ্ট শক্ত। ওয়ালেটটা বের করল আবার। অনেক ছোট ডায়েরীর ভাঁজের কাছে যেমন ছোট্ট পেন্সিল থাকে, ওর ওয়ালেটের ভাঁজের কাছেও তেমনি ছোট্ট একটা বল পয়েন্ট কলম আছে। জহির ভাইয়ের গুঁতানির ঠেলায়ই ওয়ালেটে কলম রাখার এই অভ্যাসটা হয়েছে ওর। ভদ্রলোকের বক্তব্য হচ্ছে: প্রত্যেক রিপোর্টারের কাছে সব সময় একটা রিজার্ভ কলম থাকতেই হবে।

মেসেজটা তাড়াতাড়ি লিখে ফেলল ও। কলমটা জায়গামত রেখে ওয়ালেটটা আবার ঢুকিয়ে দিল ব্যাক পকেটে। ডান পকেটটা পুরো খালি করে কাগজটা কয়েক ভাঁজ করে রেখে দিল সেখানে। ঢোকার দুমিনিট পর বেরিয়ে এল ও ল্যাভেটরি

থেকে।

'চলো, যাওয়া যাক।'

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছোট্ট কটেজটায় পৌঁছল ওরা। রিডের দিকে ভয়ঙ্কর এক চাউনি হেনে বলল মিস মার্থা, 'আগেই তো তোমাকে বলেছি, বাপু, আমি জানি না কোথায় ও। 'এমন সময় চোখ পড়ল রানার দিকে, 'তোমাকেও তো বলেছি।'

'মিস মার্থা,' বলল রানা, 'আপনাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই আমি। ঘরে আসতে পারি আমরা?'

'সেরকম কোন দরকার তো...'

'ব্যাপারটা খুবই জরুরী। সত্যিই জরুরী, মিস মার্থা, প্লীজ!'

একটু দ্বিধা করল মিস মার্থা। কিন্তু রানার কণ্ঠস্বরে এবং ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল যে আর না করতে পারল না মহিলা। দরজা ছেড়ে একটু পেছনে সরে গিয়ে ওদের ঢোকার পথ করে দিল।

'ঠিক আছে, এসো।'

ছোট্ট পরিপাটি সিটিং রুমে ঢুকল ওরা। সাদাসিধে কিন্তু সুন্দর কারুকাজ করা গদিমোড়া সোফায় বসতে বসতে বলল মহিলা, 'হ্যাঁ, এবার বলো।'

ওয়ালেটটা বের করল রানা পকেট থেকে। ফটোগ্রাফটা বের করে দিল বুড়ির হাতে। বলল, 'সুফিয়া আশরাফ।' রানার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে ছবিটার দিকে মনোযোগ দিল মহিলা।

বি.সি.আই-এর আগের ব্যাচের এজেন্টদের জার্নালিজম-এর ট্রেনিং শেষে জহির ভাইয়ের দেয়া এক ঘরোয়া পার্টিতে তোলা ছবিটা। পাশাপাশি বসে আছে রানা আর সুফিয়া। সোহানাকে ঈর্ষাকাতর করে তোলার জন্যে ছবিটা তুলেছিল রূপা। ওর কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল রানা। গোদেনবার্গে যাওয়ার সময়ই ছবিটা ওয়ালেটে ঢুকিয়েছিল ও। হারিয়ে যাওয়া কাউকে খোঁজার সময় সঙ্গে একটা ছবি থাকলে অনেক সুবিধা হয় খুঁজতে।

প্রায় আধ মিনিট একমনে ছবিটা নিরীক্ষণ করল মিস মার্থা। তারপর মুখ তুলে তাকাল রানার দিকে, একটু যেন প্রসন্ন দৃষ্টিতে।

'জেমস হেন্ডারসনের সঙ্গে কখনও পরিচয় হয়নি আমার,' বলল রানা। 'কিন্তু সুফিয়া আমার পুরানো বন্ধু।'

এখনও দ্বিধামুক্ত হতে পারছে না মহিলা, কি বলবে বুঝতে পারছে না যেন।

'এ ছবিটা লন্ডনে এক পার্টিতে তোলা,' আবার বলল রানা! 'আমরা একই কাগজে কাজ করি। আমার নাম মাসুদ রানা। হেন্ডারসন তো ওর খালাতো ভাই, তাই না? আপনার কাছে না হলেও হেন্ডারসনের কাছে বোধহয় আমার গল্প করেছে সুফিয়া। অন্তত জামিল যে করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'জামিলটা আবার কে?' জিজ্ঞেস করল রিড।

'সুফিয়ার ছোট ভাই।'

এখনও কোন প্রতিক্রিয়া নেই বুড়ির ভেতর। বলল, 'আচ্ছা, এই ভদ্রলোকদের ব্যাপারটা কি? এরাও কি ওর বন্ধু নাকি?'

'না, মিস মার্থা।'

'এক মিনিট, রানা!' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল রিড।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' বলল ও, 'এরা চেনে না সুফিয়াকে, তবে এরাও জড়িত ব্যাপারটার সঙ্গে।'

'হুম-ম-ম।' উজ্জ্বল সতর্ক চোখ মেলে আবার কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল মহিলা রানার দিকে। ধুত্তোর, কি দেখে বুড়ি এত! দুমড়ানো মুচড়ানো কাপড় পরা, দুই দিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি মুখে নিশ্চয়ই রাজপুত্রের মত দেখাচ্ছে না আমাকে, ভাবল রানা। নির্ঘাত বিশ্বাস করতে পারছে না বুড়ি কথাগুলো। এখনও যদি বিশ্বাস না হয় বুড়ির তো আর কিছু করার নেই।

কিন্তু, সত্যিই কি তাই? হঠাৎ কি মনে পড়ল রানার, বলল, 'সুফিয়া আমাকে অ্যাগি-ওয়্যাগি সম্পর্কেও বলেছিল।'

'অ্যাগি-ওয়্যাগি?'

একটু হাসল রানা, 'হ্যাঁ, অ্যাগি-ওয়্যাগি।'

'একমাত্র শেটল্যান্ডেই প্রচলিত শব্দটা,' বলল মিস মার্থা।

'জানি। সুফিয়া বলেছে আমাকে।'

প্রায় লাফিয়ে উঠল রিড। 'কি···অ্যাগি-ওয়্যাগিটা আবার কি?'

'বাচ্চাদের একটা খেলা,' বলল রানা। 'বাচ্চারা স্কুলের উঠানে খেলে ওটা। তাই না, মিস মার্থা?'

'হ্যাঁ। রাস্তায়ও।'

'মিস মার্থা,' বলল রানা, 'আপনার বিশ্বাস জন্মানোর জন্যে আর কিছুই নেই আমার থলিতে। দা নিউজে জয়েন করার আগে আফ্রিকায় ছিল ও, মাঝেমধ্যে কন্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করে সুফিয়া, আর কি বলতে পারি? এটুকুই শুধু বলতে পারি, আমি হেন্ডারসনের দিকে।'

'কেন? জীবনে কোনদিন দেখোনি যাকে তার পক্ষে হতে যাবে কেন তুমি?'

'কারণ আমি সুফিয়ার পক্ষে।' তারপরে দ্রুত যোগ করল ও, 'দেখুন মিস মার্থা, শুধু সুফিয়া নয়, জামিলের কথাও নিশ্চয়ই শুনেছেন আপনি, ওদের দু'জনেরই জীবন নির্ভর করছে এখন হেন্ডারসনের ওপর।'

রানার দিকে একবার তাকিয়ে ছবিটার দিকে তাকাল মিস মার্থা, তারপর আবার ওর দিকে। সুফিয়ার সঙ্গে লোকটা সত্যিই ও কিনা যাচাই করছে যেন।

'মনে হয় সত্যি কথাই বলছেন আপনি, মিস্টার···?' শেষ পর্যন্ত নরম হলো বুড়ি।

'মাসুদ রানা। মিস মার্থা, জানি না আপনি হেন্ডারসনকে একটা খবর দিতে পারবেন কিনা···'

কথা বলার জন্যে মুখ খুলতে গেল মিস মার্থা, কিন্তু সুযোগ দিল না রানা। বলে যেতে লাগল, 'পারবেন অথবা পারবেন না যা-ই বলুন না কেন, আমি ধরে নিচ্ছি আপনি পারবেন, এবং আশা করছি কাজটা করবেন আপনি।'

কোন জবাব দিল না মিস মার্থা। আবার বলল রানা, 'আপনি নিজে ওর সঙ্গে

দেখা করলে ভাল হয়, আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদেরও একটু কথা বলা দরকার ওর সাথে। যেখানে দেখা করাটা সুবিধাজনক মনে হয় ওর কাছে সেখানেই যাব আমরা।'

একমুহূর্ত ভাবল মহিলা ব্যাপারটা নিয়ে। এই অপরিচিত লোকগুলো তাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছে কিনা বুঝতে চেষ্টা করছে যেন। তারপরে বলল, 'আমি জানি না ঠিক, যদি...'

'বলেছি তো, মিস মার্থা, যদি সম্ভব হয় আপনার পক্ষে। আর আমার বিশ্বাস আপনি একটু চেষ্টা করলেই সম্ভব হবে।'

আর একবার চকিতে রানাকে দেখে নিয়ে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল মিস মার্থা। পরিষ্কার ইঙ্গিত। উঠে দাঁড়াল ওরাও। ডান হাতটা পকেটে রানার, ও চাইছে রিড এবং উইলকিনসন আগে আগে যাক এবং স্বভাবতই ওরা তা চাইছে না। প্রায় জোর করেই ওদেরকে আগে আগে বেরোতে বাধ্য করল রানা। শেষ মুহূর্তে দরজার বাইরে এসে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে হাত বের করে শেকহ্যান্ড করল ও মিস মার্থার সঙ্গে।

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওর সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করবেন, প্লীজ,' বুড়ির নরম হাতে চিরকুটটা পাচার করতে করতে বলল ও। 'পুলিস স্টেশনে ফোন করলেই পাবেন আমাদের।'

সঙ্গে সঙ্গেই কাগজের টুকরোটা হাতের তালুর ভাঁজে লুকিয়ে ফেলল মিস মার্থা, যেন সারা জীবন এ ধরনের কাজ করে করে হাত পাকিয়েছে বুড়ি। মৃদু একটু হেসে ঘুরে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করল রানা।

দরজা বন্ধ করে দিল মিস মার্থা।

'কাজটা করবে মহিলা?' জিজ্ঞেস করল রিড। সন্দেহ তার গলায়।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। সত্যিই ও জানে না, কাজটা করবে কিনা মিস মার্থা। ওর ধারণা বিশ্বাস করেছে মহিলা। কিন্তু চিরকুটটা আবার তাকে দ্বিধায় ফেলে দেবে না তো?

'আশায় আশায় অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার আছে কি আমাদের?' জবাব দিল রানা।

আট

পুলিস স্টেশনে ফিরে এল ওরা। অপেক্ষা ছাড়া আর কিছু করার নেই এখন। হেন্ডারসনকে পেলে রিড এবং উইলকিনসনের কাজ শেষ, আর রানার আসল কাজের শুরু। পুলিসের লোকেরা এখনও খুঁজে চলেছে হেন্ডারসনকে। কিন্তু সার্জেন্ট ম্যাকেঞ্জি এখন পর্যন্ত আশাব্যঞ্জক কোন রিপোর্ট দিতে পারেনি। সার্জেন্টও জানে ভাল করেই, হেন্ডারসন না চাইলে তাকে খুঁজে বের করা অসম্ভব। তবু

ওপরওয়ালার মন রক্ষা করার জন্যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেচারা দলবল নিয়ে খুঁজে চলেছে। লারউইক পুলিস স্টেশনের সব স্বাভাবিক কাজকর্ম স্থগিত রেখে সবাই খুঁজতে লেগেছে হেন্ডারসনকে।

ছোটখাট দু'একটা কাজ সারল ওরা বসে বসে। প্রয়োজনের চেয়ে সময় কাটানোর জন্যেই বিশেষভাবে করল ওরা কাজগুলো। ব্রেকফাস্ট সারল রানা। যথেষ্ট খিদে ছিল পেটে, সুতরাং গোগ্রাসে গিলে ফেলল পুলিসের সরবরাহ করা যাচ্ছেতাই নাস্তা। তাছাড়া, দ্রুত শারীরিক সুস্থতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে ও ভীষণভাবে। হেন্ডারসনকে পাওয়া যাক আর না যাক, ভ্লাদিমিরের সঙ্গে শেষ একটা বোঝাপড়া হবেই ওর। সুতরাং শক্তি সঞ্চয় করা দরকার।

কিন্তু গায়ের ব্যথা তো যাচ্ছে না! আরেকবার গোসল করল রানা। এবার আরও দীর্ঘ সময় নিয়ে, আরও দলাই-মলাই করে। শরীরের ব্যথা ব্যথা ভাবটার খুব একটা উন্নতি হলো না, তবে মাথার ভার কেটে গেল সম্পূর্ণ।

লন্ডনে ফোন করার জন্যে পর্দার আড়ালে চলে গেল রিড। বেরিয়ে এল মুখ হাঁড়ি করে, শরীরের কোন বাজে অংশে গজানো বিষফোঁড়ার ব্যথা চেপে আছে যেন।

উইলকিনসনের মাথায় তুখোড় একটা বুদ্ধি এসেছে: সব রাশিয়ান জাহাজকে এই মুহূর্তে লারউইকের হারবার ত্যাগ করার নির্দেশ দেয়া হোক এবং শুধু লারউইক হারবার নয়, পুরো শেটল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের জলসীমার বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হোক সেগুলোকে। কিন্তু যখন লন্ডনের অনুমতি ছাড়া স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এ ধরনের কাজ করতে সরাসরি অস্বীকার করে বসল তখনই লাগল ঘাপলাটা। আসল ঘটনা ফাঁস না করে কর্তৃপক্ষকে বোঝানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করল সে, কিন্তু লাভ হলো না কোন। শেষ অবধি বেচারা জর্জ হফম্যানকে পটানোর জন্যে ফোন করল লন্ডনে। উইলকিনসনের বক্তব্য শোনার পরই ফোনে ম্যাকেঞ্জিকে চাইল হফম্যান এবং জিজ্ঞেস করল, পোলিশ বা পূর্ব জার্মান ফিশিংবোট আসে কিনা লারউইকে এবং এখন আছে কিনা। হ্যাঁ সূচক উত্তর শুনে হফম্যান একেবারে নিরাশ করে দিল উইলকিনসনকে। রাশিয়ান ট্রলারগুলোকে ভাগিয়ে দিলেও পরিস্থিতির কোন উন্নতি হচ্ছে না সেক্ষেত্রে। তাছাড়া কি অভিযোগে তাড়াবে ওদের? ম্যাকেঞ্জি আরও যোগ করল: আগের দিন সন্ধ্যায় বেশ কয়েকজন রাশিয়ান নাবিক আপ-হেলি-আ মিছিলে যোগ দিয়েছে এবং স্থানীয় জনসাধারণের আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবেই তারা উপস্থিত ছিল সেখানে। কয়েকদিন আগে কয়েকটা রাশিয়ান ট্রলারের নাবিকরা আদর্শগত দ্বন্দ্ব ভুলে গিয়ে পেশাগত বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ ঝড়ের পরে সমুদ্রে ভেসে যাওয়া কয়েকজন স্থানীয় জেলেকে উদ্ধার করে। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ স্থানীয়রা আপ-হেলি-আ উৎসবে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ জানায়। সুতরাং রাশিয়ানরা লারউইকে আপাতত সম্পূর্ণ ফায়ার প্রুফ পজিশনে আছে।

সময় বয়ে যাচ্ছে অলসভাবে। দুপুর এল এবং চলে গেল। পুলিস স্টেশনের দোতলার সেই রুমটায় বসে আছে ওরা। কেউ কারও সাথে কথা বলছে না। কথা বলার মত কিছু নেইও আসলে। বসে থাকতে থাকতে ঝিমুনি লেগে যাচ্ছে রানার। দুপুরে লাঞ্চের পর শরীর আরও ঝরঝরে হয়ে গেছে। উইলকিনসন আরও একটা

চমৎকার আইডিয়ার অঙ্কুরোদ্গম ঘটাল: সত্যিসত্যিই এবার কড়া ভাবে চাপ সৃষ্টি করা দরকার মিস মার্থার ওপর 'এই পরিস্থিতিতে যে-কোন উপায়ে চেষ্টা চালানোটাই আইনসঙ্গত,' ঘ্যানর ঘ্যানর করে রিডের সঙ্গে যুক্তিজাল বিস্তার করে চলল সে।

'এই সাইকোপ্যাথিক ইডিয়টটা যে ইনটেলিজেন্সে আছে কি করে...' এই নিয়ে বোধহয় বত্রিশবার ভাবল রানা কথাটা। রিড সিম্পলি বলল, 'মিস মার্থা অত সোজা মহিলা নয় যে তুমি গিয়ে খানিকটা তর্জন গর্জন করলে আর উনি লেজ গুটিয়ে বসে পড়লেন! পুলিস নিয়ে গিয়ে ধরে আনতে পারবে তুমি মিস মার্থাকে? কি অপরাধে শুনি?'

ফোনের দিকে তাকিয়ে ঝিমোচ্ছে সবাই। কখন বাজে..., কখন বাজে...। লারউইক পুলিস স্টেশনের তিনটে ফোনের একটা আপাতত দোতালার এই রুমে নিয়ে আসা হয়েছে। রিডের নির্দেশে একটা এক্সটেনশন লাইনও লাগানো হয়েছে সেটার সাথে।

অপেক্ষাটা একটু দীর্ঘ হয়ে গেল। ছ'ঘণ্টার ওপর। এবং আরেকটা অপেক্ষার সূচনা করে শেষ হলো সেটা। বিকেল পৌনে চারটার দিকে বেজে উঠল ফোন। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে গিয়ে ফোন ধরল রিড। কানে ঠেকিয়ে এক সেকেন্ড রেখেই রানার হাতে দিল রিসিভারটা। নিজে তুলে নিল এক্সটেনশন লাইনের রিসিভার।

'মিস্টার রানা? মার্থা বলছি। ছ'টার সময় টাউন হলের গেটে অপেক্ষা করবে।'

'ধন্যবাদ, মিস মার্থা,' বলল রানা। তারপর রিডের দিকে একবার তাকিয়ে সতর্ক কণ্ঠে বলল আবার, 'আমার কথায় রাজি হয়েছে ও?'

'হ্যাঁ। আমার মনে হয় সুফিয়ার কাছে তোমার কথা শুনেছে ও।'

রিড শুনছে ওদের কথাবার্তা, সুতরাং আর কথা বাড়াল না রানা। দেখা যাক কি হয় ভেবে রেখে দিল ফোন। আবার শুরু হলো বিরক্তিকর অপেক্ষার পালা, কখন ছ'টা বাজবে!

জানালার কাছে উঠে গিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল ওরা। টাউন হলের গেটটা একশো গজও হবে না। সহজেই নজর রাখা যায় এখান থেকে। ফোন রাখার পরমুহূর্ত থেকে টাউন হলের গেটের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল উইলকিনসন; এক সেকেন্ডের জন্যেও নড়ল না জানালার কাছ থেকে। চারটে থেকে ঘড়ি দেখা শুরু করল সে এবং ওরা পুলিস স্টেশন থেকে বেরোনোর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতি পাঁচ মিনিট পর পর ঘড়ি দেখতেই থাকল। চেয়ারে বসে আবার ঝিমোতে শুরু করেছে রানা।

পাঁচটার দিকে সন্ধ্যা ঘুরে গেল। ঘরের ভেতর এবং বাইরে জ্বলে উঠল আলো। রাস্তায় স্ট্রীট লাইটগুলোও জ্বলে উঠল একে একে। রিড আবার ফোন করল লন্ডনে, সর্বশেষ পরিস্থিতির খবরাখবর জানাল উপরওয়ালাকে। সাড়ে পাঁচটার দিকে বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে এসে বসল রানা। ঝিমুনির ভাবটা আর নেই এখন। বসে বসে ভাবছে সুফিয়ার কথা, জামিলের কথা।

বেচারা জামিল! দুনিয়ার হালচাল কিছুই জানে না, বোঝে না। কতই বা বয়স

হবে? বারো, না তেরো? এরই ভেতর দুবার কি ভয়ানক বিপদেই না পড়তে হলো ওকে। এখনও কি বাঁচিয়ে রেখেছে ওদের ভ্লাদিমির? আশা করা ছাড়া আর কিছু কি করার আছে? ওরা জানে ট্র্যান্সপারেন্সিটা পৌঁছে গেছে হেন্ডারসনের হাতে। সুতরাং হেন্ডারসনকেই ওদের প্রয়োজন এখন, সুফিয়াকে নয়। কিন্তু হেন্ডারসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্যে জীবিত সুফিয়া একটা ভাল অস্ত্র এটা কি জানে না ভ্লাদিমির? নিশ্চয়ই জানে এবং সেক্ষেত্রে এখনও বেঁচে থাকার সম্ভাবনা আছে সুফিয়ার। হয়তো লারউইকের হারবারে নোঙর করে থাকা রাশিয়ান ট্রলারগুলোর কোন একটাতেই আছে সে।

যতই এগিয়ে আসছে সময়, ততই চিন্তিত হয়ে উঠছে রানা। একটু আগেই মনে এসেছে ওর কথাটা। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে; পুলিস স্টেশনের আশেপাশেই কোথাও ঘাপটি মেরে নেই তো ভ্লাদিমিরের লোকজন? ওরা বেরোনোর পর অনুসরণ করতে থাকল এবং হেন্ডারসনের সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরে ফেলল, তখন? রাশিয়ানরা হেন্ডারসনকে একবার হাতে পেয়ে গেলে কোন ভাবেই আর উদ্ধার করা সম্ভব হবে না সুফিয়া বা জামিলকে। কিন্তু এতখানি সাহস কি হবে ওদের?

সাড়ে পাঁচটার একটু পর থেকেই রাস্তায় লোক জমতে শুরু করল। আপ-হেলি-আ উৎসবের মিছিল শুরু হবে সাতটায়। পুরো লারউইক, পুরো শেটল্যান্ডের অর্ধেক এবং বহু টুরিস্ট জমায়েত হবে আজ। কেউ অংশ নেবে মিছিলে। কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে শুধু। সব দিক থেকেই দলে দলে লোক আসছে। পেভমেন্টগুলো ভর্তি হয়ে গেল অল্প সময়ের মধ্যেই। দু'একজন পুলিসের টুপি পরা মাথা দেখা যাচ্ছে ভিড়ের ভেতর। মিস মার্থার ফোন পাওয়ার পর হেন্ডারসনকে খোঁজা বন্ধ করেছে পুলিস। আজকের রাতটা আপ-হেলি-আ ফেস্টিভ্যালের হুইস্কি নাইট। হুইস্কির বন্যা বয়ে যাবে আজ লারউইকে, সুতরাং মিস মার্থার ফোন না পেলেও পাঁচটা নাগাদ হেন্ডারসনকে খোঁজা বন্ধ করতেই হতো পুলিসকে।

ছ'টা বাজার পাঁচ মিনিট আগেই তিনজনে বেরোল থানা থেকে। রাস্তা পেরিয়ে হাঁটতে লাগল ওরা টাউনহলের দিকে। অজস্র নারীপুরুষ দ্রুতপায়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে সামনে। অনেকের পকেট থেকেই উঁকি মারছে বোতলের মুখ। মূল জমায়েতটা হওয়ার কথা টাউন হলের সামনে, এবং সেদিকেই যেতে চাইছে সবাই। কিন্তু ইতোমধ্যেই মানুষে ভর্তি হয়ে গেছে জায়গাটা। অনেকেই উৎসবের সৌখিন সাজে সেজেছে। অনেকের হাতে রয়েছে মাথায় ন্যাকড়া জড়ানো দণ্ড: ন্যাকড়া তেলে চুবিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলেই মশাল হয়ে যাবে সেগুলো। আপ-হেলি-আ উৎসবের সবচেয়ে বর্ণাঢ্য ব্যাপারই এই মশাল মিছিল। গ্যালির সামনে বা পেছনে থেকে মশাল হাতে এগিয়ে যাবে মশালধারী ভাইকিংরা।

বহু কষ্টে মানুষ ঠেলে ঠেলে টাউন হলের গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল ওরা তিনজন। এখনও ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে উইলকিনসন। ঠিক ছটার সময় টাউন হলের ঘড়িটা ঢং ঢং করে বেজে উঠল ওদের মাথার উপরে। নিজের ঘড়িটা একবার দেখে টাউন হলের ঘড়িটার দিকে চোখ তুলে তাকাল রানা, কাঁটায় কাঁটায়

ঠিক চলছে ওটা।

চলমান লোকগুলোর মুখ তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করছে রিড আর উইলকিনসন। দুজনের একজনও চেনে না হেন্ডারসনকে। রানাও চেনে না, তবে ছবি দেখেছে। হেন্ডারসনের চিন্তার চেয়ে ভ্লাদিমিরের চিন্তাই রানাকে উদ্বিগ্ন করছে বেশি। সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে কখন উদয় হয় লোকটা কে জানে!

ছ'টা বেজে পাঁচ মিনিটে বলল রিড, 'নাহ, আসছে না ও।'

'আসবে,' বলল রানা। 'এই ভিড়ের ভেতর পথ করে হেঁটে আসা সাট্টিখানি কথা নয়! তাছাড়া মিস মার্থা নিশ্চয়ই খামোকা ফোন করেনি।'

অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। সোয়া ছ'টা বাজল। সাড়ে ছ'টা বাজল। এখনও পাত্তা নেই হেন্ডারসনের। এদিকে মানুষের ভিড় বেড়েই চলেছে। প্রচণ্ড চাপাচাপি, ঠেলাঠেলি টাউনহলের সামনে।

'নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে দেরির,' বলল রানা। 'কোথাও বোধহয় আটকে গেছে। অথবা কোন জায়গা থেকে লক্ষ করছে আমাদের। শিওর হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে বোধহয়। কারণ আমরা যেমন ওকে চিনি না ও-ও তেমনি চেনে না আমাদের।'

কয়েক মিনিট পর, রাস্তাটা পার হয়ে আবার একই জায়গায় ফিরে আসার পরামর্শ দিল রানা। বলল, 'তাতে করে বুঝতে পারবে হেন্ডারসন, মিছিলে যাওয়ার জন্যে আসিনি আমরা, টাউন হলের গেটে কারও জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'ঠিক আছে, চলো, চেষ্টা করে দেখা যাক,' হতাশ গলায় বলল রিড।

রাস্তা পেরোল ওরা এবং ওপাশে গিয়ে দাঁড়াল কিছুক্ষণ। এপাশটায় ভিড় একটু কম, কিন্তু যে হারে স্রোতের মত লোক আসছে, তাতে কয়েক মিনিট লাগবে এপাশেও ওপাশের মত ভিড় হতে। সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে গিজ গিজ করছে লোক।

'চলো ফেরা যাক,' বলল রিড।

'আর এক মিনিট,' বলল রানা। হারবারেব দিক থেকে ঢালু পথ বেয়ে হল্লা করতে করতে নেমে আসছে একদল লোক। বিরাট দলটা। শ'খানেকের বেশি হবে। নাবিক বোধহয় সব। দলটা ওদের একেবারে কাছে না এসে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ওরা। এখনও একমিনিট হয়নি।

'চলো ফেরা যাক,' বলল রানা।

রিড ঘুরে দাঁড়াল। উইলকিনসন ঘুরে দাঁড়াল। রানাও ঘুরতে শুরু করল। ওদের দেখাল যে ও-ও ঘুরছে। ইতোমধ্যেই হাঁটতে শুরু করেছে রিড আর উইলকিনসন। অর্ধেক ঘোরা অবস্থায়ই দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। এক সেকেন্ড অপেক্ষা করে দ্রুত তিন পা হেঁটে ঢুকে পড়ল নাবিকদের দলটার ভেতরে।

কিছুক্ষণ একতালে হাঁটার পর গতি বাড়িয়ে দিল ও। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই দলটার সামনে এসে পড়ল ও। সামনে বড় একটা মাঠ। দিনের বেলায় কোন এক সময় রঙচঙে গ্যালিটা টেনে এনে রাখা হয়েছে মাঠে। এখান থেকেই শুরু হবে আপ-হেলি-আ উৎসবের মশাল মিছিল। মাঠটার দু'পাশ দিয়ে চলে গেছে দুটো

রাস্তা। দুটো রাস্তাই মানুষে গিজ গিজ করছে, মাঠের ভেতরেও অসংখ্য মানুষ। ঠেলাঠেলি না করে এক পা-ও এগোনো সম্ভব নয়। আর একটু পরেই শুরু হবে মিছিল, হৈ-হল্লা বেড়ে গেছে অনেক। এরই মধ্যে কয়েক গজ পেছন থেকে রিডের গলা শুনতে পেল রানা, 'ধরো ওকে!' পরমুহূর্তে ডান পাশের এক দল লোকের উৎফুল্ল চিৎকারের নিচে চাপা পড়ে গেল ওর কথা। মানুষের ছোটখাট একটা সমুদ্রের ভেতর এখন রানা। এর ভেতরে কোথায় ওকে খুঁজবে রিড?

ধীরে ধীরে একটু একটু করে বেরিয়ে আসতে লাগল রানা ভিড়ের এলাকা ছেড়ে। মাথা নিচু করে ঝুঁকে, একে ঠেলে, ওর পা মাড়িয়ে চলতে লাগল ও জায়গাটার দিকে, মিস মার্থার হাতে পাচার করা চিরকুটে যে জায়গায় থাকতে বলেছিল হেন্ডারসনকে সেই জায়গার দিকে। লাইব্রেরি বিল্ডিংয়ের ওপাশে যে ফোন-বুদটা আছে সেটার সামনে থাকার কথা হেন্ডারসনের।

এসে পৌঁছল ও জায়গাটায়। সাতটা বাজতে এখনও দশমিনিট, একটু আগেই এসে পড়েছে মনে হচ্ছে। সাতটার ভেতর আসার কথা হেন্ডারসনের। বোধহয় কাঁটায় কাঁটায় সাতটায়ই আসবে সে। ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা মানে যে-কোন মুহূর্তে আবার রিড নয়তো ভ্লাদিমিরের হাতে ধরা পড়ে যাওয়া। আবার ভিড়ের ভেতর ঢুকে পড়ল রানা। গায়ের পোশাক নিয়ে একটু চিন্তিত না হয়ে পারল না ও। লারউইকের অধিবাসীরা আপ-হেলি-আ উৎসবে আসে তাদের সেরা পোশাক পরে। ওর গায়ের কুঁচকে যাওয়া ট্রাউজার আর নোংরা সোয়েটার দেখে না আবার সন্দেহ করে বসে কেউ।

ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে একটু পরপরই মাথা উঁচু করে দেখছে রানা, এল কিনা হেন্ডারসন। ওর দুশ্চিন্তাকে দ্বিগুণ করে দিয়ে বেজে গেল সাতটা। এখনও আসেনি হেন্ডারসন। ফোন-বুদটার সামনে বেশি লোক নেই। যে দু'চারজন আছে তার মধ্যে হেন্ডারসন থাকলে চিনতে পারত রানা। নকল ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিসের কাছে দেখা ছবির লোকটার চেহারা মনে আছে ওর।

সাতটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের বিশেষ পোশাক পরা নারীপুরুষ লাইন করে দাঁড়িয়ে গেল। ব্যান্ডে বেজে উঠল জমকালো মিউজিক। বাজি পোড়ানো শুরু হলো মাঠের ভেতর। সাঁ সাঁ করে আকাশে উঠে যাচ্ছে হাউই বাজি। তারপর লাল, নীল, সবুজ নানা বর্ণের আলোর ছটা তুলে নেমে আসছে নিচে। মিছিলের একেবারে সামনে দাঁড়িয়েছে ভাইকিং পোশাক পরা একদল লোক। প্রত্যেকের হাতে একটা করে মশাল, এখনও জ্বালানো হয়নি সেগুলো।

জ্বলে উঠল মশালগুলো একে একে। আধমিনিট পর চলতে শুরু করল মিছিল। উদ্বিগ্ন চোখে ফোন-বুদটার দিকে তাকাল রানা। এখনও আসেনি হেন্ডারসন।

মিছিলের পাশে পাশে চলতে শুরু করল ও। সকালে হেন্ডারসনকে দেখানোর জন্যে ছবিটা দিয়ে এসেছিল মিস মার্থাকে। ওই ছবি দেখে কি চিনতে পারবে ওকে হেন্ডারসন? মিছিলের পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে ফোন-বুদটার সামনে এসে পড়েছে ও। মিছিলের সঙ্গেই এগিয়ে যাবে, না ফোন-বুদের সামনে দাঁড়িয়ে পড়বে ভাবছে রানা। এমনসময় কানের কাছে ফিসফিস একটা শব্দ শুনতে পেল ও, 'রানা?'

ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও লোকটার দিকে। হ্যাঁ, নকল ফ্রান্সিসের কাছে দেখা ছবির লোকটাই। হেন্ডারসন। আস্তে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'আমার পেছন পেছন এসো,' বলল হেন্ডারসন।

সহজেই বেরিয়ে আসতে পারল ওরা ভিড় ছেড়ে। এমন ঠাসাঠাসি যে দু'একজন মিছিল ছেড়ে চলে যেতে চাইলে অন্যরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই পথ করে দিচ্ছে তাদের, একটু যদি হাঁফ ছাড়বার সুযোগ পাওয়া যায় তাতে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওরা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়ল। দ্রুতপায়ে এগিয়ে যেতে লাগল মিছিল যেদিকে চলছে তার বিপরীত দিকে। বড় রাস্তা ছেড়ে এ-গলি সে-গলি পার হয়ে অন্ধকার একটা উঠানে এসে পড়ল ওরা।

বিরাট লম্বা চওড়া শরীর হেন্ডারসনের। দেখলেই বোঝা যায় অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু, তাছাড়া যথেষ্ট শক্তি রাখে সে গায়ে। বয়সের তুলনায় একটু ভারী চেহারা। দেয়ালের কাছে সরে এল ওরা। উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করতে গেল রানা, 'তোমার কাছে...'

বাধা দিল হেন্ডারসন। বলল, 'কোন প্রশ্ন নয়, তুমি কি জানো বলো আগে।'

কথা না বাড়িয়ে সংক্ষেপে সব খুলে বলল রানা। সোভিয়েট ইহুদীদের কথা, তাদের প্ল্যানের কথা, ওদের কেউ একজন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সে-কথা, এবং তাতেও না দমে সুফিয়াকে তার অজান্তে কুরিয়ার হিসেবে ব্যবহারের কথা; জার্লশফ, স্যান্ডেনস, নরওয়ের ঠিকানা লেখা লেন্সকেসটা চশমার দোকানে ফেলে আসার কথা, তারপরে কেসটা নরওয়ের পোস্টাল সার্ভিস মারফৎ রিডাইরেক্টেড হয়ে শেটল্যান্ডে আসার কথা–সব।

চুপচাপ মন দিয়ে শুনল হেন্ডারসন, বলল না কিছু। এরপর, কি কারণে ট্র্যান্সপারেন্সিটা রাশিয়ান এবং আমেরিকান দু'পক্ষের কাছেই এত জরুরী হয়ে উঠেছে, সুফিয়ার কিডন্যাপড হওয়া, জামিলকে হোস্টেলে খুঁজে না পাওয়া, রিড এবং উইলকিনসন কে এবং কেন ওদের থেকে দূরে থাকতে হবে, হোম-অভ নস-এ রাশিয়ান রাইফেলধারী অপেক্ষা করছিল হেন্ডারসনের জন্যে এবং কিভাবে ওখান থেকে ফিরে আসতে পেরেছে ও সব ব্যাখ্যা করল রানা।

'তাহলে তুমিই ওখানে গিয়েছিলে কাল রাতে?' জিজ্ঞেস করল হেন্ডারসন।

'হ্যাঁ।'

'দূর থেকে তোমাকে দেখেছিলাম আমি। সম্ভবত আমার জীবন বাঁচিয়েছ তুমি!'

'সম্ভবত, হ্যাঁ। কারণ সুফিয়া এবং জামিলের জীবনের প্রশ্ন জড়িত এর সঙ্গে। বুঝতে পেরেছ? এখন বলো তোমার কাছে আছে ওটা?'

একটু দ্বিধা করল হেন্ডারসন। রানার চোখে চোখে চেয়ে রইল এক সেকেন্ড, তারপর মাথা ঝাঁকাল।

'এখানে? তোমার কাছে?'

'হ্যাঁ।' পকেটে হাত দিয়ে ছোট্ট প্লাস্টিক কেসটা বের করল সে। 'ভেতরে সুফিয়ার লেখা একটা নোট ছিল। সামান্য ক'টা কথা: প্যাকেটটা নিরাপদে লুকিয়ে রাখার ওপর নির্ভর করছে ওর জীবন, ব্যস। এর অর্থ কি কিছু বুঝতে পারিনি আমি, কিন্তু...'

উঠানের ওপাশ থেকে উজ্জ্বল একটা আলো জ্বলে উঠল হঠাৎ। ধুপধাপ পায়ের শব্দ শোনা গেল কয়েকটা। একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'নোড়ো না।'

নড়ার প্রশ্নই আসে না, একদিকে দেয়াল, অন্যদিক থেকে আসছে শত্রু। অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে রইল দু'জনে।

চারজন লোক এগিয়ে এল। একদম সামনে পিস্তল হাতে ভ্লাদিমির। পাশে টর্চ হাতে একজন, চিনতে পারল রানা লোকটাকে, নকল সার্জেন্ট টমাস। অন্য দু'জন একটু পেছনে। দু'জনেরই হাত পকেটে ঢোকানো। পিস্তলের বাঁট ধরে আছে বোধহয় মুঠো করে। ভ্লাদিমিরের রিমলেস চশমাটা একটু ঝিক করে উঠল। চশমার কাঁচ নয় ওর চোখটাই যেন জ্বলে উঠল ধক করে।

'দাও ওটা আমাকে,' আদেশ করল ভ্লাদিমির।

নড়ল না হেন্ডারসন, জিনিসটা দেয়ারও কোন লক্ষণ দেখাল না।

'আমি বলছি, দাও ওটা!' পিস্তলটা একটু একটু করে তুলছে ভ্লাদিমির। তাক করল হেন্ডারসনের কপাল বরাবর। কিছুই করার নেই হেন্ডারসনের, আস্তে আস্তে এগিয়ে দিল প্লাস্টিকের লেন্স কেসটা ভ্লাদিমিরের হাতে। কিছুই করার নেই রানারও। হতাশ চোখে তাকিয়ে দেখল ও, মুঠোর ভেতর পুরছে ভ্লাদিমির লেন্স কেসটা।

'খেয়াল রেখো গাধা দুটোর দিকে। ওই রিপোর্টারটা আবার এক নম্বর বজ্জাত, সুতরাং সাবধান!' বলে কয়েক পা পিছিয়ে গেল ভ্লাদিমির। লেন্সকেসের একটা ঢাকনা খুলে ভেতরের ছোট্ট প্লাস্টিক বাক্সটা বের করল, এবং সেটার ভেতর থেকে বের করল ছোট্ট চারকোনা একটা থার্টিফাইভ মিলিমিটার ফিল্ম। টর্চের আলোর সামনে রেখে দেখল সেটা। প্রসন্ন একটা হাসি ফুটে উঠল ভ্লাদিমিরের মুখে। সন্দেহ নেই, জিতে গেছে সে। লেন্সকেসটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার একটু এগিয়ে এল সে। হাসিটা আর একটু বিস্তৃত হলো তার মুখে।

'আমি জানতাম, মাসুদ রানা, শেষ পর্যন্ত তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসবে ওর কাছে।'

'তুমি!' আগুন ঝরা চোখে চাইল হেন্ডারসন রানার দিকে, 'কুত্তার বা...'

'না, হেন্ডারসন, শোনো,' তাড়াতাড়ি বলল রানা, 'আমি নিয়ে আসিনি ওদেরকে। ওরা নিশ্চয় ফলো করছিল আমাকে।'

লুফে নিল কথাটা ভ্লাদিমির। 'হ্যাঁ, হেন্ডারসন, ফলো করছিলাম আমরা। আমরা ধৈর্য ধরে ছিলাম এবং জানতাম শেষ পর্যন্ত তোমাকে খুঁজে বের করবেই ও। কথায় বলে না, সবুরে মেওয়া ফলে। আমরা ধৈর্য ধরেছি বলেই ফেরত পেয়ে গেলাম জিনিসটা। ধন্যবাদ তোমাকে, রানা।'

পকেটে হাত ঢুকিয়ে কিছু একটা বের করল ভ্লাদিমির। এক মুহূর্ত পরেই আগুনের শিখা দেখা দিল লাইটারটার মুখে। ট্র্যান্সপারেন্সিটা আস্তে আস্তে নামিয়ে আনল সে শিখাটার উপর। মৃদু একটা চড়-চড় শব্দ হলো সেলুলয়েড পোড়ার। তিন সেকেন্ড পর খানিকটা কালো রঙের ছাই ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট রইল না ট্র্যান্সপারেন্সিটার। কংক্রিটের ওপর ফেলে দিল ভ্লাদিমির ছাইটুকু।

ভ্লাদিমিরের চেলারাও বোধহয় ট্র্যান্সপারেন্সিটা ফিরে পাওয়ার আনন্দে আত্মহারা

হয়ে গেছিল, কারণ দু'পা সামনে বেড়ে হেন্ডারসন যে ভ্লাদিমিরের প্রায় কাছে পৌঁছে গেছে তা খেয়াল করেনি ওরা। সম্মোহিতের মত ট্র্যান্সপারেন্সি পোড়ানো দেখছিল বোধহয়।

'সুফিয়ার কি হবে,' জিজ্ঞেস করল হেন্ডারসন। 'কোথায় সে?'

কংক্রিটের ওপর পড়ে থাকা ছাইটুকু টর্চ মেরে একবার দেখে জুতোর তলা দিয়ে মাড়াতে মাড়াতে বলল ভ্লাদিমির, 'কার কথা বলছ তুমি? সুফিয়া! এ নামের কাউকে চিনি বলে তো মনে পড়ছে না!'

কোন জবাব দিল না হেন্ডারসন। দাঁতে দাঁত চেপে শুধু উচ্চারণ করল, 'কুত্তার বাচ্চা!' পরমুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভ্লাদিমিরের ওপর। বাধা দেয়ার কোন সুযোগই পেল না রানা। প্রচণ্ড একটা ঘুসি হাঁকল হেন্ডারসন ভ্লাদিমিরের নাকের ওপর। এক চোখ বন্ধ করে মুখটা একটু বাঁকা করে ফেলল রানা, ঘুসিটা ও-ই হজম করল যেন। ভ্লাদিমিরের নাক যদি লোহার তৈরি না হয়ে থাকে তো ওটার দফারফা হয়ে গেছে। হেন্ডারসনের দ্বিতীয় ঘুসিটা গিয়ে লাগল ভ্লাদিমিরের চোয়ালে। দুটো ঘুসির মাঝে সময়ের পার্থক্য আধ-সেকেন্ডের বেশি হবে না। মৃদু একটা আর্তচিৎকার বেরোল ভ্লাদিমিরের গলা দিয়ে। পরমুহূর্তে ভেসে এল গুলির শব্দ। চলন্ত ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লাগার মত ছিটকে দেয়ালের ওপর গিয়ে পড়ল হেন্ডারসন। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল তীব্র একটা চিৎকার। দেয়ালের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে ঝুপ করে বসে পড়ল নিচে। নকল সার্জেন্ট টমাস ছুঁড়েছে গুলিটা। ছুটে গেল রানা হেন্ডারসনের কাছে।

টর্চলাইট নিভে গেল। অন্ধকারে ছেয়ে গেল চারদিক। দ্রুত ধাবমান পদশব্দ শোনা গেল কয়েকটা। দলবল নিয়ে চলে যাচ্ছে ভ্লাদিমির।

দেয়ালের গোড়ায় পড়ে আছে হেন্ডারসন। যন্ত্রণাক্ত গোঙানির মত শব্দ বেরিয়ে আসছে গলা চিরে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রানা ওর পাশে। কাঁধের কাছে ধরে সোজা করতে গেল ওকে। প্রচণ্ড ব্যথায় তীব্রভাবে কাতরে উঠল হেন্ডারসন। গুলি লাগা জায়গায়ই হাত পড়েছে রানার। তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে ফেলল ও কাঁধ থেকে। কোমরের কাছে ধরে আলগোছে সোজা করে পিঠের ওপর ভর দিয়ে বসাল ওকে। আধ সেকেন্ডের জন্যে হাত রেখেছিল ও হেন্ডারসনের কাঁধে, এর ভেতরেই হাতের তালু ভিজে গেছে রক্তে।

'আমার কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটতে পারবে না?' জিজ্ঞেস করল রানা। হেন্ডারসন জবাব দেয়ার আগেই আবার শোনা গেল পদশব্দ। দৌড়ে আসছে কেউ। একজন নয়, একাধিক লোকের পদশব্দ মনে হচ্ছে। উঠানের মুখটার কাছে এসে থেমে গেল পদশব্দ। জ্বলে উঠল টর্চ।

রীতিমত ঝাঁপিয়ে পড়ে উঠানে ঢুকল উইলকিনসন। দু'পা পেছন পেছন রিড। 'গুলির শব্দ শুনলাম মনে হলো,' বলল সে, 'কি হয়েছে এখানে?'

'ওরা গুলি করেছে হেন্ডারসনকে,' শুকনো গলায় বলল রানা।

'হেন্ডারসন!' নিচু হয়ে ভাল করে হেন্ডারসনের মুখটা দেখল উইলকিনসন। 'এ-ই তাহলে হেন্ডারসন? ট্র্যান্সপারেন্সিটা কোথায়?'

'নিয়ে নিয়েছে ওরা।'

বুনো জন্তুর মত হয়ে উঠল উইলকিনসনের চেহারা। চারদিকে একবার তাকাল অস্থির চোখে। জিজ্ঞেস করল, 'কোন্‌দিকে গেছে?'

'লাভ নেই,' বলল রানা। 'আমাদের সামনেই ভ্লাদিমির পুড়িয়ে ফেলেছে ওটা।' কংক্রিটের ওপর পড়ে থাকা ছাইটুকুর দিকে ইশারা করল ও। 'ওইটুকুই অবশিষ্ট আছে ওটার।'

মুহূর্তে ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল রিড। ঝুঁকে পড়ে ভাল করে দেখল ছাইটুকু, ইতোমধ্যে বাতাসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে। 'ওহ গড!' হতাশ একটা শব্দ বেরোল শুধু তার মুখ দিয়ে। রানার কানে শব্দটা কাৎরানির মত লাগল।

'উহ! কত বড় ক্ষতি করেছ আমাদের তা যদি জানতে!' বলল উইলকিনসন।

'আমি কিছুই করিনি,' বলল রানা। 'তবে সত্যিই যদি কিছু ক্ষতি হয়ে থাকে তোমাদের তো তার জন্যে মোটেই দুঃখিত নই আমি। সুফিয়া আর জামিলকে বাঁচানো গেল না এই যা দুঃখ। এখন দয়া করে একটু সাহায্য করবে আমাকে? গুলি খেয়েছে হেন্ডারসন। ভীষণভাবে রক্ত বেরোচ্ছে, এক্ষুণি হাসপাতালে নেয়া দরকার।'

'ঠেকা পড়েনি আমাদের। দরকার পড়লে নিজেই ঘাড়ে করে নিয়ে যাও!'

এক সেকেন্ড পরেই আবার একা হয়ে পড়ল ওরা। আবার অন্ধকার হয়ে গেছে উঠানটা। চলে গেছে রিড ও উইলকিনসন। অনুশোচনায় ছেয়ে উঠেছে রানার মনটা। বার বার মনে হচ্ছে একমাত্র ওর কারণেই ঘটল এটা। এখন আর কোন উপায় নেই সুফিয়া বা জামিলকে বাঁচানোর। আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল। 'বেচারা জামিল, বেচারা সুফিয়া!' বিড় বিড় করে বলল রানা।

পাশ থেকে হঠাৎ ফিসফিস করে উঠল হেন্ডারসন, 'চলে গেছে ওরা?'

তাড়াতাড়ি আবার ঝুঁকে পড়ল রানা হেন্ডারসনের দিকে। 'হ্যাঁ। কেমন বোধ করছ এখন তুমি?'

'ভাল। কাঁধে লেগেছে গুলি, বোধহয় সিরিয়াস কিছু না।' কথা শুনেই বুঝতে পারছে রানা, প্রচণ্ড যন্ত্রণা সহ্য করছে বেচারা দাঁতে দাঁত চেপে।

'হ্যাঁ, দেখছি আমি। দাঁড়াতে পারবে তুমি?'

'অ্যাঁ? বোধহয় পারব...'

বগলের তলায় হাত দিয়ে ধরে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল ওকে রানা। দু'তিন সেকেন্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে বলল হেন্ডারসন, 'চিন্তা কোরো না, বোধহয় ঠিক আছি আমি। এক মিনিট...একটু সামলে নিতে দাও।'

দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে ক্লান্ত ভঙ্গিতে দাঁড়াল সে। জ্যাকেটের ভেতর হাত দিয়ে ডান কাঁধের ক্ষতটা অনুভব করল একটু।

'এক্ষুণি হাসপাতালে যাওয়া দরকার তোমার,' বলল রানা। 'কতদূর এখান থেকে? হাঁটতে পারবে তো সে পর্যন্ত?'

'না, দরকার নেই হাসপাতালে যাওয়ার। ঠিকই আছি আমি।'

'রাখো তো! এক্ষুণি চিকিৎসা দরকার তোমার। রক্ত পড়ছে ভয়ানক ভাবে।'

জ্যাকেটের ভেতর থেকে হাত বের করতে করতে বলল হেন্ডারসন, 'হ্যাঁ, রক্ত পড়ছে, তবে বোধহয় ম্যানেজ করতে পারব।'

'আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে হাত দাও,' বলল রানা। 'তাড়াতাড়ি করো। তোমাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েই হারবারে যেতে হবে আমাকে। ওখানে কোন একটা রাশিয়ান ট্রলারে আছে সুফিয়া আর জামিল। শেষ একটা চেষ্টা করে দেখতে চাই। দরকার হলে প্রত্যেকটা রাশিয়ান ট্রলারে হানা দেব।'

'তাতে লাভ কি? সুফিয়া আর জামিলের মত তোমাকেও আটকাবে ওরা।'

'অত সহজ হবে না বোধহয়। তাছাড়া আর কোন উপায়ও নেই। যাহোক, চলো তুমি।'

'উঁহুঁ। আছে উপায়। হাসপাতালে যেতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। অন্য জায়গায় যেতে হবে তোমাকে।'

'আর কি উপায় আছে? ট্র্যান্সপারেন্সিটা পেয়ে গেছে ওরা, তোমার সামনেই তো পুড়িয়ে দিল সেটা।'

নিজের চেষ্টায়ই দেয়াল থেকে সোজা হলো হেন্ডারসন। বলল, 'হ্যাঁ, পেয়েছে ওরা, তবে একটা মাত্র...'

নয়

'মানে! একাধিক ট্র্যান্সপারেন্সি ছিল এটা নিশ্চয়ই বলবে না? ভ্লাদিমির তাহলে সন্তুষ্ট হত না একটাতে।'

'না।'

'তাহলে? তুমি কপি করিয়েছিলে নাকি ট্র্যান্সপারেন্সিটার?' বলল রানা। 'ট্র্যান্সপারেন্সি কপি করা সহজ কাজ নয়।' খুব ভাল একটা ফটো ল্যাব থাকলেই শুধু হবে না, দক্ষ, কাজ-জানা লোকও দরকার ট্র্যান্সপারেন্সি কপি করার জন্যে।

'তুমি কি মনে করো শেটল্যান্ডের মানুষরা সব গুহাচারী?' একটু রেগে গেছে বোধহয় হেন্ডারসন।

'নিশ্চয়ই না। তবু কালার ট্র্যান্সপারেন্সি কপি করার মত সুবিধা এবং লোক এত ছোট একটা জায়গায় আছে ভাবতে একটু কষ্ট হয়। যাহোক, কোথায়?'

'এক লোক আমার ছবি প্রসেস করে দেয়। এরকম গণ্ডগ্রামে পড়ে থাকলেও লন্ডনের অনেক প্রথম শ্রেণীর ল্যাব টেকনিশিয়ানের চেয়ে ভাল কাজ জানে সে। খুব ভাল একটা ল্যাব আছে তার। প্রয়োজনে আমিও ব্যবহার করি সেটা।'

'আমি বলতে চাইছিলাম, কপি ট্র্যান্সপারেন্সিটা এখন কোথায়?'

কোন জবাব না দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে শুরু করল হেন্ডারসন। অনেক আগেই রানার ঘাড়ের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছে সে। উঠান পার হয়ে গলিতে ঢুকল ও, পেছন পেছন রানা। গলির মুখটার কাছে গিয়ে থামল। বড় রাস্তার এপাশে-ওপাশে একবার দেখে নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে আবার চলতে শুরু করল। প্রায় শ'খানেক গজ গিয়ে আরেকটা গলিতে ঢুকল ওরা। এই গলিটা ধরে সামান্য এগোনোর পর

একটা বাড়ির সামনে এসে উপস্থিত হলো হেন্ডারসন। থামল না সে। পাশ দিয়ে বাড়ির পেছন দিকে চলে গেল। অনুসরণ করল রানা। পেছন দরজায় দাঁড়িয়ে নক করল হেন্ডারসন।

দরজা খুলে দিল একটা লোক। দেখলেই বোঝা যায়, ষাটের ওপর বয়স, মাথার চুল সব পেকে সাদা হয়ে গেছে। পেশীবহুল শরীরটা ফেটে বেরোতে চাইছে কাপড় ভেদ করে। এই বয়সেও যথেষ্ট শক্তি রাখে গায়ে। কর্কশ অথচ আকর্ষণীয় একটা মুখ। অনেক ঝড়জল আর উত্তাপ সয়েছে সে-মুখ। হেন্ডারসনকে দেখে একটু মাথা ঝাঁকাল লোকটা, ওদেরকে ভেতরে ঢুকতে দেয়ার জন্যে এক পা পেছনে সরে গেল।

এক সেকেন্ডও সময় নষ্ট না করে সরাসরি কাজের কথায় চলে গেল হেন্ডারসন। 'এক্ষুণি আমার বোটে চড়তে চাই, বিল। কেউ জানুক তা চাই না আমি।' বিলের সঙ্গে রানার পরিচয় করিয়ে দিল না সে।

মাথা ঝাঁকাল বিল। জিজ্ঞেস করল, 'ওটা কি হারবারে আছে এখনও?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে...' এতক্ষণে হেন্ডারসনের মুখের ওপর থেকে চোখ সরাল লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল করল তার কাঁধের ক্ষতটা। উদ্বিগ্নমুখে এগিয়ে গেল ওর দিকে। 'আরে রক্তে দেখি ভেসে যাচ্ছ! কি হয়েছে তোমার কাঁধে?'

'ও কিছু না, চলো, তাড়াতাড়ি যেতে হবে।'

'কিছু না মানে? এর আগেও আমি বুলেটের ক্ষত দেখেছি, হেন্ডারসন,' শান্ত গলার স্বর বিলের।

'হ্যাঁ, বুলেটের ক্ষতই। তবে সিরিয়াস কিছু না।'

'ঠিক আছে, দেখছি আমি সিরিয়াস কিছু কি না। খোলো তো জ্যাকেটটা।'

'পরে দেখো, এখন সময় নেই,' অস্থিরভাবে বলল হেন্ডারসন।

'গাধার মত কোরো না তো! দাঁড়াও দেখি।' বিল নিজেই সাবধানে খুলে ফেলল হেন্ডারসনের গায়ের নীল ডাফিজ্যাকেটটা। তারপর গুটিয়ে দিল সোয়েটারটা উপরদিকে। সোয়েটার এবং পিঠ দুটোই রক্তে লাল হয়ে রয়েছে। ক্ষতটা সাবধানে পরীক্ষা করল বিল। প্রথমে পেছন থেকে তারপরে সামনে থেকে। 'হ্যাঁ, খুব সিরিয়াস কিছু নয়। তবে কলার বোনটা বোধহয় গেছে। নাড়তে পারো হাতটা?'

'খুব বেশি না।'

'গুলি ওপাশ দিয়ে ঢুকে এপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। তোমার সোয়েটারের আঁশ যদি না ঢুকে থাকে তো পরিষ্কারই আছে বোধহয়। একমিনিট, জিম...'

একটা ড্রয়ার খুলে বড়সড় একটা ফার্স্ট এইড বক্স নিয়ে এল বিল। অনেক করে পেনিসিলিন পাউডার ছড়িয়ে দিয়ে বগলের নিচ দিয়ে ঘুরিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিল দু'দিকেই।

'শুনেছিলাম কারা যেন খুঁজছে তোমাকে। আমি কি কোন সাহায্য করতে পারি?' ব্যান্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে বলল বিল।

মাথা নাড়ল হেন্ডারসন, 'যথেষ্ট সাহায্য হয়েছে। এবার একটু তাড়াতাড়ি করো

দয়া করে।'

খুব একটা তাড়াতাড়ি করল না বিল। ধীরে ধীরে, সময় নিয়ে যত্ন করে বাঁধল ব্যান্ডেজ। তারপর সোয়েটারটা নামিয়ে দিল আবার। 'একটা স্লিং লাগবে বোধহয়,' বলে হাতটা জ্যাকেটের ভেতর ঢুকিয়ে বোতাম লাগিয়ে দিল বিল। স্লিংয়ের কাজ হয়ে যাবে এতেই। তারপর রানাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ও কি বোট চালাতে জানে?'

ঘরে যে তৃতীয় একজন লোক আছে এবং বিল জানে, এই প্রথম বোঝা গেল সেটা।

'হ্যাঁ, বিল। প্লীজ, একটু তাড়াতাড়ি করো।'

'ব্যস, হয়ে গেছে,' বলে হেন্ডারসনকে ছেড়ে দিল বিল। একটা টর্চ তুলে নিল একটা কাবার্ডের ভেতর থেকে। যে দরজা দিয়ে ঢুকেছিল ওরা তার উল্টোদিকের একটা দরজা খুলল সে। সিঁড়ি নেমে গেছে দরজার গোড়া থেকে। টর্চ জ্বেলে আগে আগে নামতে শুরু করল বিল। মাঝখানে হেন্ডারসন আর পেছনে রানা। জ্যাকেটের ডান হাতার ভেতর হাত ঢোকায়নি হেন্ডারসন, কাঁধের কাছ থেকে ঢিলেভাবে ঝুলছে সেটা, হাঁটার তালে তালে দুলছে একটু একটু। এতক্ষণ ভাবছিল রানা, সেলারে নামছে, কিন্তু সিঁড়ি শেষ হতেই দেখল একটা করিডরে এসে পড়েছে ওরা। অনেকটা টানেলের মত করিডরটা। কোন মেঝে নেই নিচে, কাঁচা মাটির ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে ওরা। মাথার ওপর পাথরের ছাদ। টানেলের শুরুতে বেশ উঁচুই ছিল ছাদ, হাঁটতে কোন অসুবিধে হচ্ছিল না, কিন্তু একটু পরেই খেয়াল করল রানা, ক্রমশ নিচু হয়ে আসছে ওটা।

পরপর কয়েকটা বাঁক ঘুরল ওরা। ছাদ এত নিচু হয়ে আসছে যে কুঁজো হয়ে হাঁটতে হচ্ছে এখন। আরও দুটো বাঁক ঘুরে বন্ধ একটা কাঠের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। ভারী লোহার বল্টু টেনে দরজাটা খুলল বিল। এই দরজার গোড়ায়ও সিঁড়ি, উঠে গেছে উপর দিকে। উঠতে শুরু করল বিল সিঁড়ি বেয়ে।

সিঁড়ি বেয়ে কয়েক ধাপ ওঠার পরই পানির মৃদু কল্লোল শুনতে পেল রানা। আর একটু ওঠার পরই দেখতে পেল একটা ছোট্ট ফিশিং বোট, শক্ত করে বাঁধা রয়েছে পাথরের দেয়ালে একটা আঙটার সঙ্গে। কোন কথা না বলে বোটটায় উঠে পড়ল বিল। পেছন দিকে গিয়ে এঞ্জিন স্টার্ট দেয়ার চেষ্টা করতে লাগল। হেন্ডারসন উঠে শুয়ে পড়ল ডেকের ওপর।

রানাও উঠল। 'শুয়ে পড়ো আমার মত,' ফিসফিস করে বলল হেন্ডারসন।

শুয়ে পড়ল রানা। স্টার্ট নিল এঞ্জিন। ওদের দু'জনকে একটা ত্রিপল দিয়ে ঢেকে বোট ছেড়ে দিল বিল। ত্রিপলের নিচে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে শুয়ে রয়েছে রানা আর হেন্ডারসন।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বিল আমাদেরকে পৌঁছে দেবে আমার বোট পর্যন্ত,' শান্তভাবে বলল হেন্ডারসন। 'কে জানে কেউ লক্ষ করেছে কিনা ওটা, তাই এই সাবধানতা। তৈরি থেকো, ওটার কাছে পৌঁছে লাফ দিতে হতে পারে।'

'কিন্তু ট্র্যান্সপারেন্সিটা কোথায়…

থামিয়ে দিল ওকে হেন্ডারসন। 'ওখানে পৌঁছানোর আগে আমি ছাড়া আর কেউ জানুক তা চাই না আমি। তুমিও জানবে…,' চুপ করে রইল হেন্ডারসন কয়েক সেকেন্ড। তারপর বলল, 'তবে ওখানে পৌঁছানোর আগে না।'

এঞ্জিনে মৃদু গুঞ্জন তুলে প্রায় নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে বোট। বোটের গায়ে জলের বাড়ি খাওয়ার মৃদু ছলাৎ শব্দ শুনতে পাচ্ছে রানা। তিন-চার মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল ওরা।

ত্রিপলের একটা প্রান্ত তুলল বিল। 'শান্তই মনে হচ্ছে,' ফিসফিস করে বলল সে। 'কিন্তু শিওর না আমি। খানিকটা দূরেই একটা রাশান ট্রলার দেখতে পাচ্ছি।'

'ওটার ওপরে কেউ আছে?' জানতে চাইল হেন্ডারসন।

'না, কিন্তু…'

কিন্তু উপরে না থাকলেও ভেতরে থাকতে পারে। ওরা তিনজনেই ভাল করে জানে সে কথা। হেন্ডারসন বলল, 'চেষ্টা করে দেখতে হবে আমাদের। ঠিক আছে, বিল, এগোও।'

থ্রটলটা একটু ছেড়ে দিল বিল। এঞ্জিনের শব্দ বেড়ে গেল একটু, বোটের গতিও। পরমুহূর্তে আবার গতি কমিয়ে দিল বিল। 'এসে গেছি!' গলা শোনা গেল তার।

'রেডি!' ঝট করে গায়ের ওপর থেকে ত্রিপলটা সরিয়ে দিল হেন্ডারসন। উঠে বসল দু'জনেই। হেন্ডারসনের বিগ শেটল্যান্ড মডেলের বোটটার পাশে এসে গেছে বিলের ছোট বোটটা। উঠে দাঁড়িয়েই লাফ দিল হেন্ডারসন। গুলি খাওয়া শরীরেও এমন অনায়াস ভঙ্গিতে লাফিয়ে নিজের বোটে চলে গেল যে একটু অবাক না হয়ে পারল না রানা। প্রায় নিঃশব্দে নিজের বোটে নামল সে। পরমুহূর্তে রানাও লাফ দিল। হেন্ডারসনের মত অতটা দক্ষতা দেখাতে পারল না ও। বেশ শব্দ করে প্রায় আছড়ে পড়ল ডেকের ওপর। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, স্পীড বাড়িয়ে চলে যাচ্ছে বিল।

'নোঙরটা তুলে ফেলো তাড়াতাড়ি!' দ্রুত অর্ডার করল হেন্ডারসন, নিজে ঝুঁকে পড়েছে এঞ্জিনের ওপর।

বাধ্য ছেলের মত নোঙর তুলতে লেগে গেল রানা। নিস্তব্ধ রাতে নোঙরের সরু শিকল টানার শব্দও ভীষণ জোরে কানে বাজতে লাগল। শব্দ শুনে রাশিয়ান ট্রলারের ডেকে কেউ বেরিয়ে এসেছে কিনা, সন্ত্রস্ত চোখে একবার দেখে নিল ও। অস্বাভাবিক কিছু নজরে পড়ল না। নিশ্চিন্ত হয়ে নোঙরটা তুলে রাখল জায়গা মত।

এঞ্জিন স্টার্ট দিল হেন্ডারসন। এক মুহূর্তও দেরি না করে ছেড়ে দিল বোট। হেন্ডারসনের পাশে এসে বসল রানা। পেছনে সারি দিয়ে নোঙর করে থাকা জাহাজগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে দু'জনেই।

চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর দ্বিতীয়বারের মত একই ভাবনা ভাবতে হচ্ছে রানাকে: কিভাবে কারও চোখে না পড়ে লারউইক হারবার থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায়। প্রথমবার বেরোনোর সময়ও মনে হয়েছিল, সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছে, কিন্তু আসলে ওর ধারণা যে ভুল ছিল, পরে তা হাড়ে হাড়ে টের

পেয়েছিল। পরের ঘটনাগুলোও মনে পড়ল। সেই ভয়ঙ্কর রোপওয়ের দোলনাতে করে হোম অভ নস-এ যাওয়া, রাশিয়ান গার্ডটার সঙ্গে মারামারি, দি-ন্যুপ-এর খাড়া ঢাল বেয়ে প্রায় দৌড়ে নেমে আসা, ব্রিসে আইল্যান্ডে প্রায় অচেতন অবস্থায় পাহাড় টপকানো, রিডের সহায়তায় হেলিকপ্টারে করে উদ্ধার পাওয়া–মুহূর্তের মধ্যে ছায়াছবির মত মনের পর্দায় খেলে গেল সব। উদ্ধার করার জন্যে রিড আর উইলকিনসনকে ধন্যবাদ জানানো হয়নি, মনে পড়ল রানার। হেলিকপ্টারটা কোথায় পেল, অথবা ওর খবরই বা কিভাবে জানল ওরা, তা-ও জিজ্ঞেস করা হয়নি।

আলো দেয়ার মত কিছু আছে কিনা দেখার জন্যে আকাশের দিকে তাকাল রানা। চাঁদ তো দূরের কথা, একটা তারাও নজরে পড়ল না। ফাঁকা অন্ধকার আকাশ। সবচেয়ে কাছের আলোগুলো জ্বলছে লারউইক টাউনে। পাহাড়ের আড়াল থেকে ছড়িয়ে পড়া কমলা রঙের আভা দেখা গেল এক জায়গায়। আপ-হেলি-আ উৎসবের মশাল মিছিলের আলো বোধহয় ওটা, ভাবল রানা। অথবা ভাইকিং গ্যালিটাও হতে পারে, পোড়াতে শুরু করেছে বোধহয় ওরা। যা হোক, এই মুহূর্তে একটা অশুভ সংকেতের মতই লাগছে আগুনের আভাটাকে।

অনেকক্ষণ আগেই দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে বিলের বোট। ব্রিসে ক্লিফস-এর কাছাকাছি এসে গেছে হেন্ডারসনের বোট। সামনেই দেখা যাচ্ছে পাহাড়ী দ্বীপটা। দ্বীপটাকে পাশ কাটিয়ে দক্ষিণ দিকে যেতে লাগল ওরা। হেন্ডারসনের দিকে তাকাল রানা, শুকনো মুখে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে হুইল ধরে আছে সে। কম রক্ত যায়নি বেচারার শরীর থেকে। বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপটা মুছে যায়নি চেহারা থেকে। আগের রাতের কথা মনে পড়ে গেল রানার। জিজ্ঞেস করল, 'কিছু আছে নাকি বোটে? চা বা হুইস্কি?'

'দুটোই আছে।'

'তাহলে একটু চা করে নিয়ে আসি তোমার জন্যে।'

ছোট্ট কেবিনটার ভেতরে চলে গেল রানা। স্টোভ জ্বেলে চড়িয়ে দিল কেটলিটা। আগের রাতের স্মৃতি বারবার জেগে উঠছে মনে। ভয়ঙ্কর একটা দুঃস্বপ্নের মত লাগছে এখনও।

একটু পরেই পানি ফুটতে লাগল কেটলিতে। শক্তির উৎস শর্করা, সুতরাং অনেক করে চিনি দিয়ে চা বানিয়ে বড়সড় একটা মগে ঢেলে এবং নিজের জন্যে আধখালি একটা হুইস্কির বোতল নিয়ে বেরিয়ে এল রানা কেবিন ছেড়ে। মগটা ধরিয়ে দিল হেন্ডারসনের হাতে; স্কচ হুইস্কির বোতলটা খুলে বসল নিজে। ঢক করে এক ঢোক নির্জলা হুইস্কি গলায় ঢেলে দিল।

অল্পক্ষণেই গরম চাটুকু শেষ করে ফেলল হেন্ডারসন।

'কেমন বোধ করছ এখন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কেমন আবার, ঠিকই তো আছি আমি।'

'আমি ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাইনি তোমার কাছে,' বলল রানা। 'আজকের উৎসবের কারণে আমাদের ওপর নজর রাখার জন্যে অনেক লোককেই অনায়াসে শহরে আনতে পেরেছে ওরা।'

'জানি আমি। চিন্তা কোরো না। তখন একটুখানি মনে হয়েছিল কথাটা আমার, পরে বুঝতে পেরেছি।'

হেন্ডারসনের প্রতি কেমন এক শ্রদ্ধার ভাব জাগছে রানার মনে। পুরোপুরি আত্মপ্রত্যয়ী এবং আত্মতৃপ্ত একটা মানুষ। হেল্‌ম-এর ওপর মাথা উঁচু করে বসে থাকা লোকটাকে দেখে হাজার বছর আগের হেন্ডারসনদের যেন অনুভব করতে পারছে ও। এর মতই দৃঢ় হাতে হাল ধরে সাধারণ দাঁড়টানা পালতোলা নৌকা নিয়ে উপকূল থেকে উপকূলে ঘুরে বেড়িয়েছে তারা, আইসল্যান্ড আর গ্রিনল্যান্ডের মত দেশ আবিষ্কার করেছে। হয়তো আমেরিকা পর্যন্ত পৌঁছে গেছিল তাদের কেউ কেউ। কেমন একটা বিশালত্বের বোধে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে রানার মনটা। রাতের নিস্তব্ধতা, চারপাশের খোলা সাগর আর এঞ্জিনের মৃদু একটানা গুঞ্জনে আরও গভীর হয়ে উঠতে চাইছে অনুভূতিটা। তুচ্ছ একটা ট্র্যান্সপারেন্সির কথা জিজ্ঞেস করে এই বিশাল মহা নীরবতা ভাঙতে সংকোচ হচ্ছে।

আবেগ, অনুভূতি দেখানোর অনেক সময় পাওয়া যাবে, এখন বোকামি কোরো না তো, নিজেকেই নিজে ধমক দিল রানা। হেন্ডারসনের দিকে তাকিয়ে নীরবতা ভাঙল ও, 'কোথায় আছে জিনিসটা? আর কপিই বা করেছিলে কেন ওটার?'

চকিতে রানার দিকে চাইল হেন্ডারসন। বলল, 'সুফিয়ার নোটে লেখা ছিল, ওর জীবন নির্ভর করছে ওই জিনিসটার ওপর। একটু আশ্চর্য না? তুচ্ছ এক টুকরো সেলুলয়েডের কারণে জীবন চলে যাবে একটা জলজ্যান্ত মানুষের! কিন্তু সুফিয়াকে যতটুকু জানি, ব্যাপারটা সত্যি না হলে ও লিখত না ওকথা, আমার মনে হয় তুমিও একমত হবে আমার ধারণার সাথে। আমি ভাবলাম, যদি কোনমতে জিনিসটা আমার কাছ থেকে হারিয়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় তো কি হবে? সুতরাং কপি করিয়ে ফেললাম একটা।'

'একটাই?'

'হ্যাঁ, একটাই। একটা হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কিন্তু দুটো? অসম্ভব!'

'কোথায় যাচ্ছি আমরা? কখন পৌঁছব সেখানে? তারপর?'

'পরে বলব।'

'এখন!' দৃঢ় স্বরে বলল রানা। 'একলা চলো নীতি এবার ছাড়তে হবে তোমাকে। একটা মাত্র হাত ভাল আছে তোমার। এখন হোক একটু পরে হোক আমাকে প্রয়োজন হবেই।'

একগুঁয়েমি ভরা চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল হেন্ডারসন রানার দিকে। চোখ দিয়ে মাপল যেন ওকে। শেষ পর্যন্ত মেনে নিল।

'নস,' বলল সে।

'হোম? সেই সর্বনেশে দোলনা, রোপওয়ে?'

'ওখানে কোন দোলনা নেই আর। গতরাতে দড়ি কেটে দিয়েছি আমি। তবে জিনিসটা হোমের ওপরেই আছে।'

'তাহলে কিভাবে আনবে ওটা?'

বলেই বুঝতে পারল রানা জবাবটা। শিউরে উঠল মনে মনে। হোমের উপর

থেকে তাকিয়ে দেখা নিচের ভয়ঙ্কর দৃশ্যটার কথা মনে পড়ে গেল ওর। এক সেকেন্ড পর হেন্ডারসন উচ্চারণ করল শব্দটা, 'উঠতে হবে ওপরে।'

'পর্বতারোহণের ব্যাপারে এক্সপার্ট তুমি ঠিকই,' ধীরে ধীরে বলল রানা। 'কিন্তু তোমার একটা হাতের যা দশা তাতে তুমি পারবে না উঠতে।'

'হ্যাঁ।'

'এবং আমিও পারব না।'

ঘাড় ঘুরিয়ে রানার মুখের দিকে তাকাল হেন্ডারসন। তারপর একটু মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'পারবে তুমি।'

'উঁহুঁ, পারব না। ছোটখাট দু'একটা পাহাড়ে যে উঠিনি তা নয়, তবে এরকম খাড়া পাহাড়ে কোন সময়ই উঠিনি আমি।'

'ঠিক আছে শিখিয়ে দেব আমি, হুইলটা একটু ধরো তো,' বলে কেবিনের ভেতর ঢুকে গেল হেন্ডারসন। বড় একটা ক্যানভাসের ব্যাগ নিয়ে ফিরে এল একটু পরেই। দড়ি দিয়ে বাঁধা ব্যাগের মুখ ব্যাগটা ডেকের ওপর রেখে চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর আবার রানাকে সরিয়ে দিয়ে হুইল ধরল নিজে।

'মুখটা খোলো ব্যাগের,' বলল সে।

বিনা বাক্যব্যয়ে ব্যাগের মুখ খুলল রানা। ধাতব জিনিসপত্রে ভর্তি ব্যাগটা। হেন্ডারসনের কথামত পেছনের দিকের একটা সীটের ওপর উল্টে দিল ব্যাগটা। টুংটাং শব্দ তুলে ধাতব জিনিসগুলো একটা স্তূপ তৈরি করল সীটের ওপর। টর্চের আলো ফেলল হেন্ডারসন স্তূপটার ওপর। চকচকে জিনিসগুলো ঝকমক করে উঠল উজ্জ্বল আলো পড়ে। স্তূপটার ওপর থেকে একটা ধাতব টুকরো তুলে নিল সে, কয়েক ইঞ্চি লম্বা জিনিসটা। 'দেখেছ এটা?' বলল সে।

মাথা নাড়ল রানা, 'কি এগুলো?'

'জুমার ক্লিপ। তাড়াতাড়ির জন্যে আমি নিজে অবশ্য হিবলারস ক্লিপ ব্যবহার করি। যাহোক, জুমার ক্লিপ নিরাপদ এবং কাজ করতে সুবিধা ওগুলো দিয়ে, তাছাড়া, হিবলারস ক্লিপ নেই এখন বোটে। এখন দেখো...' স্তূপটার ভেতর হাতড়ে হাতড়ে আরও তিনটে জিনিস খুঁজে বের করল সে। প্রথমটা একই রকমের আরেকটা জুমার ক্লিপ। অন্য দুটো দেখতে অনেকটা ঘোড়ার জিনের রেকাবের মত।

'দেখেছ এগুলো?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'কিভাবে কি করতে হবে তাই বলো।'

মনের পর্দায় দেখতে পেল রানা ভয়ানক চূড়াটা। কমপক্ষে দুশো ফুট, খাড়াভাবে উঠে গেছে। সত্যি সত্যিই কাজটা অসম্ভব মনে হচ্ছে। অসম্ভব হলেও কিছু করার নেই, চেষ্টা করতে হবে। ওদের দুজনের একজনকে উঠতেই হবে। সন্দেহ নেই, গুলি খাওয়া কাঁধ নিয়ে হেন্ডারসনের পক্ষে সম্ভব নয় ওখানে ওঠা, সুতরাং ওকেই চেষ্টা করতে হবে। কপি ট্রান্সপারেন্সিটা রয়েছে ওখানে এবং ওটা ছাড়া সম্ভব নয় সুফিয়া বা জামিলকে উদ্ধার করা। এখনও যে খুব একটা আশা আছে তা নয় অবশ্য, তবে যাই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করতে হবে। ভ্লাদিমির যদি আসল ট্র্যান্সপারেন্সিটা পেয়েই সুফিয়া, জামিল আর নিউটনকে হত্যা করার

আদেশ দিয়ে থাকে তো এতক্ষণ বোধহয় বেঁচে নেই ওরা। জোর করে তাড়িয়ে দিল রানা হতাশা। হেন্ডারসনের দিকে ফিরে বলল, 'কই, বললে না, কিভাবে কি করতে হবে?'

'গতরাতে দোলনার রশিটা কেটে দেয়ার আগে আমি একবার হোমে গিয়েছিলাম,' বলল হেন্ডারসন। 'তখন একটা রশি ঝুলিয়ে দিয়ে এসেছি নিচ পর্যন্ত। ওঠার কাজটা অনেক সহজ আর নিরাপদে সারা যাবে এখন, কাজেই দুশ্চিন্তা কোরো না। তোমাকে করতে হবে কি...'

নিঃশব্দে শুনে গেল রানা। নিরাপদে উঠতে পারবে ও এবং পড়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, বলল হেন্ডারসন। কেবিন থেকে একটা ক্লাইম্বিং বেল্ট নিয়ে এসে কতখানি নিরাপদ এবং কি কারণে পড়ার সম্ভাবনা নেই তা দেখিয়ে দিল। নাইলনের যে রশিটা ঝুলিয়ে দিয়ে এসেছে সেটাও নিরাপদ, ছিঁড়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, জানাল সে। এ-সবই জানে রানা, কিন্তু ওভাবে ওপরে ওঠার কথা ভাবলেই কেমন যেন শুকিয়ে আসতে চায় কলজেটা।

'সাড়ে তিন হাজার পাউন্ড ওটার ব্রেকিং স্ট্রেইন। তোমার ওজন কত? খুব বেশি হলে দু'শো পাউন্ড হবে। প্রশ্নই আসে না ছিঁড়ে যাওয়ার।'

ব্রিসের পুব প্রান্তের চূড়াগুলো ছাড়িয়ে খোলা সাগরের ওপর দিয়ে নস-এর দক্ষিণ প্রান্তের দিকে এগোচ্ছে ওরা। ঝাপসাভাবে দেখা যাচ্ছে দ্বীপটা। অশুভ একটা প্রেত মূর্তির মত অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে যেন। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ব্রিসের দিকে তাকাল রানা। লারসনের বোটটার কথা মনে পড়ে গেল। কি হয়েছে ব্লু-ঈগলের? একদম ভেঙেচুরে গেছে না সামান্য আঘাত লেগে ডুবে গেছে শুধু? বেচারা লারসন! বেচারা ব্লু-ঈগল। বোটটার জন্যে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেবে লারসনকে, ঠিক করল রানা।

নস-এর যত কাছে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা চূড়াগুলোকে ততই উঁচু মনে হচ্ছে এখন। উপর থেকে পাহাড়গুলোকে বেশ বড়ই লাগছিল কাল রাতে। কিন্তু নিচ থেকে এখন আর তত বড় মনে হচ্ছে না। বোটটাকে চূড়াগুলোর প্রায় নিচে নিয়ে যেতে চাইছে হেন্ডারসন। কেমন একটু অদ্ভুত লাগছে ওগুলোকে দেখতে, ঘষা ঘষা ধরনের সাদা ডোরাকাটা গাঢ় ধূসর রঙের দেয়াল যেন। অনেকটা স্নেহের দৃষ্টিতে ঘাড় উঁচু করে তাকাল হেন্ডারসন চূড়াগুলোর দিকে। ও নিজে উঠতে পারছে না বলে একটু দুঃখ বোধ করছে যেন।

'তোমার ভাগ্য ভাল, শীতকাল এটা,' বলল সে।

'কেন?'

'এই চূড়াগুলো সব পাখিদের ব্রিডিংগ্রাউন্ড। ডিম পাড়ার সময় সব ধরনের পাখিই বাসা বানায় এগুলোয়: সব ধরনের গাল, গানেট, রেজরবিল সব। ফুলমাররাও। একমাত্র ফুলমাররা নেই বলেই ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানানো উচিত তোমার।'

'কেন?'

'ওদেরকে বিরক্ত করলেই থুতু মারে ওরা। ওদের গলার কাছে একরকম তেল

জমা হয়, সেগুলোই থুতুর মত ছোঁড়ে। এমন দুর্গন্ধ ওতে যে ওই গন্ধের ধাক্কায়ই নিচে পড়ার দশা হয়। কাপড়ে যদি একবার লাগে তো একশো কেন হাজার বার সাবান ঘষেও দূর করা যায় না গন্ধ। বুঝেছ, কেন বলেছি, কপাল ভাল তোমার?'

'তাহলে তো বলতে হবে সত্যিই ভাগ্য ভাল। আমাদের দেশে যে কাক আছে ওদের এসব থুতু-মুতু নেই, কিন্তু যে গাছে বাসা বাঁধে সে গাছে কাউকে উঠতে দেখলেই হলো, সাঁ করে উড়ে গিয়ে চাঁদির ওপর ঠোকর লাগায় পুরুষ কাকটা।'

নস আর হোম অভ নস-এর মাঝখানের কালো ফাঁকটা দেখা যাচ্ছে সামনে এঞ্জিনের গতি অনেক কমিয়ে দিয়েছে হেন্ডারসন। দক্ষ হাতে হুইল ধরে আছে সে। এমন জায়গা দিয়ে চলছে যে দক্ষতা না থাকলে যে-কোন মুহূর্তে চুরমার হয়ে যাবে বোট।

'সুফিয়াকে বিয়ে করবে তুমি?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল রানা।

একটু যেন চমকে গেল হেন্ডারসন। কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল রানার মুখের দিকে, তারপর বলল, 'প্রশ্নটা আমিই করব ভাবছিলাম। আমাকে ও রিফিউজ করেছে...তুমি জানো না?' রানাকে মাথা নাড়তে দেখে বলল, 'তুমি প্রপোজ করলে রাজি হয়ে যাবে, আমার বিশ্বাস।'

এঞ্জিনটা পুরো বন্ধ করে দিল এবার হেন্ডারসন। এসে গেছে ওরা। বাকি যে পথটুকু আছে সেটুকু এঞ্জিন ছাড়াই পৌঁছে যেতে পারবে ওরা। অন্ধকার চূড়াদুটোর দিকে তাকিয়ে আছে রানা, উত্তর দিকে দি ন্যুপ আর দক্ষিণ দিকে হোম অভ নস। হোম অভ নস-এর অন্ধকার উপরিভাগটার দিকে নজর পড়তেই মনটা একটু দমে গেল রানার। একেবারে খাড়াভাবে উঠে গেছে দুশো ফুট। বিশতলা বিল্ডিংয়ের দেয়াল যেন, তার ওপর অন্ধকার, শেষপর্যন্ত ও পারবে তো উঠতে?

ধীরে ধীরে পৌঁছে গেল বোটটা। মৃদু একটা ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল পাহাড়ের গায়ে। ক্লাইম্বিং বেল্টটা বেঁধে নিয়ে উঠল রানা, এক হাতে একটা বোটহুক আর অন্য হাতে টর্চ নিয়ে এগিয়ে গেল সামনের দিকে, হেন্ডারসনের ঝুলিয়ে দেয়া রশিটা খুঁজে বের করতে হবে আগে।

উপর দিকে তাকিয়ে হেন্ডারসনও খুঁজছে ঝুলন্ত রশিটা। ও-ই আগে দেখতে পেল সেটা। 'ওদিকে, রানা, আরেকটু ডানে,' বলল সে। একটু ডানে সরতেই রানাও দেখতে পেল পাহাড়ের গায়ে লেগে থাকা নাইলনের রশিটা। শেষ প্রান্তটা ডুবে রয়েছে পানিতে, বাতাসে দুলছে অল্প অল্প। বোটের উপর থেকেই হাত দিয়ে ধরে ঝুলে পড়ে দেখল, যথেষ্ট শক্ত করে বাঁধা আছে উপরে কোন কিছুর সঙ্গে। হেন্ডারসনের শিখিয়ে দেয়া পদ্ধতি অনুসরণ করে কাজে লেগে গেল রানা।

রশির ভেজা মাথাটা পানি থেকে উঠিয়ে বেল্টের লুপের ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে দিল ও। তারপর বুক-সমান উঁচুতে দুটো জুমার ক্লিপ একটা একটা করে আটকাল রশির সঙ্গে। দুটো ক্লিপের মাঝখানে কোন ফাঁক রাখল না। প্রতিটা ক্লিপ থেকে ঝুলিয়ে দিল একটা করে রেকাব। প্রায় একই উচ্চতায় ঝুলতে লাগল রেকাব দুটো। প্রায় তিন ফুট মত লম্বা পাকানো রশি লাগানো রেকাবগুলোয়। রশির অন্য প্রান্তে লাগানো লোহার হুক একটা করে। এই হুকই আটকে দেয়া হয়েছে জুমার ক্লিপের

সঙ্গে।

কতখানি শক্ত করে আটকেছে রেকাবগুলো দেখার জন্যে পরীক্ষামূলকভাবে একটা রেকাবে পা বাধিয়ে উঠে পড়ল রানা। অন্য পায়ের নিচে বোটের ডেকটা নড়ে উঠল সেই সময়। চমকে তাকাতেই দেখতে পেল, ঢেউয়ের ধাক্কায় দ্রুত সরে যাচ্ছে বোটটা।

'ভয় পেয়ো না, এবার অন্য পা-টা অন্য রেকাবে,' চিৎকার করে উঠল হেন্ডারসন।

রশিটা শক্ত করে ধরল রানা। ওর একটা পা এখন রেকাবের সঙ্গে বাঁধানো, অন্য পা ঝুলছে শূন্যে। নিচে সমুদ্র। হোম অভ নস-এর গা এরকম খাড়াভাবে কতখানি নিচে নেমে গেছে কে জানে। রশি ধরা দুইহাত এবং এক পায়ে ভর দিয়ে অন্য পা-টা ধীরে ধীরে আরেকটা রেকাবের সঙ্গে বাধাল ও। রশিটা দুলছে অল্প অল্প, জুমার ক্লিপ থেকে ঝোলানো ধাতব রেকাবগুলোও দুলছে একটু একটু। দ্বিতীয় পা-টা অন্য রেকাবে আটকাতেই হাত দুটোকে একটু ঢিল্ দিতে পারল রানা। কিন্তু হাত ঢিল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম পা-টা হড়কে গেল একটু। প্রাণপণে আবার রশিটা আঁকড়ে ধরে হড়কানিটা সামলাল ও। দম নেয়ার জন্যে একটু থেমে উপরে তাকাল, প্রায় দুইশো ফিট উপরে চূড়াটার পাশে আকাশের অংশ দেখতে পেল তেরছা ভাবে। এই ভাবে ঝুলে ঝুলে অতখানি উঠতে হবে ভেবে আবার একটু দমে গেল রানা। বোটের ওপর থেকে চিৎকার করে বিভিন্ন নির্দেশ দিয়ে চলেছে হেন্ডারসন। সমুদ্রের গর্জন আর জলের কল্লোলের নিচে চাপা পড়ে যাচ্ছে ওর চিৎকার।

'উঠে যাও, রানা, সময় নষ্ট কোরো না!' আবার চিৎকার করল হেন্ডারসন।

একবার ঢোক গিলে প্রথম রেকাবের উপর থেকে পা সরিয়ে শুধুমাত্র দ্বিতীয় রেকাবে ভর করে দাঁড়াল রানা। রশিটা বাঁ হাতে ধরে ডান হাত দিয়ে প্রথম জুমারের ক্লিপটা একটু আলগা করল। তারপর রেকাবসহ একটু একটু টেনে ওপরে ওঠাতে লাগল জুমারটা। প্রায় দু'ফুট মত তুলে রশির সঙ্গে ক্লিপটা আটকে দিল আবার। এবার আবার প্রথম রেকাবটায় এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় রেকাব থেকে অন্য পা-টা সরিয়ে নিল ও। ক্লিপ আলগা করে দ্বিতীয় জুমারটা টেনে ওঠাতে শুরু করল। এই জুমারটাও রেকাবসহ প্রায় দু'ফুট ওঠাল। ওপরের জুমারটার গায়ে গায়ে লাগতেই ক্লিপ আটকে দিয়ে এই রেকাবটায় উঠে দাঁড়িয়ে আবার প্রথম জুমারটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও। একটু পরেই নিচে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে দেখল রানা, একতলা বিল্ডিঙের ছাদ সমান উঁচুতে উঠে পড়েছে ওর মাথা। প্রথম জুমারটা আবার দু'ফুট মত ওঠাল। ক্লিপ আটকে দিয়ে সেটার ওপর ভর দিয়ে আবার দ্বিতীয়টা ওঠাতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা নিয়মের ভেতর এসে গেল ব্যাপারটা। অভ্যস্ত হয়ে উঠল রানা। পনেরো বিশ সেকেন্ড করে লাগছে একেকটা ক্লিপ ওপরে ওঠাতে। অর্থাৎ প্রতি ত্রিশ বা চল্লিশ সেকেন্ডে দুফুট করে উঠে যাচ্ছে ও।

বেশিদূর ওঠেনি রানা, ফুট বিশেক হবে, লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে প্রথম জুমারটা ওঠাতে যাবে এমন সময় জোর বাতাসের একটা ঝাপটা এসে লাগল গায়ে। আতঙ্কে শ্বাস বন্ধ করে ফেলল ও। পাক দিয়ে উঠল পেটের ভেতর। বাতাসের ঝাপটায়

রশিটাও দুলে উঠেছে ভয়ানকভাবে। এক হাতে ধরা ছিল রশিটা, জুমার ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি দু'হাতেই শক্ত করে রশি আঁকড়ে ধরল ও। পরমুহূর্তে শুনতে পেল এঞ্জিনের শব্দ। ঘাড় ফিরিয়ে নিচে তাকাল রানা। আশ্চর্য হয়ে দেখল, বোটে স্টার্ট দিয়ে সরে যাচ্ছে হেন্ডারসন। ইতোমধ্যেই ব্যাক করে দি ন্যুপ আর হোম-অভ নস-এর মাঝের কালো ফাঁকটার দিকে অনেকখানি চলে গেছে। কেন?

জোর করে প্রশ্নটা তাড়াল রানা মন থেকে। নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে, তা নাহলে খামোকা ওটার ভেতরে ঢুকবে কেন হেন্ডারসন? ওকে পাহাড়ে চড়তে লাগিয়ে দিয়ে ভেগে পড়বে লোকটা এমন ভাবাই যায় না। আবার দড়ি বাওয়ার কাজে মন দিল ও। পায়ের ওপর বেশ চাপ পড়ছে, পুরো শরীরের ভরটা রয়েছে পায়ের পাতার মাঝখানে। ইতোমধ্যেই জায়গাটা একটু একটু ব্যথা করতে শুরু করেছে। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি ওঠা যাবে ততই মঙ্গল। গোড়ালির ওপর ভর দিতে পারলে বোধহয় এত চাপ পড়ত না, ভাবল রানা। গোড়ালির ওপর ভর দেয়ার জন্যে চেষ্টাও করল একবার, কিন্তু অনভ্যস্ত পায়ে পারল না ঠিকমত, মাঝখান থেকে আরেকটু হলেই পা-টা যাচ্ছিল ফসকে। তাড়াতাড়ি আবার আগের ভঙ্গিতে পায়ের পাতার মাঝখানে ভর দিল ও। আগের মতই একটু একটু করে উঠে যেতে লাগল। একটু দ্রুত হাতে জুমার ওঠানোর চেষ্টা করছে এখন।

জুমারটা রশি গলিয়ে ওপরে ওঠানো, রেকাবের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ানো, তারপরে আবার অন্য জুমারটা টেনে ওঠানো; এই নিয়মে দ্রুত হাত চালানোর চেষ্টা করছে রানা। কিন্তু ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে কাজটা। বিদ্রোহ করতে চাইছে পাগুলো। হাতগুলোর অবস্থাও খুব একটা সুখের নয়; কাল রাতের ব্যথাই পুরোপুরি সারেনি, তাছাড়া এখনও কম চাপ পড়ছে না। এদিকে হাত আর পায়ের কাজে যদি সমন্বয় সাধন না করা যায় তো বিপদের সম্ভাবনা। প্রায় শ'খানেক ফুট উঠে এসেছে ও। এখন যদি কোনরকমে হাত বা পা ফসকে যায় তো পৃথিবীর আলো বাতাস আর দেখতে হবে না। প্রথমে কাজটাকে যত সহজ লাগছিল, এখন হাত পায়ের দুর্বলতার কারণে তত সহজ আর লাগছে না মোটেই। সন্দিহান হয়ে পড়েছে ও, বাকি অর্ধেকটা উঠতে পারবে তো!

প্রতি মুহূর্তেই একটু একটু করে দুলে চলেছে রশিটা। সেটাই হয়েছে আরেক বড় সমস্যা। দুলুনির কারণে রশিটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে হচ্ছে, ফলে হাতের ওপর চাপ পড়ছে বেশি। মনোযোগও দিতে হচ্ছে বেশি রশির ওপরেই। আরও কিছুদূর ওঠার পর দুটো রেকাবে দুই পা বাধিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে হাত দুটোকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিয়ে নিল রানা। মিনিটখানেক পর আবার উঠতে শুরু করল। সেই একই রকম, একপায়ে ভর দিয়ে টেনে টেনে জুমার তোলা, তারপর অন্য পায়ে ভর দিয়ে আবার অন্য জুমারটা তোলা। তারপর আবার আরেকটা...

কাল রাতের মত আজও হঠাৎ করেই বাতাসের বেগ বেড়ে উঠল। রীতিমত ঝড়ো বাতাস। গায়ের কাপড় ভেদ করে ঠাণ্ডা ঢুকে পড়েছে ভেতরে। ভাগ্য ভাল চূড়ার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ও। তা না হলে রশির দুলুনির ঠেলায় অবস্থা খারাপ হয়ে যেত।

অবশেষে চূড়ার কাছাকাছি পৌঁছুল ও। এখনও মাথাটা হোমের মাথা ছাড়িয়ে ওপরে ওঠেনি। আরও বার দুয়েক জুমার টানতে হবে। শেষ দুবারের কাজ শুরু করল রানা। উপরের জুমারটা টানল। হোমের কিনারে যেখানে রশিটা মাটির সঙ্গে সেঁটে রয়েছে সেখান পর্যন্ত ঠেলেঠুলে ওঠাল জুমারটা। এই জুমারের সঙ্গে ঝোলানো রেকাবে পায়ের ভর রেখে নিচের জুমারটা ওঠাতে গিয়ে ফ্যাসাদে পড়ে গেল রানা।

উপরে আর রশি নেই ধরার মত। ওর শরীরের ওজনে টানটান হয়ে লেগে রয়েছে রশিটা হোমের সমান মাটির সঙ্গে। মাটির ওপর রশি ধরতে গেলে হাত থেঁতলে যাওয়ার সম্ভাবনা আর হোমের কিনারের মাটি এমন সমান যে সেখানে ধরার মত কিছুই নেই। ঘাসও এমন কিছু লম্বা বা শক্ত নয় যে সেগুলো ধরে তাল রাখা যাবে। সত্যি-সত্যিই মহা সমস্যায় পড়ে গেল ও। দ্বিতীয় জুমারটা না ওঠালে দু'পায়ে ভর দিতে পারবে না, আর দু'পায়ে ভর দিতে না পারলে ওপরে ওঠাও অসম্ভব। এই অসম্ভবটাকে যে কিভাবে সম্ভব করা যায় ভাবছে রানা।

শেষ পর্যন্ত ঝুঁকি নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল ও, তাছাড়া সম্ভব নয়। রশির যে অংশটা ওর বুকের কাছে রয়েছে সেখানে ধরা যায় সহজে। ধরল রানা রশিটা। এখন দেখা দিল আরেক সমস্যা, রশিটাকে ভাল করে ধরতে হলে ডান হাত ব্যবহার করা দরকার আর জুমারটাকে সহজে টেনে তুলতে হলেও ডান হাত দরকার। মা দুর্গার মত দশটা না হোক চারটে হাত হলেও দারুণ উপকার হত এখন। অন্তত দুটো ডান হাত পাওয়া যেত তাহলে। যাহোক, সেটা যখন সম্ভব নয় একটা ডান হাত আর একটা বাঁ হাত দিয়েই কাজ চালিয়ে নিতে হবে।

ডান হাতে রশিটা ধরে, বিপজ্জনকভাবে ঝুঁকে বাঁ হাতে জুমারটা ওঠাতে শুরু করল রানা। ক্লিপটা ঢিলে করতেই লেগে গেল অনেকটা সময়। ক্লিপটা ঢিলে করতেই জুমারটা ছেড়ে দিতে পারছে না ও, জুমারটা গড়িয়ে নিচে নেমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাতে। একটু একটু করে ওঠাতে শুরু করল জুমারটা। এক মিনিটের ভেতরেই ডান হাত আর ভর দেয়া পা-টা টন টন করতে শুরু করেছে কপালের কাছ দিয়ে ঘাম দেখা দিতে শুরু করেছে। আর আধ মিনিটও এমনভাবে থাকতে পারবে কিনা সন্দেহ। উহ্, অন্য পা-টা দিয়ে যদি আর একটু ভর দেয়া যেত কোন কিছুতে। হোমের খাড়া পাথুরে গায়ে একবার ঝুলন্ত পা-টা দিয়ে ঠেকনা দিতে চাইল, কিন্তু তাতে বিপদ বেড়ে উঠল আরও। প্রায় স্থির রশিটা বেশ জোরে দুলে উঠল, মাথাটা ঠুকে গেল পাথরের সাথে। এক হাতেই প্রাণপণে রশিটা আঁকড়ে ধরে দাঁতে দাঁত চেপে সামলাল দুলুনিটুকু।

প্রায় উঠে এসেছে জুমার। এখন আর অত ঝুঁকে থাকতে হচ্ছে না। আর কয়েক ইঞ্চি মাত্র। আর দু'বারের প্রচেষ্টায় কাজটা শেষ করতে পারে ও।

এমন সময় শুনতে পেল রানা শব্দটা। দূরাগত একটা একটানা ভোঁ ভোঁ শব্দ। কিসের শব্দ বুঝতে পারল না প্রথমে। কান খাড়া করে রইল ও। কয়েক সেকেন্ড পরেই বুঝতে পারল। এঞ্জিনের শব্দ। এঞ্জিন! এঞ্জিন আসবে কোত্থেকে? হেন্ডারসন নাকি? হেন্ডারসন হলে তো অত দূর থেকে আসার কথা না শব্দটা!

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রানা খোলা সাগরের দিকে। দূরে একটা জাহাজ দেখতে পেল। মিটমিটে কয়েকটা বাতি জ্বলছে সেটার ওপর। কি ধরনের জাহাজ ওটা বুঝতে পারল না প্রথমে। দ্রুত কাছে এগিয়ে আসছে ওটা, আলোগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠছে ক্রমশ। একটু পরই সার্চলাইট জ্বলে উঠল ওটার ডেক থেকে। এতক্ষণে চিনতে পারল ও, বিরাট একটা ফিশিং বোট। মুহূর্তে বুঝে ফেলল রানা পরিস্থিতিটা। নিঃসন্দেহে ওটা একটা রাশিয়ান ট্রলার। অর্থাৎ দলবল নিয়ে এসে গেছে ভ্লাদিমির। হোম অভ নস-এর গা বেয়ে ধীরে ধীরে উঠে আসছে সার্চলাইটের আলোটা চূড়ার দিকে। আলোটা উঠতে উঠতে যখন রানার গায়ে এসে পড়ল ততক্ষণে আরও কাছে এসে পড়েছে বোট।

দ্বিতীয় জুমারটা এখনও ধরে আছে রানা। ভাগ্যিস ছেড়ে দেয়নি, মনে মনে ভাবল ও। এখন আর অত জান বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করে লাভ হবে না, হ্যাঁচকা টানে বাকিটুকু উঠিয়ে ক্লিপটা এঁটে দিল ও। শূন্যে ঝুলন্ত পা-টা এই রেকাবটায় ওঠাতে যাবে এমন সময় ঠকাস করে একটা বুলেট এসে লাগল তিন চারফুট দূরে পাথরের গায়ে। এক সেকেন্ড পর পেছন থেকে ভেসে এল 'কড়াৎ' শব্দটা।

পেছন ফিরে তাকাল না রানা। ঝটপট পা-টা ভরে দিতে গেল রেকাবে। কিন্তু পারল না। স্বপ্নের মধ্যে বাচ্চা ছেলেকে ল্যাংড়া-ফকির তাড়া করার মত অবস্থা। যখনই তাড়া থাকে, বিপদ ঘাড়ের উপর উপস্থিত, তখনই যেন চারদিকের সবকিছু বিশ্বাসঘাতকতা শুরু করে। এবার আর তাড়াহুড়ো করল না, ধীর স্থির ভাবে রেকাবটার অবস্থান আন্দাজ করে পা গলিয়ে দিল ওটার ভেতর। দুই রেকাবে দুই পায়ের ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে ও, এমন সময় ছুটে এল দ্বিতীয় বুলেট। চুঁই-ই-ই করে শব্দ তুলে কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল গুলিটা। মাথা নিচু করে নিল রানা। ভ্লাদিমিরের কাছে বোধহয় টেলিস্কোপিক সাইটওয়ালা রাইফেল নেই। থাকলে প্রথম গুলিটাই লাগত ওর গায়ে।

ফিশিংবোটের এঞ্জিনের একটানা ভোঁ ভোঁ শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। চূড়ার উপর উঠে পড়তে পারলে নিরাপদ। অত নিচে থেকে গুলি করে কিছু করতে পারবে না ভ্লাদিমির। ডেস্ট্রয়ার নিয়ে এসে শেলিং করে হোম অভ নস-এর চূড়াটা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিতে পারলেই একমাত্র খতম করা যাবে ওকে। এছাড়া সারা জীবনভর গুলি করলেও একটা লাগাতে পারবে না রানার গায়ে।

উপরে উঠে পড়ার চেষ্টা করতে হবে। সোজা হলো রানা, সঙ্গে সঙ্গে আবার ছুটে এল বুলেট। একটা নয়, এক সেকেন্ড করে বিরতি দিয়ে পরপর তিনটে। এবারও ঝট করে মাথা নামিয়ে নিল রানা। একটাও লাগল না গায়ে। একটু অবাক না হয়ে পারল না রানা, এদের ওপরেও কি মিস করার নির্দেশ রয়েছে? নাকি ওকে নড়তে-চড়তে দেখলেই খামোকা গুলি করছে ওরা, যাতে উপরে উঠতে না পারে?

আবার চেষ্টা করল রানা। ধীরে ধীরে সোজা করল মাথা। আবার শুরু হলো গুলি। না, মিস করার নির্দেশ নেই বোধহয়। এবারে একটা গুলি ওর সোয়েটারের বাঁ হাতার খানিকটা উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। আর ছ'ইঞ্চি ওপাশে লাগলেই হার্টটা এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যেত। সর্বনাশ, মিস করার নির্দেশ নেই ব্যাটাদের ওপর,

সুতরাং উঠে পড়তে হবে উপরে, যা হয় হোক, ভাবল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ট্রলারটার দিকে। সার্চ লাইটটাই দেখতে পেল শুধু। ভয়ানক ভাবে দুলছে সেটা। এতক্ষণে বুঝতে পারল রানা, এতগুলো গুলি চলার পরেও কেমন করে বেঁচে গেছে ও। বাতাস এবং ঢেউয়ের দোলায় দুলছে ট্রলার আর সেই কারণেই ঠিকমত নিশানা করতে ব্যর্থ হচ্ছে মার্কসম্যানরা। কতক্ষণ থাকে ঝড়ো বাতাস ঠিক নেই, এর মধ্যে উঠে পড়তে না পারলে মুশকিল।

সোজা হয়ে কিনারটা ধরল রানা। এবার আর গুলি ছুটে এল না দেখে একটু আশ্চর্য হলো ও। ঠিক সেই সময়ই যান্ত্রিক শব্দটা যেন একটু বদলে গেল মনে হলো। কি ব্যাপার? অবস্থান বদলাচ্ছে ভ্লাদিমির? কিন্তু না, বোটের শব্দ না এটা! বোটের এঞ্জিনের শব্দ আসছে নিচে থেকে, আর এই শব্দটা আসছে মাথার উপর থেকে। চমকে উঠল রানা। হ্যাঁ, যা ভেবেছিল ঠিক তাই! হেলিকপ্টার। আবার সেই হেলিকপ্টার।

একটু হতাশ চোখে দেখল রানা জিনিসটা। দ্বিতীয় পক্ষও এসে গেছে তাহলে! নিঃসন্দেহে রিড আর উইলকিনসন আসছে ওতে চড়ে। ফিশিংবোটের লোকগুলোও নিশ্চয়ই দেখেছে কপ্টারটা এবং সেজন্যেই গুলিগোলা বন্ধ করেছে আপাতত, বুঝতে পারল রানা।

এখনও অনেকটা ওপরে রয়েছে হেলিকপ্টার। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, হোম অভ নস-এর ওপর নামবে ওটা। কিন্তু এখনও উদ্ধার করতে পারেনি রানা ট্র্যান্সপারেন্সির কপিটা। আর দেরি করা যায় না। হোমের কিনারাটা ধরে পাঁচিল টপকানোর ভঙ্গিতে একটা লাফ দিয়ে উঠে পড়ল রানা উপরে।

দম নেয়ার জন্যে একমুহূর্ত দাঁড়াল ও কিনারেই। আর এক ঝাঁক গুলি ছুটে এল নিচে থেকে। ও যে উঠে পড়েছে তা বোধহয় এতক্ষণে খেয়াল করেছে বোটের লোকেরা। ঝট করে মাটিতে শুয়ে পড়ল রানা। আর সময় নষ্ট করা যায় না, হেলিকপ্টারের শব্দটা বেড়ে উঠেছে ভয়ানকভাবে। সোজা মাথার ওপর চলে এসেছে সেটা। একটু একটু করে নামছে নিচের দিকে। নিঃসন্দেহে ল্যান্ড করবে।

এখনও কিনারের কাছেই আছে ও। দাঁড়ালে গুলি লাগার সম্ভাবনা, হামাগুড়ি দিয়ে এগুলো রানা। হামাগুড়ি দিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর উঠে দাঁড়াতে গেল ও। এখন দাঁড়ালে আর বিপদের সম্ভাবনা নেই; বোটের মার্কসম্যানদের টার্গেটের বাইরে ও এখন। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখল রানা, দাঁড়াতে পারছে না। কি ব্যাপার? পরমুহূর্তেই বুঝতে পারল ব্যাপারটা, ক্লাইম্বিং বেল্টটা রশির সঙ্গে আটকে রেখেছে ওকে।

দ্রুতহাতে বেল্ট থেকে মুক্ত হয়েই দৌড় লাগাল রানা। হেন্ডারসনের হাইডটার কাছে পৌঁছে গেল কুড়ি সেকেন্ডের ভেতর। আরও নিচে নেমে এসেছে হেলিকপ্টার। মাটি স্পর্শ করতে বোধহয় আর আধ মিনিটও লাগবে না ওটার। কোথায় পাওয়া যাবে কপি ট্র্যান্সপারেন্সিটা সে সম্পর্কে বলা হেন্ডারসনের কথাগুলো স্মরণ করল রানা, হাইড আউট থেকে দড়িটা যে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা সেদিকে যেতে হবে পনেরো কদম।

গুনে গুনে পা ফেলে এগোল রানা। খুব সাবধানে পা ফেলছে যাতে মাপটা বেশি ছোট বা বড় না হয়ে যায়। হেলিকপ্টারের রোটর ব্লেডগুলোর ঠেলে দেয়া বাতাস এসে লাগছে ওর গায়ে। মাথার চুল, কাপড়ের ঢিলে অংশগুলো নড়ছে বাতাসে। দশ কদম এগিয়েছে ও, এমন সময় ওপর থেকে গুলি ছুটে এল একটা, শব্দটা চাপা পড়ে গেল কপ্টারের শব্দের নিচে।

মুখ তুলে কপ্টারটার দিকে তাকাল রানা। গমগমে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল উপর থেকে, 'দাঁড়াও, রানা! খবরদার, আর একপাও এগিয়ো না।' কপ্টারটার সঙ্গে নিশ্চয়ই কোন লাউড স্পীকার লাগানো আছে, ভাবল রানা।

দাঁড়াল না ও, হাঁটার গতিটা বাড়াল শুধু।

বারো পা এসেছে ও। তেরো, চোদ্দ, পনেরো। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রানা মাটিতে। এক সেকেন্ডের বেশি খুঁজতে হলো না। পেয়ে গেল জিনিসটা, প্লাস্টিকের বোতল একটা, হেন্ডারসন যেমন বর্ণনা দিয়েছিল ঠিক সেই রকম। ছোট একটা গর্তের ভেতর ছিল সেটা। বোতলটা ধরে নাড়া দিল রানা, ভেতরে পানি নড়ার শব্দ শোনা গেল। ট্র্যান্সপারেন্সিটাকে পানিতে চুবিয়ে রেখেছে হেন্ডারসন, ফলে এ রকম খোলা জায়গায়ও জিনিসটা নষ্ট হবে না।

'যেখানে আছ সেখানেই থাকো, রানা, নইলে গুলি করলাম!' আবার লাউড স্পীকারে ভেসে এল গমগমে গলাটা।

পাত্তা দিল না রানা, শক্ত হাতে বোতলটা ধরে উঠে দাঁড়াল ও। ছুটতে শুরু করল কিনারের দিকে।

দশ

বিশ গজ মত যেতে হবে, তাহলেই কিনারে পৌঁছে যাবে রানা। ছুটতে ছুটতে একবার পেছন ফিরে তাকাল ও, আরও নেমে এসেছে হেলিকপ্টার। দরজা খোলা ওটার। দরজার মুখে একটা সীটে পিস্তল হাতে বসে আছে রিড। হাতে ধরা একটা মাইক্রোফোন। আবার লাউড স্পীকারে শোনা গেল তার গলা, 'দাঁড়াও, রানা।'

এত অল্প জায়গা দৌড়ে আসতে হবে যে একটু অসতর্ক হলেই হোমের কিনার গলে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নিচে। পেছনে তাকিয়ে দৌড়ানো বিপজ্জনক এখন, তাড়াতাড়ি আবার সামনে তাকাল রানা। প্রায় এসে গেছে কিনারে। দশ ফুটও নেই দূরত্ব। আর তিন সেকেন্ড যদি পেছনে তাকিয়ে দৌড়াত তাহলে গেছিল, ঝপাৎ করে পড়ত দু'শো ফুট নিচে উত্তাল সাগরে। কিনারের এতটা কাছে এসে গেছে যে এখন আবার রাশিয়ান ফিশিংবোটের মার্কসম্যানদের টার্গেটে পরিণত হয়েছে সে।

উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল রানা মাটিতে। পরমুহূর্তেই চুঁই-ই-ই শব্দ তুলে মাথার উপর দিয়ে চলে গেল একটা গুলি। এক সেকেন্ড পরে ভেসে এল 'কটাস' শব্দটা। প্লাস্টিকের বোতলটা হাতে ধরে বুকে হেঁটে কিনারের তিন ফুটের ভেতর চলে গেল

ও। বোতলটা মাটিতে রেখে আবার হেলিকপ্টারটার দিকে ফিরল ও। বিরাট আকৃতির জিনিসটা। সামবার্গ এয়ারপোর্টে নামতে দেখেছিল যেটাকে এরকমই ছিল সেটার চেহারা। এক সারি জানালা পাশে। প্যাসেঞ্জার হেলিকপ্টার বোধহয়। গতরাতে যেটায় করে ওকে উদ্ধার করেছিল ওরা সেটার মত নয় দেখতে। অনেক ছোট ছিল সেটা আর গায়ে ছিল আর্মির চিহ্ন। এটার গায়ে কি একটা তেল কোম্পানির মনোগ্রাম আঁকা। তেল কোম্পানির লোকদের ডিপ সী ড্রিলিং রিগে আনা-নেয়া করে বোধহয়। হঠাৎ করেই মনে হলো রানার, সামবার্গে কোন এয়ারবেস নেই, তাহলে আর্মি হেলিকপ্টার পেয়েছিল কোথায় উইলকিনসন? কিন্তু প্রশ্নটা প্রশ্নই থেকে গেল। হয়তো আর্মির হেলিকপ্টার নিয়েই গ্যাভিনের সেসনার পেছন পেছন এসেছিল ওরা, সেই হেলিকপ্টারটা হয়তো রয়ে গেছিল সামবার্গে এবং প্রয়োজনের সময় গতরাতে ব্যবহার করেছে ওরা। হয়তো আজ ফিরে গেছে ওটা লন্ডনে বা অন্য কোন এয়ার বেস-এ এবং উইলকিনসন তার সরকারী প্রভাব খাটিয়ে ধার করে এনেছে তেল কোম্পানির কপ্টার।

বিশাল একটা দানবের মত গর্জন করতে করতে মাটিতে নেমে এল কপ্টারটা। চাকাগুলো মাটি স্পর্শ করল, ঝাঁকুনি খেলো একটু দানবটা। রোটরগুলো ঘুরে চলেছে এখনও, তবে তত জোরে নয়, এঞ্জিনের শব্দও কমে গেছে একটু। নিজের অজান্তেই ইঞ্চি ইঞ্চি করে আরও কিনারের দিকে সরে যাচ্ছে রানা। কিনারের ফুটখানেকের মধ্যে এসে গেছে ও। নিচ থেকে ফিশিংবোটের সার্চলাইটের আলো পড়তেই সতর্ক হলো। আর এক ইঞ্চি কিনারে চাপলেও বিপদ হতে পারে।

জ্বলে উঠল হেলিকপ্টারের সার্চ লাইটও। অন্ধকার ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে রানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল উজ্জ্বল আলো। কপ্টারটার চাকা মাটি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গেই নেমে এসেছে রিড। একটু পরই নেমে এল উইলকিনসন। দু'জনের হাতেই পিস্তল।

হেঁটে আসছে দু'জন রানার দিকে। আগে আগে রিড, তার থেকে আট দশ ফুট তফাতে থেকে উইলকিনসন। তাড়াহুড়ো করছে না কেউ। আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গি দু'জনের পদক্ষেপেই। দ্রুত হাতে প্লাস্টিকের বোতলটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে মুখটা খুলে ফেলল রানা।

ওর দশ বারো ফুট সামনে এসে থেমে দাঁড়াল দু'জনেই, তাকিয়ে আছে ওর দিকে। হেলিকপ্টারের শব্দ ছাপিয়েও যাতে শোনা যায় সেজন্যে চিৎকার করে উঠল উইলকিনসন, 'তোমার খেলা শেষ, মাসুদ রানা, জিনিসটা এবার দিয়ে দাও।'

মাথা নাড়ল রানা। 'উঁহুঁ, অত সহজ না,' সমান চিৎকার করে জবাব দিল ও। 'যাও, তাড়াতাড়ি ওটায় উঠে ভেগে পড়ো এখান থেকে, বিরক্ত কোরো না আমাকে।' হেলিকপ্টারের দিকে ইঙ্গিত করল রানা।

আরও দু'পা এগিয়ে এল ওরা, দু'জনেই বাগিয়ে ধরেছে পিস্তল। এবার কথা বলল রিড, 'আমরা কিন্তু গুলি করব, রানা। কথা না বাড়িয়ে দিয়ে দাও ওটা।'

বোতল ধরা হাতটা কিনারের দিকে প্রসারিত করে দিল রানা। ঠিক কিনারের উপর রয়েছে হাতের বোতলধরা অংশটুকু। সামান্য একটু ঠেলা দিয়ে ছেড়ে দিলেই

পড়ে যাবে বোতলটা দুশো ফুট নিচে পানিতে। 'সেক্ষেত্রে এটা চলে যাবে নিচে,' চিৎকার করে বলল রানা। 'বোতলের মুখটা খোলা। সুতরাং বুঝতেই পারছ। দু'সেকেন্ডের বেশি লাগবে না এটার তলিয়ে যেতে।'

'কি করে বুঝব যে ট্র্যান্সপারেন্সিটা আছে ওর ভেতর?' একই রকম চিৎকার করে জানতে চাইল রিড।

'আমার কথাই এখন শেষ কথা, রিড। আমি বলছি ওটা আছে এর ভেতরে। বিশ্বাস করো তো ভাল কথা, না করলেও কিছু এসে যায় না। কিন্তু তোমরা, আর এক পা-ও এগিয়েছ কি এটা চলে যাবে নিচে। আমার কথা সত্যি না মিথ্যে তা যাচাই করার সুযোগও পাবে না তোমরা। অতএব ভেগে পড়ো, ভাগো এখান থেকে।'

চাল মাৎ।

রানার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে রইল রিড। ধীরে ধীরে অসহায় হয়ে উঠছে তার চেহারা। আবার চিৎকার করে উঠল রানা, 'তোমরা গুলি করলেও এটা চলে যাবে নিচে, বুঝতে পারছ? আমার গায়ে গুলি লাগার সঙ্গে সঙ্গে হাত থেকে ছুটে যাবে এটা। এখন ভেবে দেখো কি করবে।'

রিডের দিকে তাকিয়েই কথা বলছিল রানা। দু'জনের মধ্যে সে-ই নেতা। উইলকিনসনকে ইচ্ছে করেই উপেক্ষা করেছে ও এবং সেটাই মারাত্মক হয়ে দেখা দিল কয়েক সেকেন্ড পর। আগেই আন্দাজ করা উচিত ছিল, কারণ ইতোমধ্যে উইলকিনসন সম্পর্কে ভালই ধারণা লাভ করতে পেরেছে ও। একেবারে যে অসতর্ক ছিল ঠিক তা-ও নয়, তবে উইলকিনসন যে প্রয়োজনের সময় কতটা ক্ষিপ্র হতে পারে তা ধারণা করতে পারেনি ও।

যে মুহূর্ত থেকে তাকে উপেক্ষা করে রিডের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছে রানা, সেই মুহূর্ত থেকে একপাশে সরে যেতে শুরু করেছে উইলকিনসন। এবং পরবর্তী পাঁচ-ছয় সেকেন্ডে একটু ঘুরে এসে পড়েছে প্রায় ওর গায়ের ওপর। আচমকা লাফ মেরে ধরে ওকে মাটিতে পেড়ে ফেলার ফন্দি এঁটেছে ব্যাটা।

উইলকিনসন লাফ দেয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে টের পেল রানা। কোন শব্দ পায়নি, ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ই বোধহয় সতর্ক করে দিল। একটু সময় নষ্ট না করে বিদ্যুৎগতিতে শরীর নাড়ল রানা। ছোট একটা গড়ান দিয়েই একটা পা ভাঁজ করে নিয়ে এল বুকের কাছে। কিন্তু ততক্ষণে লাফ দিয়েছে উইলকিনসন। অপ্রত্যাশিতভাবে রানা সরে যেতেই হোঁচট খেলো সে। সাথে সাথেই দড়াম করে প্রচণ্ড এক লাথি এসে পড়ল ওর চোয়ালের ওপর। একেবারে কিনারে ঘটছে ঘটনাটা, লাথিটা খেয়ে ঝোঁক সামলাতে পারল না উইলকিনসন। কিনারটা যেখানে খাড়া নিচে নেমে গেছে ঠিক সেখানে পড়ল হাঁটু দুটো, পরমুহূর্তে ডিগবাজির ভঙ্গিতে গড়িয়ে পড়ে গেল নিচে। লম্বা একটা মরণ-আর্তনাদ ভেসে এল নিচ থেকে, ক্রমশ আরও নিচে চলে যাচ্ছে শব্দের উৎসটা, কমে আসছে শব্দ। চলে গেছে উইলকিনসন! খুব সম্ভব চিরদিনের জন্যেই।

পুরো ঘটনাটা ঘটতে সময় লেগেছে এক সেকেন্ডের কিছু বেশি তবে দুই

সেকেন্ডের কম। এর ভেতরে রিড আবার কি করছে দেখবার আগে বোতলটার দিকে তাকাল রানা। গড়ান দেয়ার সময় যদি পড়ে গিয়ে থাকে ট্র্যান্সপারেন্সিটা তাহলেই সর্বনাশ! ঝাঁকুনি দিতেই ভেতরে পানি নড়ার শব্দ পাওয়া গেল। যাক, আছে তাহলে! পানি যখন পড়েনি তো ওটাও পড়েনি।

এবার আবার রিডের দিকে মনোযোগ দিল ও। ঘুরে তাকাল। না, দুশ্চিন্তার কিছু নেই, একই জায়গায় পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। উইলকিনসনের পড়ে যাওয়া দেখে হতভম্ব হয়ে গেছে বোধহয়। তবে পিস্তলটা তাক করা আছে এখনও।

- 'যাও, ভাগো!' চিৎকার করে উঠল রানা।

সঙ্গে সঙ্গে নড়ল না রিড। ঝাড়া দশ সেকেন্ড পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর একটু কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়াল। ধীর পায়ে হেঁটে যেতে লাগল হেলিকপ্টারের দিকে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল রানা, কপ্টারের কাছে পৌঁছল রিড, মাটি থেকে বেশ উঁচু মেঝেটা, পাঁচিলে ওঠার ভঙ্গিতে উঠে পড়ল কপ্টারে, টেনে বন্ধ করে দিল দরজাটা। এক সেকেন্ড পর আবার তীব্র হয়ে উঠল ওটার এঞ্জিনের শব্দ, ব্লেডগুলো ঘোরার গতিও বেড়ে উঠল, তীব্র ঝড়ো হাওয়ার মত ছড়িয়ে পড়ল রোটরের ঠেলে দেয়া বাতাস। আরও কয়েক সেকেন্ড পরে উঠে পড়ল সেটা মাটি ছেড়ে।

সাবধানে ক্রলিং করে কিনার থেকে বেশ খানিকটা ভেতরে সরে এল রানা। একটু থেমে বোতলের মুখটা লাগাল আবার, মাটিতেই পড়ে ছিল সেটা। চলে যায়নি হেলিকপ্টারটা। মাটি থেকে কয়েকশো ফুট উপরে উঠে হোম অভ নস-কে কেন্দ্র করে চক্কর দিয়ে চলেছে।

এখন কি করা যায়, ভাবছে রানা। এই মুহূর্তে জিতেছে ও, তবে কতক্ষণের জন্যে? আসলে এই জয়ের কোন মূল্য আছে কি? আমেরিকানরা ট্র্যান্সপারেন্সিটা পেল কি না পেল তাতে কিছু আসে যায় না ওর, সুফিয়া আর জামিলকে রাশিয়ানদের হাত থেকে মুক্ত করাটাই ওর আসল লক্ষ্য। আর সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে কি করা যায় তাই ভাবছে ও।

এখানে ওঠার আগ পর্যন্ত হেন্ডারসন আর ওর পরিকল্পনা ছিল ট্র্যান্সপারেন্সিটা এখান থেকে নিয়ে গিয়ে দর কষাকষির জন্যে কোন ভাবে যোগাযোগ করবে রাশিয়ানদের সাথে। এখান থেকে নামতে পারলে সেটা কোন সমস্যা হত না অবশ্য, তবে এতক্ষণে বোধহয় বুঝে ফেলেছে ভ্লাদিমির ওর এখানে আসার কারণ। হয়তো হেন্ডারসনকে ধরে ফেলেছে ওরা। যদি তাই হয় তাহলে তো পুরোপুরিই জেনে গেছে কারণটা। সম্ভবত হেন্ডারসন আর কোন সাহায্য করতে পারছে না। অর্থাৎ এখান থেকে নামতে পারলেও লারউইক পর্যন্ত পৌঁছানোর কোন উপায় নেই। সবচেয়ে বড় কথা, নামতেই পারবে না ও। নামাটা কোন কঠিন কাজ নয় ঠিক, কিন্তু কয়েক ফুট নামার পরই তো গুলি খাবে। এদিকে রিড মিঞাও চক্কর মেরে চলেছে মাথার ওপর। একদিকে আমেরিকান আর অন্যদিকে রাশিয়ান। দু'পক্ষই সমান বিপজ্জনক রানার জন্যে। একটা যদি ফুটন্ত তেল ভর্তি কড়াই হয়, অন্যটা জ্বলন্ত উনুন।

কোন বুদ্ধি আসছে না মাথায়। এখন প্রথম কাজ হচ্ছে রাশিয়ানদের সাথে যোগাযোগ করা। কিন্তু প্রাণ না খুইয়ে কিভাবে সেটা সম্ভব? ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল রানা। হেন্ডারসনের কুটিরটার দিকে যাবে ভাবল। মাথার ওপর থেকে এখনও ভেসে আসছে হেলিকপ্টারের শব্দ। নিচে রয়েছে রাশিয়ান ট্রলার। কিছুই করার নেই। জলে কুমীর আর আকাশে ক্ষুধার্ত শকুন, এই হয়েছে অবস্থা।

হঠাৎ কিছুটা দূরে ঘাসের ওপর একটা স্তূপ মত নজরে পড়ল রানার। অন্ধকারে কালো একটা ছায়ার মত লাগছে সেটাকে। কি হতে পারে? দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল সেদিকে। ঝুঁকে পড়ে জিনিসটা দেখেই চোখ কপালে উঠে গেল ওর। একটা মানুষ, নিঃসাড় পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল ওর, গতরাতের রাশিয়ান গার্ডটার কথা। সন্দেহ নেই বেশ জোরে মেরেছিল রানা, কিন্তু তাই বলে মরে যাবে লোকটা তা ভাবেনি। পরমুহূর্তেই খেয়াল করল ও, কি যেন একটা পড়ে রয়েছে লোকটার পাশে। হাত বাড়িয়ে তুলে নিল জিনিসটা। ট্র্যান্সমিটার একটা, ভ্লাদিমিরের সাথে কথা বলেছিল লোকটা এটা দিয়ে। মৃতদেহের কাছ থেকে সরে এল ও জিনিসটা নিয়ে। হেন্ডারসনের কুটিরটার দিকে এগোল। কুটিরের কাছে পৌঁছে ভেতর থেকে একটা টর্চ বের করল রানা। টর্চ জ্বেলে ভাল করে দেখল জিনিসটা। সাধারণ ওয়াকি-টকি। অন-অফ সুইচ, এবং সম্ভবত একটাই ওয়েভ লেংথে ব্যবহার করা যায় এটা।

এরিয়ালটা টেনে দিয়ে সুইচটা টিপে দিতেই খড়মড় করে উঠল যন্ত্রটা। মুখের কাছে নিয়ে বলে উঠল রানা, 'ভ্লাদিমির?'

কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। হেঁটে হেঁটে কিনারের দিকে চলে এল রানা। এরিয়ালটা সম্পূর্ণ ওঠানো হয়েছে কিনা একবার দেখে নিয়ে আবার কথা বলতে শুরু করল। অনেকক্ষণ ভ্লাদিমিরের নাম ধরে ডাকল। কিন্তু একই অবস্থা, নো রিপ্লাই। রাশিয়ানটা যখন পড়ে গিয়েছিল তখন এটাতেও হয়তো চোট লেগেছিল, বিকল হয়ে গেছে বোধহয় জিনিসটা, ভাবল রানা।

অকেজো মনে করে ওয়াকি-টকিটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাবে, এমন সময় রাশিয়ান ভাষায় একটা কথা শোনা গেল সেটার ভেতর থেকে। তাড়াতাড়ি মুখের কাছে নিয়ে এল ও জিনিসটা। কথা বলতে শুরু করল আবার, 'ভ্লাদিমির! ভ্লাদিমির! শুনতে পাচ্ছ আমার কথা?'

অপেক্ষা করছে রানা। এখনও কোন জবাব পাওয়া যায়নি। মৃদু শোঁ-শোঁ একটা শব্দ হচ্ছে শুধু।

'ভ্লাদিমির বলছি।' কিছুক্ষণ পরে ভেসে এল শব্দটা।

'আমি মাসুদ রানা,' বলল রানা, 'আমার কাছে তোমাদের ওই ট্র্যান্সপারেন্সিটার একটা কপি আছে। হেন্ডারসন তৈরি করেছিল।'

'তাহলে বদলাবদলি করতে পারি আমরা, কি বলো?'

'তিনজন বন্দী আছে তোমার কাছে, সুফিয়া আশরাফ, জামিল আশরাফ আর নিউটন নামের এক পক্ষী-বিশারদ, ঠিক?'

কিছুক্ষণের জন্যে নীরবতা। তারপর আবার ভেসে এল, 'হ্যাঁ, স্বীকার করছি, তিনজন আছে আমার কাছে। দড়ি বেয়ে নেমে এসো তুমি, রানা, জিনিসটা দিয়ে দাও

আমাদের, কথা দিচ্ছি, ওদের তিনজনকে শেটল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের কোন একটা দ্বীপে নামিয়ে দেব আমরা।'

'চমৎকার! কে.জি.বি-র সব লোকই তোমার মত গর্দভ নাকি?'

'প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আমি, রানা।'

'অবশ্যই না রাখার জন্যে, তাই না?' বলল রানা। 'আমার মাথায় এর চেয়ে ভাল বুদ্ধি আছে।'

'ট্র্যান্সপারেন্সিটা আমেরিকানদের হাতে পড়লে কোন ডিলই সম্ভব নয়,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ভ্লাদিমির।

'পড়বে না। একটু আগে দেখলে তো, কেড়ে নিতে এসে একজনের কি অবস্থা হলো! এখন শোনো, ফেরত দিয়ে দেব আমি জিনিসটা, কিন্তু তার আগে, সুফিয়া, জামিল আর নিউটনকে হেন্ডারসনের বোটে তুলে দেবে তোমরা। যখন আমি পরিষ্কার বুঝতে পারব, ওরা নিরাপদে বোটে পৌঁছেছে এবং রওনা হয়ে গেছে উপকূলের দিকে, তার পরেই তোমরা ফেরত পাবে ট্র্যান্সপারেন্সিটা।'

কেমন খড়খড়ে আওয়াজ হলো ওয়াকি-টকিটায়। তারপর শোনা গেল ভ্লাদিমিরের গলা, 'তুমি বিশ্বাস করো না আমাকে, তাই না? তাহলে আমি কেন বিশ্বাস করতে যাব তোমাকে? আমি নিরাপদে হেন্ডারসনের বোটে পৌঁছে দিলাম ওদের, বোট নিয়ে রওনা হয়ে গেল হেন্ডারসন, তারপর তুমি আমেরিকানদের হাতে তুলে দিলে জিনিসটা···তখন? আমি তখন বসে বসে আঙুল চুষব? তাছাড়া হেন্ডারসনকেই বা কোথায় পাচ্ছি আমি?'

'শোনো, ভ্লাদিমির, আমি আমেরিকান নই, ব্রিটিশও নই, ট্র্যান্সপারেন্সিটার কোন গুরুত্বই নেই আমার কাছে। বুঝেছ? আগেও বলেছি, এখনও বলছি সুফিয়া আর জামিলের ব্যাপারেই একমাত্র মাথা ঘামাচ্ছি আমি। এদের সাথে নতুন একজন যোগ হয়েছে–নিউটন। শোনো, হেন্ডারসন এখানেই আশেপাশে কোথাও আছে। একটু খুঁজলেই পেয়ে যাবে ওকে।'

'তা সত্ত্বেও তোমার কথা বিশ্বাস করার কোন কারণ দেখছি না আমি।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল রানা। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, আমি তাহলে জিম্মি হিসেবে ঘোষণা করছি নিজেকে। এবার তুমি সন্তুষ্ট? ওদেরকে ছেড়ে দেয়ার পরেও আমি যদি ওটা না দিই তাহলে আমাকে জিম্মি হিসেবে পাবে তোমরা।'

'কিভাবে?'

'আমি দড়ি বেয়ে নেমে চূড়া থেকে খানিকটা নিচে ঝুলে থাকব···জাহান্নামে যাক্!' উপর দিকে তাকাল রানা, কপ্টারের প্রচণ্ড শব্দে কানে তালা ধরে যাবার দশা। আবার অনেকখানি নিচে নেমে এসেছে ওটা। এখন হোম অভ নস-এর চূড়ার সমান উচ্চতায় থেকে কয়েকশো ফুট দূর দিয়ে চূড়াটাকে চক্কর মেরে চলেছে। কপ্টারটা ঘুরে একটু দূরে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা। তারপর আবার বলল, 'শুনছ, ভ্লাদিমির?'

'হ্যাঁ, বলো।'

'চূড়া থেকে খানিকটা নিচে ঝুলে থাকব আমি। ট্র্যান্সপারেন্সিটা থাকবে আমার

সঙ্গে। একটা বোতলে আছে ওটা, সম্পূর্ণ নিরাপদ, আমেরিকানদের হাতে পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। ঝুলে পড়ার আগে বোতলটার সঙ্গে লম্বা একটা রশি বেঁধে নেব আমি। সুফিয়া, জামিল আর নিউটনকে নিরাপদে হেন্ডারসনের বোটে উঠতে দেখার পর রশিটা কেটে দেব আমি। বোতলটা প্লাস্টিকের, সুতরাং ভাঙার সম্ভাবনা নেই, নিচে পড়ে ভাসতে থাকবে ওটা। অনায়াসেই তুলে নিতে পারবে তোমরা। কিন্তু আগেই যদি গুলি করে বসো, আমি মারা পড়লেও বোতলটা ঝুলতেই থাকবে–খুব সহজেই উদ্ধার করতে পারবে ওটা আমেরিকানরা। বোঝা গেছে?'

বেশ কিছুক্ষণের নীরবতা। কানের কাছে যন্ত্রটা ঠেকিয়ে রেখেছে রানা। হেলিকপ্টারের শব্দ এখনও শোনা যাচ্ছে, তবে অনেক আস্তে। দূর থেকে ভেসে আসছে শব্দটা। এই মুহূর্তে দেখতে না পেলেও, আশেপাশেই কোথাও আছে ওটা।

কানের কাছে ভ্লাদিমিরের গলা শুনতে পেল ও, 'আমি ওদেরকে ছেড়ে দেয়ার পর তুমি যে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে না তার নিশ্চয়তা কি? যত যাই হোক, হেলিকপ্টার উপস্থিত রয়েছে এখনও।'

ভ্লাদিমিরের কথা শোনার পরেই খেয়াল করল রানা, নিছক চক্কর মেরে সময় কাটানোর চেয়ে আরও বেশি কিছু করছে যেন হেলিকপ্টারটা। হোম অভ নস-এর ওপাশে কোথাও সি লেভেলে নেমে গিয়েছিল, যাতে রানা বা রাশিয়ানরা দেখতে না পায়। হঠাৎ করেই আবার চূড়ার কিনার দিয়ে উঠে এল ওটা, তারপর হোমের ওপর খুব নিচু দিয়ে উড়ে গেল। ঘাড় ঘুরিয়ে ওটার চলে যাওয়া দেখল রানা, কি মতলব এঁটেছে রিড তা বোঝার চেষ্টা করছে। একবার মনে হলো, টিয়ার গ্যাস? অথবা ওই জাতীয় কিছু? অথবা খুব নিচু দিয়ে উড়ে এসে চাকার ঘায়ে ওকে আহত করা? টিয়ার গ্যাস হলেও হতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ কিনারে আছে ততক্ষণ ওকে আহত করবে না ওরা, ট্র্যান্সপারেন্সিটা চিরতরে হারানোর সম্ভাবনা রয়েছে তাতে।

টিয়ার গ্যাসের সম্ভাবনাটাও খুব যুক্তিযুক্ত মনে হলো না। প্রথমত লারউইকের মত শান্তিপূর্ণ ছোট একটা জায়গার পুলিসের কাছে ওসব জিনিস না থাকার সম্ভাবনাই বেশি। দ্বিতীয়ত থাকলেও আসার সময় ওরা যে সব জিনিস নিয়ে এসেছে তারই বা নিশ্চয়তা কি? এ ধরনের পরিস্থিতিতে পড়বে তা নিশ্চয়ই আগে থাকতে ধারণা করা সম্ভব ছিল না রিড বা উইলকিনসনের পক্ষে।

হেলিকপ্টারের শব্দটা মিলিয়ে যেতেই বলল রানা, 'চূড়ার দশ-বারো ফুট নিচে দড়িতে ঝুলতে থাকব আমি। কথা না রাখলে খুব সহজেই গুলি করতে পারবে তোমরা। তোমাদের রাইফেলের রেঞ্জের ভেতরই রয়েছি আমি, তাই না?'

ভ্লাদিমিরের জবাবের জন্যে অপেক্ষা করছে রানা। জানে, প্রস্তাবটা মেনে নেয়ার সম্ভাবনা ফিফটি ফিফটি। হলে ভাল, ট্র্যান্সপারেন্সিটা বোধহয় ফেরতই দিতে হবে সেক্ষেত্রে। না হলেও করার কিছু নেই। আর কোন অস্ত্রই নেই ওর হাতে।

দ্বিধান্বিত গলা শোনা গেল ভ্লাদিমিরের, 'কিভাবে আমি বিশ্বাস করব তোমাকে?'

'আমি যদি কথা না রাখি তো পরিষ্কার খুন করবে আমাকে, এর চেয়ে সহজ সরল আর কি হতে পারে?'.

এখনও ইতস্তত করছে ভ্লাদিমির। একটাই করণীয় আছে, ভাবল রানা। উঠে

দাঁড়িয়ে চূড়ার একেবারে কিনারে চলে এল ও, তাড়াতাড়ি বলল, 'গুলি কোরো না, জিনিসটা আমার হাতে নেই, এখন আমাকে মারলে আমি একাই পড়ব নিচে, বোতলটা পড়বে না। খুব সহজেই রিড ওটা উদ্ধার করতে পারবে তারপর। শোনো, আমার দিকে তাকাও, তোমার কোন লোককে রাইফেল তুলে দেখতে বলো, আমাকে টার্গেট করতে অসুবিধা হয় কিনা। এখন হয়তো দৌড়ে ভেতর দিকে চলে যেতে পারব, কিন্তু আমার প্রস্তাব গ্রহণ করলে দশ ফুট নিচে নেমে ঝুলে থাকব আমি। কি মনে হয়, মিস হওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে?'

নিচে ট্রলারের আলোকিত ডেকের উপর থেকে লোকজন দেখছে ওকে, খেয়াল করল রানা। দু'একজনের হাতে রাইফেলও রয়েছে। তাক করে দেখল একজন। আবার বলল রানা, 'কি? এবার সন্তুষ্ট?'

আশ্বস্ত গলা শোনা গেল এবার ভ্লাদিমিরের। 'ঠিক আছে, রানা। আমি গ্রহণ করছি তোমার প্রস্তাব। কিন্তু সাবধান, কোন চালাকি নয়, আমরা মিস করব না তোমাকে।'

খাড়াভাবে নিচে তাকাল রানা। রীতিমত ঢোক গেলার মত দৃশ্য। সোজাসুজি দিগন্তের দিকে তাকালে তত উঁচু মনে হয় না পাহাড়টাকে, কিন্তু খাড়াভাবে তাকালেই মাথা ঘুরে উঠতে চায়।

'যেখান দিয়ে উঠেছি সেখান দিয়েই ঝুলে থাকব আমি, বুঝেছ?' বলল রানা।

'হ্যাঁ, বুঝেছি।'

এতক্ষণে ট্রলারের ডেকের উপর ভ্লাদিমিরকে চিনতে পারল রানা। চোখের রিমলেস চশমাটা এতদূর থেকেও দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। হাতে ওয়াকি-টকি নিয়ে, মাথা পেছনে হেলিয়ে ঘাড় উঁচু করে তাকিয়ে আছে এদিকে। অন্যান্য লোকজনের আড়ালে অথবা কেবিনের ভেতরে ছিল বলে এতক্ষণ দেখতে পায়নি ও। এক সেকেন্ড পরেই ট্রলারের বো-টা ঘুরতে শুরু করল, স্টার্নের নিচে জলের তোলপাড় উঠল, চলতে শুরু করল ভ্লাদিমিরের ট্রলার। রানাও পেছনে সরে এসে প্লাস্টিকের বোতলটা তুলে নিল। ঝাঁকিয়ে পানি নড়ার শব্দটা শুনে নিল আরেকবার। হেন্ডারসনের কুঁড়ের কাছে চলে এল আবার। ভেতরে ঢুকে সরু নাইলন কর্ডের রোল তুলে নিয়ে বেরিয়ে এল। টর্চ নিয়েছে আগেই। ওয়াকি-টকিটা কাঁধে ঝুলিয়ে বোতলের গলার সঙ্গে নাইলনের রশিটা বাঁধতে বাঁধতে যে জায়গা দিয়ে উঠেছিল সে জায়গার দিকে হাঁটতে লাগল। টর্চ জ্বেলে খুলে ফেলা ক্লাইম্বিং বেল্ট, জুমার ক্লিপ এবং রেকাবগুলো খুঁজে বের করে আবার পরে নিল বেল্টটা। রশির সঙ্গে জুমার এবং জুমারের সঙ্গে রেকাব লাগিয়ে একেবারে প্রান্তে চলে এল রানা। বোতলের গলায় বাঁধা রশিটার অন্যপ্রান্ত খুঁটির সাথে এমনভাবে বাঁধল, যেন বোতল নিয়ে দশফুট নিচে নামতে কোন অসুবিধে না হয়।

নামার আগে রশিটা খুঁটির সঙ্গে কতখানি শক্ত করে বাঁধা আছে আরেকবার পরখ করে নিল ও। নামার ব্যাপারটা খুবই সহজ, রশিটা দু'হাতে ধরে পা দুটো পাহাড়ের গায়ের সঙ্গে লাগিয়ে আস্তে আস্তে নেমে এলেই হলো। পেশীতে একটু জোর থাকলে দুশো ফুট নামা কিছুই না, সময়ও মিনিট দুয়েকের বেশি লাগার কথা

নয়। কিন্তু সমস্যা হলো এভাবে নামতে পারছে না রানা। প্রথমত ক্লাইম্বিং বেল্টের লুপের ভেতর দিয়ে নেমে গেছে রশিটা, তাছাড়া রেকাবে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ওকে, সুতরাং এভাবে নামতে গেলে বিপদের সম্ভাবনা। যেভাবে উঠেছে সেভাবেই একটু একটু করে নামতে হবে।

রশিটা ঝুলিয়ে দিল রানা। হাত বাড়িয়ে কিনার থেকে কয়েক ইঞ্চি নিচে আটকাল জুমার দুটো। ঝুলিয়ে দিল রেকাব দুটোও। বোতলটা গুঁজে নিল কোমরে।

নামতে শুরু করল রানা। সমুদ্রের দিকে পেছন ফিরে রশিটা প্রথমে দু'হাতে ধরল, তারপর ধীরে ধীরে শূন্যে ঝুলিয়ে দিল ডান পা-টা। এবার পেটের ওপর ভর রেখে বাঁ পা-টাও ঝুলিয়ে দিল। রশিটা শক্ত করে ধরে ইঞ্চি ইঞ্চি করে নামতে লাগল। এক পা পাহাড়ের গায়ের সঙ্গে ঠেকিয়ে অন্য পা দিয়ে খুঁজতে লাগল রেকাবগুলো। বেশ কিছুক্ষণ লাগল পায়ের নিচে একটা রেকাব পেতে। রশিটা শক্ত করে ধরে থাকায় এরই মধ্যে হাতের পেশীগুলো টনটন করতে শুরু করেছে। পায়ের তলায় রেকাব পেতেই হাত দুটো ঢিল করে দিল ও, পুরোপুরি নিরাপদ এখন, নিচে পড়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। ও পড়তে চাইলেও পড়বে না, ক্লাইম্বিং বেল্টটা ঠেকাবে পতন।

নামার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করল এবার রানা। ওঠার মত একই পদ্ধতিতে নামতে শুরু করল। ওঠার সময় জুমারগুলোকে টেনে ওঠাতে হচ্ছিল, নামার সময় এখন ঠেলে নামাতে হচ্ছে। চূড়া থেকে ফুট দশেক নিচে এসেই নামা বন্ধ করল ও।

চ্যানেলের প্রবেশ মুখটার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। এখনও এসে পৌঁছায়নি ভ্লাদিমির তার ট্রলার নিয়ে। হঠাৎ করে মনে পড়ল ওর, ট্র্যান্সমিটার নেই হেন্ডারসনের বোটে। কিভাবে খবর দেবে ওকে ভ্লাদিমির? যা-ই হোক, সমস্যাটা ভ্লাদিমিরের, মাথা ঘামাল না রানা। মোর্সকোডেই খবর দিতে পারবে। নিশ্চয়ই মোর্সকোড জানে হেন্ডারসন।

মিনিটখানেক পরেই দেখতে পেল ও ট্রলারটাকে। সামনের ডেকের সবগুলো বাতিই জ্বালানো। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ডেকের ওপর মানুষজন আর মাছ ধরার যন্ত্রপাতিগুলো। এমন সময় আবার এগিয়ে আসতে লাগল হেলিকপ্টারের শব্দ। বাড়তে বাড়তে একেবারে কানে তালা ধরিয়ে দেয়ার পর্যায়ে উঠে গেল শব্দটা। হোম অভ নস-এর চূড়া থেকে পঞ্চাশ ফুটেরও কম উপর দিয়ে উড়ে গেল সেটা।

একটু উদ্বিগ্ন না হয়ে পারল না রানা। কি করতে চাইছে লোকটা? রিডের এই বাড়াবাড়ি দেখে ভ্লাদিমির যদি মত পাল্টে ফেলে আবার, তাহলে সব ভেস্তে যাবে। কিছু একটা বুদ্ধি এঁটেছে রিড, কিন্তু কি সেটা ধরতে পারল না রানা। কাঁধ থেকে ওয়াকি-টকিটা খুলে মুখের কাছে আনতে আনতে নিচে তাকিয়ে দেখল ও, প্রায় ওর ঠিক নিচে এসে উপস্থিত হয়েছে ভ্লাদিমির ট্রলার নিয়ে। পাহাড়ের গা থেকে পঞ্চাশ ফুটও দূরে নেই সেটা। বোতলটা ছেড়ে দিলে ট্রলারের ডেকের ওপরেই যেন পড়ে বোধহয় সেইজন্যেই।

'ভ্লাদিমির?' ওয়াকি-টকির সুইচটা অন করে ডাকল রানা।

'হ্যাঁ, তৈরি আমি।'

'হেন্ডারসনের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে?'

'হ্যাঁ, এসে যাবে ও কয়েক মিনিটের মধ্যেই।'

'কোথায় ওরা? আমি দেখতে চাই ওদের।'

'নিচে তাকাও।'

তাকাল রানা। স্টার্নের ডেকে দেখতে পেল ওদের তিনজনকে। সুফিয়া, জামিল আর নিউটন। তিনজন লোক সাবমেশিন গান তাক করে আছে ওদের দিকে। একটু দূরে রেলিংয়ের কাছে দাঁড়াল ভ্লাদিমির। নিউটনকে না চিনলেও বেচারার অবস্থা দেখে সহজেই আন্দাজ করা যাচ্ছে, লোকটা নিউটনই।

'তোমার ওয়াকি-টকিটা দাও সুফিয়ার কাছে,' বলল রানা। 'আমি কথা বলতে চাই ওর সাথে।'

রেলিংয়ের কাছ থেকে সরে এসে ওয়াকি-টকিটা সুফিয়ার হাতে দিল ভ্লাদিমির। মনে মনে অনেকখানি স্বস্তি বোধ করল রানা। সত্যি সত্যিই নরম হয়েছে তাহলে ভ্লাদিমির।

'রানা?' দ্বিধান্বিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল সুফিয়ার। এখনও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না সত্যিই রানার গলা শুনবে সে ওয়াকি-টকিতে।

'হ্যাঁ। তোমাদের সঙ্গের ওই লোকটা কি নিউটন?'

এক মুহূর্তের নীরবতা। তারপর আবার শোনা গেল সুফিয়ার গলা, 'হ্যাঁ, রানা, ও-ই নিউটন।'

'জামিলের খবর কি?'

'ভালই আছে। তবে ভয় পেয়েছে বোধহয় একটু।'

'মারধর করেনি তো ওরা?'

'না।'

'ঠিক আছে, জামিলকে একটু দাও তাহলে।'

আবার কিছুক্ষণের নীরবতা। জামিলের হাতে ওয়াকি-টকিটা দিতে দেখল ও সুফিয়াকে। মুখ নড়তে দেখল সুফিয়ার, কিছু বলল বোধহয়। একটু পরেই শোনা গেল জামিলের গলা, 'মাসুদ ভাই? কই তুমি?'

'এই তো, জামিল, তোমার মাথার ওপরে তাকাও।'

মাথা তুলে জামিলকে উপরে তাকাতে দেখল রানা। হাত নাড়ল। ওয়াকি-টকিতে ভেসে এল জামিলের গলা, 'ওখানে কি করছ তুমি, মাসুদ ভাই?'

'এখানে? কিছু না, নতুন ধরনের এক্সারসাইজ একটা। ঘাবড়াও মৎ, তোমাকেও শিখিয়ে দেব পরে এক সময়। তুমি নাকি ভয় পেয়েছ?'

'কে বলল, আপা? উঁহুঁ, মোটেই ভয় পাইনি আমি।'

'এই তো চাই, ভয়ের কিছু নেই। একটু পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এবার আপাকে দাও।' জামিল ওয়াকি-টকিটা সুফিয়ার হাতে দেওয়ার পর আবার বলল রানা, 'সুফিয়া, ভ্লাদিমির তোমাদের হেন্ডারসনের বোটে তুলে দেবে। বোটে উঠেই সোজা লারউইকের দিকে রওনা হবে তোমরা, বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তুমি?'

'আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না। আমার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

চ্যানেলের প্রবেশ মুখের দিকে ভ্লাদিমিরকে তাকাতে দেখল রানা। ও-ও ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সেদিকে। হেন্ডারসনের বিগ শেটল্যান্ড মডেলের বোটটা ঢুকছে চ্যানেলে, এগিয়ে আসছে রাশিয়ান ট্রলারের স্টার্নের দিকে।

'যাও, উঠে পড়ো হেন্ডারসনের বোটে,' বলল রানা। 'আর হ্যাঁ, যা বলেছি মনে থাকে যেন, বোটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ফুলস্পীডে লারউইকের দিকে।'

'ঠিক আছে। সাবধানে থেকো, রানা।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর বলতে হবে না, সাবধানেই থাকব আমি। ভ্লাদিমিরকে দাও এখন যন্ত্রটা।'

আরও মিনিট দুয়েক লাগল হেন্ডারসনের বোট নিয়ে ট্রলার পর্যন্ত এসে পৌঁছতে। ট্রলারের স্টার্নের দিকে বোট ভিড়াল সে। কি অবস্থা বেচারার ভাল বুঝতে পারল না রানা তার মুখ দেখে।

'ওদেরকে ছেড়ে দিচ্ছি, রানা,' গলা শোনা গেল ভ্লাদিমিরের। 'দেখতে পাচ্ছ তুমি?'

পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা। প্রথমেই নিউটনকে বোটে উঠতে দেখল ও: বেচারা নিউটন, পক্ষীপ্রীতির কারণে আরেকটু হলেই প্রাণ পাখিটা খাঁচা ছাড়া হতে বসেছিল। তারপর উঠল জামিল, সবশেষে সুফিয়া। হুইল থেকে উঠে এসে ভাল হাতটা দিয়ে জামিল আর সুফিয়াকে বোটে উঠতে সাহায্য করল হেন্ডারসন। নিউটন ইতোমধ্যে বসে পড়েছে হুইলে। ঘুরে দাঁড়িয়ে রানার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল সুফিয়া, দেখাদেখি জামিলও। হেন্ডারসনও বোধহয় একবার উঁচু করল ওর ভাল হাতটা।

কানের কাছে হাতুড়ির বাড়ি মারল যেন ভ্লাদিমিরের গলা। 'বোটে উঠে পড়েছে ওরা, দেখতে পেয়েছ?'

'হ্যাঁ, দেখেছি। এখন,' বলল রানা। একটু বিরতি দিয়ে যোগ করল, 'যতক্ষণ পর্যন্ত ওরা দৃষ্টির আড়ালে না যাচ্ছে, ততক্ষণ অপেক্ষা করব আমরা।'

সতর্ক হয়ে উঠল ভ্লাদিমিরের গলা। হুমকি মেশানো স্বরে বলল, 'সাবধান, রানা! অটোমেটিক রাইফেল হাতে তিনজন লোক রয়েছে এখানে। একটুও নড়াচড়ার চেষ্টা করবে না তুমি, গুলি করার অর্ডার দেয়া হয়েছে ওদের।'

'ঠিক আছে, নড়ছি না আমি। কিন্তু ওরা দৃষ্টির আড়ালে না যাওয়া পর্যন্ত বোতলটাও ফেলছি না।'

চলতে শুরু করেছে হেন্ডারসনের বিগ শেটল্যান্ড মডেল বোট। ধীরে ধীরে পিছনে চলে চ্যানেলের বাইরে বেরিয়ে গেল ওটা। বোটটার স্টার্নের দিকে চারটে মূর্তি দেখতে পাচ্ছে রানা। হুইল ধরে বসে আছে নিউটন। সুফিয়া, জামিল আর হেন্ডারসন দাঁড়িয়ে আছে এখনও কেবিনের ছাদে হাত রেখে। রানার মনে হলো হোম অফ নস-এর চূড়ার দিকে একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওরা।

চ্যানেল থেকে বেরিয়ে বড় একটা বৃত্ত তৈরি করে সামনের দিকে চলতে শুরু

করল বিগ শেটল্যান্ড মডেল। দ্রুত বেড়ে উঠছে স্পীড। লারউইকের দিকে নাক সোজা করে বোট ছোটাতে শুরু করল নিউটন। ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে বোটের অবয়বটা। শেষ পর্যন্ত একটা বিন্দুর আকার নিল ওটা। একটু পরেই আর দেখা গেল না।

আরও আধমিনিট পর কথা বলল ভ্লাদিমির। 'এবার, রানা, ফেলো বোতলটা।'

জবাব দিল না রানা।

'শুনতে পাচ্ছ, রানা?'

'হ্যাঁ, বলো।'

'দশ পর্যন্ত গুনব আমি। এর ভেতরে যদি তুমি তোমার কথা না রাখো...আমার লোকেরা...ফায়ার ওপেন করবে।...এক...'

'শোনো, ভ্লাদিমির। তাতে কোন লাভ হবে না তোমার,' ধীরে ধীরে বলল রানা। 'শেষ পর্যন্ত ট্র্যান্সপারেন্সিটা আমেরিকানদের হাতেই পড়বে তাহলে। গুলি করার আগে একবার ভেবে দেখো, জিনিসটা আমেরিকানদের হাতে পড়ুক তা তুমি চাও কি না।'

'কেন, আমেরিকানদের হাতে যাবে কি করে ওটা?' অস্থির শোনাল ভ্লাদিমিরের গলা।

'কারণ, ক্লাইম্বিং বেল্ট দিয়ে রশিটার সঙ্গে বাঁধা রয়েছি আমি, গুলি খেয়েও নিচে পড়ব না। তাছাড়া বোতলের গলায় বাঁধা সরু নাইলন কর্ডের একমাথা বাঁধা রয়েছে ওপরের খুঁটির সাথে। গুলি করে আমাকে মারতে পারবে তোমরা, কিন্তু ট্র্যান্সপারেন্সিটা পাবে না। এখনও বুঝতে পারছ না, আমেরিকানরা কি করে পাবে ওটা? হেলিকপ্টারটা দেখেছ তো, এখনও মাথার ওপর চক্কর দিয়ে চলেছে। আমাকে মারার পরের চক্করে এদিকে এসেই ওরা দেখতে পাবে আমার মৃতদেহ। সহজেই বুঝতে পারবে ওরা ব্যাপারটা। এখন যেভাবে দাঁড়িয়ে আছি নিশ্চয়ই মরার পরেও সেভাবে মোটেই দাঁড়িয়ে থাকব না আমি, স্টাইল চেঞ্জ করব। তখন ওরা কি ভাববে বলো তো? আমি তোমাদেরকে ট্র্যান্সপারেন্সিটা দিতে চাইনি বলে আমাকে মেরে ফেলেছ তোমরা। তারপর ওরা কি করবে তা জানো? ট্র্যান্সপারেন্সিটা যদি এখনও আমার কাছে থেকে থাকে, এই আশায় ওপরে কপ্টারটা ল্যান্ড করিয়ে দড়ি ধরে টেনে তুলবে আমাকে। আমার লাশটা সুফিয়া আর হেন্ডারসনের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার একটা নৈতিক দায়িত্বও অনুভব করবে ওরা মনে মনে। স্বাভাবিক মানবতাবোধেই কাজটা করবে ওরা। বুঝতেই পারছ, বোতলটা দেখেই ধক করে উঠবে রিডের কলজেটা। তাড়াতাড়ি বোতলটা তুলে নিয়ে খুলবে ও, এবং পেয়ে যাবে তোমার সাধের ট্র্যান্সপারেন্সিটা।' অনেক সময় নিয়ে, বেশ রসিয়ে রসিয়ে গল্প বলার ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল রানা। 'কি? করবে গুলি?'

'কুত্তার বাচ্চা!' দাঁত কিড়মিড় করে উচ্চারণ করল ভ্লাদিমির।

'উঁহুঁ, অত খেপে যাওয়ার কিছু হয়নি, ভ্লাদিমির। প্রত্যেকেরই অধিকার আছে তার প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করার, কি বলো? আমিও তা-ই করছি। ধরো বোতলটা আমি নামিয়ে দিলাম, ট্র্যান্সপারেন্সিটা পেয়ে গেলে তোমরা, তারপরে নিছক মনের

ঝাল মেটানোর জন্যে যদি আমাকে মেরে রেখে যাও তোমরা তো কিছু করতে পারব আমি?'

'কুত্তার বাচ্চা!' আবার বলল ভ্লাদিমির। 'তোকে বিশ্বাস করেছিলাম আমি!'

'সুফিয়াও বিশ্বাস করেছিল তোমাকে, বেচারা ভাবতেই পারেনি ওকে কোনদিন আটকাবে তুমি। তারপর, শুধু ওকে আটকেও ক্ষান্ত হওনি, নিরীহ জামিলকেও কিডন্যাপ করেছ তোমরা। কেবলমাত্র এই অপরাধেই ট্র্যান্সপারেন্সিটা আমেরিকানদের হাতে তুলে দিলেও কোন দোষ হবে না আমার। কিন্তু ভয় পেয়ো না, ওটা আমেরিকানদের জিনিস নয়, ওদের হাতে যাবে না। আমি জানি জিনিসটা তোমাদেরই প্রাপ্য। আমার প্রাণের নিশ্চয়তা যদি থাকত তাহলে ওটা এখুনি তোমাদের ফেরত দিতাম আমি। কিন্তু তোমাদের অতীত আচরণের কারণে কোনভাবেই বিশ্বাস করতে পারছি না তোমাদের। একটা কানাকড়ি দিয়েও না।'

'তাহলে কি করবে তুমি ওটা দিয়ে?'

'কিছুই না, আমিও রাখব না ওটা। আগেই তো তোমাকে বলেছি ওটার কোন মূল্যই নেই আমার কাছে। কেবল মাত্র সুফিয়ার ব্যাপারেই ইন্টারেস্টেড ছিলাম। ওকে নিরাপদে তোমার নাগালের বাইরে পাঠিয়ে দিতে পেরেছি, এখন আমি নিশ্চিন্ত।'

'কি করবে তুমি ওটা দিয়ে?' আবার জিজ্ঞেস করল ভ্লাদিমির।

'তুমি যা চাও তা-ই করব, নষ্ট করে ফেলব ওটা, আমার নিজের হাতে। তোমার হাতেই ফিরিয়ে দিতাম, কিন্তু তাহলে আমাকে খুন করবে তোমরা। আর, আমি পোড়ালেও কোন ক্ষতি হচ্ছে না তোমাদের, তুমিও তো ওটা পুড়িয়েই ফেলতে।'

এমন সময় অন্য একটা গলা শোনা গেল ওয়াকি-টকিতে। চিনতে পারল রানা, রিডের কণ্ঠস্বর।

'না, রানা, ওটা তুমি পুড়িয়ে ফেলতে পারো না,' বলল রিড। 'সারা দুনিয়ার সামরিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে তাতে।'

তারমানে এতক্ষণ ওদের সব কথাবার্তাই শুনেছে রিড। শুনুকগে, তাতেও কিছু এসে যায় না। হেলিকপ্টারের শব্দটা আবার বেড়ে উঠতে শুরু করেছে। আবার হোম অভ নস-এর উপরের দিকে এগিয়ে আসছে বোধহয় ওটা।

'বাজে কথা রাখো,' বলল রানা। 'যেমন ছিল তেমনি থাকবে ভারসাম্য! তোমরা পাল্লাটা তোমাদের দিকে ভারী করে নিতে চাইছ এমন একটা কিছুর মাধ্যমে, যেটা পাওয়ার কোন অধিকার নেই তোমাদের। সুতরাং পাবে না ওটা তোমরা। বহুত ভুগিয়েছ, এখন ভাগো!'

'প্লীজ, রানা, মিনতি করছি তোমার কাছে, জিনিসটা নষ্ট কোরো না তুমি।'

'ভাল কথা! নষ্ট করব না তো কি করব বলো তো? তোমাকে দেব? নিজের প্রাণটা খোয়ানোর জন্যে? ওসব ধানাইপানাই রাখো, রিড, ভাগো তুমি—পাবে না ট্র্যান্সপারেন্সি।' এক সেকেন্ড বিরতি দিয়ে আবার বলল রানা, 'শোনো, ভ্লাদিমির, আমি এখন উঠে যাচ্ছি উপরে, ইচ্ছে করলে মারতে পারো আমাকে, জেনে রেখো,

সেক্ষেত্রে আমেরিকানরাই পাবে ট্র্যান্সপারেন্সিটা।'

জুমার ক্লিপগুলো ঠেলে উপরে ওঠাতে লাগল রানা। প্রথমে একটা, তারপরে আরেকটা, আবার প্রথমটা, আবার দ্বিতীয়টা। দশফুট মাত্র উঠতে হবে, দুমিনিটের বেশি লাগবে না কোনমতেই।

ভ্লাদিমিরের গলা শোনা গেল ওয়াকি-টকিতে, আশ্চর্য রকম অমায়িক গলায় কথা বলছে সে। 'ঠিক আছে, রানা, উঠে যাও তুমি। ওপরে উঠেই কিন্তু পুড়িয়ে ফেলবে ওটা।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে।'

'আচ্ছা, রানা, একটা কথা বলবে, রিডকে কেন তুমি দেবে না জিনিসটা?'

'ওর সঙ্গে যদি কোনদিন দেখা হয় তোমার তো ওকেই জিজ্ঞেস কোরো। সে কারণটা অবশ্যই গৌণ। আসল কারণটা বললাম তো, আমি মনে করি ওটা পাওয়ার কোন অধিকার নেই আমেরিকানদের।'

এসে গেছে বিশাল হেলিকপ্টারটা হোম অভ নস-এর উপর। ধীরে ধীরে নামছে নিচে। সন্দেহ নেই ল্যান্ড করতে যাচ্ছে ওটা।

'রানা, ওরা তো ল্যান্ড করতে যাচ্ছে!' প্রায় আতঙ্কিত গলা শোনা গেল ভ্লাদিমিরের।

জবাব দেয়ার কোন সুযোগ পেল না রানা, ভেসে এল রিডের গলা, 'আমরা কিন্তু মরিয়া, রানা! খবরদার! জিনিসটা নষ্ট কোরো না তুমি।'

'উঁহুঁ, রিড, ট্র্যান্সপারেন্সিটা পাবে না তুমি,' বলল রানা। প্রায় উঠে এসেছে ও, আর একবার জুমার ওঠালেই হলো। ওর মাথাটা উঠে এসেছে কিনারের উপর। সবচেয়ে কষ্টকর ভাবে জুমার ওঠানোর কাজটা করছে এখন রানা। এমন সময় গুলি হলো কপ্টার থেকে। মাথাটা নিচু করে নিল রানা। কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল গুলিটা।

'ওরা গুলি করছে, রানা?' ভ্লাদিমিরের উৎকণ্ঠিত গলা শোনা গেল।

কোন জবাব দিল না রানা। জুমার ওঠানোর কাজটা শেষ করেছে ও। আবার গুলি করল রিড। পরমুহূর্তে নিচে থেকে ভেসে এল গুলির শব্দ। পরপর সাত-আটটা গুলি হলো ট্রলার থেকে। কপ্টারটা লক্ষ্য করে গুলি করছে ভ্লাদিমিরের লোকেরা।

মাথা তুলল রানা। প্রায় নেমে এসেছে কপ্টার, পঞ্চাশ ফুটও ওপরে নেই আর। কিনারে যেখান দিয়ে উঠছে রানা ঠিক সেখানেই সার্চলাইটের আলোটা ফেলে রেখেছে পাইলট। আরেকটা গুলি করল রিড। এক সেকেন্ডের জন্যে মাথাটা নামিয়েই লাফ দিয়ে উঠে পড়ল রানা চূড়ার ওপর। পরমুহূর্তে আরেক ঝাঁক গুলির শব্দ হলো ট্রলার থেকে। আচমকা হেলিকপ্টারের পেছনটা একটু ঝুলে পড়ল নিচের দিকে। তারপর অনেকটা বেতাল ভাবে টলমল করতে করতে ধপাস করে মাটিতে এসে পড়ল ওটা। নিভে গেল সার্চলাইট।

এখনও কিনারেই দাঁড়িয়ে আছে রানা। তাড়াতাড়ি বোতলের মুখ খুলে ট্র্যান্সপারেন্সিটা বের করল ও। লাইটার বের করার জন্যে পকেটে হাত ঢোকাল, এমন সময় আবার শোনা গেল রিডের গলা, এবার আর ওয়াকি-টকিতে নয়, লাউড

স্পীকারে, 'খবরদার, রানা, হাত বের করে আনো পকেট থেকে...'

হাত বের করে আনল রানা, তবে খালি নয়। লাইটারটা বের করে এনেই লাফ দিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল ও। পর মুহূর্তে মাথার উপর দিয়ে চলে গেল গুলিটা। দাঁড়ানো থাকলেই কলজেটা এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যেত।

আর এক সেকেন্ডও সময় নষ্ট করা যায় না। দুটো হাতই কিনারের বাইরে নিয়ে গেল রানা। এক হাতে ধরা ট্র্যান্সপারেন্সিটা অন্য হাতে লাইটার। ক্লিক করে শব্দ তুলে জ্বলে উঠল গ্যাসলাইটার। ট্র্যান্সপারেন্সি ধরা হাতটা নিয়ে এল রানা ওটার ওপর। ওয়াকি-টকির সুইচটা অন করাই ছিল। বলল রানা, 'দেখো, ভ্লাদিমির।'

'হ্যাঁ, রানা, দেখতে পাচ্ছি, ধন্যবাদ তোমাকে।'

চিটপিট করে শব্দ হচ্ছে সেলুলয়েড পোড়ার, মৃদু একটা নাকজ্বলা গন্ধ। এক সেকেন্ড পর হাত থেকে ছেড়ে দিল রানা প্রায় পুড়ে যাওয়া ট্র্যান্সপারেন্সিটা দু'আঙুলে ধরে থাকা অংশটুকু পুড়তে বাকি রয়েছে এখনও। নিচে পড়তে পড়তে পুড়ল সেটুকু।

কিনার ছেড়ে চূড়ার খানিকটা ভেতর দিকে চলে এল রানা। অনেকক্ষণ ধরে রিডের তরফ থেকে কোন গুলি হচ্ছে না। কি ব্যাপার, গুলি শেষ নাকি? ঘাড় ঘুরিয়ে কপ্টারটার দিকে তাকাতে গেল রানা, ঠিক সেই মুহূর্তে আক্রান্ত হলো ও।

ঝাঁপিয়ে পড়েছে রিড ওর ওপর। বুকে ভর দিয়ে মাটিতে শোয়া অবস্থায় ছিল রানা, পিঠের ওপর পড়ল রিড। একমুহূর্তও দেরি না করে দু'হাতে রানার মাথাটা ধরে ঘাড় ভেঙে দেয়ার ভঙ্গিতে ঘুরিয়ে টানতে লাগল পিছন দিকে। পিছন দিকে কনুই চালাল রানা। পাঁজরের নিচে নরম জায়গাটায় লাগল রিডের। কোঁত করে একটা শব্দ করে ছেড়ে দিল ও রানার মাথা। পরমুহূর্তে এক ঝটকায় পিঠের ওপর থেকে রিডকে ফেলে দিয়ে সোজা হলো রানা। ইতোমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে রিডও। ঘুসি চালাল রানার মুখ লক্ষ্য করে। রানা মুখটা একটু সরিয়ে নিতেই পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল ঘুসিটা। কয়েক সেকেন্ডের জন্যে সাংবাদিকের ভূমিকা ভুলে গেল রানা—দড়াম করে থুতনির নিচে লাগিয়ে দিল একটা কড়া পাঞ্চ। দুই হাত দু'পাশে ছড়িয়ে পেছন দিকে দু'পা সরে গেল রিড। পরমুহূর্তে, একলাফে সামনে বেড়ে দুহাতে পরপর দুটো ঘুসি চালাল রানা, একটা নাকে, আর একটা দুই পাঁজরের মাঝামাঝি সোলার প্লেক্সাস বরাবর। নিঃশব্দে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল রিড।

ওয়াকি-টকিতে অনেকক্ষণ ধরে ভ্লাদিমিরের গলা শোনা যাচ্ছে। রিডের সঙ্গে ব্যস্ত ছিল বলে এতক্ষণ সেদিকে নজর দেয়ার সময় পায়নি। ওয়াকি-টকিটা তুলে নিয়ে বলল ও, 'কি ব্যাপার, ভ্লাদিমির, আবার কি চাই তোমার?'

'আমি কিছু চাই না। তোমার কিছু দরকার কি না জানতে চাইছি, ধরো ট্র্যান্সপোর্ট, বা...'

'না, আমার কিছু দরকার নেই, এবার কেটে পড়ো তো তোমরা।' হেলিকপ্টার হঠাৎ করে ওভাবে আছড়ে পড়ল কেন দেখতে গেল রানা। খোলা দরজা দিয়ে উঠে একটু সামনে এগোতেই বুঝতে পারল ব্যাপারটা। ককপিটের বাঁ পাশের জানালাটা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে মেঝেতে। গুলি খেয়েছে পাইলট। ঘাড়ের বাম

পাশ দিয়ে ঢুকে ওপাশ দিয়ে চলে গেছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেছে লোকটা। এ ছাড়া অক্ষতই আছে হেলিকপ্টারটা।

মৃতদেহটাকে টেনে হিঁচড়ে পেছনে নিয়ে এল রানা। সীটে লেগে থাকা রক্ত মুছে ফেলল পকেট থেকে রুমাল বের করে। আবার নেমে এল ও হোম অভ নস-এর উপর। রিডের অজ্ঞান দেহটা কাঁধে তুলে নিচের দিকে তাকাল একবার, চলে যাচ্ছে ভ্লাদিমিরের ফিশিং বোট। বোটের নাকটা লারউইকের দিকে নয়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রিডের দেহটা কাঁধে করে কপ্টারের দিকে এগোল রানা।

ত্রিশ সেকেন্ড পর হেন্ডারসনের ছোট্ট কুঁড়েঘরটার বিশফুট দক্ষিণে একটা ঝোপের ভেতর থেকে একজোড়া শ্বেত প্যাঁচা ভীত চোখে দেখল, বিশাল এক দানব পাখি উঠে যাচ্ছে আকাশে।

***